শ্রীরাম লীলা

পাবাবার একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী ও সাধ্যসাধনতত্ত্বকথা)

তদীয় শিষ্য

শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্.

এড্ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট, প্রণীত

তৎ শিষ্য

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., সম্পাদিত

প্রকাশক :
শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.
সম্পাদক, বামা মিশন
৫১নং চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী

চতুর্থ সংস্করণ
১লা বৈশাখ, ১৩৭২ সাল।

প্রাপ্তিস্থান :
(১) বামা মিশন কার্যালয়
৫১, চড়কডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী
(২) ডাঃ একাদশী মান্না
৯এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭
(৩) মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
(৪) বামা মিশন, ক্ষ্যাপাবার আশ্রম মন্দির
তারাপীঠ, বীরভূম

মুদ্রাকর :
শ্রীপরিমলকুমার বসু
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬



শ্রীশ্রীমহাত্মা বামা ক্ষ্যাপা

সূচীপত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মুদ্রাকর প্রমাদক্রমে ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর ৩৯৯ পৃষ্ঠা সংখ্যা না ছাপিয়া ৪০১ পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপা হইয়াছে, অবশ্য তাহাতে পৃষ্ঠাস্থ বিষয়বস্তু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আবার ৪৪৮ পৃষ্ঠা সংখ্যার পর ৪৪৯ পৃষ্ঠা সংখ্যার পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে ৪৪৭ পৃষ্ঠা সংখ্যা পুনরায় ছাপা হইয়াছে। এখানেও পৃষ্ঠাস্থ বিষয়বস্তু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পাঠক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

শ্রীবাম লীলা মধ্য ও অন্ত্য লহরী একত্র বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে সম্পূর্ণ আদি, মধ্য ও অন্ত্য লহরী এবং পাঠক মহলের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীমহাত্মা ক্ষ্যাপাবাবার বিদেহলীলার কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সন্নিবেশ করা হইল। বাবার মাহাত্ম্যে পাঠক মাত্রেরই হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হউক এই অভিপ্রায়।

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বামা মিশন

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীবাম লীলা পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ জনসাধারণে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছে। সব বইগুলি বিক্রীত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই সংস্করণে বইটি আরও একটু বর্দ্ধিত আকারে ছাপান হইল। ইহাতে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের মহাত্মা শ্রীশ্রীতারাক্ষ্যাপাজীর বৃত্তান্ত কিছুটা বিশদভাবে ও বসিরহাটের তারাক্ষ্যাপার সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সন্নিবেশিত হইল। কয়েকখানি নূতন ছবিও যোগ করা হইল। পরিশিষ্টে শিমূলতলায় সাধনা প্রবন্ধে তিনটি পর্য্যায়ে পঞ্চ মকার সাধনা, জপ সাধনা, যোগ সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠে সাধকদের তৃপ্তি হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অনেকের অনুরোধে মধ্য ও অন্ত্য লহরী একত্রে বাঁধান হইল, তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না।

মিশনের সহকারী সম্পাদক শ্রীশঙ্করপদ ভট্টাচার্য্য কাগজ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া, বসুশ্রী প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ সুলভে মুদ্রণ ভার লইয়া, মিশনের যুগ্ম-সম্পাদক ডাক্তার একাদশী মান্না আনুকূল্য ও উৎসাহ দিয়া, ডকটর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ডি-এস-সি, ডি-আই-সি (লণ্ডন), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাসায়নিক পরীক্ষক ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক, পুস্তকটির সম্পাদনা ও প্রুফ দেখিয়া দিয়া পুস্তকটির মুদ্রণ কার্য্য সুশৃঙ্খল করিয়া ক্ষ্যাপাবাবার আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বামা মিশন।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত শ্রীবাম লীলা অতি অল্পদিনে নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত আকারে দুইটি পৃথকভাগে প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শ্রীবামের অলৌকিক জীবন কাহিনী তদীয় অনুগৃহীত শিষ্যবর শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অমৃতময়ী লেখনী মুখে যে মধুক্ষরণ হইয়াছে তাহার আস্বাদে যে পাঠক পাঠিকা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন তা বলাই বাহুল্য। তাই পরিবর্দ্ধিত আকারে এই সংস্করণ অনতিবিলম্বে ছাপা হইল। ইহাতে ২য় ভাগে শাস্ত্রী মহাশয়ের ও অন্যান্য কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত তুরীয় গুরুর গুহ্যলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইতি—

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বামা মিশন।

প্রকাশকের নিবেদন

অভিনব সাধ্যসাধন রহস্য কথা শ্রীবাম লীলা তারাপীঠভৈরব শ্রীশ্রীমহাত্মা বামা ক্ষ্যাপাবাবার জ্ঞানভক্তি রসাত্মক অলৌকিক জীবনী সম্বলিত শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনা। আদি লহরী বহুকাল পূর্ব্বে লেখক বামা ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয়তম মন্ত্রশিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। তিনি বহু পরিশ্রমে বীরভূমের বহুস্থান ঘুরিয়া বামা ক্ষ্যাপা-বাবার সহিত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বহুলোকের সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট তাঁহাদের গোপন রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া শ্রীগুরুর মহিমা তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় ও ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহার রচিত শ্রীবাম লীলা বাস্তব সত্য ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ, স্বকপোল কল্পিত রচনা নহে যাহা অধুনাতম কোন কোন লেখক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন পরিচয়ের বালাই নাই বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন সুযোগ কখনও ঘটে নাই। অনিবার্য্য কারণে ও নানা বিরুদ্ধ ঘটনার চাপে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত মধ্য ও অন্ত্য লহরী এতদিন সাধারণ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ইচ্ছা সত্ত্বেও এই অমিয়গাথা যে জনসমাজে এতদিন প্রচার করিয়া পাঠকবৃন্দের তৃপ্তি সাধন করিতে পারি নাই, তাহার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। ভক্ত-মাত্রেই নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বামা মিশন।

কয়েকটি অভিমত

(১) গ্রন্থকার স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় বহুশ্রুত পুরুষ। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁহার গুরু তারাপীঠের সিদ্ধ মহাপুরুষ বামা ক্ষ্যাপাবাবার জীবন কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বামাক্ষ্যাপার আরও কয়েকখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য জীবনীতে একটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে। অপরাপর জীবনীগুলি পরোক্ষ। ... ... সর্ব্বজনারাধ্য গুরুর জীবনের দিব্যানুভূতির আঁচ এই আলোচনায় আমরা অন্তরে অনুভব করি। গ্রন্থাকারের শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার এই অনুভূতিকে দীপ্তি দিয়াছে। —আনন্দবাজার পত্রিকা, ২. ৬. ৫৭।

(২) লেখক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ও তন্ত্রশাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শ্রীবাম লীলায় ক্ষ্যাপাবাবার অলৌকিক জীবনীর সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে অনেক শাস্ত্রতত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছেন, যেমন বাহ্যপূজা ও যোগময়ী পূজা, জন্মমৃত্যু রহস্য, পঞ্চ মকার সাধনা, তন্ত্রে ভৈরবী সাধনা, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অবতারতত্ত্ব, কালীতত্ত্ব ইত্যাদি। —বসুমতী, ৩রা বৈশাখ, ১৩৬৩।

(৩) ···In Sri Bama Lila he depicts his Guru Bama Kheyapa-Baba, the renowned Kaula Saint of Tarapith as He revealed Himself to him and to some of His intimate disciples. Every anecdote described in the book has thus the stamp of authenticity hitherto unknown.

The sanskrit couplets on the top of each chapter read like the composition of some ancient Rishis, sweet as well as expressive and bear testimony to the erudition of the author.

—**Amrita Bazar Patrika**, 3. 6. 57.

(৪) ···Every Tantric is a mystic and how his inner self work is evident from the perusal of this vital biography of Sri Sri Bamakshyapa of Tarapith, Birbhum. ···Those who want to understand the inner essence of Tantricism must go through this book written by a saintly author who was not only a disciple of Bamakshyapa but passed many years in company of the great Saint. The vitality of the book is due to personal touch.—Amrita Bazar Patrika, Opinion on the third edition, 5. 4. 64.

(৫) …শাস্ত্রী মহাশয় বহু শ্রম সহকারে তাঁহার গুরুদেবের জীবন তথ্য সন্ধান ও সাধন ও উপদেশ প্রণালী প্রণিধান করিয়া প্রামাণ্য গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। …গ্রন্থটিতে সরস মাতৃভাবের সাধনার নিখুঁত চিত্র সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। —যুগান্তর, ১৬. ১২. ৬৩।

(৬) বাংলা তন্ত্রসাধনার ভূমি। … তারাপীঠ মহাশ্মশানে বীর বামাচার সাধনায় অনেকে সিদ্ধিলাভ করিয়া ভারতীয় সাধক সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি অনেকে এইস্থানে সফল সাধনা করিয়াছেন। মোক্ষদানন্দ ও কৈলাসপতির উত্তরসাধক বামাক্ষ্যাপাবাবা বোধকরি তারাপীঠের শেষ সিদ্ধসাধক। তাঁহার তিরোধানের পর বাহান্ন বৎসর অতীত হইয়াছে। তারাপীঠের মাহাত্ম্য আজও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।…

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন সংস্কৃত ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আবার একদিকে বুদ্ধিজীবী। তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি ক্ষ্যাপাবাবার দৈনন্দিন জীবন, ক্ষুদ্র বৃহৎ কথাকার্য সকলই বারবার যাচাই করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহারই ইতিবৃত্ত সরসভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষ্যাপাবাবার জীবনীর পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রতত্ত্ব, পঞ্চমকার তত্ত্ব, ভৈরবী সাধনা, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদির প্রসঙ্গ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অবতারণা করিয়াছেন। … তন্ত্রসাধনার অন্তর্গূঢ় অর্থ, মাতৃভাবের সাধনার চিত্রটি অব্যাহতভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। —বিশ্ববাণী, কার্তিক সংখ্যা ১৩৭০।

(৭) কাশীতে পাঠক মহলে সকলেই 'শ্রীবাম লীলা' পুস্তকটির একবাক্যে প্রশংসা করিতেছেন। সরল অথচ ভাবগম্ভীর ভাষায় মহাপুরুষের জীবনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এই প্রকার পুস্তক লেখকেরা পাঠক চিত্তকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র অলৌকিক ঘটনাবলীর অবতারণা জীবনী সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ মনে করেন, বাস্তববোধ একেবারে ভুলিয়া যান। এই পুস্তকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া সাহিত্যিক সুরুচি বোধের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি খুবই মনোজ্ঞ হইয়াছে ও বাঙ্গালী পাঠক মণ্ডলীর দ্বারা আদৃত হইবে আশা করি।

—অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী
২৪. ১২. ৬৩।

লেখকের জীবনী ও বাসা মিশন

শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল, এডভোকেট (কলিকাতা হাইকোর্ট) স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাইগ্রামে ১২৮১ সালে ১৯শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশচন্দ্র রায়ের মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক Literary Atlas, উপাধি-ভূষিত বিচক্ষণ পণ্ডিত, "পাশ্চাত্য সাহিত্যরথী" কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ইনি একমাত্র পুত্র। দ্বিতীয় ব্যাসের ন্যায় এই অপূর্ব্ব জ্ঞানবত্তার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কিশোরীমোহনকে আজীবন ৫০৲ মাসিক পেনসন্‌ দিয়াছিলেন। হরিচরণ বাল্যকালে জনাইয়ে কেদারনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে শিবপুর Higher Class English School হইতে প্রথম বিভাগে ১০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দুইটি বৃত্তি পান। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে এম্‌-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রাধাকান্ত সুবর্ণপদক ও শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আইন পাশ করিয়া রিপন কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়া হুগলী কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি দুইবার অস্থায়ী মুন্সেফের পদে কার্য্য করেন ও স্যর আশুতোষের আহ্বানে ইউনিভারসিটি আইন কলেজে ১৯১১—১৯১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ইনি কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর পদে বৃত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। যেমন পিতা তেমনি পুত্র। উভয়েই বাণীর বরপুত্র। "সেকালের জনাই" গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে "সংস্কৃত সাহিত্যে অসামান্য পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রীয় বিচারে অকাট্য যুক্তি, বক্তৃতায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তাঁহার সমসাময়িক সময়ে জনাই সমাজে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না।" ইনি রঘুবংশের ছয়সর্গ, ভট্টির প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গের কলেজ সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকাসহ 'দায়ভাগ' আইন অনুবাদ করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকার সুপুরুষ, মিষ্টভাষী, সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি দেবদেবীর স্তোত্র মুখস্থ বলিতেন, গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তিমান ছিলেন। বামা ক্ষ্যাপাবাবার সহিত তাঁহার মিলন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ অতি অদ্ভুত ব্যাপার। এ বিষয়ে তাঁহার রচিত শ্রীবাম লীলার অষ্টা লহরী হইতে সকল উপলব্ধি করিবেন। ইনি তন্ত্রশাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপন্ন। এত পাণ্ডিত্য, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান দেখি নাই। গুরুগত প্রাণ, প্রেমময় পুরুষ। ইহার রচিত শ্রীবাম লীলা পড়িলে শিশির ঘোষ প্রণীত "অমিয় নিমাই চরিতের" কথা মনে পড়ে। বামা ক্ষ্যাপাবাবার অলৌকিক জীবন কাহিনী অতি গোপন রহস্যাবৃত। শাস্ত্রী মহাশয় সেই গোপন রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইনি নিজের বলিতে কিছুই চাহিতেন না। দিবানিশি "জয়তারা" তাঁহার জপমালা ছিল। সুখদুঃখ তিনি সমজ্ঞান করিতেন। শ্রীগুরুর স্পর্শে ইনি যে অপার্থিব প্রেমধনের ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা অকাতরে দুই হাতে আপামর সাধারণে দান করিয়া গিয়াছেন। জাতি বিচার করেন নাই, ধনী নির্ধন বিচার করেন নাই আচণ্ডালকে আলিঙ্গন দান করিয়া ইনি চাহিয়াছিলেন জগতের তৃষিত তাপিত প্রাণ শ্রীবামের অহেতুক কৃপার পাত্র হইয়া প্রেম পীযূষ আস্বাদন করে। তাঁহার তাই চেষ্টা ছিল "বামা মিশন" গঠন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ইকড়ার জমিদার শ্রীবামের অন্যতম শিষ্য হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ও রামপুরহাটের উকিল শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মহাত্মা তারা ক্ষ্যাপা।

ইনি বামা মিশন গঠন করিয়া বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত আর্ত্ত আতুরের সেবার ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লন। বীরভূম, উত্তরবঙ্গ ও বাঁকুড়ায় এমন সুষ্ঠুভাবে সেবা কার্য্য পরিচালন করেন যে তদানীন্তন বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল কর্ম্মিদলের প্রধান অধ্যক্ষের সহিত বাঁকুড়ার বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে করমর্দ্দন করেন। তিনি যেসব যুবকদের আকর্ষণ করেন তন্মধ্যে কাটোয়ার সিতিকণ্ঠ সিংহ, কলিকাতার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার, গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার উকিল অভয়াপদ ভট্টাচার্য্য, বর্দ্ধমানের পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন গুহ, চণ্ডীচরণ সাম, অতুলচন্দ্র দাস ও এই অধম উল্লেখযোগ্য। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করি। তিনি

এই অধমের উপর বামা মিশনের সম্পাদকতার ভার অর্পণ করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় শ্রীবামের ভগ্ন আশ্রমগৃহ নগেন্দ্রনাথ বাগচীর দ্বারা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করান ও মিশনের সমবেত চেষ্টার ফলে বাবার ভোগরাগের নিত্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করান ও প্রথমে হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে যে তিরোধান মহোৎসব প্রবর্তিত হয় তাহার সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ব্যবস্থা করান। তিনি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর (২৫শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, সন ১৩৪৩ সালে) সহসা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হইয়া যে "জয়তারা জয়তারা" দিবানিশি জপমালা করিয়াছিলেন, সেই চিত্তাভ্যস্ত পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য মণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার বহু শিষ্যগণ মধ্যে কলিকাতা, কাটোয়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার দল প্রধান। তাঁহার আকর্ষণ ও দীক্ষাদান পদ্ধতি অদ্ভুত ছিল। তিনি কর্ণে মন্ত্র খুব কমই দিয়াছেন। ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টমূর্ত্তি হৃদাকাশে দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার রচিত শ্রীবামের শ্লোকাষ্টক স্তোত্র তাঁহার মুখে যে শুনিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে ও শ্রীবামে তদ্গত হইয়াছে। তিনি নিজের কোন গুণপনা স্বীকার করিতেন না। সবই শ্রীগুরু "বামের" দয়ায় হইতেছে বলিতেন ও শ্রীবামকেই গুরু বলিয়া দেখাইয়া দিতেন। এমন কি অশরীরী বামের সহিত যোগসূত্র বন্ধন করাইয়া দিয়া কত ভক্ত শিষ্যকে তরাইয়াছেন। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, এই অধম ও স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এতাদৃশী কৃপার পাত্র। তাঁহার গঠিত বামা মিশন পরে ক্ষ্যাপাবাবার নিত্য ভোগপূজা আরতির জন্য অন্যূন ১৮০০৲ টাকা ব্যয়ে ১৮৷৷০ বিঘা ধানের জমি ক্রয় করিয়াছে। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। অর্থ সাহায্য করেন পূর্ণবাবু, ধীরেন্দ্রনাথ রায় ও এই অধম। পূর্ণবাবু ১৩৪৪ সালে শত-বার্ষিকী উৎসব জাঁকজমকের সহিত পালন করেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই অধমের উপর সব দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ১৩৫৩ সালে বাবার আশ্রম ঘর খড়ের পরিবর্ত্তে টিন দিয়া ছাওয়া হয় প্রায় ২০০৲ টাকা ব্যয়ে। বাঁকুড়ার উকিল অভয়াপদ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতার ডাঃ একাদশী মান্না, মণিরামপুরের হরিপদ ঘোষ (পূর্ণবাবুর দাদা), গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি অর্থ সাহায্য করেন। কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার আমায় এ বিষয়ে বহু সাহায্য করেন। আশ্রম ঘরে শ্রীবাম ও একদিকে মহাত্মা তারাক্ষ্যাপা ও অন্যদিকে

মদীয় গুরুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিকৃতি এক বেদীর উপর স্থাপনা করান। এখানেও নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য সুরেন একনিষ্ঠ কর্ম্মী। তারাপীঠ আশ্রম ও মিশনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সুপরিচালনা তাঁহার নিত্য চিন্তার বিষয়। বর্ত্তমানে ভক্ত নগেন্দ্রনাথ বাগচী যিনি ক্ষ্যাপাবাবার ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষা করেন ও আশ্রম ঘর নির্ম্মাণে বহু পরিশ্রম করেন, তিনি নিজ সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রম ঘর রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া মিশনের ঘরে তারাপীঠে আছেন। ইনি ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয়পাত্র। একবার নিজগ্রামে শিকারে গিয়া গুলী বিদ্ধ হইয়া মরণের মুখ হইতে বাবার দয়ায় পুনর্জীবন লাভ করেন। সে ঘটনা স্থানান্তরে বিবৃত। পাণ্ডা ইন্দ্রপদের উপর বাবার সেবাপূজার ভার শাস্ত্রী মহাশয় দিয়া যান। তাঁহার দেহান্তে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী কুণ্ডলিনী দেবী ও তাঁহার ভ্রাতা যোগেশ পাণ্ডা দ্বারা এই কার্য্য চলিতেছিল বর্ত্তমানে মিশনের কর্ম্মী দ্বারা চলিতেছে। মিশন এই কার্য্যে সব ব্যয় ভার বহন করে। যে উৎসব বাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে হইত এখন তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া শিবরাত্রি তিথির পর তাঁহার জন্মোৎসব পালন করা হয়। ন্যূনপক্ষে ৫০০০ হাজার ভক্ত সমাবেশ হয় ও বাবার ভোগ প্রসাদ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করে। এ কার্য্যে রামপুরহাটের উকিল ৺ভোলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান। এই কর্ম্মের গুরুভার গত কয়েক বৎসর হইতে সন্ধিগড়া বাজারের জমিদার উদারপ্রাণ অনাদিপ্রসাদ রায় বহন করিতেছেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া কর্ম্মিদল লইয়া সব ব্যবস্থা পরিচালনা করেন ও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জল গ্রহণ করেন না। শ্রীবাম তাঁহার মঙ্গল করুন।

মিশন আর একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিয়াছে। শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত শ্রীবাম লীলার আদি, মধ্য ও অন্ত্য লহরী একত্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আদি লহরী শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩৬৪ সালে মিশন শুভ শিবরাত্রি মহানিশায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তাঁহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত শ্রীবামের মর্ম্মরমূর্ত্তি তাঁহার আশ্রম গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া ও তাঁহার নিত্য ভোগরাগারতির ব্যবস্থা করিয়া ধন্য হইয়াছে। ১৩৬৭-৬৮ বর্ষে মিশন আর একটি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সাফল্য

লাভ করিয়াছে। শ্রীক্ষ্যাপাবাবার আশ্রম গৃহটি টিনের ছাউনির পরিবর্ত্তে পাকা মন্দির ও নাট মন্দির সুচারুরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছে। বাবা যে ঘরে বাস করিতেন সেটিকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মহান কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছে। তবে এখনও পাকশালাটি সমাপ্ত হয় নাই। জনসাধারণ ও ভক্তগণের আনুকুল্যে ইহা সম্ভব হইবে ভরসা হয়। সকলে এ বিষয়ে অবহিত হইলে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় ১৯।৭।৬২ তারিখে বামা মিশন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ ধারা অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ কোন কোন স্থানে শ্রীবামের নামে কয়েক বৎসর যাবৎ উৎসব করিতেছেন। সকলই শ্রীবামের ইচ্ছা। যিনি যাহা করেন করুন। আমি বলি অতিগহন তারাবিদ্যা শিমূলতলার গভীর গুহায় নিহিত, "ঘৃতবৎ পয়সি নিগূঢ়ং"। যদি কেউ বীর সন্তান উপযুক্ত শিষ্য থাকেন, আসুন, শ্রীগুরু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় আছেন। অমৃত আস্বাদন করুন। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। জয়তারা জয়বাম।

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বামা মিশন।

শ্রীশ্রীমাতৃপ্রশস্তিঃ

মাতশ্‌শশ্বৎসুতহিতরতে স্নেহকারুণ্যমূর্ত্তে
শ্রেয়োবর্ষৈস্‌স্নপয়সি সুতং স্বর্গতাপি প্রসন্না।
দেবি ত্বং মে প্রকটিতবতী বামদেবং বিদেহা
দিব্যা রম্যা তব করুণয়া গীয়তে বাম লীলা॥

নশ্বরধরণী ছাড়ি গিয়াছ মা দিব্যধাম।
সুতহিততরে তবু সচকিতা অবিরাম॥
স্নেহের মুরতি তুমি করুণার প্রস্রবণ।
বরষিছ সুতশিরে শ্রেয়োধারা অনুক্ষণ॥
বিদেহা যখন তুমি শোকে আমি মুহ্যমান।
ফুটালে এ হৃদে দেবি! বামদেব মহীয়াম্‌॥
বিমল বিরাজ শান্ত বাম লীলা সুধাধার।
আমাসম জন গাহে করুণা সে মা তোমার॥



শ্রীশ্রীমহাত্মা বামা ক্ষ্যাপা

শ্রীবামাষ্টকম্

আনন্দচিৎ সত্যমরূপমাদ্যং
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তমীশম্।
লীলাময়ং ব্রহ্মপরম্পুরাণং,
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ১ ॥

বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ,
বামাভিধানং পুরুষং ভজামঃ।
বামাভিধানং পুরুষং স্মরামঃ,
বামাভিধানং পুরুষং বিশামঃ।
তং ক্ষিপ্তবামাচরণং নমামঃ,
শ্রীবামমাদর্শগুরুং নমামঃ।
তং সিদ্ধবামাচরণং নমামঃ।
শ্রীবামমানন্দশিবং নমামঃ ॥ ধ্রুঃ ॥

উর্দ্ধোর্দ্ধকামং কলিজীববৃন্দং
শ্রীবীরভূমৌ ধৃতবিপ্ররূপম্।
শ্রীবামতারাকরুণাবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ২ ॥

আজন্মতারাচরণৈকলক্ষ্যং
তারাময়প্রাণমনঃশরীরম্।
লোকোত্তরং ভক্তিময়াবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৩ ॥

কৌমারসন্ন্যাসমিরস্তভোগং
ঘোরশ্মশানালয়মাশুতোষম্।
ত্যাগাবতারং কুলনাথনাথং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৪ ॥

তারাপদপ্রেমমধুপ্রমত্তং
তৎপ্রেমসংপ্লাবিতমর্ত্ত্যলোকম্ ।
তারাময়প্রেমপরাবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৫ ॥

তারাবিবেকোদিতবিশ্বতত্ত্বং
বাণীশ্বরং কালমনোরুতজ্ঞম্ ।
জ্ঞানাবতারং ধৃতমুগ্ধভাবং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৬ ॥

যোগেশ্বরং ভিন্নত্রিসপ্তচক্রং
কূটস্থিতং তন্ময়মিদ্ধবোধম্ ।
ছায়াবপূর্ব্যাপ্তত্রিসপ্তলোকং
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৭ ॥

আলোকদীক্ষাংশুবিবুদ্ধপদ্মান্
শিষ্যান্ শরণ্যং পরিদর্শয়ন্তম্ ।
রূপাক্ষরারূপতুরীযতত্ত্বং ।
বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীবামমহিমাপারাম্ভোধিমজ্জনপাবনম্ ।
শ্রীহরিচরণস্যান্তঃ শ্রীবামকৃপয়োদিতম্ ॥
বামাষ্টকমিদং রম্যং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ।
শ্রীবামচরণাম্ভোজে সন্ধত্তামচলাং রতিম্ ॥

শ্রীবাম স্তোত্র

অনাদি অরূপ তুমি সচ্চিদানন্দময় ।
নিরঞ্জন নিত্য তুমি অনন্ত নিলয় ॥
লীলাময় ব্রহ্ম তুমি পরম পুরাণ ।
শ্রীবাম ! পুরুষ তুমি তোমায় প্রণাম ॥
তুমি হে আদর্শ গুরু তোমায় প্রণাম ।
"ক্ষ্যাপাবামাচরণ" নাম তোমারে প্রণাম ।
তোমারে ভজিয়া, তোমারে স্মরিয়া
তোমাতে মজিয়া, যেন করি হে প্রয়াণ ॥ (১)

উদ্ধারিতে কলিজীবে বীরভূমে বিপ্রগৃহে ।
করুণার অবতার ধর "বাম" নাম ।
শ্রীবাম পুরুষ তুমি, তোমারে প্রণাম ॥ (২)

জন্মাবধি লক্ষ্য তব "তারামা" চরণ ।
তারা পদে সঁপিয়াছ দেহ প্রাণ মন ॥
অদ্ভুত ভক্তি রসে তব অবতরণ ।
শ্রীবাম, পুরুষ তুমি, করি তোমায় নমন ॥
করি তোমায় স্মরণ ।
করি তোমায় ভজন ।
তোমার জলধি মাঝে করি নিমজ্জন ॥ (৩)

আকুমার সন্ন্যাসী তুমি, ত্যজি অভিলাষ ।
লইয়াছ আশুতোষ ! শ্মশানেতে বাস ॥
কুল-নাথ-নাথ তুমি ত্যাগে সুমহান্ ।
শ্রীবাম ! পুরুষ তুমি, তোমারে প্রণাম ॥ (৪)

তারাপদ প্রেম তোমা করিল পাগল।
ডুবাইলে সেই প্রেমে মর্ত্ত্যবাসিদল ॥
তোমাসম তারাপ্রেম কে দেখাবে আর।
শ্রীবাম আদর্শ গুরু ! নমি বারে বার ॥ (৫)

হ'লে বাণীশ্বর করি তারা কৃপা লাভ
উদ্ঘাটিত বিশ্বতত্ত্ব দেশ কাল গূঢ়তথ্য
পূর্ণজ্ঞান পেয়ে তবু ধর মুগ্ধ ভাব।
চক্রদল করি ভিন্ন হ'লে যোগেশ্বর
ভুলিলে আপন সত্ত্বা ভূমানন্দে ভোর
লভিলে প্রকাম্য ব্যাপ্তি পুরুষ প্রধান
শ্রীবাম! আনন্দগুরু! তোমারে প্রণাম। (৬+৭)

শরণ্য শিষ্যগণে দেখাইলে পথ।
(তব) মৌন দীক্ষা সুকৌশলে ছোটে চিত্তরথ।
অরূপ তুরীয় তত্ত্বে, জয় গুণ ধাম।
শ্রীবাম! আদর্শ গুরু তোমায় প্রণাম।
জয় জয় বাম জয় জয় জয় বাম
জয় তারা বাম জয় জয় তারা বাম। (৮)

শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত শ্রীবামাষ্টকম্ অবলম্বনে
তৎশিষ্য শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত।

॥ শ্রীবামদেবায় নমঃ ॥

আদি লহরী আখ্যায়িকার পূর্ব্বাভাস

জয়তু জয়তু তারাপ্রেমোন্মত্তোহি ব

বাংলা সন ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার শিবচতুর্দ্দশী। এই পুণ্যতিথিতে শ্রীশ্রীমহাত্মা বামাক্ষ্যাপার ধরায় আবির্ভাব। তিনি নিত্য সিদ্ধ মহাপুরুষ তারাপ্রেমোন্মত্ত। বীরভূম জেলার তারাপীঠের সন্নিকট আটলা গ্রামে ভক্ত সর্ব্বানন্দ ও পুণ্যশীলা রাজকুমারীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। বাল্যকালে নাম শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আটলা গ্রাম রামপুরহাট মহকুমায় অবস্থিত। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। সিদ্ধপীঠ। তারাপীঠ হইতে দুই মাইলের মধ্যে। এই তারাপীঠে শ্মশানের শিমুল বৃক্ষতলে বসিষ্ঠের সিদ্ধাসন। প্রাচীন স্থান, পুণ্যতোয়া দ্বারকা নদীতীরে অবস্থিত। বসিষ্ঠ হইতে তান্ত্রিকসিদ্ধ সাধকপরম্পরা এই আসনের অধিকারী। সর্ব্বশেষ শ্রীবাম এই আসন অধিকার করেন। তারাপীঠে শ্মশানের অনতিদূরে তারামার মন্দির বিদ্যমান ও জীবৎকুণ্ড নামে পুষ্করিণী। ভক্তমাত্রেই এ পবিত্রস্থানে আসিয়া অপার্থিব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। পথের ক্লেশ ভুলিয়া যান ও মনপ্রাণ অভূতপূর্ব্ব আনন্দেউদ্বেল হইয়া উঠে।

বীরভূম জেলা তন্ত্রাচারের নীড়। ৫১ পীঠের ৪টী পীঠই এই জেলার অন্তর্ভুক্ত। যথা—ফুল্লরা (লাভপুর), কঙ্কালী (বোলপুর), নন্দিকেশ্বরী (সাঁইথিয়া), নলাটেশ্বরী (নলহাটী)। দুইটি বিশিষ্ট সিদ্ধপীঠ আবার এই জেলায় অবস্থিত—বক্রেশ্বর ও তারাপীঠ। বাংলায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরভূম জেলায় তন্ত্রের আচরণ ও অনুষ্ঠান পালন করিতেন বহু ত্যাগী ও শক্তিশালী সাধক। দেশে তখন একদিকে যেমন একটা ধর্ম্মের অন্তর্প্রবাহ ছিল, পল্লীগ্রামের সাধারণ লোকও অনেকে সরল ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিল।

বামাচরণের বাল্যজীবন সুখের ছিল না। সর্ব্বানন্দের কিছু সংস্থান ছিল না। বামাচরণ ও কনিষ্ঠ পুত্র রামচরণকে লইয়া চণ্ডীগান, রামায়ণ ও মহাভারতের গান গাহিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। ইহাতে লাভের মধ্যে এই হইল বামাচরণ কিছু শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইলেন ও সঙ্গীতে জ্ঞানলাভ

করিলেন। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন চলিল না। সর্ব্বানন্দ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে সংসার চলা ভার। ছেলেরা শিশু। মাতা রাজকুমারী কি করেন অগত্যা পুত্র দুইটিকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলেন। মাতুল ঘোর সংসারী লোক। তিনি বড় ভাগিনেয়কে গোচারণের ভার দিলেন। বামাচরণ মাঠে গোমাতাকে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিতেন ও নিজে গাছতলায় বসিয়া "আকাশ তারা" দেখিতেন। ফলে গোমাতা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী চাষীদের ফসল উদরসাৎ করিতে লাগিল ও মাতুলের কাছে ক্রমশঃ নালিশ হইতে লাগিল। মাতুল প্রথম প্রথম ধমক দিয়া প্রহারের ভয় দেখাইয়া সাবধান করিয়া দিলেন। পরে উত্তম মধ্যম দিলেন। কোন ফলই হইল না। মা নিরুপায় দেখিয়া নিজের ভিটায় ছেলেদের লইয়া আসিলেন। আত্মভোলা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন—পুত্র পূর্ব্ববৎ অকাজেই রহিলেন। কখনও কাহারও শালগ্রাম শিলা মন্দির হইতে সংগ্রহ করিয়া জলে চুবাইয়া রাখিতেন। কখনও বা নদীধারে বালুকাতে প্রতিমা গড়িয়া ফুল দিয়া পূজা করিতেন। কখনও তাড়নার ভয়ে খড়ের গাদায় লুকাইয়া থাকিতেন ও সেই গাদায় আগুন লাগাইয়া দিতেন ও সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে লম্ফ দিয়া অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসিতেন। একবার দেখা গেল স্থানীয় সরকারদের গৃহ হইতে শালগ্রাম শিলা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সরকার বংশ তাঁহাদের পরম হিতৈষী ও সরকার গৃহিণী তাঁকে পুত্রবৎ যত্ন করিতেন। তাঁহার ঠাকুর নাড়া বাতিক আছে জানিয়া দুর্গাদাস সরকার তাঁহাকে ডাকাইয়া তথ্য জানিতে চাহিলেন। উত্তরে বাম বলিলেন, "ঠাকুর জল জল করিয়া চেঁচাইতেছিল, আমি পথে যাইতে যাইতে শুনিয়া চিলে নদীতে ডুবাইয়া রাখিয়াছি।" তখন ঠাকুর আনান হইল। খুব পিটন খাইয়া বাম তদবধি ঠাকুর নাড়া গুরুজ্ঞান করিলেন। গুরুজ্ঞান অর্থাৎ ত্যাগ। তাঁহার ভাষা বিচিত্র। যেদিন খড়ের গাদায় আগুন লাগাইয়া দেন সেইদিন ঘটনাক্রমে ঐ অঞ্চলের দারোগাবাবু কোন জরুরী কাজে ঐ গ্রামে তদারকে আসেন। "চ্যাবা" বামাচরণকে ভয় দেখাইবার জন্য গ্রামবাসী তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া দারোগার হাতে জিম্মা করিয়া দিয়া সব ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। দারোগা ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলেন। বাম নির্ব্বিকার। বালক বয়সে

পুলিশের হেপাজতে যাওয়া খুবই আতঙ্কের কথা। দারোগা তাঁহার আনমনা হাবভাব ও সরল নির্ভীক স্বীকারোক্তিতে অতিমাত্রায় চমৎকৃত হন এবং তাঁহাকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইয়া বিদায় দেন।

বামের আর একটি নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল তারাপীঠ শ্মশান পরিক্রম। তারামাকে দিনান্তে একবার না দেখিলে যেন তাঁহার প্রাণে শান্তি হইত না। তিনি তারাপীঠে আসিয়া কখনও আপন মনে গান গাহিয়া নাচিতেন, কখনও তারামাকে দেখিয়া দেখিয়া হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও শ্মশানের ফুল তুলিয়া আনিয়া "তারামা নে" বলিয়া ছুঁড়িয়া দিতেন, মা নিলেন কিনা তিনিই জানেন। পরে একটু বয়স্ক হইলে সাধক ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে মিশিয়া গাঁজা ভাঙ্গ কিছু কিছু অভ্যাস করিলেন। মা জানিতে পারিয়া আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে ঘরে খিল দিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কে মুক্ত বিহঙ্গমকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিতে পারে? বাম ভাণ করিয়া মুখ দিয়া ফেণা বাঁটিতে আরম্ভ করিলেন ও এমন বিকট শব্দ করিলেন যে মা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দরজা খুলিয়া দিতে পথ পান না। দরজা খোলা পাইয়া বাম একেবারে দ্বারকাতীরে উপস্থিত, প্রাচীন তারাপীঠ শ্মশানের অপর পারে। দ্বারকা কূলে কূলে বহতা। বাম বিহ্বল হইয়া দণ্ডায়মান। এমন সময় জলদগম্ভীর স্বরে আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া শব্দ উত্থিত হইল, "ব্রাহ্মণ বালক দাঁড়াও, তুমি পাবার অধিকারী।" কিশোর বাম বিস্ময়চকিত হইয়া দেখিলেন, যে বসিষ্ঠাসনের তদানীন্তন অধিকারী ব্রজবাসী কৈলাসপতি মহারাজ খড়ম পায়ে খরস্রোতের উপর দিয়া হাঁটিয়া দ্বারকা পার হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ডান হাতটি ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "কি দেখিতেছ?" বাম বলিলেন—"মরা তুলসী গাছ।" ভৈরব বলিলেন—"তুলসী জিউ, তুলসী জিউ, তুলসী জিউ।" একটি মরা তুলসী গাছ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তীরে লাগিয়াছিল। তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই ঘটনা। বাম পরে বলিতেন—"বাবা, গুরুর আশ্চর্য্য মহিমা। মরা তুলসীগাছে পরে মঞ্জরী ধরিল।" এই বেধ দীক্ষা বা স্পর্শ দীক্ষা, শিক্ষা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা। দীক্ষার পর বাম একপ্রকার গৃহবাস ত্যাগ করিলেন। শ্মশানে গুরুর সাহচর্য্যে রহিলেন। কাঙ্গালিনী মা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। পুত্রকে যে কাজ করিতে বলিয়াছিলেন

এবং সুপুত্র যে তারামার চরণে আত্মনিয়োগ জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বাছিয়া লইবেন, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। তিনি আসিয়া কৈলাসপতিকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। পুত্রকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। শ্রীগুরু বলিলেন, "মা, কেন কাতর হও। তোমার ছেলের ভার আমি নিলাম, ও আর ঘরে ফিরিবে না।" মা চোখের জল আঁচলে মুছিয়া তারামার কাছে ছেলের মঙ্গল কামনা করিয়া ঘরে ফিরিলেন। কৈলাসপতিকে সে অঞ্চলে সকলে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া জানিত। যখন তিনি আশ্বাস দিলেন, তখন আর ভয় কি? সবই তারামার খেলা।

এই বসিষ্ঠাসনের উগ্রসাধক ব্রজধাম হইতে ভৈরবীসহ তারাপীঠে আসেন বামকে দীক্ষা দিবার মাত্র ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার কণ্ঠে তুলসীমালা ও রুদ্রাক্ষমালা দুই-ই ছিল। তিনি আটলায় সরকারবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে মাঝে মাঝে থাকিতেন। বাম ঐ সরকার বাটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন ও সাধুর নিকট যাতায়াত তাঁহার অবাধে চলিত। কি শিক্ষা নীরবে চলিত তাঁহারাই জানেন, তবে সকলে দেখিত আনমনা বাম যেন কৈলাসপতির নিকট সহজভাবে থাকিত। তখন তাঁহাকে যেন সে বাম বলিয়া চেনা যাইত না। বিবিক্ত পুরুষ কৈলাসপতিও যেন বামের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন। এ কিসের পূর্ব্বাভাষ? কেহই তখন বুঝে নাই যে বামকে দীক্ষা দিয়া বসিষ্ঠাসনের অধিকার দেওয়াই তাঁহার তারাপীঠে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য। দীক্ষাপর্ব্ব পূর্ব্বেই নিভৃতে সমাপ্ত হইয়াছে। এইবার আসন অধিকারের পালা। সে ব্যাপার আরও আকস্মিক ও বিচিত্র। এমন কি গুরু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ও চমৎকৃত। এই পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে বাম স্বয়ং সিদ্ধ, গুরুকরণ তাঁহার কাছে কেবল লৌকিক ব্যাপার মাত্র।

বাম অবলীলাক্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার আশ্রয়ের চিন্তা নাই, লজ্জাবস্ত্রের চিন্তা নাই, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে রক্ষার জন্য বাসগৃহের চিন্তামাত্র নাই।

নাটোরের রাজকর্ম্মচারী দুর্গাদাস সরকার যখন দেখিলেন যে বাম সংসারের গণ্ডী পার হইয়া শ্মশান বাসই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার দেহধারণের ব্যবস্থা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্থির করিয়া দিলেন। তারামার প্রসাদ

বাম নিত্য পাইবেন আর তারামার নিত্য ফুল তুলিয়া দিবেন, বিনিময়ে মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি তাঁহার মা পাইবেন। চিরহিতৈষী 'সরকার কাকা' ত এই ব্যবস্থা করিলেন দুস্থ পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু এই সামান্য ফুল তোলা কাজও, যাহা সরকার মশায় মনে করিলেন বাম আগ্রহ সহকারে করিবে, বামের ধাতে সহিল না। দিবানিশি 'তারামা' অনুধ্যান মাত্রই তাঁহার কাজ। অন্য কিছু নহে। পাণ্ডা পূজারীর হুকুমে বাম রোজ সাজি হাতে যান শ্মশানে ফুল তুলিতে—কোন কোন দিন সাজি হাতে অবাক হইয়া নীরবে ফুল হাতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পূজার সময় হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে তাঁহার হুঁশ হয়, কোনদিন বা হুঁশ হয় না, তিনি নিশ্চল পাথরের মত শ্মশানে বসিয়া থাকেন। এইসব অসুবিধার কথা সরকার কাকার কানে গেলে তিনি বামকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়া পূজার আয়োজন চন্দন ঘষা, পুষ্পপাত্র সাজান ইত্যাদির ভার দিলেন। এ কাজেও তাঁহার কোন ঔৎসুক্য দেখা গেল না। তিনি পূজারীর তাড়নায় চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করেন, ক্ষণেক পরে তারামার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বেহুঁশ হইয়া যান। একাজেও অচল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ভোগ রাঁধিবার কাজে দেওয়া হইল। কড়ায় দুধ দিয়া বাম তন্ময়। দুধ পুড়িয়া ধরা গন্ধ উঠিল। সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে বাম বসিয়া আছেন, দুধ ধরিয়া উঠিয়াছে। পিটন দিয়া তাঁহাকে আপাততঃ বিদায় দেওয়া হইল। বামের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। এই সময় তারাপীঠে চতুর্দ্দশীর মেলায় মুর্শিদাবাদ কাছারীর নাটোরের কর্ম্মচারী মৈত্র মহাশয় তদারকে আসিলেন। তিনি শুনিলেন যে সরকারের তহবিল হইতে বামকে অযথা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার এক পাচকের প্রয়োজন—এই সবল সুস্থকায় ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা চলিবে। বাম প্রস্তাব শুনিয়া যাইতে নারাজ। শেষে একজন পাণ্ডা মুর্শিদাবাদে "গঙ্গামা আছেন, তাঁহাকে দেখিবি না" এইকথা বলায় বাম রাজি হইলেন। মৈত্র মহাশয় মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথপুর কাছারীতে বামকে লইয়া গেলেন। সেখানে রান্নার ভার দিলেন। তারাগত প্রাণ বাম চুল্লীর পাশে ধ্যানে মগ্ন। অন্ন দগ্ধ হইয়া গেল। মৈত্র মহাশয় অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাকে রন্ধন কৌশল শিখাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছু ফল হইল না।

কোন দিন অন্ন দগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ হইত, ব্যঞ্জন অলবণ বা বেশী লবণ পড়িত। এইরূপে মাসাধিক কাল কাটিল। বাম স্নান করিতে যাইয়া গঙ্গামাকে বলিতেন—"মা আমায় তারাপীঠে ফিরাইয়া দে।" অবশেষে মৈত্র মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তারাপীঠে পাঠাইয়া দিলেন। তারাপীঠে তাঁহার তারামার প্রসাদ ও বেতন হুকুম দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

যাত্রীগণ বামের পরিচর্য্যার ভার লইলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। ১২৭৬ সালে মন্বন্তরে বাংলা বিধ্বস্ত হইল। সর্ব্বত্র অন্নভাবে হাহাকার উঠিল। তখন মোক্ষদানন্দ নামে যে তেজস্বী সাধক তারাপীঠে সাধনা করিতেন, তিনি বামের উপগুরু বিশেষ। তিনি বামকে সঙ্গে লইয়া তারাপীঠের অদূরবর্ত্তী ডাবুকে কৈলাসপতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কৈলাসপতি উন্নত সাধক। তিনি বামকে দেখিয়াই চিনিলেন—এ অসাধারণ যুবক নিত্যসিদ্ধ কৌল। তিনিও তাঁহাকে আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুদিন ডাবুকে থাকিয়া বামের প্রাণে তারাপীঠের জন্য টান ধরিল। তিনি দুর্ভিক্ষের দুর্নিবার ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তারাপীঠে ফিরিলেন। এ সময় তিনি কয়েকদিন পদ্ম বা শালুকের গোঁড় খাইয়া কাটাইলেন। অবশেষে এমন অবস্থা আসিল যে শালুকও দুর্লভ হইল। তখন না খাইয়া শ্মশানে পড়িয়া রহিলেন। পাষাণী তারামার প্রাণ এবার গলিল। নাটোরের ছোটতরফের রাণীমা স্বপ্নে দেখিলেন তারামা তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমার আজ দু'দিন খাওয়া হয় নাই, ব্যবস্থা করিস্।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তারাপীঠে সংবাদ লইবার জন্য কর্ম্মচারীগণকে তাগিদ দিলেন। খোঁজখবর লইয়া জানা গেল, তারামার সেবার কোন ত্রুটি নাই। পরদিন রাণীমা আবার স্বপ্ন দেখিলেন। রাণীমা বড় উদ্বিগ্না হইয়া মুর্শিদাবাদের নায়েবকে সত্বর তদারকে পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন যেন মার সেবার কোন বিঘ্ন না থাকে, তাহার বন্দোবস্ত সত্বর করিয়া সংবাদ দিতে। নায়েব অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "এক ব্রাহ্মণ যুবক পাগলা সাধক কয়েকদিন উপবাসী আছেন, তাহা ছাড়া আর কোন বিঘ্ন হয় নাই।" রাণীমা সেই হইতে হুকুম দিলেন—"এই সাধু যতদিন তারাপীঠে থাকিবেন দুপুরে মার ভোগ অন্ন ও রাতে ৪ খানি লুচি ও দুধ প্রসাদ পাইবে। যেন অন্যথা না হয়।" গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং

বলিয়াছেন—"যাঁহারা আমাভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া আমাকেই সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করে, সেই সকল আমাতে একমাত্র নিষ্ঠগণের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ আমিই করি।" বাম যে তারামা ছাড়া জানেন না। তারামা তাঁহার মুখ না চাহিলে কে চাহিবে। তাই তারামা তাঁহার শরীর যাত্রাদির ব্যবস্থা এইভাবে করিলেন।

বাম এমনই গূঢ়ভাবে আত্মগোপন করিতেন, বাহিরে পাগল সাজিয়া থাকিতেন যে সাধারণ লোক ত দূরের কথা মোক্ষদানন্দ বাবা, এমন কি কৈলাসপতি মহারাজও বামের প্রকৃত অবস্থা সঠিক অবগত হন নাই। বাম পরিচয় দিলেও প্রথম প্রথম তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। একদিন বাম বলিয়া উঠিলেন—"বাবা শ্মশানে এক মহাকায়া রাক্ষসী আসিয়াছে।" মোক্ষদানন্দ ও কৈলাসপতি শুনিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন বামের চক্ষু খুলিয়াছে ও সূক্ষ্মদর্শন জ্ঞান আসিয়াছে। পরে একদিন বাম যখন সভয়ে বলিলেন—"বাবা কি তাজ্জব ব্যাপার! শ্মশানে এক ব্যাঘ্র আসিয়াছে"। অমনি পাণ্ডারাও লাঠি সোটা লইয়া সাজ সাজ রবে শ্মশান ঘেরাও করিল। কোথায় বাঘ! এ বামের ক্ষ্যাপামি মনে করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিল। মোক্ষদানন্দ মনে করিলেন, বামের মন্ত্রের উগ্রতা জন্য কিছু সংস্কার দরকার। তিনি কৈলাসপতির মত লইয়া তাঁহার অভিষেক করাইলেন। বাম দ্বিরুক্তি করিলেন না। ইহা কি পূর্ণাভিষেক? পরে একদিন গভীর রাতে যখন কৈলাসপতি ও মোক্ষদানন্দ শিমূলতলায় চক্রানুষ্ঠান করতঃ ইষ্টদেবীকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন (এরূপ তাঁহাদের নিত্যই চলিত), বাম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে বাম জিজ্ঞাসা করিলেন "কার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন বাবা।" তাঁহারা বামকে অনধিকারী বিবেচনা করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন বাম তাঁহাদের আহূত দেবীর রূপ বর্ণনা করিলেন। বলিলেন—"কি কথা কহিতেছিলেন বাবা?" কোন উত্তর না পাইয়া নিজেই যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাঁহার ইঙ্গিত দিলেন। উভয় গুরুই কিছু বিস্মিত হইলেন কিন্তু মনে করিলেন বাম অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছে। তিনি যে সিদ্ধ হইয়াছেন তাহা তাঁহারা বুঝিলেন না। বাম নিত্যই গুরু কৈলাসপতিকে বসিষ্ঠাসনে গঞ্জিকা সাজিয়া দিতেন।

গাঁজার কলিকায় আগুন ধরাইয়া গুরুর হাতে দিতেন। গুরু তাঁহার নিয়মমত কলিকাটি আসনের সামনে রাখিয়া ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া দিতেন। পরে উঠাইয়া লইয়া নিজে টানিতেন ও শিষ্যকে প্রসাদ দিতেন। একদিন এইরূপ প্রথামত গাঁজার কলিকা ইষ্টকে নিবেদন করিতেছেন এমন সময় বাম কলিকা উঠাইয়া লইয়া নিজে গুরুর প্রসাদের অপেক্ষা না রাখিয়া টানিতে লাগিলেন। গুরু চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিয়া অবাক! কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন "এ ছেলে ত এত দুর্বিনীত নহে। তবে কেন এরূপ করিল?" আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পরে ধ্যান ভাঙ্গিলে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, তবে তুমিই পাহারা দাও। আমি চলিলাম।" বাম বলিতেন, "আমার আশ্চর্য্য গুরু বাবা, তিনি ভৈরবী মার সঙ্গে আকাশে উড়ে গেলেন।" সত্যই তারপর হইতে আর কেহ তাঁহার সন্ধান পায় নাই। এই হইল বামের আসন অধিকার। সিদ্ধগুরু মুহূর্ত্তে বসিষ্ঠাসন সিদ্ধাসন সিদ্ধসাধক শিষ্যকে ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই ঘটনা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, বাম বসিষ্টগণের শ্রেষ্ঠ বসিষ্ট। অর্থাৎ পূর্ণ ঐশ্বর্য্য-শালী যোগীরাজ। তন্ত্রমতে সিদ্ধনাথ, কুলনাথ।

অতঃপর উপগুরু মোক্ষদানন্দ কাশীধাম হইতে ফিরিলে বাম তাঁহার কাছেও নিজ পরিচয় বিশেষভাবে দেন। একদিন তিনি চন্দ্রচূড় শিবের মন্দিরে বসিয়া পূজার যোগাড় করিতেছেন। ইত্যবসরে বাম শ্মশান হইতে চিতাভষ্ম মাখিয়া মড়ার কলিকা হাতে লইয়া মন্দিরের সিঁড়িতে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"বাবা এক ছিলিম গাঁজা দেবে। একটু তামাক খাব।" তিনি পূজার ব্যাপারে ব্যস্ত, মুখে কোন উত্তর দিতেছেন না। তবে পুনঃ পুনঃ গাঁজা চাওয়ায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—"দূর হও ভাঁঙ্গড়! গাঁজা চাইবার আর সময় পেলে না।" বাম ধমকানি ও গালাগালি খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মোক্ষদানন্দ অতঃপর পূজায় বসিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়া এক বিষম বিপত্তি দেখা গেল। তাঁহার জিহ্বা যেন কে ভিতর দিকে টানিতেছে। তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিল। মুখ দিয়া ফেণা পড়িতে লাগিল। তবে তিনি জ্ঞান হারান নাই। মনে মনে শম্ভুকে আত্মনিবেদন করিলেন। দেখিলেন বাম ও চন্দ্রচূড় যেন এক

হইয়াছেন। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। গদগদভাবে বামকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি বুঝিতে পারি নাই।" "আমি কি জানি বাবা, তারামা জানে" বলিতে বলিতে বাম উঠিলেন। মোক্ষদানন্দ বুঝিলেন—বাম বসিষ্টের অবতার; কৈলাসপতি তাই বামকে আসন ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

বামের সব সময়ই ধ্রুতমুগ্ধ ভাব। পূর্ণজ্ঞানী অথচ বাহিরে দেখান যেন বালকবৎ অজ্ঞান। তাঁহার অহমিকা নাই। তাঁহার বলিতে কিছু নাই—সবই তারামার। তারা মনপ্রাণশরীর।

জনসাধারণ তাঁহার পরিচয় তখনও পান নাই। তাহারা জানে এ পাগল। তিনি নিঃসঙ্গ উলঙ্গ। যুবতী নারী তাঁহার সামনে লজ্জা পাইত না। তিনি যে কামজয়ী এ পরীক্ষা পাণ্ডারা ও জমিদারের লোকেরা করিতে ছাড়ে নাই। অর্থের লোভে কুলটা গভীর রাতে তিনি যখন শিমুলতলায় সমাধিস্থ তখন চুপে চুপে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে ও তাঁহার অঙ্গবিশেষ খুঁজিতে থাকে। কিন্তু অনেক হাতড়াইয়াও যখন কিছুই নির্ণয় করিতে না পারে তখন হতাশ হইয়া তাঁহার পায়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে! জ্ঞান হইলে তাঁহার কাছে কাঁদিয়া ক্ষমা চায়। পরে সে রমণী অসৎপথ ত্যাগ করিয়া সৎপথে ফেরে। কাঁচ কিনিতে গিয়া কাঞ্চন লাভ করে।

বামের যে সর্ব্ববাসনা ক্ষয় হইয়াছিল, ইহা তাঁহার সমস্ত জীবনেই প্রকাশ। কোন এষণা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তারাপদই তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন! তিনি নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার। জীবকে ভক্তিভাবের দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রেরণা দিবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব। জীবকল্যাণহেতু যাহা কিছু মাত্র অধ্যাস তাঁহাতে দেখা যাইত। তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

কিন্তু কয়জন লোক তাঁহার মত গুপ্তসাধকের সাধ্যসাধন তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা পাইত? তিনি হাসিমুখে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করিয়া একেবারে উলঙ্গ দেহে কৌপিনের অপেক্ষা না রাখিয়া ভীষণ শ্মশানে মশার কামড় ও অনাহার অনিদ্রা সহ্য করিয়া দিনযামিনী নিঃসঙ্গ যাপন করিতেন কেন, সে কথা কি শতকরা পাঁচজনও চিন্তা করিয়া দেখিত? তাহা না দেখিলে কি হয়। ফুল ফুটিলে সৌরভ ছুটে। কতদিন আর বাম নিজকে

চাপা দিয়া রাখিবেন। এমন দিন শীঘ্রই আসিল যখন তাঁহার সিদ্ধিবার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইয়া গেল। ১২৯৫ সালে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বৃষ্টি স্তম্ভন করিয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করেন ও লোকে জানিতে পারে—"সিদ্ধ হয়েছে বামা, করতলগতা হয়েছেরে তার তারা সুমনোরমা।"

শ্রীবামলীলা

উপোদঘাত

জয়তি জয়তি তারা বিশ্বরূপাতিরূপা
জয়তি জয়তি তারাসিদ্ধনাথো বসিষ্ঠঃ।
জয়তি জয়তি তারাসম্প্রদায়ো বরেণ্যো
জয়তি জয়তি তারাপ্রেমমত্তশ্চ বামঃ॥

তারাপ্রেমোন্মত্ত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বামাক্ষ্যাপানামে দেশে বিদেশে বিশ্রুত। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় তারাপীঠের নিকটবর্ত্তী আটলাগ্রামে ভক্ত সর্ব্বানন্দের ও পুণ্যশীলা রাজকুমারী দেবীর পুত্ররূপে ১২৪৪ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শিবচতুর্দ্দশীতে তিনি শিবলীলাপ্রদর্শনে কলিজীববৃন্দের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হন। জন্মাবধি তারাচরণই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মনঃপ্রাণ তারাময়। বাল্য হইতেই অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ তাঁহাতে প্রকাশিত হয়। নিত্যই তারাপীঠে ছুটিয়া আসিতেন। তারানামে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেন। কৈশোরে গৃহত্যাগের দিনেই কৌলচূড়ামণি ব্রজবাসী কৈলাসপতি তাঁহাকে বেধদীক্ষা দেন। বাম তদবধি তারাপীঠে বসেন। তখন গৃহাদি বাঁধেন নাই। সংসারের কোন কাজ, এমন কি তারামার বাহ্যপূজার আয়োজনাদিও করিতে পারেন নাই। তাঁর শয়নে তারা, স্বপনে তারা, আহারে তারা, বিহারে তারা। তিনি কামজয়ী সমদর্শন দ্বন্দ্বাতীত নিত্যসিদ্ধ আত্মারাম। কিছুদিন গুরুসঙ্গ করিয়া ইঙ্গিতে স্বপরিচয় দিলে শ্রীগুরু তাঁহাকে বসিষ্ঠের সিদ্ধাসন ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হন। শ্রীবামের শক্তি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। মাতৃশ্রাদ্ধে বৃষ্টিস্তম্ভনে সিদ্ধিবার্ত্তা ছড়াইয়া পড়ে। লীলাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃপাসিন্ধু, বসিষ্ঠদেব, তারাপীঠের ভৈরব এমন কি শ্রীবামদেব বলিয়া পরিগণিত হন। আজীবন তারাপীঠের শ্মশানে অতিবাহিত করেন। চল্লিশবর্ষ যাবৎ নিত্য দলে দলে যাত্রী তাঁহার দর্শনলোভে নানা দেশ হইতে যাইতেন। বসিষ্ঠারাধিতা "শিলাময়ী" তারার নিকট কামনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা মায়ামনুজ বীর তারাভক্ত ভৈরবেরও নিকট

পরিচয়

বর চাহিতেন। তারা ও রামকে অভিন্ন ভাবিতেন। রাম বাঞ্ছাকল্পতরু। কেহ সেই তরুর নিকট গিয়া বিফলমনোরথে ফিরেন নাই। কামকামী সংসারীর প্রতি কখন কখন কঠোর ভাব দেখাইলেও ভক্তের কামনা অপূর্ণ রাখিতেন না। তাঁহার আশীর্ব্বাদে কতশত রোগীর অসাধ্য রোগ সারিয়াছে, বোবার বুলি ফুটিয়াছে, অপুত্রকের জীর্ণারণ্যবৎ গৃহ পুত্রমুখপূর্ণচন্দ্রোদয়ে নন্দনকাননবৎ আনন্দময় হইয়াছে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসুভক্তগণ তাঁহার শান্তিময়ক্রোড়ে অনায়াসে স্থান পাইয়াছেন। প্রভু ধৃতমুগ্ধভাব, নিজশক্তিতে কিছু করিলেন এ অভিমান কখনও করেন নাই। তারা মা তাঁহার সর্ব্বস্ব। তারামা আর্ত্তের আর্ত্তি, অর্থার্থীর অর্থ, জিজ্ঞাসুর জ্ঞান দিলেন এই কথাই বলিতেন। তাঁহার বাণী কখনও বিতথা হয় নাই। তাঁহার ভক্তিগদ্গদভাবে কত শত পাষাণহৃদয় গলিয়াছে। কত জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছে। এইরূপে করুণাময় করুণাসিঞ্চনে কত তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া কতিপয় ভাগ্যধরকে জন্ম-মরণজয়ি-তারাতত্ত্বের আভাসদানে কৃতার্থ করতঃ ভোগপরজগতে ত্যাগশীলতা দেখাইয়া পুণ্যস্রোতে ভুবন ভাসাইয়া শ্রীরাম ১৩১৮ সনের ২রা শ্রাবণ কর্কটস্থভাস্করে রেবতীনক্ষত্রে কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে তারাকবচোক্ত শুভসংযোগে মহানিশায় দেহ রাখিয়া কামাদিনিমীলনে অপ্রকট হন।

তাঁহার কি সরল ভীমকান্ত দিব্যভাব! পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, বালক-বৃদ্ধ, যুবা নরনারী যে সেইরূপ একবার দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। সন ১৩১১ সালে মাতৃশোকানলে মাতৃকৃপাবর্ষণফলে আমি চণ্ডীপাঠের জন্য দৈবাদেশ পাইলাম। অচিরে মাতৃমূর্ত্তিদর্শন ঘটিল। তৎপরেই আমাকে নিজ নাম শুনাইয়া ও অলৌকিকভাবে নিজমূর্ত্তি দেখাইয়া দয়ালরাম আকর্ষণ করেন। উৎকট অদ্ভুত আশা ছিল যে ভস্মীভূত মাতৃদেহ রামের আশীর্ব্বাদে পুনরায় সজীব হইবে। প্রভু এ দাসকে নশ্বরমাতৃকায়ার পরিবর্ত্তে সনাতনী মাতার ছায়া দেন। কাচ কিনিতে গিয়া কাঞ্চন লাভ হইল। শ্রীমুখের সুধামাখা তারানামও এ পাষাণ প্রাণে অঙ্কিত হইয়া গেল।

প্রেরণা

তিনবৎসর পরে পিতৃবিরহে আবার চোখের জলের মাঝে এ তাপিতকে ডাকিয়া তিনি শান্তিবারি বর্ষণ করেন। পুণ্যদর্শনে, পুণ্যপদ-স্পর্শে, সূক্ষ্মমিলনে এ পাপময়জন্ম ঘুচাইয়া নবজীবনদানে দয়াল গুরু এ পতিতকে কৃতার্থ করেন। সেই লীলা বর্ণনের অভিলাষ জন্মে।

তান্ত্রিক শিরোমণি শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, বাগ্মিবর শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি সুধীগণ বামের নির্ম্মানমোহ সমদুঃখসুখ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়াদি ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া শিক্ষিতসমাজে তাঁহার গুণগান করেন। অন্যান্য ভক্তগণও তাঁহার কতক অলৌকিক মহিমা প্রচার করেন। তারানামক পুস্তিকায় শিক্ষক মহিমাচরণ তারাপীঠ কাহিনী সহ তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। বীরভূম জেলার ইতিহাসেও তারাপীঠপ্রসঙ্গে তারাপীঠভৈরব বামের কথা লিখিত হয়। তদবলম্বনে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কল্পনাবলে সাধক বাম বা বামাক্ষ্যাপার জীবনী রচনা করেন। ঐ সমস্ত অসম্পূর্ণ আখ্যানে ভক্তের তৃপ্তি সম্ভাবনা নাই। প্রভুর মধুর লীলা ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশের প্রেরণা এ হৃদয়ে আসে। ঐ গুরুভার দিয়া শ্রীগুরু এ দাসকে বুদ্ধদেব, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যাদি দেশীয়

উন্মেষ

এবং প্রভুযিশু, হজরৎ মহম্মদাদি বিদেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠে প্রবৃত্তি দেন। তাঁহার ন্যায় পরম কৌলের জীবনীতে সাধ্যসাধনতত্ত্বসন্নিবেশ সঙ্গত এই বোধ দিয়া জ্ঞানদাতা বাম এ দাসকে তদবধি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, বেদবেদান্তাদি পুনরাবৃত্তি করাইতেছেন। শাস্ত্রালোচনার প্রতিবিম্ব শ্রীবাম লীলা বিবরণে প্রতিফলিত। সুতরাং শ্রীবাম লীলা নাটকের ন্যায় সর্ব্বত্র সুখপাঠ্য না হইলেও তত্ত্বাংশ বাদে প্রেমকারুণ্যময় বামের প্রেমকরুণালীলার কথা অমৃতময়ী হইবে। তৎপাঠে সর্ব্বসাধারণের আনন্দ নিশ্চিত। প্রায়ই মহাপুরুষগণের কাহিনী প্রকাশাবস্থার পূর্ব্বে কিম্বদন্তীতে রক্ষিত; পরে তাহা ভক্তগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। সত্যবটে জনশ্রুতি অমূল্য নহে। কিন্তু শতমুখে তাহা শতধারায় বিস্তীর্ণ হওয়ায় প্রায়ই বহুবিধা হইয়া থাকে। বামের আদি মধ্য লীলার জনশ্রুতি তাঁহার সমসাময়িক স্বজন ভক্ত শিষ্য ও সেবকবৃন্দের নিকট সযত্নে সংগৃহীত। উহার প্রামাণিকতা নানারূপে পরীক্ষা করিয়া যাহার সত্যতা সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহাই

বিকাশ

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এ অধমের সহিত লীলার প্রামাণিকতা নিঃসন্দিগ্ধ। এই সব বিবরণে অলৌকিকতা বিদ্যমান বলিয়া অবিশ্বাস্য নহে। মহাপুরুষগণ লোকোত্তর এবং তাঁহাদের লীলা অলৌকিকী। দেহরক্ষার পর এ দাসের দ্বারা প্রভু যে সব ভক্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর।

শ্রীবামের লীলা ভক্তের চক্ষে ত্রিলহরী পতিতপাবনী সুরধুনী। দেবনদীর

যেরূপ স্বর্গ হইতে অবতরণ, গোমুখীতে উন্মেষ, কেদারখণ্ডে বিকাশ, হরিদ্বারে প্রকাশ, ব্রহ্মাবর্ত্তে প্লাবন, বঙ্গে সন্তানধারা এবং শেষে পতিতসগরকুলের ত্রাণ ও মহাসাগরে সম্মিলন ; শ্রীরাম লীলারও সেইরূপ অবতরণ, বাল্যে ভক্ত্যুন্মেষ, কৈশোরে জ্ঞানাদিবিকাশ, যৌবনে সিদ্ধিপ্রকাশ, প্রৌঢ়ে প্রেমকারুণ্যপ্লাবন, বার্দ্ধক্যে সন্তানধারা ও পতিতত্রাণ, শেষে অনন্তে অন্তর্দ্ধান। অবতরণ হইতে বসিষ্ঠাসনাধিকার পর্য্যন্ত আদিলীলা আভাসোন্মেষবিকাশ-প্রকাশ তরঙ্গত্রয়ে আদি লহরীভাবে প্রথমে আবির্ভূতা হইল। মধ্যলীলায় রামের বিভূতি, করুণা ও প্রেম প্রকাশপ্লাবনসন্তানতরঙ্গত্রয়ে মধ্য লহরী নামে, এবং অন্ত্যলীলায় প্রভুর পাবনতারণ ভাব ও তত্ত্ব পাবনতারণতত্ত্ব-তরঙ্গত্রয়ে অন্ত্য লহরী নামে পরে প্রকাশিতা হইল।

তাঁহার নাম শ্রবণেই আমি আকৃষ্ট হই। দর্শনমাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করি। শাস্ত্রমতে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রথম দর্শনে গুরুবীজাদি জানা না থাকায় তাঁহাকে শিবায় শান্তায় ইত্যাদি শিবমন্ত্রে প্রণাম করিয়াছি। তদবধি তিনি হৃদয়ের রাজা। তাঁহাকে ইষ্টদেবতার সহিত পূজা করিতেছি। তাঁহার অলৌকিক বিভূতির পরিচয়ে তাঁহাকে দেব বলিয়া বোধ হইতেছে। এমন কি তিনি একাধারে তারারাম এরূপ ধারণাও আসিতেছে।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥—গীতা। ৯। ১৭।

লীলাদ্বারা তাঁহার দেবভাব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তজ্জন্য অসত্যের আশ্রয় লই নাই। এমন কোন ঘটনা উল্লেখ নাই যাহার মৌলিকত্ব নাই।



২নং বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা নিবাসী ৺অবিনাশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীনিরঞ্জন চন্দ্র রায় কর্তৃক বামা মিশনকে ১০।১২।৪০ সালে উৎসর্গী কৃত।

তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপা বাবার মহাপ্রস্থানের সময় শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায় বারিপাদা, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট সদর মহকুমা শাসক, কর্তৃক গৃহীত "পদচিহ্ন"

শ্রীরাম লীলা

আদি লহরী

আভাস-তরঙ্গ

১। প্রয়োজন

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥—গীতা, ৪ অ. ৭।৮।

অবতার

এই কথা পরম উদার ও পরম সত্য। কি ক্ষুদ্রসমিতিতে, কি বিশিষ্টজাতিতে, কি মানবসমাজে, কি গৃহে, কি পল্লীতে, কি দেশে, কি মহাদেশে, কি ভূমণ্ডলে, কি গগনে, কি অনন্তব্রহ্মাণ্ডে যখনই নিয়মব্যত্যয় ঘটে, তখনই আবার নিয়ম সংস্থাপিত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার একসুরে বাঁধা। সেই সুর যখন বেসুর হয়, তখন সেই বাদকই আবার সুর বাঁধেন। যখন দারুণগ্রীষ্মে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে ধরা তাপিতা, যখন আর যেন তাপ সহ হয় না, তখনই আকাশে নিবিড়কাদম্বিনীঘটা ও অবিরলবৃষ্টি। আবার যখন প্রবলবর্ষায় ধরা উদ্বেজিতা, তখনই বৃষ্টিনিবারণ, নির্ম্মল গগন; প্রকৃতি শারদসাজে প্রফুল্লা। যখনই দেশে ভীষণ অত্যাচার, তখনই তাহার প্রতিকার। যখনই মানবজীবনে ঘোর দুঃখ, তখনই সুখস্বচ্ছন্দতা। আবার যখনই মানব সমাজে প্রেম ভক্তি ত্যাগ জ্ঞানাদি ধর্ম্মভাবের গ্লানি এবং বিদ্বেষাহঙ্কার স্বার্থপরতা মোহাদি অধর্ম্মভাবের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই কোন না কোন মহাপুরুষ এই ধরাধামে আসিয়া পুনর্ব্বার প্রেমের বাঁধনে সমাজকে বাঁধিয়া, ভক্তিবারিতে কলুষ হৃদয় ধৌত করিয়া, ত্যাগের অনলে স্বার্থপরতা দগ্ধ করিয়া, জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতিমির নাশ করিয়া, জরামরণাদিদুঃখসঙ্কুল মানবজীবনকে প্রেমময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় করেন। মহা[illegible] ভগবানের লীলামূর্ত্তি। [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible]। তাঁহাদের কার্য্যবলীই তাঁহার

ভাবলহরী। তাঁহাদের ঝঙ্কারেই তাঁহার ঝঙ্কার। তাঁহাদের লীলাই তাঁহার লীলা। কি সনক, সনন্দ; কি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য; কি কপিল, পাতঞ্জলি; কি গৌতম, ব্যাস; কি রাম, কৃষ্ণ; কি বুদ্ধ, জিন; কি মুশা, ঈশা; কি নানক, চৈতন্য; কি ক্ষ্যাপা বামাচরণ, কি তৈলঙ্গ স্বামী—সকলেই ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য অবতীর্ণ।

বামাক্ষ্যাপার অবতারণ কালে সমাজের অবস্থা আলোচনা করিলেই তাঁহার অবতরণ প্রয়োজন বুঝা যায়। অন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতীচ্য সংসর্গে প্রাচ্যে ভীষণ ভাববিপর্য্যাসের ঝড় বহিতেছিল। প্রাচ্য শান্তিবীর, প্রতীচ্য কর্ম্মবীর। প্রাচ্যের পুরুষার্থ পারলৌকিক, প্রতীচ্যের পুরুষার্থ ঐহিক। প্রাচ্যে ত্যাগ ভক্তি প্রেমই আদর্শ, প্রতীচ্যে ভোগ সুখ স্বচ্ছন্দতাই অভীষ্ট। তাই প্রাচ্যে কি বেদে, কি আভেস্থায়, কি পুরাণে, কি কোরাণে, কি বাইবেলে সুরাসুর সংগ্রামচ্ছলে ত্যাগভোগের দ্বন্দ্ব ও ত্যাগের জয় নানাছন্দে নানা উপাখ্যানে ঘোষিত। ত্যাগমন্ত্রেই আর্য্য ঋষি ভারতকে দীক্ষিত করেন। সেই মন্ত্রেই চাতুর্ব্বর্ণ্য গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচ্যসমাজ ত্যাগমন্ত্র

সংসার ভোগভূমি। জীব ভোগপ্রিয়। ভোগই সংসারে মজ্জাগত। কিন্তু এই ভোগের মধ্যে আবার ত্যাগও আছে। সন্তানের জন্য জননীর ত্যাগ না থাকিলে সংসার চলিত না। ঋষিগণ সমস্ত বুঝিয়া ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় জন্য ভোগেই যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ত্যাগমন্ত্রই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব, সেই মন্ত্রই ব্রাহ্মণের গৌরব। তাই ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি বিহিত। ত্যাগবলেই ব্রাহ্মণ আদর্শ শিক্ষক, ধর্ম্মের রক্ষক, প্রেমশান্তিময়, জ্ঞানী, সদাচারী, ন্যায়ের বিধাতা, দেবেরও দেবতা, সমাজের নেতা ও পরম ভিখারী।

ব্রাহ্মণ

ঐ ত্যাগমন্ত্র গুপ্তির জন্য ক্ষত্রিয়সৃষ্টি,

ক্ষাত্রো ধর্ম্ম শ্রিত ইব তনুং মন্ত্রকোষস্য গুপ্ত্যৈ।—উত্তরচরিতে, ৬ অঙ্কে।

(ত্যাগ) মন্ত্রের ভাণ্ডার (বেদ) রক্ষার জন্যই যেন ক্ষাত্রধর্ম্ম তনুধারণ করিয়াছে।

ক্ষত্রিয়ত্ব পাছে স্বার্থপরত্বে পশুবলে পরিণত হয়, তাই তাহাতে ত্যাগমন্ত্র। রাজন্যগণের পঞ্চকর্ম্ম,

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥—মনুঃ, ১ অ. ৮৯।

ক্ষত্রিয়

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ক্ষত্রিয়ের এই পঞ্চ কর্ত্তব্য যথা—প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি। ক্ষত্রিয় রাজ্য করিবেন, বিষয় ভোগ করিবেন বটে, কিন্তু বিষয়ে আসক্ত থাকিবেন না। অনাসক্ত হইয়া কেবল সমাজরক্ষার জন্য রাজদণ্ড ও রাজমুকুট প্রভৃতি লইবেন, নিজ সুখের জন্য নহে। এই নিয়মব্যত্যয়ে রাজা-প্রজায় দ্বন্দ্ব, যুদ্ধবিগ্রাদি।

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ।
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবম্বিধৈব ॥—অভিজ্ঞানশকুন্তলে,৫ অ.।

রাজন্! তুমি নিজসুখে বীতস্পৃহ, কেবল লোককল্যাণ হেতু প্রতিদিন ক্লেশ পাইতেছ। অথবা একথা বলিবার আবশ্যক নাই। ইহাই তোমার বৃত্তি।

বৈশ্য

এই ত্যাগমন্ত্রে বৈশ্য জীবনও গঠিত। তিনি সমাজেরই মুখাপেক্ষা করিয়া কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, পশুপালন করিবেন, প্রভূত ধনোপার্জ্জনে সুখলাভ করিবার জন্য নহে। তিনি দ্রব্যাদি একচেটে করিয়া যথেচ্ছমূল্যনির্দ্ধারণ করতঃ সমাজের রক্তশোষণ করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে সমাজে ধনি-শ্রমজীবিতে বিবাদ, জনকতকের হস্তে ধনসঞ্চয়, সাধারণের দরিদ্রতাদি ও অশান্তি।

শূদ্রও এই ত্যাগের মূর্ত্তি। তিনি আত্মবলি দিয়া নিজ শ্রমবলে সমাজের কল্যাণসাধন করিবেন।

শূদ্র

আসিবে কি সেই শূদ্র বিনীত, কর্ম্মঠ, ভদ্র,
হয়েছিল অভ্যুদয় শ্রমবলে যার ?

কেবল বুদ্ধিতে কার্য্য হয় না, পরিশ্রম চাই। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তিষ্ক, ক্ষত্রিয় হস্ত, বৈশ্য উদর, শূদ্র পদস্বরূপ। সকল অঙ্গ লইয়া দেহ। একাঙ্গ বিকল হইলে সমস্ত শরীরই বিকল হয়। যতদিন প্রাজ্ঞঋষিগণের বিধান

মানিয়া আর্য্যসমাজ চলিয়াছিল, ততদিন তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। যতদিন ব্রাহ্মণ ত্যাগী ছিলেন, ততদিন মনুর সত্য তেজোময়ী বাণী রক্ষিত হইয়াছে।

সুফল

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

— মনুঃ, ২ অ. ২০।

এই দেশের ত্যাগি-বর্ণশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণের চরিত্র দেখিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতি নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিবে।

যখনই ব্রাহ্মণ ত্যাগ ছাড়িয়া ভোগমন্ত্রসাধনা আরম্ভ করিলেন, তখনই তাঁহার পতন আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয়াদিও ত্যাগ ছাড়িলেন। রাজা বুঝিলেন রাজ্য তাঁহার সুখের তরে, বৈশ্য ভাবিলেন ব্যবসা তাঁহার স্বার্থের জন্য, শূদ্র ভাবিলেন আমাকে দাস করা হইয়াছে। ফলে সমাজে বিপ্লব আসিল।

রামায়ণকাল পর্য্যন্ত আর্য্যসমাজে ত্যাগমন্ত্রের সাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। কৈকেয়ী বিপরীতমন্ত্রের সাধিকা বটে, কিন্তু তাঁহার স্বার্থপরচরিত্রে রামাদির নিস্বার্থ চরিত্র অত্যুজ্জ্বল। ভারতে ঐক্যমত তখন আদর্শীভূত। নর ও বানর একতাসূত্রে আবদ্ধ। আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যই নর, দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যই বানর। ঐ বানরেরা তখন আর্য্যসমাজভুক্ত হইতেছেন। বালী, সুগ্রীব, হনুমান্, নল প্রভৃতি দেবগণের বংশধর বলিয়া খ্যাপন করিতেছেন। আর্য্য সূর্য্যবংশীয়গণ রাজচক্রবর্ত্তিসূত্রে বানররাজগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী। বানরগণ আর্য্যদের রীতি নীতি অবলম্বন করিতেছেন। উভয় জাতি মালেয় রাক্ষসজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তাই বনবাসী সহায়সম্পত্তিহীন কেবল

ফলাফল

ধর্ম্মবলে বলী রামচন্দ্র সেই রাজরাজেশ্বর সহায়বান্ কিন্তু অধর্ম্মরোগে জর্জ্জরিত রাবণকে জয় করিলেন। মহাভারতের কালে স্বার্থবীজ সমাজে এত বিকীর্ণ যে জ্যেষ্ঠতাতও অনাথ ভ্রাতুস্পুত্রকে প্রবঞ্চনা করিতে উদ্যত। তার পরিণাম ভারত-যুদ্ধ। সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয় সেই কলহাগ্নিতে আহুতিস্বরূপ হইল। ধনুর্ব্বেদ লোপ পাইল। ভারত একপ্রকার নিবীর্য্য হইল। পাণ্ডবগণের অশ্বমেধের অশ্ব ধরিবার ক্ষত্রিয় ভারতে রহিল না। ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মরাজ্য আসিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ি হইল না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবগণও মহাপ্রস্থান করিলেন। কয়েকপুরুষ পরেই কুরুরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন। অন্তর্বিপ্লবে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে

ভারত বিরত হইল। বুদ্ধদেব তন্ত্রের ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া ভারতে নবজীবন দানে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার শক্তিতে ভারতে নবশক্তি আসিল। তৎফলে শূদ্রের অভ্যুত্থান। কুরু প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষত্রিয়বংশ একরূপ উচ্ছিন্ন করিয়া মগধে মহানন্দ একচ্ছত্রাধিপতি হইলেন। তাঁহার বংশধরগণ অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারী। নবকোটীশ্বর নন্দগণও শেষে গৃহবিবাদে কৌটিল্যের কূটনীতিতে সমূলে উৎপাটিত, চন্দ্রগুপ্ত মগধাসনে প্রতিষ্ঠিত। মৌর্য্যেরা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিলেন। অশোকাদির প্রভাব ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইল। কিন্তু সাম্যবাদের গোড়ায় গলদ। আবার ভারতে স্বার্থপরতায় কলহ উপস্থিত। সেই কলহের বিষময় ফল ইতিহাসে সুব্যক্ত। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর গৌরবরবি অস্তমিত ও মুসলমানগণের ভাগ্যরবি উদিত। মহম্মদিগণও যতদিন ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ততদিন তাঁহাদের প্রভাব অটুট ছিল। তখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" আবার যখন "ভর পিয়ালা" ভাব জাগিল তখনই ভারতলক্ষ্মী স্বজাতিবৎসল ক্লাইভের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

প্রতীচ্য সমাজ

প্রতীচ্যের স্বার্থপরতা আধুনিক ভারতের স্বার্থপরতার ন্যায় নহে। প্রতীচ্যের স্বার্থপরতার মধ্যে জাতীয়তা আছে। প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ জাতির ঐহিক কল্যাণ কামনায় জাগরূক। সত্য বটে জাতির মধ্যে ব্যক্তিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজমান, কিন্তু জাতির কল্যাণ জন্য সকলেই আত্মবলি দিতে প্রস্তুত।

উভয় সভ্যতার সংঘর্ষ

যখন প্রতীচ্যের সহিত ভারতের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রতীচ্যের বাহ্য শ্রীবৃদ্ধিদর্শনে প্রতীচ্যের সভ্যতা, প্রতীচ্যের ভাবই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিজিত ভারতে বিবেচিত হইল, প্রতীচ্যের ভাবস্রোত প্রাচ্যে প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। ভারত নিজ আদর্শ হারাইয়া অপরের আদর্শ লইতে লোলুপ হইল, কিন্তু সে আদর্শ ধরিতে পারিল না। স্বজাতি প্রেম পরম স্বার্থত্যাগ। তাহাই প্রতীচ্যের ঐহিক উন্নতির সোপান। ভারত ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না। কেবল এ দেশের অনুপযোগী কতকগুলি বহিরাচার প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী গ্রহণ করিল। নিজ দেশের নিজ জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল, স্বার্থপরতা বাড়িল, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বিভক্ত হইল, সামাজিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িল। স্বজন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজ ভাষা, নিজ

ভাব, নিজ পরিচ্ছদ, নিজ খাদ্য, নিজ দেশ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া আমরা এক কিম্ভূতকিমাকার জাতি হইলাম।

প্রতীচ্যও ভোগমন্ত্রের কুহকে ক্রমশঃ অবনত হইতেছে। স্বজাতিপ্রেম ভিন্ন তথায় আর কোন বাঁধন নাই। জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উদ্দাম। এক জাতি নিজ ভোগের জন্য অন্য জাতিকে পদদলিত করিতে সততই উদ্যত। জাতিতে জাতিতে প্রেম নাই। আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র, আবার পরশ্ব দিবসে সে শত্রু। এক জাতি বাড়িতেছে অমনি অপর জাতিরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রবল জাতির নাশে বদ্ধপরিকর। স্বকার্য্য সাধিত হইল, আবার মিত্রশক্তির মধ্যে যে ঈর্ষা সেই ঈর্ষা। ঐ ঈর্ষাই ঐ সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট। তদ্ধেতু ইউরোপের মহাসমর ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এবং পুনরায় মহাসমরের ও ধ্বংসের সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যগণ! এখনও আপনারা বুঝিয়া দেখুন, ভোগমন্ত্র ত্যাগ করুন। ভগবৎকৃপায় জ্ঞানে ও বুদ্ধিবলে আপনারা পৃথিবীর নেতৃত্বপদ পাইয়াছেন। আপনাদের কর্ত্তব্য পৃথিবীতে প্রেমরাজ্যস্থাপন; সুশাসনের সুবিচারের অছিলায় পরদেশদলন, পরজাতি পীড়ন নহে। নিজ নিজ স্বার্থে বলিদান দিয়া সেই প্রেমরাজ্য আনিতে যত্নবান্ হউন।

প্রতীচ্যের কর্ত্তব্য

এই বিষময় ভোগমন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ যিশুও করিয়াছেন। এই ভোগ-বিষে মূর্চ্ছিত বর্ত্তমান সমাজে ত্যাগামৃতসিঞ্চন জন্য আমাদের রামাচরণ অবতীর্ণ হইয়া ভোগের মস্তকে পদাঘাত করতঃ মহাশ্মশানে জীবনযাপনে প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও জ্ঞানের আদর্শছবি দেখাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার অবতারের বাহ্য প্রয়োজন। ধরাবাসিগণ! তাঁহার ত্যাগের, তাঁহার প্রেমের, তাঁহার ভক্তির আদর্শ দেখিয়া যথাসম্ভব নিজ জীবন গঠিত করুন। ধরাধাম আনন্দধামে পরিণত হউক।

ত্যাগাদর্শ

২। অভিসন্ধি

কারুণ্যং তে জয় জয় গুরো বাম জীবেম্বপারম্।
কর্ম্ম জ্ঞানং শ্রুতিষু বিদধৎ কর্ম্মিণাং জ্ঞানিনাং যৎ।
ভক্তিং যোগং সততভজতাং যোগিনাং চ প্রদর্শ্য
তারামার্গং রচয়সি পুনর্যোগভোগাদিভাবং॥

তারাবিদ্যাং পরমগহনাং ব্রহ্মদাং ব্রহ্মরূপাং
বামাচারাং বিগলিতবিধিং স্ফোরিতাং শ্রীবশিষ্ঠে।
মুক্তৈঃ পূর্ব্বৈঃ কুলদগুরুভিঃ সেবিতাং ভক্তিপুষ্টাং
লুপ্তপ্রায়াং কপটকুটিলৈঃ কামুকৈর্নামকৌলৈঃ॥

দৃষ্ট্বা বামো গলিতহৃদয়ো দীনবন্ধুর্দয়ালু-
স্তারামার্গপ্রকটনপরো জীবনিস্তারহেতোঃ।
নিষ্কামোঽপি প্রভুরিহ কলৌ বামতারাবিলাসৈ-
স্তারাবামাত্মকনরবপুঃ কাময়ামাস চিত্রম্॥

হে জগদ্‌গুরো শিবসুন্দর বাম! তোমারই জয়। জীবের প্রতি তোমার করুণা অপার। তাহার নিঃশ্রেয়সার্থ তুমি কত উপায় করিয়াছ। তুমিই হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দিয়াছ। প্রবৃত্তিতে ভোগ, নিবৃত্তিতে যোগ। জীব ভোগী, ভোগ চায়। আবার সে ভোগের বিষময় পরিণাম জ্ঞানবিচারে বুঝিয়া, হে অমৃতময়! তোমাকে জানিতে চায়। তোমার সহিত চিরযোগ চায়। তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, সকলেরই অভীষ্ট পূর্ণ কর। তাই তুমি বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মীর জন্য কর্ম্মের ও জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানের বিধান করিয়াছ। কর্ম্মী কর্ম্মকে, জ্ঞানী জ্ঞানকে মুক্তির দ্বার বিবেচনা করেন। আবার কোন কোন জীব কাম্যকর্ম্মে বা শুষ্কজ্ঞানে আনন্দ পান না। তাঁহারা তোমাকে জানিতে চান না। তোমার সহিত লীলা করিতে চান। তাঁহারাই ভক্ত। তাঁহাদের জন্য তুমি ভক্তিপথ করিয়াছ। আবার কোন কোন জীব নামসংকীর্ত্তনাদি হৈচৈ ভালবাসেন না। তাঁহারা তোমাকে অন্তরের অন্তরে ধরিয়া রাখিতে চান। মনকে বাহ্য-জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তোমার কোন একরূপ ধ্যান করিয়া

কর্ম্মাদি পথ

আনন্দ পান। ক্রমে নামরূপ-স্থূলধ্যেয় অপসারণ করিয়া প্রেমজ্ঞানাদি সূক্ষ্মভাবধ্যেয়ে উঠিয়া, পরে সমস্ত ভাবনিরোধে মহাভাবে মহাশূন্যে মিশিয়া যান। সর্ব্বশেষে কৈবল্যের পূর্ণভাবে ব্রহ্মানন্দ অধিকারী হন। তাঁহারাই পারিভাষিক যোগী। তাঁহাদের জন্য তুমি যোগশাস্ত্রে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির বিধান করিয়াছ। ভিন্নরুচি অনুসারে জীবের হৃদয়ে এই ভোগযোগ পক্ষপাতিত্ব শাস্ত্রেও প্রতিবিম্বিত। তাই পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মের, উত্তরমীমাংসা জ্ঞানের, ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিপ্রেমের, যোগশাস্ত্র যোগের উৎকর্ষ খ্যাপনে তৎপর।

বাম! এ সমস্ত শাস্ত্র তোমার প্রেরিতধী বৃত্তির ফল। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগবাদের বিরোধ হিল্লোলে দোলায়িত জীবের জন্য তুমিই, দেব! তন্ত্রাদিতে ঐ সকল বাদের সমন্বয় করিয়াছ। ভোগ ও যোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপাত-মাত্র। স্থূল দৃষ্টিতেই ভোগ ত্বদীয়-প্রাপ্তির অন্তরায়, যোগ ত্বদীয়-প্রাপ্তির উপায়। যথার্থতঃ ভোগও তোমার, যোগও তোমার; ভোগও তুমি, যোগও তুমি। তুমি সর্ব্বময়। কি স্থলে, কি জলে কি অনলে, কি অনিলে, কি আকাশে—সর্ব্বত্রই তুমি বিরাজমান। তুমিই ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাদি ভোগ্যবস্তু। আবার তুমিই ভোক্তা জীব। ভোগের করণও তুমি। সেই করণ দ্বিবিধ—অন্তঃ ও বাহ্য। বাহ্য আবার পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ভেদে দশধা বিভক্ত। অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—মনঃ, অহঙ্কার, বুদ্ধি। ঐ পঞ্চবিধভোগ্যে মন দিলেও তোমাতে মন দেওয়া হয়; আবার ভোগ্য হইতে অপসারণ করিয়া ভোগকরণে মন দিলেও তোমাতে দেওয়া হয়। সুতরাং ভোগ ও যোগ পৃথক্ নয়। ভোগেই যোগ, আবার যোগেই ভোগ। যে সব জীব এরূপ উন্নত ভাবনা ভাবেন, যাঁহারা ভোগ ও যোগ সমান চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি, দেব! যোগভোগাদি ভাবাভাবময় অদ্ভুত তন্ত্রমার্গ রচিয়াছ।

তন্ত্রমার্গ

সেই তন্ত্রসাধনার উচ্চতম স্তর তার বিদ্যা। তাহা পরম গহন, গুহ্যাতি-গুহ্য। উহার সাধনও দুরূহ। এই বিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান। এই বিদ্যাই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপিণী। ঐ বিদ্যাবলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। উহার আচার বাম, অর্থাৎ সংসারের প্রতিকূল, আপাততঃ কদর্য; কিন্তু সত্য সত্যই পরমসুন্দর। এই আচারে বিধিনিষেধ নাই, শুচি-অশুচি নাই, দিগ্‌দেশকালাদি নিয়ম নাই। হৃদয়বল্লভকে ডাকিতে,

তারাবিদ্যা

প্রাণের প্রাণকে ভালবাসিতে, আপনার হইতে আপনার জনের সহিত মিশিতে আবার কালাকাল কি? উত্তরপূর্ব্বাস্যতা কি? শুচি অশুচি কি?

এই উচ্চভাব জীবে মলিন। তাই প্রথম সংযম আবশ্যক। সোপানের চূড়ায় একেবারে উঠা যায় না। তাই কর্ম্মমার্গে বিধিনিষেধ পালন। তাই ভক্তিমার্গে সতত স্মরণ কীর্ত্তন বন্দনাদি। তাই যোগমার্গের প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য সত্যাস্তেয় প্রভৃতির ব্যবস্থা। তাই জ্ঞানমার্গেও শম দম তিতিক্ষা উপরতিরূপ সাধনচতুষ্টয় বিহিত। কিন্তু চরমবিদ্যা তারাবিদ্যার অনুশীলনে ঐরূপ বিধিনিষেধ থাকিতে পারে না। ঐরূপ বিধিনিষেধাদি পালনে ভাব জাগিলে, তবে তারাবিদ্যার অধিকারী হওয়া যায়। তাই ঐ বিদ্যা বসিষ্ঠাদির ন্যায় সাধকেই স্ফোরিত হইয়াছিল। ঐ বিদ্যা বুঝিতে ঐরূপ ত্রিকালদর্শি ব্রহ্মর্ষিরও সময় লাগিয়াছিল। তিনিও প্রথমে ভাবিয়াছিলেন শুদ্ধাচারেই তারামা পাওয়া যায়। তাই শুদ্ধাচারেই তারামার আরাধনা করেন। কিন্তু বহুতপস্যাতেও তারামাকে পাইলেন না। পরে বামাচারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত হইয়া তারাবিদ্যালাভে সিদ্ধ হন।

বামাচার

ঐ বিদ্যাবলে তাঁহার পর বহু জীব মুক্ত হইয়াছেন। সেই প্রাচীন মুক্ত-পুরুষগণই জীবনিস্তার হেতু কৃপাপরবশ হইয়া ঐ বিদ্যা মর্ত্তধামে প্রচারিত করেন। তাঁহারাই এই অকূল ভবসাগরে কূলদাতা। প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বই কুল বা গণ—অর্থাৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড। ঐ কুলকে বা ব্রহ্মাণ্ডকে ও ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে যাঁহারা ছেদন করিয়াছেন তাঁহারাই কুলদ। যাঁহারা ঐ কুলকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন দেখেন তাঁহারাই কৌল। তাদৃশ কুলদ গুরুগণের দ্বারা তারাবিদ্যা অতিযত্নে ভক্তিরসে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে সেই কৌল-সম্প্রদায় কর্ম্মদোষে নিস্তেজ হইলে তন্ত্রসাধকগণ কামের দাস হইলেন। ভোগ-বাসনায় তাঁহাদের কুটিলতা আসিল। সেই কুটিলতার ফলে কপটতা জুটিল। সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া সাধু সাজিয়া মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগার্থ তাঁহারা তন্ত্রের আশ্রয় লইলেন। এইরূপ ভণ্ড কামুক নামমাত্র কৌলের আচরণে সমাজ কলুষিত এবং তন্ত্র অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িল। ধর্ম্মের ভানে মদ্যপানের ব্যবস্থা তন্ত্রে নাই। তন্ত্রের মদ আন্তর ও বাহ্য ভেদে দ্বিবিধ। আন্তর মদ তেজস্তত্ত্ব। তাহা

কপট কৌল

আত্মাতে আহুতি দিতে হয়। বাহ্যমদও শোধন করিয়া সেব্য। তৎপানে মাত্রাদি নিয়ম আছে।

যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃপরম্‌॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে, ৬ উল্লাসে ১৯৬।

যে পর্য্যন্ত না দৃষ্টি বিচলিত হয়, মনও চঞ্চল হয়, সেই পর্য্যন্ত পান করিবে। ইহার অধিক পান পশুপান। তাহা শাস্ত্রীয় পান নহে। তাহাতে পতন ও নিরয়।

দুরাশয় তান্ত্রিকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইলে বঙ্গে শ্রীচৈতন্য তন্নিবারণ জন্য অবতীর্ণ হইলেন। বামাচার অতি কঠিন বুঝিয়া তিনি শুদ্ধাচার স্থাপনে যত্নবান্‌ হইলেন। স্ত্রীলোক লইয়া খেলা সর্প লইয়া খেলার তুল্য। তাই বৃদ্ধ গৌরীমার নিকট গোপনে তণ্ডুল ভিক্ষার অপরাধে প্রাণপ্রিয় ছোট হরিদাসকে শ্রীগৌর বর্জ্জন করিলেন। বৈদিক কর্ম্মও এ কালের উপযোগী নহে। আধুনিক জীবের সে ইচ্ছা, সে শক্তি, সে সুযোগ, সে অবসর নাই দেখিয়া তিনি ঝঙ্কার তুলিলেন,

হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্‌।

কপট তান্ত্রিকগণের বীভৎসাচরণে এ ঝঙ্কার মলিন হইয়াছিল। নিমাই-এর অমিয়কণ্ঠে মধুর প্রেমমাখা নামের ঝঙ্কারে ভারত চকিতপ্রাণে নামদীক্ষা লইল। নাম বাহ্য সাধনা, শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য কান্তাদি ভাব অন্তঃসাধনা। রামানন্দের সহিত প্রভুর কথোপকথনে সাধ্য ও সাধন নির্ণীত। যখন শ্রীমতীর, ভাববর্ণনে, না সো রমণো ন হাম্‌ রমণী, এই অভেদ ভাব রামানন্দ গাহিলেন, তখন প্রভু তাঁহার মুখ চাপিলেন। তাৎকালিক সমাজ এ মহাভাবের অধিকারী ছিল না। সমাজ-সংস্কারক সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার করিবেন। আপামর সাধারণ তাঁহার গুহ্যভাবসাধনা ধরিতে পারিতেছে না, ইহা শ্রীচৈতন্যকে তদন্তরঙ্গ ইঙ্গিতে জানাইলেন, "আউলকে কহিছে বাউল, এ হাটে বিকায় না চাউল।" মহাপ্রভু উত্তর দিলেন "মাগুর মাছের ঝোল, ঘরযুবতীর কোল, বোল হরিবোল।"

বৈষ্ণব সংস্কার

সাধারণ লোকে সূক্ষ্মভাব বা অন্তঃসাধনা না ধরিতে পারে ক্ষতি নাই।

তাহারা বাহ্যসাধন হরিনামই করুক। নামেই সর্ব্বশক্তি দিলাম। তবে ইন্দ্রিয়-সংযম চাই। রসনাতৃপ্তির জন্য মৎস্য খায় খাউক, অন্য জীবহত্যা না করে। জননেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য দারগ্রহণ করে করুক, পারদার্য্য না করে।

শ্রীচৈতন্যের সমাজসংস্কার শাক্ততন্ত্রের প্রতিকূল নহে। উভয় সম্প্রদায় তাহা বুঝিতে না পারায়, কচিৎ শাক্ত বৈষ্ণবে বিরোধ ঘটে। নামতত্ত্ব, জাতি-বিচারাভাব, শুদ্ধাচার প্রভৃতি কেবল বৈষ্ণবতন্ত্রের নহে, শাক্ততন্ত্রেরও মত। সর্ব্বতন্ত্র একসুরে বাঁধা। তাহা দেখাইবার জন্য বাম আসিয়াছিলেন। সেই সামঞ্জস্য তারাবিদ্যার বলে বুঝা যায়। তারাবিদ্যার বিপরিণাম এবং তৎফলে সমাজবিপ্লব ও বিভিন্ন তন্ত্রের ভক্তগণের মধ্যে দ্বৈধ দেখিয়া, দয়াল বামের হৃদয় গলিল। দীনবন্ধু জীবগণের নিস্তার হেতু তারাতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্বয়ং নিষ্কাম হইলেও এই কলিযুগে দেহ-ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ, দেহী জীব তৎসদৃশ জীবকেই কতকটা বুঝিতে পারে, বিদেহজীবের বা বিশ্বব্যাপিকা অবাঙ্মানসগোচরা শ্রীভগবচ্ছক্তি বুঝিতে পারে না। তাই দেহিগণের শিক্ষার জন্য শ্রীভগবান্ দেহিরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলাচ্ছলে শিক্ষা দেন।

বামাবতার

শ্রীবামকে শাস্ত্রে শ্মশানচারী, দিগম্বর, নির্গুণ সন্ন্যাসী বলে। সকলের ত্যাজ্য তাঁহার গ্রাহ্য। ভস্ম তাঁহার ভূষণ। দিক্ তাঁহার বসন। কালকূট তাঁহার পেয়। তাঁহার গৃহিণী তারাও শ্মশানবাসিনী, দিগ্বসনা, সর্ব্বত্যাগিনী, ভীমকান্তা। বাম ও তারার এই ভাব যে কেবল কবিকল্পনা নহে, সাধকের হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে, মদিরাঘূর্ণিত তান্ত্রিক মস্তিষ্কের বিকারচ্ছবি নহে, তাহার প্রমাণ জন্য সেই তারা ও সেই বাম একাধারে নরলোকে তারাবামলীলা দেখাইয়া, তন্ত্রের গূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটন জন্য অদ্ভুত নরদেহ ধারণ করিলেন এবং নামও লইলেন বামাচরণ।

বামাচরণের বাহ্যলীলা দেখিলে বুঝা যায় তিনি একাধারে তারা-বাম। তাঁহার গুহ্যভাবের আভাস পাইলেত কথাই নাই। কি প্রাচীন, কি মধ্য-কালীন, কি আধুনিক, ঋষি মহাপুরুষ সিদ্ধ ও সাধক—সকলেই আমাদের মাথার মণি। তাঁহার দাসানুদাসের পদ পাইলেও আমরা কৃতার্থ। সকলেরি মহিমা ও কৃপা অপার। সকলেই দেবাদিদেব শ্রীবামের মূর্ত্তি। তাঁহাদের মধ্যে রেষারেষি নাই। তবে কেন

বৃথা রেষারেষি

তৎতদ্ভক্তগণ দ্বেষাদ্বেষি করেন? যিনি যাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাতে মজিয়াছেন। তাঁহাকেই তিনি হৃদয়ারাধ্য করুন, তিনি ভিন্ন তাঁহার গতি নাই ভাবুন। কিন্তু অন্যেরও যে তদ্ভিন্ন গতি নাই এ সঙ্কীর্ণ ভাব হৃদয়ে স্থান না পায়। পথ নানা, গন্তব্য এক। আমরা নররূপি রামের দ্বারা অমরধামে মিশিব। তিনিই আমাদের তারা অর্থাৎ ত্রাতা, তিনিই আমাদের রাম অর্থাৎ পরমসুন্দর। আমরা বলি না যে তাঁহাকেই ভজ, না ভজিলে গতি নাই। আমরা জানি যিনি যাঁহাকেই ভজুন না, তিনি দেবাদিদেবকেই ভজিতেছেন ও তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ করিবেন।

৩। ক্ষেত্র

যস্যা মূর্ত্তি-র্নিখিলভুবনাকর্ষিণী রত্নভূষা।
যস্যা ভাষা ভুবি নিরুপমা স্নিগ্ধগম্ভীরশান্তা।
যস্যা ভাবো মধুরসরলোদারধীরপ্রসন্নঃ।
যস্যা দৃষ্টির্বিভুপদপরা নৈহিকস্বার্থলগ্না॥ ১॥
যস্যা রোচি-র্বিকচগগনোদ্ভাসনস্-সৌরভাসো
যস্যা হাসো বিকশিত দিশাবক্ত্ররাকাপ্রকাশঃ;
যস্যাস্-শ্বাসো মৃদুমলয়জামোদবাহপ্রবাহো
যস্যাঃ কণ্ঠো বিজিতমুরলীকোকিলামঞ্জুরাগঃ॥ ২॥
যস্যৈ পাদ্যং বহতি বরুণো নীলসিন্ধূর্মিভঙ্গ্যা
যস্যৈ পুষ্পাঞ্জলিমৃতুবপুঃ পুষ্পধন্বা বিধত্তে।
যস্যৈ শক্রো বিতরতি ঘনৈঃ স্নানপানীয়ধারাং
যস্যৈ সোমো রচয়তি মুদা শস্যনৈবেদ্যজাতম্॥ ৩॥
যস্যাং চিত্রং জগত উদগাল্লোচনং বেদভানু-
র্যস্যাং মন্ত্রাহুতিজপবলাৎ সত্যধর্ম্মৌ প্রবুদ্ধৌ।
যস্যাং বাণী তনয়নিকরাহ্বানমুগ্ধাবতীর্ণা
যস্যাং বর্ণাশ্রমবিধিগুণৈঃ কোঽপি বদ্ধঃ সমাজঃ॥ ৪॥

যাং ভূদেবাশ্-শমদমদয়াপ্রেমকায়া বিনিন্যু-
র্যাং রাজন্যা নয়ধৃতিবলৌদার্য্যরূপা ররক্ষুঃ।
যামূরব্যা বিদধুরলকাং মূর্ত্তবাণিজ্যশিল্পাঃ
যাং ভক্ত্যোপাসত সরলতাকর্ম্মদেহাশ্চ শূদ্রাঃ॥ ৫॥

যস্যা লেভে লিপিপরিচয়ং শিক্ষয়া ভূকুমারী
যস্যাশ্ শব্দাগমমধিজগে শোধনে সা স্ববাচঃ।
যস্যা একপ্রভৃতিগণনং সাঙ্কশাস্ত্রং বিজজ্ঞৌ
যস্যা বার্ত্তাং কৃষিমপি কলাঃ কোমলাস্-সাজহার॥ ৬॥

আর্ত্তত্রাণং ব্রতমিতি যয়া শস্ত্রবেদো মমন্থে
দুষ্টানাং সংদমনবিধয়ে ন্যায়দণ্ডো ধৃতশ্চ।
লোকক্ষেমে সুখবিমুখয়া রাজ্যভারো যযাস্তঃ
শাঠ্যস্যৈষা কবচমিতি চালম্বিতা কূটনীতিঃ॥ ৭॥

যা ছন্দোভির্লঘুগুরুপদৈ নর্ত্তয়ামাস বাণীং
যালঙ্কারৈরতুলসুষমাগারমেনামকার্ষীৎ।
যা তাং ধর্ম্মৈারমরমরয়োস্তোষয়ামাস হৃত্তৈ-
র্যা তাং কুঞ্জে মুহুরমদয়দ্বল্লকীমূর্চ্ছনাভিঃ॥ ৮॥

যা ভূগোলে সকলধরণীদেহতত্ত্বং বিচিক্যে
যা তারাণামগণয়দিহ ব্যাসবস্থাং খগোলে।
যায়ুর্ব্বেদে পরমকরুণাং দর্শয়ামাস জীবে
যা সামুদ্রে বিবৃতিমনয়ৎ ভূতভাব্যং রহস্যম্॥ ৯॥

যা সঞ্চেরে স্থল ইব জলে বীচিমালে বহিত্রৈ-
র্যাকাশেঽভূদবিহতগতিঃ পুষ্পকাদ্যৈর্বিমানৈঃ।
যা স্থাপত্যৈরবনিহৃদয়েঽস্থাপয়ৎ স্বর্গশোভাং
যেষ্টাপূর্ত্তৈরিহ বিতরণৈরানয়দ্ধর্ম্মরাজ্যম্॥ ১০॥

যা বেদান্তে মরণতরণং দিব্যসেতুং বিতেনে
যা সাঙ্খ্যাদ্যৈর্বিরচিতবতী তত্ত্বহারঞ্চ সূত্রৈঃ।
যা ব্রহ্মাণ্ডং বশমগময়ৎ সিদ্ধিভির্যোগজাভি-
র্যা তন্ত্রৈশ্চাখিলতনুযুষাং নির্ম্মমে ত্রাণমার্গম্॥ ১১॥

তামম্ভোধেরপরকমলামুদ্গতাং বিশ্ববন্দ্যাং
লঙ্কাম্ভোজাহিতপদযুগাং সহ্যনীলাদ্রিজঙ্ঘাম্ ।
রেবা-গোদা-মুখররশনা-বদ্ধ-বিন্ধ্যোন্নিতম্বা-
মার্য্যাবর্ত্তোরসমরসবিদ্ব্রহ্মপুত্রাদিহারাম্ ॥ ১২ ॥

তাং মাহেন্দ্রার্ব্বুদকুচযুগাং সিদ্ধযক্ষাঙ্গনাস্যাং
সিন্ধু প্রাগ্ জ্যোতিষবরভুজামুত্তরাখণ্ডঘোণাম্ ।
নেপালশ্রীবিজয়তিলকাং ভোটকাশ্মীরকর্ণাং
নীহারাচ্ছস্ফটিকমুকুটাশ্লিষ্টশৈলেন্দ্রভালাম্ ॥ ১৩ ॥

তাং চ স্বায়ম্ভুবগণমুখব্রহ্মসিদ্ধর্ষিজুষ্টাং
গর্গাত্রেয়াঙ্গিরসকপিলব্যাসবাল্মীকিধাত্রীম্ !
মান্ধাত্রৌশীনরপুরুপৃথাস্থনুদেবব্রতাঢ্যাং
বৌদ্ধাহিংসাগলিতহৃদয়াং শঙ্করজ্ঞানদীপ্তাম্ ॥ ১৪ ॥

তাং ব্রহ্মজ্ঞাং সমুপহসিতেন্দ্রত্বভোগাং বরেণ্যাং
লীলাভূমিং চিরপরিচিতাং রামকৃষ্ণাবতারাম্ ।
কালেনাস্তংগমিতমহিমাংভ্রষ্টলক্ষ্যাং বরাকীং
ত্রাতুং ভূয়শ্চরণরজসা ভারতীং ভূতধাত্রীম্ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গে তত্রাগমনিগময়োর্বিশ্রুতে ধাম্নি পুণ্যে
শ্রীগৌরাঙ্গোচ্ছলিতবিমলপ্রেমপূরৌঘপূতে ।
বক্রেশাদিস্বতনুনিলয়ে বীরভূমৌ স্বপীঠে
তারাবামাভিনবনটনং বাম ঐষীৎ শ্মশানে ॥ ১৬ ॥

যাঁহার রত্নভূষিতা মূর্ত্তি নিখিলভুবনকে চিরকাল আকর্ষণ করিতেছে, যাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাষা ভুবনে নিরুপমা, যাঁহার ভাব মধুর সরল উদার ধীর ও প্রসন্ন, যাঁহার দৃষ্টি সেই পরাৎপরের শ্রীচরণপরায়ণা, ঐহিক স্বার্থে লগ্না নহে। ১।

(অন্যত্র দুর্লভা) বিমলগগনোদ্ভাসিনী সৌরভাতি যাঁহার কান্তি, দিগ্বধুমুখ-রঞ্জন-পূর্ণচন্দ্র-প্রকাশই যাঁহার হাস্য, মৃদুল মলয়চন্দনামোদিত পবনহিল্লোলই যাঁহার শ্বাসানিল, মুরলীবিজয়িনী-কোকিলার মোহন রাগই যাঁহার কণ্ঠস্বর।২।

বরুণদেব নীলসিন্ধুতরঙ্গচ্ছলে যাঁহার জন্য পাদ্য রাখিয়াছেন, পুষ্পধন্বা (অনঙ্গ) ঋতুরূপদেহ ধরিয়া যাঁহার জন্য পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, দেবরাজ মেঘ দ্বারা যাঁহার জন্য স্নান-পানীয় ধারা বিতরণ করিতেছেন, এবং চন্দ্র সানন্দে যাঁহার জন্য শস্য-নৈবেদ্য আহরণ করিতেছেন। ৩।

ভারত

যাঁহার (আলয়ে) জগতের বিচিত্রনয়নভূত সেই বেদরূপ ভানু উদিত, যাঁহার (আলয়ে) মন্ত্র হোম জপবলে সত্য এবং ধর্ম্ম জাগ্রত, যাঁহার (আলয়ে) তনয়গণের আহ্বানে মোহিত হইয়া স্বয়ং বাণী অবতীর্ণ হন, যাঁহার (আলয়ে) বর্ণাশ্রম-বিধিরূপ রজ্জুদ্বারা অদ্ভুত সমাজ বদ্ধ হইয়াছে। ৪।

যাঁহাকে শম দম দয়া প্রেমাবতার বিপ্রগণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাঁহাকে নয়ধৈর্য্যবলৌদার্য্যবিগ্রহ রাজন্যগণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহাকে শিল্পবাণিজ্য-মূর্ত্তি বৈশ্যগণ অলকাতুল্য করেন, যাঁহাকে সরলতা ও কর্ম্মের শরীররূপ শূদ্রগণ ভক্তিভরে উপাসনা করিয়াছিলেন। ৫।

যাঁহার নিকট পৃথিবীরূপ বালিকা শিক্ষাশাস্ত্রে লিপিপরিচয় পাইয়াছেন, যাঁহার নিকট তিনি নিজ বাক্যশুদ্ধির জন্য শব্দশাস্ত্র শিখেন, যাঁহার নিকট তিনি এক হইতে গণনা শিখিয়া সমস্ত অঙ্কশাস্ত্র বিজ্ঞাত হন, যাঁহার নিকট তিনি কৃষি বার্ত্তা ও কোমল কলা গ্রহণ করেন। ৬।

যৎকর্ত্তৃক আর্ত্ত ত্রাণরূপ ব্রতের জন্য ধনুর্ব্বেদ মথিত হয় এবং দুষ্টগণের দমন মানসে ন্যায়দণ্ড ধৃত হয়, সমাজের কল্যাণার্থই নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া যৎকর্ত্তৃক রাজ্যশাসনভার গৃহীত হয় এবং ইহাই শাঠ্যের কবচ এই বোধে কূটনীতি যৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়। ৭।

যিনি লঘুগুরুপদচ্ছন্দে তালে তালে বাণীকে নাচাইয়াছেন, যিনি শব্দার্থালঙ্কারে তাঁহাকে অতুল সুষমার আগার করিয়াছেন, যিনি পুরাণের নানাবিধ ধর্ম্মসঙ্গত সুরাসুর নরের উপাখ্যানে তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে বারবার (কাব্য) কুঞ্জে বীণার মূর্চ্ছনায় উন্মাদিত করিয়াছেন। ৮।

যিনি ভূগোলে সমস্ত ধরণীর দেহতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন, যিনি মর্ত্ত্যধামে থাকিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রবলে গগনে তারাচক্রের সংস্থান গণিয়াছেন, যিনি আয়ুর্ব্বেদে জীবের প্রতি পরমকরুণা প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি সামুদ্রিকশাস্ত্রে ভূতভবিষ্যৎ রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। ৯।

যিনি নৌযান দ্বারা তরঙ্গমালাকুল সলিলে স্থলের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছিলেন, যিনি পুষ্পকাদি বিমান সাহায্যে আকাশেও অবিহতগতি ছিলেন, যিনি স্থাপত্যবিদ্যার ফলে পৃথিবীর বক্ষে স্বর্গের শোভা স্থাপিত করেন, যিনি ইষ্টাপূর্ত্ত ও দানবলে এখানে ধর্ম্মরাজ্য আনিয়াছিলেন। ১০ ।

যিনি বেদান্তে মৃত্যুত্তারণ দিব্যসেতু বিস্তার করিয়াছেন. যিনি সাঙ্খ্যাদিসূত্রে তত্ত্বহার গাঁথিয়াছেন, যিনি যোগজসিদ্ধিবলে ব্রহ্মাণ্ড বশে আনিয়াছিলেন, যিনি তন্ত্রে সকল জীবের ত্রাণপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ১১ ।

সেই সাগর হইতে দ্বিতীয় কমলার ন্যায় উদগতা, সেই বিশ্বের বন্দনীয়া, লঙ্কারূপকমলে বিন্যস্তচরণা, সহ্যনীলাদ্রিরূপ জঙ্ঘাশালিনী, রেবাগোদাবরী-রূপ মুখরমেখলামালিনী, বিন্ধ্যরূপ তুঙ্গনিতম্ববতী, আর্য্যাবর্ত্তরূপ বক্ষঃস্থলে গঙ্গাব্রহ্ম-পুত্রাদিরূপ হারে ভূষিতা। ১২ ।

সেই মহেন্দ্রার্ব্বুদ পর্ব্বতদ্বয়রূপ স্তনদ্বয়যুতা, সিদ্ধযক্ষগণ বিহারভূমিরূপ বদনমণ্ডলা, সিন্ধুপ্রাগজ্যোতিষরূপ শ্রেষ্ঠভুজশালিনী. উত্তরাখণ্ডরূপ নাসা, নেপালরূপ শ্রীবিজয়তিলকধারিণী, ভোটকাশ্মীররূপ শ্রবণযুগলা, হিমাচলভালে নীহাররূপ স্বচ্ছস্ফটিক মুকুটান্বিতা। ১৩ ।

সেই স্বায়ম্ভুবমন্বত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধর্ষি কর্ত্তৃক সেবিতা, গর্গ আত্রেয় আঙ্গিরস কপিল ব্যাস ও বাল্মীকির ধাত্রী, মান্ধাতৃ শিনি পুরু কৌন্তেয় ও ভীষ্মের জননী, বুদ্ধদেবের অহিংসাবাদে বিগলিতহৃদয়া, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানে সমুজ্জ্বলা। ১৪ ।

সেই বরেণ্যা, ব্রহ্মজ্ঞা, তৃণীকৃতেন্দ্রত্বাদিভোগসুখা, চির পরিচিতা লীলাভূমি, যথায় রাম কৃষ্ণাদি অবতীর্ণ, সেই কালক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্টা (তাই) বিলুপ্তগৌরবা দীনা ভারতী ভূতধাত্রীকে আবার শ্রীচরণধূলিতে ত্রাণ করিবার জন্য। ১৫ ।

লীলাভূমি

তাহারই অংশীভূত এই আগম নিগমের প্রসিদ্ধ পুণ্যধাম, শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সিন্ধুচ্ছলিত বিমল প্রেমতরঙ্গপূত বঙ্গদেশে, বক্রনাথাদি নিজমূর্ত্তির আলয় বীরভূমে, নিজ (তারা) পীঠে শ্মশানে তারাবামময় অভিনব লীলা দেখাইতে শ্রীবাম ইচ্ছা করিলেন।

৪। তারাপীঠ

বসিষ্ঠাদেস্-সিদ্ধিপীঠস্তারাপীঠো বিমুক্তিদঃ।
তারা শিলাময়ী যত্র চীনাচারেণ পূজ্যতে ॥

বসিষ্ঠাদি মহাপুরুষগণের সিদ্ধির পীঠ তারাপীঠ মোক্ষদায়ক স্থান। সেখানে (বসিষ্ঠারাধিতা) শিলাময়ী তারা চীনাচারে পূজিত হন।

তন্ত্রে তারাপীঠের মহিমা উদ্ঘোষিত। ইহা তারাপন্থিদের সিদ্ধিস্থান। তারা অষ্টবিধা। যথা মায়াতন্ত্রে—

তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রা নীলা সরস্বতী।
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা ॥

তারা

তারা, উগ্রতারা, মহোগ্রতারা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী—এই অষ্ট তারিণী। ভদ্রকালীর পরিবর্ত্তে কোন কোন তন্ত্রে চামুণ্ডা নাম পাওয়া যায়। তারা স্বয়ং দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া।

অষ্ট পীঠ

এই অষ্ট তারার অষ্ট পীঠ। বসিষ্ঠ, ভৃগু, দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মহর্ষিগণ তারাবিদ্যায় সিদ্ধ। যে যে অষ্ট ক্ষেত্রে সাধকগণের নিকট তারা প্রকাশ পাইয়াছেন, সেই সেই সিদ্ধিক্ষেত্র তারার বাহ্য পীঠ। সুষুম্নায় অষ্ট চক্র অষ্ট তারার গুহ্যপীঠ। এক একটী চক্রে এক একটী তারার স্থূল মূর্ত্তি ধ্যেয়া। অষ্ট তারার সূক্ষ্ম ভাবময়ী অষ্ট মূর্ত্তিও আছে। তাহার প্রধানপীঠ মনঃ। কিন্তু তত্তদ্ভাবমূর্ত্তি ধ্যানে সহস্রারের যে যে অষ্টচক্র স্পন্দিত হয়, সেই সেই ভাবমূর্ত্তির সেই সেই চক্র গৌণপীঠ। ভাবাতীতা তারা পরা, অবাঙ্‌মানসগোচরা।

বসিষ্ঠ

বীরভূমের অন্তর্গত তারাপীঠ বসিষ্ঠদেবের সিদ্ধিক্ষেত্র। ইহা সিদ্ধপীঠ, বিখ্যাত একপঞ্চাশৎপীঠের অন্তর্গত নহে। বসিষ্ঠদেব উগ্রতারার সাধনায় এই ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। এজন্য এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী উগ্রতারা। এই বসিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া তন্ত্রে পরিচিত। কিন্তু "তারা" নামক পুস্তিকাকার তাঁহাকে তারাপীঠের চন্দ্রচূড় রাজার পত্নী তারাবতীর সখী হারাবতীর গর্ভজাত কুবুদ্ধ নামক স্থানীয় যোগীর ঔরসোৎপন্ন বলিয়াছেন। ঐরূপ উক্তির প্রমাণ দেন নাই। "বামাক্ষ্যাপা"

প্রণেতা "তারা" লেখকের অনুকরণে ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠকে মারিয়া উক্ত হারাবতীকে দাসী সাজাইয়া তাহার গর্ভে কুবুদ্ধের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করাইয়াছেন। ইহা তন্ত্রবিরুদ্ধ অদ্ভুতোক্তি।

বসিষ্ঠের তারাসাধনার আখ্যায়িকা মহাচীনাচারক্রমে এইরূপ বিবৃত।—

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ বসিষ্ঠঃ স্থিরসংযমঃ।
তারামারাধয়ামাস পুরা নীলাচলে মুনিঃ॥
জপন্ সন্তারিণীং বিদ্যাং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।

* * *

নানুগ্রহং চকারাসৌ তারা সংসারতারিণী॥
অথাসৌ পিতরং গত্বা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিণম।
কোপেন জ্বলিতো বিদ্বান্ উবাচ পিতুরন্তিকে॥

* * * *

ব্রহ্মোবাচ—

বসিষ্ঠ গচ্ছ পুত্র ত্বং পুনর্নীলাচলং প্রতি।
তত্র স্থিতো মহাদেবীমারাধয় মহাব্রত॥

* * * *

তত্র গত্বা মুনিবরঃ পূজাসংভারতৎপরঃ।
আরাধয়ৎ মহামায়াং বসিষ্ঠোঽপি জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

* * * *

তারাসাধনায় বৈকল্য, তথাপি তৎপ্রতি প্রীতা যথা নাভূৎ মহেশ্বরী।

* * * *

তদা জলং সমাদায় তাং শপ্তুমুপচক্রমে॥

* * * *

ততো দেবী মহামায়া তারিণী সর্ব্বসিদ্ধিদা।
উবাচ সাধকশ্রেষ্ঠং বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্॥
রোষেণ দারুণমনাঃ কথং মামশপস্তবান্।
ময়ি আরাধনাচারং বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ॥

এক এব বিজানাতি নান্যঃ কশ্চন তত্ত্বতঃ।

* * * *

উদ্বোধরূপিণো বিষ্ণোঃ সন্নিধিং যাহি সম্প্রতি ॥
তেনোপদিষ্টমার্গেণ সমারাধয় সুব্রত।
তদৈব সুপ্রসন্নাহং ত্বয়ি যাস্যাম্যসংশয়ম্ ॥

—ইতি প্রথম পটলে

ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং বসিষ্ঠোঽসৌ মহামুনিঃ।
জগামাচারবিজ্ঞানবাঞ্ছয়া বুদ্ধরূপিণম্ ॥
ততো গত্বা মহাচীনে দেশে জ্ঞানময়ো মুনিঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বরমুমাপতিম্ ॥
রণজ্ঝঘনরাবেণ রূপযৌবনশালিনা।
মদিরামোদচিত্তেন বিলাসোল্লসিতেন চ ॥
শৃঙ্গারপরিবেষেণ জগন্মোহনকারিণা।
ভয়লজ্জাবিহীনেন দেবীধ্যানপরেণ চ ॥
কামিনীনাং সহস্রেণ পরিবারিতমীশ্বরম্।
মদিরাপানসংসক্তং মদমন্থরলোচনম্ ॥
দূরাদেব বিলোক্যৈনং বসিষ্ঠো বুদ্ধরূপিণম্।
চীনাচারী বুদ্ধ বিষ্ণু বিস্ময়েন সমাবিষ্টো স্মরন্ সংসারতারিণীম্ ॥
কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম্ম বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
দেবদেব বিরুদ্ধোঽয়মাচারঃ সম্মতো ময়া ॥
ইতি চিন্তয়তস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহামুনেঃ।
আকাশবাণী প্রাহাশু এবং চিন্তয় সুব্রত ॥
আচারঃ পরমার্থোঽয়ং তারিণীসাধনে মুনে।
এতদ্বিরুদ্ধাচারস্য মতে নাসৌ প্রসীদতি ॥
যদি তস্যাঃ প্রসাদং ত্বমচিরেণাভিবাঞ্ছসি।
এতেন চীনাচারেণ তদা তাং ভজ সুব্রত ॥
আকাশবাণীমাকর্ণ্য রোমাঞ্চিতকলেবরঃ।
বসিষ্ঠো দণ্ডবদ্ভূমৌ পপাতোঽতীবহর্ষিতঃ ॥

তত উত্থায় প্রণম্যাসৌ কৃতাঞ্জলিপুটো মুনিঃ।
জগাম বিষ্ণুসমীপং বুদ্ধরূপস্য পার্ব্বতি ॥
অথাসৌ তং সমালোক্য মদিরামোদবিহ্বলঃ।
প্রাহ বুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥
অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহ ভক্তিনম্রো মহামুনিঃ।
তদুক্তং তারিণীদেব্যাঃ নিজারাধনহেতবে ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বুদ্ধস্তত্ত্বজ্ঞানময়ো হরিঃ।
বসিষ্ঠং প্রাহ সুজ্ঞানশ্চীনাচারাধিকারবান্ ॥
অপ্রকাশ্যোঽয়মাচারস্তারিণ্যাঃ সর্ব্বদা মুনে।
তব ভক্তিবশাদস্মি প্রকাশয়ামীহ তৎপরঃ ॥

—ইতি দ্বিতীয় পটলে

সারার্থ—নীলাচলে কামাখ্যামণ্ডলে ব্রহ্মার (মানস) পুত্র বসিষ্ঠদেব শুদ্ধাচারে বহুকাল তারাদেবীর সাধনা করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না। পিতার নিকট আসিয়া তিনি খেদ করিলে, পিতা তাঁহাকে নীলাচলে গিয়া তারা সাধনায় ব্রতী হইতে বলিলেন। তদনুসারে বসিষ্ঠ পুনরায় শুদ্ধাচারে নীলাচলে বহুবর্ষ মার সাধনা করিলেন। তাহাতেও সিদ্ধি পাইলেন না। তখন তিনি ক্রোধভরে তারামন্ত্রে অভিশাপ দিলেন যে ঐ মন্ত্রে কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। তখন তারার এই বাণী বসিষ্ঠের কর্ণগোচর হইল—"আমার উপাসনার আচার বিদিত না থাকায় সিদ্ধি পাও নাই। আচার শিক্ষার জন্য মহাচীনে যাও। তথায় বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন শিক্ষা দিবেন।" বসিষ্ঠ হিমালয়পৃষ্ঠে মহাচীনে গমন করিয়া দেখিলেন যে একজন পুরুষ পানাসক্ত মদমন্থরলোচন এবং মদিরামোদচিত্ত বিলাসোল্লসিত কামিনী সহস্রে পরিবৃত রহিয়াছেন। এই দৃশ্যে বিস্মিত হইয়া বসিষ্ঠ তারামাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন এ কি কার্য্য করিতেছেন! বীভৎস্যবোধে তাঁহার হৃদয় যখন দোলায়িত, তখন আকাশ বাণী হইল, "হে সুব্রত মুনে! তারাসাধনের এই আচার। ইহাই চীনাচার। ইহার বিরুদ্ধাচারে তারা প্রসন্না হন না।" তখন তিনি ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ পুরুষের নিকট গেলেন। সেই মদিরামোদ বিহ্বল বুদ্ধ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—"কেন তুমি এখানে

আসিয়াছ ?" তখন বুদ্ধকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া মুনিবর তারার আদেশ তাঁহাকে জানাইলেন। তত্ত্বজ্ঞানময় চীনাচারে অধিকারী হরি তখন তাঁহাকে চীনাচার শিক্ষা দিলেন। ঐ আচার যাহার তাহার নিকট প্রকাশ্য নহে।

তন্ত্রমতে তারাই ব্রহ্ম, তারাই জগৎ। তারা নির্গুণা, সগুণা, নিরাকারা, সাকারা; দ্বন্দ্বীভূতা, দ্বন্দ্বাতীতা; সর্ব্বভাবময়ী, সর্ব্বভাবাতীতা। শুচি, অশুচি; পাপ, পুণ্য; ধর্ম্ম, অধর্ম্ম; কর্ম্ম, অকর্ম্ম—সকল ভাবেই তারা বিরাজমান। তাঁহাকে শুচিভাবেই পাওয়া যায়, অশুচি ভাবে পাওয়া যায় না—ইহা ক্ষুদ্র বুদ্ধি। এই সঙ্কোচভাব থাকিতে সেই অনন্ততারার অনন্ত ছবি হৃদয়ে জাগে না। আতপ তণ্ডুল, ফলমূল প্রভৃতি শুদ্ধদ্রব্যও তাঁহার, মদ্যাদি অশুদ্ধ দ্রব্যও তাঁহার। তাঁহার পূজা তাঁহারই দ্রব্যে। সুতরাং সে পূজায় শুদ্ধ দ্রব্য আবশ্যক, অশুদ্ধ দ্রব্য চলিবে না—ইহা সঙ্কীর্ণতা। শুচি ও অশুচি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান অপহৃত করিয়া সাধনই সাধন। প্রথম অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য শুচিভাব-গ্রহণ আবশ্যক। চিত্ত শুদ্ধ হইলে দুইই সমান।

ব্যাখ্যা

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

রামপ্রসাদ

কালীকল্পতরুমূলে আয় মন বেড়াতে যাবি
(তথা) ধর্ম্মঅর্থ কামমোক্ষ চারিফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা অজা ধৈর্য্যখোঁটায় বেঁধে থুবি
না মানে নিষেধ তবে জ্ঞানখড়্গে তায় বলি দিবি।
কুমতি সুমতি জায়া দিব্যখাটে শোয়াইবি।
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামামাকে পাবি।
প্রসাদ বলে এমন হলে মন কালের হাত এড়াইবি
তখন বাপধন বাপের ঠাকুর বাপু বাছা হয়ে রবি।

গীতাতেও এই কথা—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭ অ. ১২।

যে সব সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব আছে তাহারা আমা হইতে উদ্ভূত। আমি সে সকলে নাই, তাহারা আমাতেই আছে। মনস্তত্ত্ব যখন আমার তখন সমস্ত মানসিকভাবও আমার। আমি তাহাদের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন। তাহারা আমাতে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় বিদ্যমান। আমি নিত্যনির্ম্মল, তাহাদের কালুষ্যে আমার কালুষ্য হইতে পারে না।

বুদ্ধরূপিজনার্দ্দনের শিক্ষায় বসিষ্ঠের ভ্রম নিরাস হইল। তিনি শুচি অশুচি সমান করিয়া কোন তন্ত্রমতে কামাখ্যাপীঠে অন্যমতে তারাপীঠে মহাশ্মশানে শাল্মলী-তরুতলে তারাসাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তারা মা সাকারা ও নিরাকারা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় তিনি মার তন্ত্রোক্ত কোন বিশিষ্ট-মূর্ত্তি স্থাপিত না করিয়া প্রতীকস্বরূপ একখানি শিলার পূজা করেন।

তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা।

* * * *

বসিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী।

—তারারহস্যে।

তারাপীঠ মহাপীঠ, তথায় সযত্নে যাইবে * * * যেখানে বসিষ্ঠের আরাধিতা তারা আছেন, সে তারা শিলাময়ী। ঐ শিলাখানিকে পাণ্ডারা ব্রহ্মশিলা বলেন। তদ্গাত্রে একটি শয়াননারী ও তৎক্রোড়ে একটি স্তন্যপায়ী শিশু অঙ্কিত। তারার ধ্যানে আছে—

তারাশিলা

দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।

* * * *

বামে শিবস্বরূপং তং কল্পিতং বৎস্যরূপকম্॥

দেবীকে দ্বিভুজা সর্পময়যজ্ঞোপবীতে ভূষিতা * * * এবং তাঁহার বাম-ক্রোড়ে সাক্ষাৎ শিব বৎস্যরূপে কল্পিত চিন্তা করিবে।

পুরোহিত দক্ষিণ মুখে বসিয়া ঐ শিলাখানির পূজা করেন। ভোগ আতপ তণ্ডুলের; কিন্তু মৎস্য, মাংস ও কারণ চাই। দিগ্‌দেশ কালাকাল শুচি অশুচির নিয়ম নাই। আর বিশেষত্ব যে শ্যামায় শ্যামেরও পর্ব্ব হয়।

চীনাচার

৫। পূজাপ্রচার

পূজাং প্রচারয়ামাস জয়দত্তো বণিগ্বরঃ।
তারায়াঃ কৃপয়া তত্র পশ্যন্নুজ্জীবিতং সুতম্ ॥

সেই পীঠে তারার কৃপায় পুত্রকে উজ্জীবিত দেখিয়া বণিগ্বর জয়দত্ত পূজা প্রচারিত করিয়াছিলেন।

তারাপীঠে তারামার প্রকাশ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে বসিষ্ঠের বহুকাল পরে জয়দত্ত নামক বণিক্ বাণিজ্যের জন্য দ্বারকা নদী বাহিয়া যাইতেছিলেন। পথে তাঁহার পুত্র মারা যায়। তারাপীঠে পৌঁছিলে তারামার মায়ায় পণ্যসমূহও ভস্মীভূত হয়। সদাগর কাঁদিয়া আকুল। তারামা অবোধজীবের চৈতন্য জন্য সময়ে সময়ে বিপদ দেন, আবার সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার কৃপায় সদাগর পণ্য পাইলেন। সদাগরের পরিচারক কোটা মৎস্য শ্মশানের সন্নিহিত কুণ্ডে ধুইতে গেলে, মৎস্যগুলি জলস্পর্শে জীবিত হয়। এই সংবাদ পাইয়া জয়দত্ত মৃতপুত্রদেহ ঐ কুণ্ডে ভাসাইলেন। পুত্র পুনরুজ্জীবিত হইল। বণিক্ তারামার মহিমাদর্শনে ভক্তিভরে মার পূজার ব্যবস্থা করিলেন। প্রবাদ নিম্নলিখিত ছড়ায় রক্ষিত।—

কোথা হইতে সদাগর বাণিজ্যে আইল।
সাত ডিঙ্গা ধন সাধু সাজাইয়া লইল ॥
কোন নায়ে ছিল তাড়া মাণিকমুক্তা।
কোন নায়ে ছিল তাড়া রেশমের সূতা ॥
কোন নায়ে ছিল তাড়া চামর চন্দন।
কোন নায়ে ছিল তাড়া রজত কাঞ্চন ॥
কোন নায়ে ছিল তাড়া শঙ্খমনোহর।
কোন নায়ে ছিল তাড়া ফটিক পাথর ॥
এ সকল দ্রব্য সাধু তুলে নিল নায়।
হেন কালে সদাগরের পুত্র মরে যায় ॥
পুত্র শোকে সদাগর হৃদয় জর্জ্জর।
সাধু ম'ল শব্দ গেল গ্রামের ভিতর ॥

গ্রামের যতেক লোক দেখিবারে ধায়।
অশেষ বিশেষ কথা সাধুরে বুঝায়॥
তোমা হতে পুত্র সাধু তোমা হতে ধন।
মিছে মায়া কর সাধু শোক অকারণ॥
বুঝিয়ে না বোঝে সাধু শোকেতে কাতর।
অমনি পড়িয়া রহে নৌকার ভিতর॥
কাণ্ডারে ডাকিয়া বলে বণিক বচন।
ঘৃতে ভাজি রাখ পুত্রে করিয়ে যতন॥
আগেতে দেখাব পুত্র ইহার জননী।
পশ্চাতে ফেলাব পুত্র গঙ্গার তটিনী॥
গ্রামের যতেক লোক গ্রামে চলে যায়।
পুত্র শোকে সদাগর অচেতন প্রায়॥
দিগম্বরী রূপে তারা সাধুরে সুধান।
কোথা তব বাড়ী ঘর কি তোমার নাম॥
কি ভাড়া ভরিয়ে যাও নৌকার ভিতর।
পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইয়ে কাতর॥
মৃতপ্রায় ছিল সাধু কহিল উত্তর।
ছাই ভাড়া ভরে যাই নৌকার ভিতর॥
এত শুনি মহামায়া রোষান্বিত হয়।
নৌকায় যতেক ধন ছাই হয়ে যায়॥
অন্যরূপে এসে মাতা সাধুরে সুধান।
কোথা তব বাড়ী ঘর কি তোমার নাম॥
মৃতপ্রায় দেখি তব মলিন বদন।
অবনি লুটায়ে আছ কিসের কারণ॥
এত বাক্য শুনি সাধু চেতন পাইল।
জোড় হস্ত করি সাধু কহিতে লাগিল॥
এ দেশে বসতি নয় বহু দূরে ঘর।
পুত্র ধন লয়ে এলাম নৌকার ভিতর॥

পুত্র গেল, ধন গেল সব হল ছাই।
কোন দেবতা ছলে মোরে বুঝা নাহি যায়॥
নিশাভাগে স্বপ্নযোগে আসিয়া নিকটে।
উপনীত হন মাতা দ্বারকার তটে॥
দেবী বলে সাধু তুমি না হও কাতর।
যত ধন গেছে সাধু পাইবে সত্বর॥
প্রভাতে তরণী দেখি পরিপূর্ণ ধন।
নিশ্চয় হইল সত্য দেবীর বচন॥
এই গ্রামে উত্তরিয়ে দুখ পেলাম অতি।
গ্রামের নাম হল পাপপড়া খেওয়াতি॥
কাণ্ডারে ডাকিয়া বলে শুনরে বচন।
এ ধার হইতে ডিঙ্গা লহত এখন।
ও ধারে করিব গিয়ে স্নানাদি তর্পণ॥
দাঁড় বাহি নৌকা লয়ে নদীপার হল।
তারাপুরের ঘাটে এসে উপনীত হল॥
লোহার শিকলে নৌকা শিমুল গাছেতে।
বাঁধি সাধু যায় স্নান তর্পণ করিতে॥
কেহ স্নান করে কেহ মৎস্য ধর্ত্তে গেল।
রাঘব বাটীর বিলে যোল মৎস্য পেল॥
মৎস্য কুটি ধুতে যায় জীবৎকুণ্ডজলে।
কাটা মৎস্য জোড়া লাগি পলায় সকলে॥
সাধু বলে হেন বাক্য কভু সত্য নয়।
মৃত পুত্র বাঁচে যদি তবে জানি হয়॥
মৃত পুত্র ফেলে দিল সে কুণ্ডের জলে।
মৃত পুত্র বেঁচে উঠে তারা তারা বলে॥
পুত্র দেখে সদাগর হৃদয়ে উল্লাস।
তারা নামে কেবা আছে হওত প্রকাশ॥
প্রকাশ হইয়ে মাতা কহে সদাগরে।
মন্দির বানায়ে দাও দ্বারকারি তীরে॥

তখন ফেলাল সাধু একলক্ষ তঙ্কা।
আরো কত কৈল ছলে নাহি তার সংখ্যা॥
একচিত্ত জয়দত্ত হয়ে একমন।
ভক্তি ভাবে পূজা করে তারার চরণ॥
এইরূপে পুত্র পায় তারার কৃপায়।
এইখানে হলো মোর বন্দনা যে সায়॥

এই জয়দত্ত কবে কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন তাহা প্রবাদে উল্লেখ নাই। প্রবাদের পরিপোষক প্রমাণও নাই। দেবতাদের পূজা পাইবার সাধ সম্বন্ধে বাঙ্গলায় বহু প্রবাদ প্রচলিত। মনসাপূজা প্রচারের প্রবাদ কেতকাদাসের, ধর্ম্মপূজা প্রচারের প্রবাদ ঘনরামের, চণ্ডীপূজা প্রচারের প্রবাদ মুকুন্দরামের অমর লেখনীতে রক্ষিত। তারাপূজা প্রচারের কথার অদৃষ্টে সেরূপ কোন কবি জুটে নাই। প্রবাদ কিন্তু প্রাচীন। তারাপীঠে পাণ্ডাদের ২৫।৩০ পুরুষ বাস। আবহমানকাল তাহাদের মধ্যে এই জনশ্রুতি।

জয়দত্তের মন্দির কোথায় ছিল তাহার চিহ্ন নাই। তবে প্রাচীন শ্মশানে পুরাকালে যে এক মন্দির ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ত্রিকালদর্শী বাম বোধকরি ঐ বিষয় জানাইবার জন্য দেহরক্ষার পূর্ব্বে বসিষ্ঠের আসনের পার্শ্বে নিম্ব বৃক্ষের তলে তাঁহার সমাধি দিবার কথা বলেন। তাঁহার আদেশানুসারে তথায় ১৩১৮ সালে ৩রা শ্রাবণ তাঁহার দেহের সমাধি হয়। সেই সমাধির উপর পরে মন্দির হইয়াছে। সমাধি মন্দিরের ভিত্তিপত্তন জন্য খনন করিতে করিতে প্রাচীন লুপ্ত মন্দিরের চারিটি ভিত্তি পাওয়া যায়। উহার আয়তন আনুমানিক চতুর্হস্ত দীর্ঘ ও হস্তত্রয় প্রস্থ। উহার দুইটি ভিত্তির উপর বর্ত্তমান সমাধি মন্দিরের দুইটি ভিত্তি স্থাপিত।

প্রাচীন মন্দির

৬। তারাসেবা

তারিণীসেবকা ধন্যাঃ শ্রীরামজীবনাদয়ঃ।
তেষাং রাজা রামকৃষ্ণঃ সাধকো ধুরি কীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীরামজীবন প্রভৃতি তারিণীসেবকগণ ধন্য। সাধক রাজা রামকৃষ্ণই তাঁহাদের অগ্রণী বলিয়া কীর্ত্তিত।

জয়দত্তের ব্যাপার ঐতিহাসিক হউক আর নাই হউক, বীরভূমের এঁড়োল গ্রামের রাজা রামজীবন রায়ের তারাসেবা সম্বন্ধে সংশয় নাই। তিনি রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন। বিভব ও সদগুণের জন্য রাজা বলিয়া খ্যাত হন। বর্ত্তমান তারামন্দিরের স্থানে তিনি মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া সেবার জন্য পাণ্ডা প্রতিষ্ঠা করেন। আশুতোষ পাণ্ডা প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্তভূমির বৃত্তিভোগ করিতেছেন। রামজীবন রায়ের সময়ে সেবার জন্য ।/৫ নিত্য ব্যবস্থা ছিল। তখন টাকায় ৮/০ চাউল। সুতরাং তখনকার ।/৫ এখনকার ২১ টাকার সমান। রামজীবনের বংশধর এঁড়োলের বাঁড়ুয্যে বলিয়া বিদিত। এখনও শারদীয়াপূজার পর চতুর্দ্দশীর মেলায় এঁড়োলের পূজা সর্ব্বাগ্রে হইয়া থাকে।

রাজা রামজীবন

এঁড়োলের দশাবিপরিণামে মুর্শিদাবাদ জেলার রাণী জয়াবতী তারাসেবার ভার লন। তারামার নিকট মানসিক করিয়া তিনি এক কন্যারত্ন পান ও ও তাঁহার নাম রাজরাজেশ্বরী রাখেন। রাজরাজেশ্বরীর পরিণয় মুর্শিদাবাদের কাঁদিবাগডাঙ্গার জমিদার সূর্য্যমণি চৌধুরীর সহিত ঘটে। সেই সূত্রে জামাতার বংশে তারাসেবা আসে। তাঁহারা বুঁন্দেলখণ্ডী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূজা চতুর্দ্দশীর মেলায় এঁড়োলের পূজার পর হইয়া থাকে।

রাণী জয়াবতী

ইতিমধ্যে বীরভূমের বীররাজার বংশধর স্বীয় পাঠান কর্ম্মচারীর হস্তে নিহত হইলে, নগরের সিংহাসন মুসলমানের হস্তগত হয়। তারাপীঠ প্রভৃতি রাজা কালীরায়ের অধিকারে ছিল। নগরের মহম্মদী ভূপতিগন কালীরায়কে পরাভূত করিলে, তারাপীঠ নগরের অধিকারভুক্ত হয়। তখন পাণ্ডারা মাকে পায়স ভোগ মাত্র দিয়া পূজারক্ষা করেন। সে ভোগ এখনও চলিতেছে। পরে স্থানীয় সাপুরের জমিদার নগর হইতে অনুমতি লইয়া সেবা চালান।

সাপুরের সেবা

অনন্তর নাটোরাধিপতি স্বনামধন্য রাজা রামকৃষ্ণ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে তারাপীঠে সাধনার জন্য আসেন। কিছু দিন সাধনার পর দৈবাদেশে তিনি তারাপীঠ পরিত্যাগ করিলেও তারাপীঠে মার সেবার বিপর্য্যয় দেখিয়া সিংহবাহিনীর তালুক বিনিময়ে চণ্ডীপুর উদ্ধার করিয়া উহাই তারামার সেবায় অর্পণ করেন। তখন বর্ত্তমান মন্দির ছিল না। রামজীবন রায়ের ভগ্নমন্দিরে

মার পূজা হইত। এক্ষণে রাজা রামকৃষ্ণেরই সেবা চলিতেছে। তখন রাণী ভবানী জীবিত থাকায় কেহ কেহ রাণী ভবানীর সেবা বলিয়া থাকেন। নাটোরের ছোট তরফ শাক্ত দেবোত্তর এবং বড় তরফ বৈষ্ণব দেবোত্তর পাইয়াছেন। কুমার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় ছোটতরফের মালিক। চণ্ডীপুর তালুকের বার্ষিক আয় আনুমানিক ২০০০৲ টাকা তারামার সেবায় অর্পিত। প্রত্যহ ।০ সের আতপতণ্ডুলের ভোগ ব্যবস্থা আছে। প্রতি অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও পক্ষান্তে ছাগবলিও নির্দ্দিষ্ট। প্রসাদ স্থানীয় সাধকগণের জন্য অভিপ্রেত।

৭। গ্রাম পরিচয়

পুণ্যে চণ্ডীপুরে ভাতি দ্বারকোত্তরবাহিনী।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্গঙ্গা বারাণসীপুরে যথা॥
তস্যাঃ পূর্ব্বতটে গৃধ্রগোমায়ুকুক্কুরাকুলম্।
শবচীরকটৈঃ রুণ্ডৈঃ শ্মশানং ঘোরপাবনম্॥
তত্রান্তে শাল্মলীমূলে বসিষ্ঠস্যাসনং শুভম্।
সিদ্ধসাধকবৃন্দস্য সমাজাশ্চ তদন্তিকে॥
পূর্ব্বস্যাং চ ততো রম্যং জীবৎকুণ্ডাভিধং সরঃ।
যস্য দক্ষিণতো নব্যং তারায়তনমুন্নতম্॥
তস্মিন্নভ্রংলিহং তারামন্দিরং রাজতে মহৎ।
বসিষ্ঠারাধিতা তারাশিলা যত্র প্রতিষ্ঠিতা॥
পূজ্যতে চ সদা তত্র চন্দ্রচূড়োঽন্যমন্দিরে।
বহ্নিকোণে ততঃ পল্লী তারাসেবকশোভিতা॥

পবিত্র চণ্ডীপুরে উত্তরবাহিনী দ্বারকানদী বারাণসীধামে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার ন্যায় শোভমান। নদীর পূর্ব্বতটে গৃধ্র, শৃগাল ও কুক্কুরে সমাকুল, এবং শবকন্থা, শবশয্যা ও শুষ্ক নৃমুণ্ডে ভীষণ অথচ পাবন শ্মশান বর্ত্তমান। সেই শ্মশানে শাল্মলীতরুর মূলে কল্যাণকর বসিষ্ঠের আসন। তার নিকট ঐ পীঠের সিদ্ধসাধকবৃন্দের সমাধিসমাজ। তাহাদের পূর্ব্বদিকে রমণীয় জীবৎকুণ্ড

নামক সরোবর। তাহার দক্ষিণে তারার নূতন উচ্চ পূজাবাটী। সেখানে বৃহৎ মেঘচুম্বি তারামন্দির বিরাজিত। ঐ মন্দিরে বসিষ্ঠারাধিতা তারাশিলা প্রতিষ্ঠিতা। আরও সেখানে ভিন্নমন্দিরে চন্দ্রচূড়ের নিত্য সেবা হয়। তাহার অগ্নিকোণে তারাসেবক পাণ্ডাদের পল্লী।

তারাপীঠ বা তারাপুর তন্ত্রোক্ত নাম। গ্রামখানির নাম চণ্ডীপুর। ইহার নিকট তারাপুর নামক অন্য গ্রাম আছে। তাহা দিনাজপুরের মহারাজার তালুক। তন্ত্রে তারাপীঠের সন্নিবেশ যথা—

তন্ত্রোক্তি

ঈশানে বক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ।
তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুবি দুর্লভম্॥ —তারারহস্যে।

বক্রনাথের ঈশানকোণে ও বৈদ্যনাথের পূর্ব্বদিকে তারাপুর নামক নগর আছে। তাহা ভুবনে দুর্ল্লভ।

দ্বারকানদী সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত হইতে উঠিয়া পূর্ব্ব মুখে প্রবাহিত হইয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিশিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। তারাপীঠের নিকট

দ্বারকা নদী

ক্রোশাবধি দ্বারকা উত্তরবাহিনী। নদীর পূর্ব্বকূলে গ্রাম। ঐ কূলের সৈকতে মহাশ্মশান। এই শ্মশানে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের শবদাহ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের লোক তারাপীঠে অস্থি রাখিতে পারিলে ধন্য জ্ঞান করেন। তাই এখানে শবের অভাব নাই। প্রত্যহ ৫।৭টী আছে। বর্ষাদিতে যখন যমের দ্বার উন্মুক্ত হয় তখন প্রতিদিন ২০।২৫টী আসে। আবার মহামারিতে ৪০।৫০টীও দৈনিক সংখ্যা হয়। কাষ্ঠের দুর্ম্মূল্যতা প্রযুক্ত হউক বা অন্য কারণে হউক এখানে শবদেহের

মহাশ্মশান

সম্পূর্ণ দাহ প্রথা নাই। নদীগর্ভে বালুকার উপর চিতা সাজাইয়া মুখাগ্নি করতঃ অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় বালুকাবৃত করিয়া আত্মীয়েরা শেষকৃত্য করেন। পরক্ষণেই তথায় প্রতীক্ষমাণ শৃগালকুক্কুরদল বালুকা সরাইয়া শবদেহ বাহির করে। শকুনির পালও পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক মেঘদর্শনে পুচ্ছবিসারিময়ূরের মত আনন্দে নাচিতে নাচিতে শবকে ঘেরিয়া ফেলে। তখন ভোজ আরম্ভ হয়। ঐ ভোজ ভীষণ দৃশ্য। নির্ভীকেরও হৃৎকম্প হয়। কেবল তারামার সেবকগণই সে দৃশ্যে মার নৃত্য দেখিয়া সুখ দুঃখ ভয়ের অতীতাবস্থায় পড়ে। শৃগাল ও কুক্কুর শবদেহ ছিঁড়াছিড়ি

করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া খণ্ডযুদ্ধ বাধাইতেছে। শবমাংসভোজনে তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ। শকুনিরা পদতল প্রভৃতি কোমল অঙ্গের মাংস খাইতেছে। কুকুরেরা অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে। কখনও শকুনিদের লম্বা গলা কামড়াইয়া শৃগাল ও কুকুর তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া দিতেছে। আবার শকুনিরা মালশাট মারিয়া নিজাংশ পাইবার জন্য আসিতেছে। এরূপ ভীষণ শ্মশান প্রায় দেখা যায় না। নরমুণ্ড ভাঁটার মত গড়াগড়ি। নরাস্থি চারিদিকে ছড়ান। চিতার কাঠে, মড়ার কাঁথায় ও চেটায় শ্মশান ও শ্মশানের পথ ঘাট ভরা।

শিমূলতলা

ঐ শ্মশানের পূর্ব্ব গায়ে প্রাচীন শ্মশান। তাহার কতকাংশ গাছপালায় ঢাকা ঝোপের মত, কতকটা ফাঁকা জমি। সেখানেও নরকপাল ও নরকঙ্কাল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ। বর্ষাকালে যখন নদীতে বন্যা আসে ও নদীর গভ ডুবিয়া যায় তখন প্রাচীন শ্মশানেই শবদাহ হয়। প্রাচীন শ্মশানের তরুলতাসমাচ্ছন্নস্থানে এক শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। প্রবাদ সেই শাল্মলীতরুমূলেই বসিষ্ঠের আসন। তাই ঐ স্থানের বর্ত্তমান নাম শিমূলতলা।

পাদপদ্ম

শিমূলতলায় একখানি শিলা আছে তাহাতে দুইখানি পদচিহ্ন অঙ্কিত। উহাকেই তারামার পাদপদ্ম বলে। ঐ শিমূলতলা ও ঐ শিলা আমাদের বামের হৃদয়ের ধন। ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক সাধুর উদ্যোগে শিমূলতলায় একটি ইটের পাকা বেদী প্রস্তুত হয়। বামের দেহ রক্ষার পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য রাণীগঞ্জের সন্নিহিত ইকড়া গ্রামবাসী শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ঐ বেদীকে বাড়াইয়া উচ্চ করিয়া একটি নূতন বেদী ও তাহার উপর তারমার পাদপদ্ম রাখিবার একটি ছোট মন্দির ও বামের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ভক্তগণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

আশ্রম

শিমূলতলা নদীর গর্ভ হইতে ৪।৫ হাত উচ্চ। শিমূলতলা হইতে ৬।৭ হাত উচ্চ একখণ্ড উত্তর দক্ষিণে লম্বা পতিত ভূমি আছে। ঐ ভূমির কতকাংশে বামের সন্ন্যাস গ্রহণের ৩০।৩৫ বৎসর পরে একখানি চালাঘর প্রস্তুত হয়। উহাই বামের আশ্রম বলিয়া পরিচিত। ঐ আশ্রমের উত্তরে ও বামের সমাধিমন্দিরের

পূর্ব্বদিকে মোক্ষদানন্দ প্রভৃতি পীঠের সাধকগণের সমাধি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ আছে।

উক্ত পতিতভূমিখণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে গ্রামের উত্তরদক্ষিণমুখী প্রধান পথ। পথের পূর্ব্ব দিকে জীবৎকুণ্ড নামক বৃহৎ পুষ্করিণী। প্রবাদ ঐ

জীবংকুণ্ড কুণ্ডে জয়দ্রথের মৃতপুত্র উজ্জীবিত হয়। তাই উহাকে জোৎকুণ্ড বলে। উহার পশ্চিম পাড়ে পথের উপর একটি বাঁধা ঘাট। ঘাটের দুই পাশে কল্কে ফুলের ঝাড়।

পথের পূর্ব্বে ও জীবৎকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে তারামার মন্দির বাটী। বর্ত্তমান

জগন্নাথ রায় মন্দির মল্লারপুর গ্রামের বণিক্ জগন্নাথ রায়ের কীর্ত্তি। মানসিক পূর্ণ হইলে তিনি ১৭৪০ শকে বিপুলার্থব্যয়ে রাজা রামজীবনের প্রাচীন মন্দিরস্থলে ইহা নির্ম্মাণ করান।

মন্দির খোদিত শিলালিপি যথা—

নাত্রকের তরফ

পুরহিত শ্রীকেদার নাথ পাণ্ডা

মন্দিরলিপি

শ্রীপঞ্চানন সরকার সাং মদনকাটি।

শ্রীস্বরানন্দ সত্তা
শ্রীরামশঙ্কর রাজ বিরাদারী
শ্রীরামমোহন রাজ
শ্রীভোলানাথ রাজ
শ্রীগোপাল রাজ
শ্রীভৈরব রাজ
এই ছয়জন রাজ

৺শ্রীশ্রীদুর্গা
শকাব্দা ১৭৩০
শ্রীশ্রী৺রী বাটী ও মন্দির
গয়রহ তৈয়ারী নাএক
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রায় সাং
মল্লারপুর তরফ ম্যানে-
জার শ্রীভাগবত রায়
সাং ঐ সন ১২২৫ সাল
তাং ১২ই ফাল্গুন।

পথ হইতে পূজাবাটী একতালা উচ্চ। পথের দিকে গজগিরি করা গাঁথান পাকা প্রশস্ত প্রাচীর। সেই প্রাচীরের ভিতর বাঁধান বৃহৎ আঙ্গিনা। পথ হইতে আঙ্গিনায় উঠিতে ১২ পাউটী সিঁড়ি ও সদরফটক। আঙ্গিনার দক্ষিণ

দিকে ৪।৫ তালা উচ্চ মন্দির। তাহার চূড়া মল্লারপুর হইতে রামপুরহাট যাইবার পথে রেলগাড়ী হইতে দেখা যায়, মন্দির ইষ্টকের। চিত্রাদি অঙ্কিত আছে। মন্দিরের উত্তর ভিত্তিতে প্রধান দ্বার, পূর্ব্বদিকেও একটি দ্বার। মন্দির মধ্যে দক্ষিণাংশে এক উচ্চ বেদী। তাহার উপর বসিষ্ঠারাধিতা শিলা স্থাপিতা। মন্দিরঘরের সম্মুখে উত্তরে দর্ দালান। মন্দিরের চারিপাশে খোলা রোয়াক্। তাহা আঙ্গিনা হইতে ৩।৪ হাত উচ্চ। ঠাকুরবাটীর পশ্চিমাংশে মন্দিরের সমতল প্রশস্ত খোলা বাঁধান চত্বর। তাহার মধ্যে একটি রাসমঞ্চের ন্যায় ছোট মঞ্চ। উহার নাম বিশ্রামখানা। শারদীয়া পূজার চতুর্দ্দশীতে তারামার মেলার সময় ঐ মঞ্চে তারাশিলাখানি বসাইয়া পূজা হয়।

মন্দিরাদি

আঙ্গিনার পূর্ব্বদিকে আঙ্গিনা হইতে প্রায় ২ হাত উচ্চ পোতা থামলের উপর চন্দ্রচূড়ের মন্দির ও তাহার চারিপাশে রোয়াক্। চন্দ্রচূড় তারাপুরের ভৈরব, আদিলিঙ্গ। কেহ কেহ বলেন যে স্থানীয় রাজা চন্দ্রচূড় নিজনামে এই লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই মন্দিরটী প্রায় তিন তালা উচ্চ; ইহার একটি মাত্র পূর্ব্বমুখি দ্বার। মার মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে মার পাকশালা ও ভাণ্ডারাদি।

চন্দ্রচূড়ের মন্দির

পূর্ব্বদক্ষিণে পাণ্ডাপাড়া। প্রায় বিশ ঘর পাণ্ডা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে সরস্বতীর উপাসনা বিরল। কৃষি ও যাত্রী তাঁহাদের অবলম্বন। তারামার সেবার পালা ভাগ আছে। প্রণামি পালিদারের প্রাপ্য। তারামার স্নান, শৃঙ্গার প্রভৃতি পাণ্ডাদের করণীয়। পূজা ও ভোগাদির ভার নাটোর কর্ম্মচারিদের উপর ন্যস্ত। পাণ্ডারা অল্পে সন্তুষ্ট। তাঁহারা যাত্রিদিগকে বড়ই যত্ন করেন। যজমান ধরিবার নিয়ম আছে। নূতন যাত্রী পুরাতন যাত্রীর আত্মীয় বা প্রেরিত হইলে পুরাতন যাত্রীর পাণ্ডাই তাঁহার অধিকার পান; নচেৎ নূতন যাত্রী পালিদারের প্রাপ্য।

পাণ্ডা

গ্রামে নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ল্যাট্ প্রভৃতি জাতি আছে। একঘর শুঁড়ি একখানি দেশী মদের দোকান খুলিয়া তারাপীঠের বাহ্যিক বীরাচারের সহায়তা করিতেছে। কয়েকঘর পাটনীও আছে। তাহারা দ্বারকায় খেয়া দেয় ও শ্মশানে বন্ধুকৃত্য করে।

অন্যান্য জাতি

৮। সিদ্ধসাধকবৃন্দ

পীঠেঽস্মিন্ পাবনীং বন্দে গুরুভূতাং সনাতনীম্।
আবসিষ্টাদবিচ্ছিন্নাং বামান্তাং কৌলসন্ততিম্॥

এই পীঠে বসিষ্ঠ হইতে বাম পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রাচীন যে কৌলগণের সম্প্রদায় (জগৎকে) পবিত্র করিতেছেন, এবং জগতের গুরুস্থানীয় তাঁহাদিগকে বন্দনা করি। বঙ্গদেশ শক্তিসাধনার ভূমি। তারাপীঠ সেই সাধনার কেন্দ্র। এখানে সিদ্ধ ও সাধক প্রায়ই থাকেন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বিশে ক্ষ্যাপা বলিয়া এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি "ডাক পুরুষ" বিশে পাগলা নহেন। রাজা রামকৃষ্ণের সময় আনন্দনাথ নামে এক উন্নত কৌল সাধক থাকেন। তিনি তন্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে তারাপীঠের প্রধান কৌলপদে বৃত করেন। তিনি অষ্টমীতে ও পক্ষান্তে তারামার পর্ব্বপূজার প্রচলন করেন। চতুর্দ্দশীর মেলায় যাত্রিগণের শিক্ষার জন্য তিনি ধর্ম্মব্যাখ্যার ও শাস্ত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে ঐ মেলায় তান্ত্রিকতা কেবল তারা-তারা-রবে কারণপানেই পর্য্যবসিত। আনন্দনাথের পর তাঁহার শিষ্যও আনন্দনাথ নাম ও প্রধান কৌলপদ প্রাপ্ত হন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের বিরোধ পরিহারের জন্য তারাপীঠে শ্যামার শ্যামের পর্ব্ব প্রতিপালন করিবার বিধান করেন। তদবধি জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি তারামাতেই হইয়া থাকে। তাহার প্রভাবে শাক্তবৈষ্ণব-সম্মিলন ঘটে। তিনি ১২৬১ সালে দেহ রাখেন। এ অঞ্চল কেবল শাক্ত-গণের তীর্থ নহে, বৈষ্ণবগণেরও তীর্থ। তারাপীঠের নিকট একচাকা গ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। তথায় বীরচন্দ্রপুরে বাঁকারায় ও সিংহবাহিনী বিরাজমান। নিত্যানন্দের পূজিত প্রস্তরময় যন্ত্রও আছে। প্রবাদ সিংহবাহিনী নিত্যানন্দের কুলদেবতা। যন্ত্রটি শ্রীবিদ্যার যন্ত্র। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ঐটিকে মন্দিরের মধ্যে প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটি ইষ্টকের গোলাকার বৃত্ত করা হইয়াছে। তাহাতে যন্ত্র অদৃশ্য। আনন্দ-নাথের সমসাময়িক সাধক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য উল্লেখযোগ্য। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও তান্ত্রিককর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার শিষ্য মোক্ষদানন্দও উন্নত সাধক।

বিশে ক্ষ্যাপা

আনন্দনাথ

নিত্যানন্দ

মোক্ষদানন্দের সাংসারিক নাম মাণিকরাম মুখোপাধ্যায়। তারাপীঠের নিকটবর্ত্তী রাতনা গ্রামে তাঁহার জন্ম। নৈয়ায়িক জগদীশের ন্যায় মাণিকরাম বাল্যকালে বিদ্যার্জ্জন করেন নাই। হঠাৎ যৌবনে সরস্বতীর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষায় অধিকার লাভ করেন। ঐ স্থানের দক্ষিণ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সন্তান হয় নাই। প্রথমে বেদান্ত চর্চ্চায় গৃহত্যাগ ঘটে। কাশীতে গিয়া অকৃতদার পরিচয় দিয়া দণ্ড গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথের রাজ্যে প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মব্যাখ্যাতা হন। একদিন তথায় ব্যাখ্যাকালে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে চিনিতে পারেন। পত্নী থাকার কথা প্রচার পাইলে দণ্ডিগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া তিনি সপত্নীক কৌলসন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শেষজীবন তারাপীঠে আসিয়া তন্ত্রচর্চ্চায় ও তান্ত্রিকসাধনায় অতিবাহিত করেন। তিনি আনন্দনাথের কৌলপদ পান। তাঁহার কৃতিত্বে তারাপীঠ উজ্জ্বল হয়। তিনিই তারাশিলায় জগদ্ধাত্রীপূজা প্রবর্ত্তিত করেন। তাহা অদ্যাবধি হইয়া আসিতেছে। তাঁহার শেষজীবনের সহিত বামের মধ্যজীবন সংশ্লিষ্ট। তাঁহার পত্নী তাঁহার লোকান্তে জীবিতা ছিলেন। লেখক সেই মাকে দেখিয়াছেন। মা সম্প্রতি দেহ রাখিয়াছেন।

মোক্ষদানন্দ

ঈশান ভট্টাচার্য্য নামক একজন তান্ত্রিক ঐ সময়ে তারাপীঠে থাকিতেন। তিনিও কর্ম্মী। মোক্ষদানন্দের সময় তারাপীঠে এক মহাপুরুষের শুভাগমন হয়। তাঁহার সাংসারিক জীবন অজ্ঞাত। কোথায় জন্ম, কাহার পুত্র, কিরূপ অবস্থায় সংসারত্যাগ করেন, কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে আশ্রয় দেন, কি সাধনায় কোথায় সিদ্ধ হন—কিছুই জানা নাই। তিনি কেবল ব্রজবাসী কৈলাসপতি ক্ষ্যাপা নামে তারাপীঠে খ্যাত। তাঁহাকে মণি গোঁসাইও বলিত। তিনি বশিষ্ঠাসনের অধিকারী। সিদ্ধাবস্থায় তারাপীঠে আসেন। প্রবাদ পূর্ব্বে ব্রজধামে ছিলেন। বোধ হয় শ্যামসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্যামশ্যামার অভেদপীঠে অভেদসাধনা দেখাইতে আসেন। তাঁহার গলায় তুলসীর মালা, সঙ্গে ভৈরবী। তারাপীঠে সাধন বামাচারে ছিল।

ঈশান

ব্রজবাসী কৈলাসপতি

বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্র-
মগ্রে ন্যস্তং মরিচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।

স্কন্ধে বীণা ললিতসুভগা সদ্‌গুরূণাং প্রপঞ্চঃ
কৌলোধর্ম্মঃ পরগগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥
—কুলার্ণবে আনন্দ স্তোত্রে।

কৌলের বামপার্শ্বে রমণকুশলা বামা, দক্ষিণে পানপাত্র, সম্মুখে মরিচ সহিত উষ্ণ বরাহমাংস, স্কন্ধে সুললিতা মোহিনী বীণা, এবং সদ্‌গুরুগণের সঙ্গ—এই ভোগ যোগাত্মক কৌলধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, যোগিগণেরও অগম্য।

উল্লিখিত তন্ত্রের চিত্র তাঁহাতে প্রকাশ পায়। তাঁহার অলৌকিক বিভূতির কিম্বদন্তী এখনও ঐ দেশে প্রচলিত। তিনিই বামের গুরু। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ জন্মজন্মান্তরীণ। তাই কি তিনি সুদূর ব্রজধাম হইতে তারাপীঠে আসিয়াছিলেন?

ডাবুকের কৈলাসপতি

অপর এক মহাপুরুষ কৈলাসপতিবাবাও তারাপীঠে মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। তিনি মোক্ষদানন্দের শ্বশুরের গুরু। সেই সূত্রে মোক্ষদানন্দ তাঁহার ভক্ত ছিলেন। এই কৈলাসপতি নদীয়া জেলায় উলো গ্রামের বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। বিবাহের পর ৩০ বৎসর বয়সে ১২০৫ সালে বৈরাগ্য হইলে সংসার ত্যাগ করেন। কাশীতে ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষিত হন ও নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সন ১২৬১ সালে বীরভূমে শক্তিসাধনের জন্য আদিষ্ট হইয়া আসেন। তথায় ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ১২৬৬।৬৭ সালে দক্ষিণ গ্রামের ঈশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন এবং শুভঙ্করী নাম্নী রামানন্দ মণ্ডলের কন্যাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর তারাপীঠে প্রায়ই থাকিতেন। এখানে সাধকদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা জন্মে। বামকেও তিনি বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। এই কৈলাসপতি পরে ডাবুকে অনাদিলিঙ্গের মন্দিরাদি প্রস্তুত করান। তাঁহার নাম ডাবুকের কৈলাসপতি হয়। তাঁহার বহু শিষ্যসেবক। ১৩২৪ সালে ১৬ই মাঘ তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। কাশ্মীররাজ ইহার ভক্ত ছিলেন এবং ডাবুকে সেবার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া দেন।

উন্মেষতরঙ্গ

১। অবতরণ

তৌর্য্যত্রিকং স্থললিতং দিবি পুষ্পবৃষ্টি-
র্হাসোদিশাঞ্চ বিমলানিলশান্ত বহ্নী।
গুপ্তাবতারনটনেঽনুচিতং স্মরারে-
স্তন্নীরবং কিমধুনা বরদোঽবতীর্ণঃ॥

দেবলোকে স্থললিত নৃত্যগীত ও বাদ্য এবং পুষ্পবৃষ্টি, দিক্ সকলের প্রসন্নতা, নির্ম্মল বায়ু ও নির্ধূম বহ্নি—জিতকাম শ্রীরামের গুপ্তাবতারাভিনয়ের উপযোগি নহে। তাই কি সেই বরদাতা এবার নীরবে অবতীর্ণ হইলেন?

মহাপুরুষের অবতরণ বর্ণনায় ভক্তগণ অলৌকিকতা ঘোষণা করেন। রামায়ণে রাবণপ্রপীড়িত দেবগণের বিষ্ণুস্তুতি ও বিষ্ণুর ধরাবতরণ স্বীকৃতি

অলৌকিকতা

শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক অবতরণিকা। পুত্রেষ্টিযজ্ঞে প্রাজপত্য-পুরুষের পায়সপাত্রহস্তে উদ্গমনও অলৌকিক। দাশরথিগণের আবির্ভাবকালে অলৌকিকতার অভাব নাই।

শ্রীরামাবির্ভাবে

জগুঃ কলঞ্চ গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ!
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ॥

—রামায়ণে বালকাণ্ডে ১৮স. ১৭।

গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে গান গাহিয়াছিলেন, অপ্সরাগণ সুঠামে নৃত্য করিয়াছিলেন। দেবদুন্দুভিসকল বাজিয়াছিল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে অলৌকিকতার ইয়ত্তা নাই।

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোডুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানে জনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি॥

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং তদা॥
মুমুচুর্ম্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্॥

—ভাগবতে ১০ স্ক. ৩অ. ২-৭।

সেই মহাপুরুষ জন্মিলে দিক্‌সকল প্রসন্ন ও গগনে তারকাচয় উজ্জ্বল হইল। পৃথিবীতে নগরগ্রাম প্রভৃতির বহু মঙ্গলচিহ্ন দেখা দিল। নদীর জল প্রসন্ন হইল, হ্রদে কমলশোভা ফুটিল। বনে বনে বিহগকুল আনন্দে কূজন করিতে লাগিল। সুখস্পর্শ পবিত্র বায়ু পুণ্যগন্ধ ছড়াইয়া বহিল। দ্বিজাতিগণের যজ্ঞাগ্নি শান্তভাবে প্রজ্বলিত এবং সাধু সুরগণের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। আকাশে দেবদুন্দুভি বাজিল। কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ গাহিতে, এবং অপ্সরার সহিত বিদ্যাধরীগণ নাচিতে লাগিলেন। মুনি ও দেবগণ আনন্দভরে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। সাগর গর্জ্জনের পশ্চাৎ জলধরগণ গর্জ্জন করিল।

শ্রীকৃষ্ণাবতরণে

মহাভারতে পাণ্ডবগণের, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের ও পাণ্ডব কুটুম্ব ধৃষ্টদ্যুম্নাদির জন্ম এত অলৌকিক রঙ্গে রঞ্জিত যে তজ্জন্য তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা সংশয়াপন্ন।

ব্যাসবাল্মীকির ক্ষুণ্নপথাবলম্বনে কালিদাস পার্ব্বতীর জন্মোপলক্ষে বলিয়াছেন—

প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখায় তজ্জন্ম দিনংবভূব॥

—কুমারসম্ভবে ১স. ২৩।

যে দিনে দিক্‌সকল প্রসন্ন, বায়ু ধূলিকণাশূন্য এবং (আকাশে) শঙ্খধ্বনির পর পুষ্পবৃষ্টি ঘটে এরূপ তাঁহার জন্মদিন স্থাবরজঙ্গম-প্রাণিগণের সুখকর হইয়াছিল।

পার্ব্বতী জননে

রঘুর উদ্ভবেও অনুরূপ ব্যাপার—

দিশঃ প্রসেদুর্ম্মরুতো ববুঃ সুখাঃ প্রদক্ষিণার্চ্চির্হবিরগ্নিরাদদে।
বভূবসর্ব্বং শুভশংসিতৎক্ষণং ভবোহি লোকাভ্যুদয়ায়তাদৃশাম্॥

স্থখশ্রবা মঙ্গলতূর্য্যনিস্বনাঃ প্রমোদনৃত্যৈঃ সহবারযোষিতাম্।
নকেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ পথি ব্যজৃম্ভন্ত দিবৌকসামপি ॥
—রঘুবংশে ৩স, ১৪।১৯।

দিক্‌সকল প্রসন্ন ও স্থখকর বায়ু প্রবাহিত হইল। যজ্ঞাগ্নি হোতার দক্ষিণাবর্ত্তে জিহ্বা প্রসারণ করিয়া আহুতি লইল। সেই সময় সমস্ত শুভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। কারণ তাদৃশপুরুষগণের জন্ম সংসারের অভ্যুদয়ের জন্য। বারাঙ্গনার প্রমোদনৃত্য সহ কর্ণস্থখকর মঙ্গল তূর্য্যধ্বনি কেবল মাগধীপতির গৃহে নহে, দেবগণের পথে অর্থাৎ আকাশেও প্রকটিত হইল।

রঘুস্তবে

রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক পুরুষ শ্রীভগবদবতার। তাঁহাদের অবদান অলৌকিক। তজ্জন্য তাঁহারা দেবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত। পার্ব্বতী সাক্ষাৎ দেবী। রঘুও দেবকল্প। স্থতরাং তাঁহাদের জন্মে অলৌকিকতা বিচিত্র নহে। পুরাণ অলৌকিকতাপূর্ণ; বহুস্থলে বিশ্বাসের গণ্ডী ছাড়াইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী-মহাপুরুষগণের জন্মে অলৌকিকতাবর্ণন বিস্ময়কর। অশ্বঘোষের বুদ্ধদেব-জন্ম-বর্ণনা পূর্ব্বসূরিগণেরই অনুকরণমাত্র।

বাতা ববুঃ স্পর্শস্থখাঃ মনোজ্ঞা দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্তঃ।
সূর্য্য স এবাভ্যধিকং চকাশে জজ্বাল সৌম্যার্চ্চিরনীরিতোঽপি ॥
—বুদ্ধচরিতে।

মনোরম স্পর্শস্থখকর বায়ু দিব্য বসন বর্ষণ করিতে করিতে প্রবাহিত হইল। সেই সূর্য্যই অধিক দীপ্তি পাইল। অগ্নি ফুৎকারাদি-প্রেরণাব্যতীত সৌম্যভাবে অধিক জ্বলিতে লাগিল।

বুদ্ধোদ্ভবে

শঙ্করাচার্য্যের শুভাগমনে তাঁহার মাতার গর্ভে শঙ্করের প্রবেশ প্রভৃতি অলৌকিক আখ্যায়িকা। পাশ্চাত্যদেশেও এই প্রথা। যিশুর উৎপত্তি মেরীর গর্ভে হইলেও পুরুষসংসর্গজ নহে। জন্মকালেও দৈববাণী, প্রাচ্য ঋষিগণের বালকদর্শন প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাপার।

শঙ্করাগমনে
যিশুর প্রকাশে

শ্রীচৈতন্যের জন্ম মাতাপিতৃজ। কিন্তু জন্মকালে কবি অলৌকিকতা ঘোষণা করিয়াছেন।

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ।
নানা দ্রব্যপাত্র ধরি, ব্রাহ্মণীর বেশ করি
আসি সবে করে দরশন ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩ পরি।

তাই—

গৌরাঙ্গাগমে

শচীর অঙ্গনে সব দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহো নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে।

—চৈতন্যভাগবতে, আদিখণ্ডে ২ অ।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মে

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মেও ভক্ত রামচন্দ্রাদি শঙ্করাচার্য্যজন্মানুরূপ প্রবাদ খ্যাপন করিয়াছেন। এ সমস্ত যে অমূলক তাহা আমরা বলি না। মহাপুরুষগণ অলৌকিক। তাঁহাদের জন্ম, গুণ, কর্ম্ম—সমস্তই অলৌকিক।

শ্রীবামের জন্মকালে কোন অলৌকিক ঘটনা আমরা শুনি নাই। তবে ইহাই যথেষ্ট গৌরবের কথা যে আমাদের প্রভু আমাদের ন্যায় পাতকীর উদ্ধার হেতু আমাদের বোধগম্য নররূপে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে শাক্তপ্রধান বীরভূমে শক্তিসাধনকেন্দ্র তারাপীঠে শ্মশানলীলার অভূতপূর্ব্ব চিত্র দেখাইবার জন্য ঐ পীঠের সন্নিহিত আটলা নামক গ্রামে অবতীর্ণ হন। তিনি গুপ্ত অবতার।

বাম গুপ্তাবতার

নানা দেশ পর্য্যটন করতঃ তর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়া তিনি নিজমত স্থাপন করেন নাই। সংসারীর দ্বারে দ্বারেও দন্তে তৃণ করিয়া নামামৃত বিলান নাই। নগরীতে থাকিয়া সভাসমিতি গঠনে নব্যধর্ম্ম প্রচারও করেন নাই। নগর সন্নিধানে বসিয়া মৌখিক ধর্ম্মোপদেশে সমাজের উপকার করেন নাই। শ্রীভগবান্ যাঁহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন তাঁহাকে তাই করিতে হইবে। তাপিত জীবের তাপহরণার্থ সাধুগণ সংসারে মিশিয়া থাকেন। তাহা দূষণীয় নহে। সমাজে যেমন কেহ কুলবধূ, কেহ পুরস্ত্রী, মহাপুরুষগণের মধ্যেও সেইরূপ কেহ গুপ্ত, কেহ ব্যক্ত। বাম কুলবধূবৎ। তিনি সংসারের প্রান্তে বসিষ্ঠের সিদ্ধক্ষেত্রে

মহাশ্মশানে নীরবে সন্ন্যাসের ছবি দেখাইয়া মাদৃশ বহু পাতকীকে ও কয়েকজন শুদ্ধ সন্ন্যাসীকে নীরবে আকর্ষণ করতঃ তারানামামৃত নীরবে বিলাইয়া দেশের প্রভুত কল্যাণসাধন করিয়াছেন। সূর্য্য জগতের আত্মা। বায়ু জগতের প্রাণ। তাঁহারা নীরবেই জগতের মঙ্গল করিতেছেন।

অব্রুবন্ বাতি সুরভির্গন্ধঃ সুমনসাং শুচিঃ।
তথৈবাব্যাহরন্ ভাতি বিমলো ভানুরম্বরে॥

—মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি।

পুষ্পের সুরভি গন্ধ নীরবে (বায়ু কর্ত্তৃক) চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। নির্ম্মল ভানুও সেইরূপ নীরবে আকাশে শোভা পান। বামও সেইরূপ নীরবে স্বীয় পুণ্য গন্ধে এই জগৎ আমোদিত, স্বীয় পুণ্য কিরণে এই জগৎ আলোকিত করিয়াছেন।

২। বংশ

রামানন্দাৎ চট্টকুলে নব্যমরীচেস্
সর্ব্বানন্দোঽজায়ত কাশ্যপমূর্ত্তিঃ।
আটলা গ্রামে মেরুনিভে দেবজনন্যা
রেমে পত্ন্যা ভক্তমণী রাজকুমার্য্যা॥

রামানন্দ চট্টবংশ আধুনিককালের মরীচিস্বরূপ। তাঁহা হইতে সর্ব্বানন্দ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কাশ্যপমূর্ত্তি। মেরুতুল্য আটলা গ্রামে ভক্তশিরোমণি সর্ব্বানন্দ দেবজননী রাজকুমারী নাম্নী পত্নীর সহিত সানন্দে কালযাপন করিয়াছিলেন।

জায়াপত্যোঽহহ মহিমা কস্তয়োর্বাগতীতঃ
লব্ধৌ সূনুং দশদিগধিপানন্তরং যৎ তদানীম্।
অংশং মায়াপ্রকটিতরূপং দেবদেবস্য বৈপ্রং
পূর্ণং বামাচরণমধুনামায়বিশ্বানুকম্পম্॥

ঐ দম্পতীর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। তাঁহারা পূর্ব্বকালে দশ দিক্‌পাল-গণের পর দেবদেবের বিপ্রভূত মায়াপূর্ব্বক দয়াপ্রকাশনপর বামন নামক

অংশাবতারকে এক্ষণে মায়াশূন্য বিশ্বানুকম্পি বামাচরণকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন।

বীরভূমে রামপুরহাট মহকুমার মধ্যে তারাপীঠের নিকট আটলা গ্রাম, উহা ব্রাহ্মণপ্রধান। এক্ষণে নসিপুররাজভুক্ত। বীরভূমে কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। নগদ পয়সার স্বচ্ছলতা না থাকিলেও এখানে অন্নসংস্থানের অভাব নাই।

জন্মভূমি

বীরভূমের সকল পীঠেই আমরা গিয়াছি। বীরভূমের বহু গ্রামে বেড়াইয়াছি। পৌষ মাসে এখানে যেন মা লক্ষ্মীর হাসি ফুটিয়া উঠে। ঘরে ঘরে মরাই ভরা ধান, পালুই ভরা খড়, পেয়ে ভরা গুড়, গোয়াল ভরা হেলে ও গাই গরু। গো সকলের কি সুন্দর আকৃতি, নিটোল গোল, গায়ে মাছি পিছলাইয়া পড়ে। অধিবাসিরা সরল প্রকৃতি। অতিথি পাইলে তাহাদের কত আহ্লাদ। কত যত্ন ও আদরের সহিত তাহারা আতিথ্য করে। সন্দেশ রসগোল্লা নাই, কিন্তু ঘনামৃতদুগ্ধ, গব্যঘৃত, গুড়, মুড়ি, প্রচুর। আবার কি প্রেমের সহিত তাহা দেয়। ভারতীর কথা স্মরণ হয়—

বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি।

—কিরাতার্জ্জুনীয়ে ৮স, ১৭।

প্রেমেই গুণ, বস্তুতে গুণ নাই। শ্রদ্ধার সহিত দত্ত মুষ্টি ভিক্ষাও মিষ্ট, অশ্রদ্ধায় দত্ত রাজভোগও হেয়।

এখন পাশ্চাত্য বিলাসিতা ভারতের পল্লীতে কতক কতক প্রবিষ্ট। শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ বিষ প্রসার পায় নাই। সুতরাং তখন অভাবের মাত্রা অল্প ছিল। তৎকালে আটলার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন মান্যগণ্য ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত দয়াধর্ম্ম ছিল। তবে যাজনবৃত্তি ছিল না; কৃষিই অবলম্বন। তিনি ভঙ্গ কুলীন। বিশিষ্ট পণ্ডিত না হইলেও তিনি শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। কলির ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার গুরুস্থান বীরভূমে ভড্ডাপুরে থাকে। তিনি শাক্ত। তারাপ্রেমে উন্মত্ত না থাকিলেও তারা মার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বেশ ছিল। তাঁহার দুই পুত্র সর্ব্বানন্দ ও ধর্ম্মদাস।

পিতামহ

সর্ব্বানন্দ বড়ই সরল। সারল্যহেতু গ্রামের লোক তাঁহাকে "হাউড়ো"

(নির্বুদ্ধি) বলিত। সর্ব্বানন্দের অল্প বয়সে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা হইলে তারাভক্তি গাঢ় হয়। রাজকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটে। রাজকুমারী শান্তা সুশীলা। তিনি অল্পবয়সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া নিজগুণে সকলকে পরিতুষ্ট করেন।

পতা

রাজকুমারীর গর্ভে সর্ব্বানন্দের প্রথমে জয়কালী নাম্নী একটী কন্যা জন্মেন। দ্বিতীয় সন্তান শ্রীবামাচরণ যাঁহার ত্যাগপ্রেমলীলায় জগৎ পূত। পরে তাঁহাদের উপর্য্যুপরি তিনটী কন্যা হয়—নাম দুর্গা, দ্রবময়ী ও সুন্দরী। সর্ব্বশেষে পুত্র রামচন্দ্র জন্মেন।

বামাদি সন্ততি

জয়কালী সাধিকা ছিলেন। বাল্য হইতে তাঁহার সাধনভজনে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পায়। বীরভূমে কাষ্ঠগড়া গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে জয়কালী সন্ন্যাসিনী হন। তিনি যৌবনে তারাপীঠে সাধন জন্য আসেন। মার নির্ব্বন্ধে বাটীতে ফিরিয়া যান। যৌবনেই তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু ঘটে। তিনি সকলকে বলেন যে দেহ রাখিব এবং তদনুসারে তারাপীঠে আসিয়া দেহ রাখেন। তথায় তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়। বাম বলিতেন,—দিদি আমার আশ্চর্য্য ছিলেন, তাঁহার আশ্চর্য্যমৃত্যু।

অগ্রজা জয়কালী

দুর্গার বিবাহ বীরভূমে হরিষাড়া গ্রামে হইয়াছিল। দ্রবময়ীর বিবাহ ধলাসিন গ্রামে যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত হয়। দ্রবময়ীর দুই পুত্র মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র। সর্ব্বানন্দ একপ্রকার ক্ষ্যাপা ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠা কন্যা সুন্দরীর দুইবার বিবাহ দেন; প্রথম মলুটিতে, দ্বিতীয়বার কানাছিতে। দুই বিবাহের কারণ জানা নাই। তবে ঐ ব্যাপার লইয়া সর্ব্বানন্দ সমাজে ঠেকা ছিলেন। রাজকুমারীর শ্রাদ্ধে সেই গোল মিটে। কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র সংসারী হন।

অনুজাদি

৩। কালনির্ণয়

নিজাবির্ভাবস্থাবিবৃতমধুনা বাদবিষয়ং
সকৃৎপৃষ্টোযস্মে বিবৃতমকরোঃকালমতনুঃ।
জলদ্বৈর্মাসং দিনমপি লিখন্ মানসপটে
ন তচ্চিত্রং মায়ামনুজশিব! তেঽচিন্ত্যমহিমন্॥

হে অচিন্ত্যমহিমন্ মানুষবেশধারি শিব! যাহা লইয়া এক্ষণে বাদানুবাদ চলিতেছে তোমার সেই আবির্ভাবের কাল তুমি যে দেহান্তে একবার মাত্র জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার মানসপটে জ্বলদক্ষরে মাস ও দিন লিখিয়া বিবৃত করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে।

বাম যৌবনে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত হইলে বহু লোক তাঁহার নিকট স্বার্থসিদ্ধির জন্য গিয়াছেন। তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্য হয়। কিন্তু তিনি দেহে থাকিতে কেহ তাঁহার দেহলীলা লিপিবদ্ধ করেন নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশ হইলে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনী রক্ষিত হইত। চিরকাল ইতিহাসের প্রতি ভারতের অনাস্থা। কালিদাসাদি কবে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পিতা মাতা কে, তাঁহারা কিরূপে শিক্ষা লাভ করেন, কোথায় তাঁহাদের বিলাস ইত্যাদি বিবরণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ভারত এক্ষণে জানিতে উৎকণ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন ভারত তাঁহাদের কৃতিত্বামৃতপান করিতেন, তাঁহাদের জীবনীজিজ্ঞাসু ছিল না। বিশেষতঃ ভারতের সাধুগণ আদৌ যশোলিপ্সু নন। আত্মপরিচয় প্রদানে মান সম্ভ্রম লাভ তাঁহাদের পক্ষে বিষস্বরূপ। তাঁহারা পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন না। বামের তিরোভাবের কিছু পূর্ব্বে জনৈক ভক্ত তাঁহার জীবনী লিখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বাম হাসিয়া বলেন—"বাবা? আমাদের আবার জীবনী! কতকগুলি তারা তারা, দুর্গা দুর্গা, হরি হরি, লিখিয়া দিও"। এক দিক্ হইতে দেখিলে একথা পরম সত্য। বামাদির জীবনী তারাময়, হরিময়ই বটে। তারানামক-পুস্তিকাকারের মতে বামের জন্ম বাং সন ১২৪১ সালে। তিনি জন্ম দিন, তিথি, বা মাস কিছুই দেন নাই। কিরূপে জন্ম বৎসর পাইলেন তাহাও উল্লেখ করেন নাই। তদনুসরণে "বামা ক্ষ্যাপা" নামক গ্রন্থে বামের জন্ম সন ১২৪১ বলিয়া উল্লিখিত। তারাপীঠের পাণ্ডা শ্রীনগেন্দ্রনাথ বামের একখানি ক্ষুদ্র কাহিনী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাম ১২৪৮ সালে অবতীর্ণ। কি সূত্রে তিনি উহা জানিলেন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন যে রামপুরহাটের সন্নিহিত বড়শালগ্রামনিবাসী বেণী ভট্টাচার্য্য বলিতেন যে তাঁহার মধ্যম সহোদর রাধামাধবের ও বামাচরণের একদিনে জন্ম হয়। আমরা রাধামাধবের পুত্র শ্রীশ ভট্টাচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে যখন শ্রীশের বয়স পাঁচ

ইতিহাসে অনাস্থা

মতভেদ

বৎসর তখন রাধামাধব ২৪ বৎসর বয়সে স্বর্গগত হন। শ্রীশের জন্ম ১২৮১ সালে। এই গণনায় রাধামাধবের জন্ম সন ১২৬১।৬২ হয়। রামের জন্ম কিছুতেই ঐ সালে হইতে পারে না; কারণ তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র যে ১২৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন তাহা আমরা রামচন্দ্রের পত্নী ইন্দুমতী দেবীর নিকট পাইয়াছি। মতভেদে দোলায়িত হইয়া ১৩২৭ সালে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সায়ংকালে আহ্নিকের পূর্ব্বে শ্রীরামকে তাঁহার জন্মদিন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। রাম ১৩১৮ সালে ২রা শ্রাবণ দেহ রাখিয়াছেন। তাঁহাকে ১৩২৭ সালে জিজ্ঞাসা শুনিয়া পাঠক বিস্মিত হইতে পারেন। কেহ কেহ মনেও করিতে পারেন যে আমাদের মস্তিস্ক বিকৃত। কিন্তু এখনও রাম সূক্ষ্মদেহে তাঁহার ভক্তগণকে মধ্যে মধ্যে দর্শন দেন, এমন কি কথাও কহিয়া থাকেন। শবাসনে রামের মূর্ত্তি চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে অনন্ত আকাশে তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি আমার মানস নয়নে ভাসিল। অচিরে মূর্ত্তির নিম্নে জ্বলন্ত অক্ষরে ১২ই ফাল্গুন শব্দগুলি দেখা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহস্পতিবার শব্দটীও পূর্ব্বোক্ত শব্দ দুইটীর দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বলন্ত অক্ষরে উঠিল। কিন্তু সনের পরিচয় পাইলাম না।

অলৌকিক উত্তর

পরদিন হঠাৎ আমাদের গুরুদাদা ছোটক্ষ্যাপা বাটীতে আসিলেন। তিনি আকুমার সন্ন্যাসী, যোগী, মহাপুরুষ। তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছে। এমন কি চর্ম্মচক্ষুদ্বারাও তিনি সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে পান, শ্রবণেও সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে পারেন। তাঁহাকে বলিলাম "বাবার লীলা লিখিবার প্রবৃত্তি আসিয়াছে, লীলা লেখাও আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু অবতরণ কাল লইয়া সমস্যায় পড়িয়াছি। আপনার এবিষয়ে কি জানা আছে"? তিনি একবারেই উত্তর দিলেন "তুই কি দেখেচিস্"? আমি বলিলাম "তা থাক্,আপনি কি জানেন বলুন"। তাহাতে তিনি কহিলেন "হাঁরে হাঁ ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার"। দুইজনেরই অঙ্কের উত্তর এক হওয়ায় প্রফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি তিথি"? দাদা বলিলেন "কেন, তারা তিথি"? আমি বুঝিতে না পারায় তিনি ব্যাখ্যা করিলেন "তারা তিথি অর্থে রটন্তী চতুর্দ্দশী এবং শিব চতুর্দ্দশী বুঝায়। বাবার জন্ম ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী যুক্তা শিবচতুর্দ্দশী।" সন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন না, অন্য কথা তুলিলেন।

সমর্থন

যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম সেইরূপ বার, তিথি ও মাসের সম্মিলন কোন সনে হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য হাইকোর্টের উকিলখানায় পুরাতন পঞ্জিকার অনুসন্ধান করিলাম। বঙ্গবাসীর পুরাতন পঞ্জিকা ইংরাজী ১৮৪৪ সাল পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। ইংরাজী শতবর্ষের যন্ত্রী লইলাম। দেখিলাম ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সন ১২৫৫, ১২৪৪ ও ১২৩৮ সালে পড়িয়াছে। তবে ১২৪৪ সালে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। বুঝা গেল উহা শিবচতুর্দ্দশী। ত্রয়োদশীযুক্তা কিনা জানা গেল না। ১২৪৪ সালের পঞ্জিকা অনুসন্ধানে কলিকাতা বৌবাজারে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বী শ্রীশশীভূষণ আচার্য্য মহাশয়ের নিকট গেলাম। শুনিয়াছিলাম, তিনি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে পারেন। আমাদের গুরুভাই ২৪ পরগণার বামুনগাছি গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন বৌবাজারে কবিরাজি করিতেন। তিনি উক্ত আচার্য্যের প্রশংসক। তাঁহার জনৈক আত্মীয় স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়া বিস্মৃত হন। আচার্য্য শশীভূষণ গণনার দ্বারা সেই মন্ত্র উদ্ধার করেন। চারু ভায়া আমাকে আচার্য্যের পরিচয় করিয়া দিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিকট উভয়ে গেলাম। তিনি বৈঠকখানার দীপ জ্বালিয়া স্বীয় ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিলে বামের কৃপায় আমার নয়নে তাঁহার ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি ভাসিল। সে বিষয়ে ইঙ্গিত করায় তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তাহাতে হাসিয়া বলিলাম "মা আপনাকে কোন বিষয়ে শক্তি দিয়াছেন। অন্য সন্তানকে কি অন্য বিষয়ে শক্তি দিতে পারেন না?" এইরূপ আলাপে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইল। আমরা গমন প্রয়োজন প্রকাশ করিলাম। তিনি বাবার চিত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহা আছে শুনিয়া চিত্রে ললাটরেখাদি-দর্শন জন্য তাঁহার নিকট চিত্র লইয়া যাইতে বলেন। অন্যদিন তাঁহাকে বামের চিত্র দিয়া আসিলাম। কয়েকদিন পরে তিনি বামের জন্মচক্র আমার হস্তে দিয়া কহিলেন শ্রীগুরু আপনাকে ঠিক দেখাইয়াছেন। ১২৪৪ সাল ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার তাঁহার জন্ম বটে।

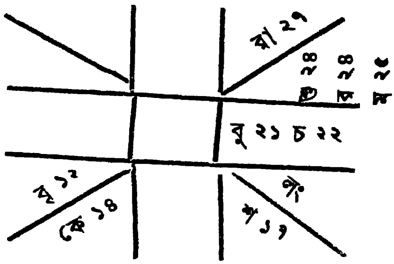
মিলন

শকাব্দ ১৭৫৯।১০।১১।৫৩.১৭

জন্মচক্র

জাতাহ

৫	২১	১৮
২৮	৬	৩৯
৪২	৫	১২



পরাহ

৬	২২	১৯
২৯	৩	২১
৩৬	৫৬	১৬

আচার্য্য শশীভূষণ রামের জন্ম সময় ও লগ্ন দেন নাই। তাহা কলিকাতা রাতুল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শাস্ত্রী শ্রীসারদাচরণ কাব্যজ্যোতিস্তীর্থ স্থির করিয়া নিম্নলিখিত ভাব দিয়াছেন "নষ্ট জাতকোদ্ধারমতে ও অন্যান্য লক্ষণাদি দ্বারা জানা যাইতেছে যে ১২৫৪ সালের ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ৫১ মিনিটে শ্রীশ্রীরামের জন্ম হইয়াছে। প্রথমতঃ তৃতীয়ে রবি শত্রুপতি ও দ্বাদশ পতি যুক্ত হইয়া অবস্থান করায় ভ্রাতৃসুখ ও আত্মীয়সুখ থাকিবে না; মাতৃস্থানে ও পিতৃস্থানে পাপগ্রহস্থিতিতে মাতাপিতা সত্ত্বেও তজ্জনিত সুখ নাই। সুতরাং সংসার-ত্যাগের সূচনা হইতেছে। বিশেষতঃ উনি ফাল্গুনী শিব-চতুর্দ্দশী-নিশিতে জন্ম লওয়ায় শিবাবতারের লক্ষণ পরিস্ফুট হইতেছে। ধনু লগ্নই জন্মলগ্ন। লগ্নপতি বৃহস্পতি ভাগ্যস্থ হইয়া লগ্নে, ধর্ম্মপতি রবি তৃতীয়ে থাকিয়া ধর্ম্মস্থানে ও মৃত্যুপতি চন্দ্র দ্বিতীয়ে থাকিয়া মৃত্যুস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছেন। সেই হেতু পূর্ণ মোক্ষযোগ প্রমাণিত হইতেছে। প্রমাণ যথা—

যদা পশ্যেদঙ্গং তনুভবননাথোঽষ্টমপতিঃ
মৃতিং ধর্ম্মাধীশো জনুষি চ তপঃস্থানমথবা।
শুভাভ্যামাক্রান্তং নবমভবনং পাপরহিতম্
বরক্ষেত্রং প্রাপ্য ব্রজতি মনুজো মোক্ষপদবীম্॥

শ্রীরাম বসিষ্ঠ মুনির একাসনস্থ হওয়ায় পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন বুঝাইতেছে। দশমপতি বুধ ধনস্থানে থাকায় "দশমভবননাথঃ কেন্দ্রকোণে ধনে বা" ইত্যাদি বচনবশতঃ ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত-কর্ম্মপতি বুধ অষ্টমপতিযুক্ত ও অল্পবলী হওয়ায় প্রবল লৌকিক-রাজযোগ নষ্ট করিয়া স্বীয় পূর্ণজ্ঞানরূপরাজত্ব দিয়াছে। "ধর্ম্মাধিপঃ পশ্যতি ধর্ম্মভাবম্" ইত্যাদি।

ত্রয়োগ্রহা যদেকত্র লগ্নরাশিবিবর্জ্জিতাঃ।
ভুক্ত্বা চ বিবিধান্ ভোগান্ ম্রিয়তে জাহ্নবীজলে॥

এই বচনানুসারে লগ্নাধিপতির লগ্নাদিস্থানদৃষ্টি ও চন্দ্র ভিন্ন তিনটী গ্রহ একত্র থাকায় নানাবিধ সুখাদি ভোগ করিয়া পবিত্র তীর্থস্থানে সজ্ঞানে দেহত্যাগ সংযোগ রহিয়াছে দেহ ও সুখপতি শুক্র মিত্রক্ষেত্রে ধর্ম্মস্থানে মিত্র ও ধর্ম্মপ্রতিদৃষ্ট। সুতরাং স্বজন দ্বারা লাঞ্ছনা যোগ হইলেও ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু সুখ ও শান্তি যোগ রহিয়াছে। তবে ঐ সুখ অলৌকিক, লৌকিক সুখ নহে। জন্মকালে গ্রহাদি সন্নিবেশ দেখিয়া ও ইং ১৯১১ সালে রামপুরহাটে অবস্থানকালে তাঁহার শারীরিক লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া রাম যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আমাদের বন্ধু জ্যোতিষী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কেও এই জন্মচক্র দেখাইয়াছি। তিনিও ইহা অনুমোদন করিয়া নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ভাবগণনা করিয়াছেন। "তৃতীয়ে শুক্রেঽব্যবহিতগর্ভনাশঃ" ইত্যাদি বচনানুসারে এবং দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল ও পাপগ্রহ রবি তৃতীয়ে থাকায় ও রাহু দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট দৃষ্ট হওয়ায় ও তৃতীয়াধিপতি দ্বাদশে থাকিয়া রাহুদৃষ্ট হওয়ায় ভ্রাতৃস্থান বিরুদ্ধ। আরও ভ্রাতৃস্থানের পঞ্চমাধিপতি বুধ উহার ধনাধিপতি চন্দ্র যুক্ত হইয়া শনি দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় সহোদরের পুত্রনাশযোগ দেখা যায়। আরও রামের পত্নীস্থানাধিপতি বুধের তৎস্থানে এককলাদৃষ্টিও না থাকায় এবং বিবাহযোগ্য কালে কোন স্ত্রীগ্রহের দশা না পাওয়ায় দারপরিগ্রহযোগ নাই। "চরাদ্যভাগে সৌম্যে জপধ্যান সমাধিমান্" ইত্যাদি বচনোক্ত সন্ন্যাসযোগ বর্ত্তমান। লগ্নাধিপতি বৃহস্পতি নবমে মন্ত্রাধিপতি মঙ্গল দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট এবং প্রেম ভক্তির অধিপতি শুক্র দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হওয়ায় "তারা বৃহস্পতে শৈব" ইত্যাদি বচনবলে রাম প্রেমভক্তিময়তারা সাধক বুঝাইতেছে। বুধ চন্দ্রের যোগজনিত মধুরকটুভাষিত্ব ও অন্যান্য কারণে করুণাময়ত্ব সূচিত। রামের একমাত্র সহোদর রাম অগ্রজের পুর্ব্বেই ১৩১৬ সালের ২৫ আশ্বিন পরলোকগত হন। তাঁহার দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র হয়। পুত্রটী ছয়মাসেই পিতামাতাকে কাঁদাইয়া চলিয়া যায়। কন্যা দুইটির মধ্যে একটি বিধবা। এই সমস্ত ভ্রাতৃভাব দ্বারাও রামের লগ্নসত্যতা সুস্পষ্ট।

১২৪৪ সালে রামের জন্ম হইলে তাঁহার বয়সের সামঞ্জস্য হয়। ১৩১১

সালের শ্রাবণ মাসে, এই পতিতকে পতিতপাবন আকর্ষণ করেন। তখন প্রভুর বয়স ৬৭।৬৮ বৎসর। পরে ১৩১৫ সালে পৌষ মাসে, এ দাস দ্বিতীয়বার তাঁহার সেবার অবসর পায়। সে সময় তাঁহার

সামঞ্জস্য

জড়দেহের শৈথিল্য আসিয়াছে। চলিতে ফিরিতে অন্যের সাহায্য আবশ্যক। হঠাৎ ৬৩।৬৪ বৎসরে এরূপ শরীরের ভাব কেন হইল জানিবার জন্য বয়স সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭১।৭২ বৎসর। ১৩১৮ সালে দেহরক্ষার কালেও তাঁহার বয়স ৭৪।৭৫ বৎসর প্রকাশ পায়। আরও কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র অপেক্ষা তিনি ১২ বৎসরের বড় ছিলেন। রামচন্দ্রের জন্ম সন ১২৫৭ সালে। এই সমস্ত কারণে ১২৪৪ সালে বামের আবির্ভাব স্থিরীকৃত হইল।

৪। বাল্য

শোণাঙ্ঘ্রিফুল্লেক্ষণবক্ত্রকান্তং প্রশস্তবক্ষোভুজভালকণ্ঠম্।
তারৈকলীলাচপলং চ মুগ্ধম্ বন্দে শিশুং শ্যামলবামরূপম্॥

শিশুটী শ্যামবর্ণ, সুরক্তপদতল, কম্বুকণ্ঠ, প্রফুল্লনয়ন, স্মেরবদন, উন্নতনাসিক আয়তলোচন, প্রশস্তললাট, পীনবক্ষাঃ এবং আজানুলম্বিতভুজ। তারামাই তাঁহার এক মাত্র লীলা। তাহাতেই তিনি চঞ্চল, নচেৎ মুগ্ধ। তাঁহার মূর্ত্তি নয়নাভিরাম। শ্রীবামে যাবতীয় মহাপুরুষলক্ষণ ছিল।

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ, ষডুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্বঃ পৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

—ইতি সামুদ্রিকে।

যাঁহার চক্ষু, নাসিকা, হনু, হস্ত ও জানু— এই পঞ্চাঙ্গ দীর্ঘ; দন্ত, রোম, ত্বক্, কেশ ও অঙ্গুলীপর্ব্ব—পঞ্চাঙ্গ সূক্ষ্ম; করতল, পদতল তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা, নখ ও নয়নকোণ এই সপ্তস্থল রক্তবর্ণ; বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটি ও মুখ এই ষড়ঙ্গ উন্নত, গ্রীবা, জিহ্বা ও লিঙ্গ—এই তিনটী হ্রস্ব; কটি, ললাট ও বক্ষঃ এই তিনটী পৃথু; নাভি, স্বর ও বুদ্ধি গম্ভীর; তিনিই মহাপুরুষ।

উদ্ধর্তুকামং কলিজীববৃন্দং তং বীরভূমৌ ধৃতবিপ্ররূপম্।
শ্রীবামতারাকরুণাবতারং বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ॥

কলিজীবগণকে উদ্ধার করিবার মানসে বীরভূমে বিপ্ররূপে শ্রীবামের ও তারার করুণার অবতার বামনামক পুরুষকে প্রণাম করি। বামের প্রভাবে কত শত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে। শত শত ব্যক্তি ঈশ্বর পথের পথিক হইয়াছেন। তাঁহার তারাপ্রেম ও ভক্তির আদর্শে আবার সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিজ জীবন গঠিত করিতেছেন ও করিবেন। তাঁহার শক্তি ফুরায় নাই, সেই শক্তি প্রিয় আধারের মধ্য দিয়া খেলা করিতেছে।

করুণাবতার

বামের ষষ্ঠী পূজা, গৃহনিষ্ক্রামণ প্রভৃতি যথাবিধি ঘটিল। অন্নপ্রাশনে নামকরণ হইল বামাচরণ। পিতা যখন বামাচরণ নাম রাখেন তখন বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু শ্রীবামের কৃপায় তাঁহার জীবনের ছায়া অবোধ পূর্ব্বক নামকরণে পড়ে। বামাচরণ বামাচরণই বটে। তিনি সেই সনাতনী ব্রহ্মময়ী বামারই পাপতাপহারি পরিদৃশ্যমান চরণ। ঐ চরণের গুণ এ পাতকী প্রথম স্পর্শে জানিয়াছিল। ঐ চরণে কতশত তাপিত জীব শান্তি পাইয়াছেন ও কত সহস্র জীব পাইবেন। তাঁহার বাহ্য আচরণ দেখিলেও বামাচরণ নাম অন্বর্থ। তাঁহাতে শাক্ততন্ত্রের বামাচারীর লক্ষণ ছিল।

নামকরণ

কবির ভাষায় বলিতে গেলে দিন দিন শশি কলার ন্যায় শিশুটী বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমেই অস্পষ্ট বাণী ফুটিল, বলিতে শিখিলেন, হামাগুড়ি ও হাঁটি হাঁটি পা পা আরম্ভ হইল। শৈশব হইতেই বামে তারাময় জীবনের উন্মেষ। শৈশব হইতেই তিনি অন্য-মনস্ক। ইহার জন্যই তাঁহাকে সকলে "হাউড়ো" বলিত। তখন কারণ জানা ছিল না। পরে তাহা প্রকাশ পায়। তিনি ইহসংসারে আসিলেও এই সংসারের জীব নহেন। তারাধ্যানেই তিনি আত্মমগ্ন। তাঁহার সংসার জ্ঞান তো মলিন হইবেই। সংসারীর চক্ষে তিনি বোকা পাগল ভিন্ন কি হইবেন? যৌবনে তারাময় ভাব পরিস্ফুট হইলে লোকে কতকটা অনুমান করেন যে তিনি প্রেমে পাগল। বাম তারার বীর সন্তান, সুতরাং বাল্যে চাপল্য আসে। কিন্তু সে চাপল্যেও তারাপ্রেম।

শৈশব

তারাময়

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তি ও প্রেম ভাব উন্মীলিত হয়। খেলা

ঘরে তিনি ঠাকুর ঠাকুরই খেলিতেন। তারানাম করিতে ভালবাসিতেন। তারাপীঠে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেন। কখনও জয়তারা রবে নাচিতেন, কখনও আবার নীরবে তারামূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে বসাইয়া দেখিতেন। কৈশোরে বাম গ্রামের যত ঠাকুর গৃহস্থদের অজ্ঞাতে একত্র করিয়া পথে ঘাটে মাঠে নদীতীরে পূজা করিতেন। কোন কোন দিন প্রভাত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরগুলি যথাস্থানে রাখিতেন, আবার কখন কখন রাখিতে ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার ঠাকুর নাড়া স্বভাব ক্রমে প্রকাশ পাইল। ঠাকুর হারাইলে "হাউড়ো" বামকেই আসিয়া চোর ধরিত। বাম অনেক হাঁকা

বাল্যখেলা

হাঁকি, ডাকা ডাকির পর ঠাকুর বাহির করিয়া দিতেন। একদিনের ঘটনা বাবা নিজমুখে এইরূপ বলিয়াছেন, "বাবা! ঠাকুরেরা জল জল করিয়া চেঁচাইতেছিল। তাই আমি রাত্রে তাহাদের লইয়া চিলে নদীতে ডুবাইয়া রাখি। পরদিন দুর্গাচরণ সরকার কাকা আমাকে ডাকাইয়া ধমকাইলেন। আমি বলিলাম ঠাকুর জল চাহিতেছিল তাই জলে রাখিয়াছি। তাঁহারা ঠাকুর আনিলেন, কিন্তু আমাকে খুব পিটন দিলেন। সেই দিন হইতে আমি ঠাকুর নাড়া গুরুজ্ঞান করিলাম।" ক্ষ্যাপার ভাষা বিচিত্র। গুরুজ্ঞান মানে ত্যাগ।

বাম তারাধ্যানে কতদূর অন্যমনা ছিলেন তাহা বাল্যে নিম্নলিখিত লীলায় ব্যক্ত। একদিন তিনি খড়ের গাদায় লুকান এবং সেই গাদায় নিজে আগুন লাগাইয়া দেন। খড় জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িল—কিরূপে আগুন লাগিল। পল্লীগ্রাম- সব খড়ো ঘর। পাড়ার লোক জড় হইল। লঙ্কাকাণ্ড বা হয়। সকলে আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিল। আগুন নিভিবার পূর্ব্বে বাম কোথায় গিয়াছে খোঁজ পড়িল। খড় ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। বাম তাহার মধ্যে। বাহ্য জ্ঞান নাই। যখন গায়ে আগুন লাগিল তখন জ্ঞান হইল। তিনি পরে বলিলেন "আমার তখন হনুভাব আসিল, আমি জয় রাম বলিয়া খড়ের গাদা হইতে

অগ্নিকাণ্ড

প্রাচীরে উঠিলাম ও প্রাচীর হইতে এক লম্ফে ভূমিতে নামিয়া পলাইলাম।" তারা মা প্রিয়পুত্রকে যেন অগ্নির মধ্যে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন। বামের গাত্রে তাপজনিত কোন ক্ষত বা ব্যথা হয় নাই।

ঐ দিন আটলা গ্রামে অন্য ঘটনা লইয়া দারোগা তদন্ত করিতে আসেন।

গ্রামের লোক দারোগাকে অগ্নিকাণ্ডের বিষয় বলেন। রামকে ভয় দেখাইবার জন্য দারোগা তাঁহাকে ধরিলেন। রামের ভাব দেখিয়া দারোগার ভক্তি আসে। কিন্তু বাহিরে তিনি কঠোরতা দেখাইয়া রামকে লইয়া মাড়গ্রামে গেলেন। রাম অটল, অচল। দারোগা বাবু রামকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া শেষে বুঝাইয়া বিদায় দিলেন।

দারোগার আদর

৫। বিদ্যার্জ্জন

বালো যঃ পাঠশালার্জ্জিতলিপিগণিতাস্বাদলেশোঽপিবুদ্ধঃ
সংকূজন্নূপুরাঙ্ঘ্রিঃ ক্বচন ধৃতবনস্রগ্ঘটীবেণুবর্হঃ।
শ্রীরামাড়ম্বরো বা ধনপতিতনয়ব্যাজরম্যঃ সুকণ্ঠঃ
তাং তাং লীলাং সবীণালয়মনুপিতরং সানুজঃ পাতু গায়ন্ ॥

যে বালক পাঠাগারে বর্ণমালা ও গণিতের আস্বাদমাত্র পাইয়াও পরম-জ্ঞানী; যিনি কখন চরণে রুণু ঝুনু নূপুর, বক্ষে বনমালা, কটিতটে (পীত) ধটী, করে মোহন বেণু ও মাথায় ময়ূরপুচ্ছ ধরিয়া; কখনও বা শ্রীরামের বেশ ধরিয়া; কখনও বা ধনপতি সদাগরের ভক্তপুত্র শ্রীমন্তের সাজে সাজিয়া; সেই সেই কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, চণ্ডীলীলা, পিতার কণ্ঠের পর সহোদরের কণ্ঠ সনে মিলাইয়া বীণার লয়মানে গান করিয়াছেন—সেই বালক আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

এদেশের চিরন্তন প্রথানুসারে রামাচরণের পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালায় যে "চেরা" সেই "চেরা" ভাব। সদাই আনমনা। কিন্তু সিদ্ধিরস্তু অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ক্ষ, স্ক, প্রভৃতি শিখিতে প্রভুর বিলম্ব হয় নাই। একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ প্রভৃতি ষট্‌কে, কড়ানে, পুন্‌কে, চৌকে, দশকেও যথাসময়ে অধিগত করিয়া কলাপাতায় ও কাগজে লেখা শেষ করিলেন। শুভঙ্করীর সহিতও কিঞ্চিৎ পরিচয় হইল।

পাঠশালায়

পাঠশালার বিদ্যা কম ছিল না। এই বিদ্যাবলেই গঙ্গাগোবিন্দ সিং প্রভৃতি কোম্পানির দেওয়ানি করিয়া গিয়াছেন। আটলা হিন্দুপ্রধান গ্রাম। তথায় ফার্সি শিখিবার মুন্সি বা মৌলভি ছিল না। ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাবে রামের রাজভাষার সহিত আলাপ হয় নাই। ভাষাই ভাবের ব্যঞ্জক। ভাষাই ভাবের দ্বার। বিদেশী ভাব বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া আমাদের

হৃদয়ে প্রবেশ করে। পাঠশালা সমাপ্ত করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে যাইবার অবসর বাম পান নাই, কারণ সংসারের অভাব। সর্ব্বানন্দের সংসার বাড়িয়াছে। আরও তিনটি কন্যা একটি পুত্র জন্মিয়াছে। সামান্য ধানজমি হইতে সংসার চলা দায়। প্রয়োজনের প্রেরণায় সর্ব্বানন্দ উপার্জ্জনের পথ ভাবিলেন। দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় সরকারী বা অন্য ছোট চাকরী করা ভাল মনে করিলেন না। বামকে যেরূপে পারি ইংরাজী পড়াইয়া মানুষ করিব এরূপ ভাবও তাঁহার আসিল না। আসিলে বাম 'মানুষ' হইতেন না। আমাদের ন্যায় কিম্ভূতকিমাকার ইংরাজীনবীস্ হইতেন। বামের ইচ্ছাতেই তাঁহার অবিদ্যার চর্চ্চা হইল না।

বিদেশী ভাব বর্জ্জিত

সর্ব্বানন্দের সহজাত স্বরশক্তি ছিল। বেহালা প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। সঙ্গীতে রীতিমত অধিকার না থাকিলেও পল্লীগ্রামের মনোরঞ্জন যথেষ্ট হইত। পুত্রদ্বয়ও পৈতৃক সঙ্গীত শক্তি পান।

তারার কৃপায় রাগ রাগিণীর উপর বামেরও বিলক্ষণ আধিপত্য আসে। সর্ব্বানন্দ প্রথমে বামকে লইয়া, পরে রাম ৫।৬ বৎসরের হইলে দুই পুত্রকে লইয়া কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ করিলেন। রাম ও বামকে কানাই ও বলাই সাজাইয়া নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী-গ্রামসমূহে বাড়ী বাড়ী গাহিয়া বেড়াইতেন। রাম পরে শিক্ষাবলে কালোয়াৎ হন।

কৃষ্ণযাত্রা

কোন দিন পুত্রদ্বয়কে রাম ও লক্ষ্মণ সাজাইয়া সর্ব্বানন্দ রামায়ণ গাহিতেন। আবার কোনদিন বা চণ্ডীর গান করিতেন। পিতা বেহালা দিয়া মূল গায়েন হইতেন। বালকেরা দোয়ার দিত। আবার সকলে সমস্বরে কোন কোন কলি গাহিতেন। পিতার মোটা গলার সঙ্গে পুত্রদের সরু গলা মিলিয়া মধুময় স্বরলহরী তুলিত। পল্লীবাসিগণ বালকদের সারল্যে প্রীত হইতেন ও যথাসাধ্য পুরস্কার দিতেন। কিন্তু বীরভূমের দরিদ্র পল্লীতে তাদৃশ আয় হইত না। কোনক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

রামায়ণ গান

এ বৃত্তিতে সর্ব্বানন্দের বিশেষ আনুকূল্য হউক আর নাই হউক বামের ইহা প্রীতিকর ছিল। তিনি ভগবল্লীলা গাহিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

তারা মা এমন কল্পতরু যে ভক্ত যা ভাবনা করেন তাঁহাকে তদনুরূপ সিদ্ধি দেন। সেই কথা প্রমাণ ক'রবার জন্যই কি রাম বাল্যে লীলাগীতিবৃত্তি লইলেন? লীলাগানে তিনি ডুবিয়া যাইতেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধা'রা বহিত।

প্রীতিবর

ভারতে শিক্ষা চিরকালই মৌখিকী। বেদ বেদান্ত সমস্তই মুখে মুখে রক্ষিত। গুরুমুখ হইতে শ্রুত বলিয়া ইঁহাদের নাম শ্রুতি। স্মৃতি ও বেদাঙ্গ মুখে মুখে শিক্ষিত। আগম-নিগমও গুরুমুখী বিদ্যা। এখনও টোলে কাব্য-ব্যাকরণ কোষ-দর্শনাদি কণ্ঠস্থ করিবার রীতি। অগ্রে আবৃত্তি পরে অর্থ। তাহা সময়সাপেক্ষ বটে কিন্তু শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। সমস্তই কণ্ঠস্থ, পুঁথি হাৎড়াইবার, মাথা চুলকাইবার আবশ্যকতা হয় না। ভারতের চক্ষে পরহস্তগত ধন ও পুস্তিকাগতা বিদ্যা—দুইই সমান।

কণ্ঠস্থা যা ভবেৎ বিদ্যা সা প্রকাশ্যা বুধস্য তু।
যা গুরৌ পুস্তকে বিদ্যা ত্বয়া মূঢ়ঃ প্রতার্য্যতে॥

মুদ্রাঙ্কনযন্ত্রের সাহায্যে আজকাল পুস্তকের অভাব নাই। যাহার যে ভাব আসিতেছে তাহাই ছাপাইতেছে। তখন এত পুস্তক ছিল না। হাতে লিখিয়া লওয়া দুর্ঘট ছিল। তাই মাথায় পুরিয়া লইত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গুরুগৃহ হইতে ন্যায়কুসুমাঞ্জলি বৃত্তিসহ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে পুঁথি লিখিয়া পড়াইতে লাগিলেন। এখনও টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পঠিত পুস্তক গোড়া হইতে ডগা পর্য্যন্ত আওড়াইতে পারেন।

মৌখিকী শিক্ষা

মৌখিকী রীতি অনুসারে রামের বিদ্যার্জ্জন। ব্যাস ও বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না হইলেও কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কথকঠাকুর, কবি, পাঁচালী, ও যাত্রা প্রভৃতি হইতে মহাভারতে রামায়ণে ও পুরাণাদিতে রামের ব্যুৎপত্তি মুখে মুখে শুনিয়াই জন্মে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নীলাম্বর, নবাই প্রভৃতি সাধকগণের সঙ্গীত এবং কবিকঙ্কণাদি ভক্তকবিদের ভক্তিরসাত্মক কৃতিতে তিনি মুখেমুখেই বিশেষ আধিপত্য লাভ করেন। তিনি যখন ভক্তদের গান গাহিতেন তখন তাঁহার নামের ঝঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডল ভক্তিতরঙ্গে তরঙ্গিত হইত।

পুরাণাদি জ্ঞান

জনৈক প্রিয় শিষ্য রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাম বলিয়াছিলেন "ছেলের বিদ্যা কতদূর? আমার স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত হইয়াছে"। রসিকদাদা বুঝিলেন কাশীরাম দাসের মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত বাবা পড়িয়াছেন। সেই বোধে তিনি উত্তর দিলেন "বাবা! আমারও ঐ পর্য্যন্ত"। বাবা বলিলেন "তবেত আমার ছেলে বিদ্বান্"। বাবার কথায় গভীর অর্থ তখন রসিদ দাদা বুঝিতে পারেন নাই, পরে বুঝিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি স্বর্গত বাবা ইঙ্গিত করিলেন স্বর্গারোহণী বিদ্যা তাঁহার করতলগতা। সত্যাসত্যাই পরা বিদ্যা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তজ্জন্য তাঁহাকে উপনিষদাদিপাঠ বা যোগসাধনাদি করিতে হয় নাই। সংস্কৃতভাষার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও তিনি তন্ত্রাদির গূঢ়তত্ত্ববোধক শ্লোকাদি কখনও কখনও প্রিয়শিষ্যগণের নিকট প্রকাশ করিতেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যা রসায়ণাদিতেও তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্বিষয় পরে শুনিবেন। পার্ব্বতী সম্বন্ধে কালিদাস বলিয়াছেন—

বিদ্যার সীমা

তাং হংসমালাঃ শরদিব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥

—কুমার সম্ভবে ১স. ৩০।

যেমন শরৎকালে হংসশ্রেণী স্বতঃ গঙ্গায় আগমন করে, যেমন রাত্রে মহৌষধি নামক তৃণবিশেষে জ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশ পায়, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মাভ্যস্ত বিদ্যাসকল শিক্ষাকালে সেই মেধাবিনী পার্ব্বতীকে স্বতঃ আশ্রয় করিয়াছিল। এই কবিকল্পনার সত্যতা বামে প্রমাণিত। বামকে শিক্ষাও দিতে হয় নাই। তারাবিদ্যা তাঁহাতে স্বতঃস্ফুরিত হইয়াছিল।

৬। পিতৃবিয়োগ

রামশ্চ সন্ত্যজ্য গৃহং জগদ্ধিতে
শ্মশানলীলানটনে মনো দধে।
জহৌচ তাতঃ সহসা কলেবরং
বিয়োগভীতেরুত লোকমঙ্গলে॥

রাম গৃহ ত্যাগ করিয়া জগতের হিতের জন্য শ্মশানলীলা ইচ্ছা করিলেন, পিতাও হঠাৎ কলেবর ত্যাগ করিলেন। ইহা কি তনয়ের ভাবি বিয়োগ সহ্য করিতে পারিবেন না ভাবিয়া না তিনি থাকিলে পাছে রামের সংসার ত্যাগে বাধা পড়ে এবং জগতের কল্যাণে বিঘ্ন হয়, তিনি গেলে জগতের শ্রেয়ঃসাধন হইবে ভাবিয়া?

কৃষ্ণবালক সাজিয়া, গান গাহিয়া, রাম প্রেমভক্তি ছড়াইতেছিলেন। উহা তাঁহার নবলীলার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। তিনি স্বার্থপর জগতে অদ্ভুত ত্যাগ শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। মুখে অনেক সৎপুরুষ ত্যাগশিক্ষা দিয়াছেন। মুখের কথা অপেক্ষা দৃষ্টান্তই অধিক আকর্ষণ করে। তাই শ্মশানলীলা আবশ্যক। সেই লীলা সংসার না ছাড়িলে আরম্ভ হয় না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য প্রথম আশ্রম।

আনুমানিক ষোড়শবর্ষে রাম উপনয়ন লইলেন। পিতার অর্থাভাবই পুত্রের উপনয়ন বিলম্বের কারণ। ডাবুকের কৈলাসপতি গোঁসাই ১২৬১ সালে বীরভূমে আসেন. তিনি বলিতেন ঐ সময়ে রামের উপনয়ন হয়। উপনয়নই সাবিত্রী দীক্ষা। ইহা স্বাধ্যায়াদির দ্বার। মনু বলিয়াছেন,

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈঃ হোমৈঃ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥

—মনুসংহিতা ২অ. ২৮।

এই রক্ত মাংসের অপবিত্র শরীর ব্রহ্মবিদ্যালোচনা, ব্রত, হোম, বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ, ও সুতোৎপাদন দ্বারা পবিত্র এমন কি ব্রহ্মভূত হয়। অবোধপূর্ব্বক শুক্রশোণিতজ জন্ম ভূতের প্রথম জন্ম। তখন মনের সংস্কার নাই, জ্ঞানের বিকাশ নাই। মনের উৎকর্ষ বিদ্যাসাপেক্ষ। বিদ্যা দ্বিবিধ, অপরা ও পরা। অপরা সংসারভোগাত্মিকা। তাহাতে মনঃ বহির্মুখি হইয়া নীচ হয় ও জীব দুঃখ

সাবিত্রী দীক্ষা

পায়। তজ্জন্য সে বিদ্যা হেয়। যে বিদ্যায় বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বজ্ঞান ও নিত্যানন্দ আসে, সেই বিদ্যার নাম পরা। সাবিত্রী দীক্ষা সেই বিদ্যার প্রবেশিকা। এই জন্য উপনয়নই দ্বিতীয় জন্ম। সকলে পরা বিদ্যার অধিকারী নহেন। যাঁহারা অধিকারী তাঁহারাই দ্বিজ।

রাম নৃলোকে আসিয়াছেন, নৃরূপে জন্ম লইয়াছেন, আজন্ম সেই পরাৎপরার দিকে তাকাইয়া আছেন। লোকাচার বশতঃ তিনি ব্রহ্মদীক্ষা লইলেন। তাহার চিহ্ন যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ করিলেন, সন্ধ্যোপাসনাদি শিখিলেন, যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেন। গুরুগৃহে যাইবার প্রথা অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি গুরুপদসেবা সে সময় করিলেন না। যে জন্য গুরুগৃহে বাস অর্থাৎ শমদমতিতিক্ষোপরতিশিক্ষা, তাহা তাঁহার জন্মসিদ্ধ।

ব্রহ্মচর্য্য

তাঁহাকে তজ্জন্য হঠযোগ করিতে হইল না। সর্ব্বদা তাঁহার রাজযোগ বা তন্ময়তা ছিল। যে কার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মণ বালক প্রাচীনকালে ২৪ বৎসরে করিতেন, রাম তাহা লোকসংগ্রহ জন্য ২৪ মাস মধ্যে শেষ করিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত। রাম গার্হস্থ্য লইবেন না। সন্ন্যাসই অবলম্বনীয়। তিনি

পিতৃবিয়োগ

সন্ন্যাস লইতে অভিলাষী হইলেন, পিতাও আং সন ১২৬২ সালে ইহধাম ছাড়িলেন। পিতা তনয়ের ভাবি বিরহ অসহনীয় এই ভাবিয়া, না পাছে মায়ার বাঁধনে পুত্রের লোকহিতকর কার্য্যে বাধা হয় অবোধ পূর্ব্বক তাহা ভাবিয়া অন্তর্হিত হইলেন ?

রামের তখন বয়স আনুমানিক অষ্টাদশ বৎসর। তিনি দ্বন্দ্বাতীত, শোকের ধার ধারেন না। পতিপ্রাণা রাজকুমারীর প্রাণে বিষম শেল বাজিল। তখন রাজকুমারীর বয়স আনুমানিক ৩৬ বৎসর। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিরূপে সন্তানদের শোকাপনয় হইবে, কিরূপে তাহাদের শিক্ষা দিবেন,

অনটন

কিরূপে তাহাদের প্রতিপালন করিবেন ভাবিয়া মাতা আকুল। বাবা গিয়াছেন। কৃষ্ণযাত্রার আর সুবিধা নাই। কৃষিই একমাত্র জীবিকা। রামের উপর চাষ দেখার ভার পড়িল। মুড়ি, নারিকেল, চাউল ভিজান প্রভৃতি জলপান রামের দ্বারা মা কৃষাণদের জন্য মাঠে পাঠাইতেন। হাউড়ো রাম হয়তো মাঠের ধারে আকাশ তারা দেখিতেন। এদিকে কৃষাণেরা বাড়ী আসিয়া রাজকুমারীর উপর কোপ

করিত। রামকে খুঁজিয়া বাড়ী আনিতে হইত। একদিন জলপান লইয়া যাইতে রামের ত্রুটি হওয়ায় প্রাচীন কৃষক পাঁচনবাড়ি দ্বারা রামকে দুই চারি ঘা দেন। বাবা বলিতেন "কৃষাণ দাদা আসিয়া পাঁচনবাড়ি দিলেন, কি করিব? তারা মা চেবা করিয়াছেন।"

মা বুঝিলেন রামের দ্বারা চাষবাস হওয়া অসম্ভব। জমি ভাগে দেওয়া হইল। তাহাতে আয় কমিল। এত অল্প ধান আমদানি হইল যে তাহাতে সংসার চলে না। মা নিজে না খাইয়া ছেলেদের খাওয়ান, কিন্তু তাহাতেও সংসার অচল। সংসারের অভাব থাকুক না থাকুক রামের তাহাতে আসে যায় না। রাম বুদ্ধিমান্। মার অবস্থা বুঝিয়া আবদার করেন না। তথাপি মার প্রাণে সন্তানের ক্লেশ দারুণ বাজিতেছে। ভাবিতেছেন কি উপায়ে সন্তানদের দুইবেলা দুই মুঠা অন্ন দেই। জননী হৃদয় গ্রন্থি ছিঁড়িয়া হৃদয়ের ধন দুইটিকে আনুমানিক ১২৬৩ সালে সাঁইতার নিকট মতুলালয়ে রাখিয়া আসিলেন।

মাতুলালয়ে

৭। গোচারণ

একঃ সাশ্রু পুরাম্বয়া সখিকরে ন্যস্তো ব্রজে প্রেমিকঃ
অন্যো নির্ম্মমমীরিতো নিজজনৈর্বঙ্গেঽসহায়োঽধুনা।
তারামগ্নমনা যযৌ মদনজিৎ ধেনূঃ কিশোরো নয়ন,
লীলৈবং বহিরন্যথা প্রকৃতিতো ধীচারণৈক্যং দ্বয়োঃ॥

পুরাকালে একজন প্রেমময় কিশোর ব্রজে স্নেহময়ী (জননী) কর্তৃক সজলনয়নে সখাগণের হস্তে অর্পিত হইয়া, অধুনা বঙ্গে একজন জিতকাম তারামগ্নমনা কিশোর নিজজন কর্তৃক নির্ম্মমভাবে অসহায় অবস্থায় প্রেরিত হইয়া ধেনু চরাইয়া ছিলেন। এইরূপে উভয়ের লীলা বাহ্যতঃ ভিন্ন হইলেও যথার্থতঃ জীবগণের প্রবৃত্তিচারণারূপলীলা উভয়ের অভিন্ন।

মাতুল মহাশয় রাম ও রামকে অন্ন দিতে লাগিলেন। শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। কেবল বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না, আমরাও নহি। তাহাতে দাতার অপেক্ষা ভোক্তার অধিক ক্ষতি। ভোক্তা ক্রমশঃ অলস ও কাজের বাহির হয়। কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্যভার দেওয়া উচিত। শোনা যায় বালকদিগকে গরুর ছানি কাটিতে, জাব দিতে, জল তুলিতে ভার দেওয়া হইয়াছিল। হাউড়ে রাম খড় কাটিতে বসিলেন, নিজের ভাবে নিজে বিভোর, হাতের খড় হাতেই থাকিয়া গেল। ধমক খাইয়াও তাঁহার চৈতন্য হয় না। মাতুল মনে করিলেন রাম অলস। কাজ করিবে না বলিয়া ঐরূপ করে। তিনি রামের তারাময় ভাব বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গোচারণের ভার দিলেন।

গোচারণ ভার

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণরূপে ধেনু চরাইয়াছিলেন। আবার শ্রীভগবান্ রামরূপে সেই লীলা দেখাইতে আসিলেন। দুই গোচারণে বাহ্যতঃ পার্থক্য আছে। কৃষ্ণাবতারের গোচারণলীলা ভক্ত কবিগণ নানা ছন্দে অমৃতময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনায় নন্দরাণীর ও নন্দরাজের অদ্ভুত বাৎসল্য, শ্রীদাম সুদামের অপূর্ব্ব সখ্য, শ্রীমতীর অনির্ব্বচনীয় প্রেম উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত। ঐ চিত্রগুলি কি হৃদয়গ্রাহি! যতদিন মানুষের হৃদয় থাকিবে ততদিন ঐ চিত্রদর্শনে সেই হৃদয়ে ভাবহিল্লোল খেলিবে। শ্রীরামের গোচারণ বাহ্যতঃ অন্যরূপ। রামের কপালে আগুন। সুতরাং সে কপালে স্নেহময়ী মা যশোদা ও স্নেহময় নন্দ জুটিবেন কেন? রাজকুমারী মাতা দেবকী ভাবে ভাবিতা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই অনাথিনী নিজ স্নেহের ধন রাম ও রামকে যে মাতুলানীর করে সঁপিয়া দিয়াছিলেন তিনি যশোমতী-ভাবের ধার ধারিতেন না। রামের অদৃষ্টে শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম জুটে নাই। কেহ প্রাতঃকালে রামকে গোষ্ঠে যাইবার জন্য বলে নাই। রাম তাঁহার যশোমতীর নিকট গোচারণ জন্য অনুমতি চাহেন নাই। রামের যশোমতীও গোচারণ-সংবাদে অচেতনে ধরণী লুঠান নাই।

তুলনা

হাউড়ো রাম একা অনেকগুলি গরু লইয়া প্রাতে মাতুলের গোয়াল হইতে বাহির হইতেন। মাঠে পৌছিতে না পৌছিতে তিনি আকাশ পানে

তাকাইয়া নিজের মনে চলিতেন। কোন গরু গৃহস্থের বাগানে, কোন গরু ক্ষেতে পড়িয়া পরের অপচয় করিত। বামের ভাষায় বলিতে গেলে "তিনি আকাশ তারা দেখিতেন, গো-মাতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন।" গো-মাতাদের আনন্দ হইত বটে কিন্তু যে সমস্ত দুঃখী কৃষিজীবির শস্য নষ্ট হইত সে সব ব্যক্তি নিরানন্দ হইতেন। তাঁহার গো-মাতাদিগকে লগুড দ্বারা ভক্তি দেখাইতেন এবং বামকেও অনুরূপ সম্বর্দ্ধনা করিতেন। যমকেও বামের জন্মনক্ষত্র যাইত না। আকাশ তারা দেখিবার রোগ তিক্তৌষধি প্রয়োগেও কাটিত না। নিত্যই বামের নামে মাতুলের নিকট অভিযোগ আসিত। নিত্যই বাম আত্মীয়ের নিকট যথোচিত পুরস্কার পাইতেন। এইরূপে ১০৬৩,৬৪ সাল কাটিয়া গেল।

বামের গোষ্ঠ

শ্যামের ও বামের বাহ্য গোচারণে এই বাহ্য প্রভেদ। আধ্যাত্মিক গোচারণ উভয়েরই এক। উভয়ে জীবগণের মনোধেনুকে চরাইতেন ও চরাইতেছেন। উভয়েই বাঁশী বাজাইয়া তাপিত জীবকে টানিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে গোচারণ-লীলা পরে প্রকাশ পাইবে।

ধীচারণা

৮ গৃহকৃত্য

আনীতঃ স্বগৃহং বামস্তারা-ধ্যানার্চ্চনে রতঃ।
গৃহকৃত্যোপ্যুদাসীনস্তস্থৌ গৃহী ন চাগৃহী ॥

(মাতুলালয় হইতে) স্বগৃহে আনীত হইলে বাম (পূর্ব্ববৎ) তারাধ্যানে ও তারার্চ্চনে ব্রতী থাকিয়া গৃহকার্য্যে উদাসীন হওয়ায় না গৃহী না গৃহত্যাগী ছিলেন।

বাম বা রাম কেহই উপকারী মাতুলের ব্যবহারে প্রতিবাদ করিতেন না। মাকেও ঐ বিষয় সংবাদ দিতেন না। রাম ভয়ে ভয়ে থাকিতেন। বাম তারা মার আদুরে ছেলে। তারা মাঁরই কাছে আব্দার করিতেন। আর

কাহারও কাছে আব্দার করিতে শিখেন নাই। তারা মাকে মনে মনে জানাইতেন—"মা কেন চেবা করিলি, তাইতো সকলের কাছে ধমকানি খাই।" মা কিন্তু ছেলেকে আঁচলের নিধি করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে 'চেবাই' রাখিলেন, 'চড়্কো' করিলেন না।

স্বগৃহে

মাতুলগৃহের কথা কয়েক মাস মধ্যেই দুখিনী জননীর কানে গেল। তিনি আটলা হইতে ছুটিয়া আসিলেন। চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল! তিনি বাদানুবাদ করিলেন না, বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পুত্র দুইটিকে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। আত্মীয় মহাশয় মায়া মমতা জানাইয়া ছেলেদের দোষ দিয়া বিদায় দিলেন।

বাম বাড়ীতে ১২৬৪।৬৫ সালে ফিরিয়া আসিয়াও পূর্ব্ববৎ আনমনা। সংসারের কোন কাজেই লাগেন না। চাষবাস দেখেন না, হাট বাজার করেন না। লেখাপড়ারও নাম নাই। মাঠে ভাগধান আনিতে গেলে, আকাশ তারা দেখেন। প্রজারা ধান ও খড় দিল, কি না দিল—তাহার খেয়াল নাই। গরু বাঁধিতে গেলে হাতের দড়ি হাতেই থাকে, বাঁধিতে ভুলিয়া যান। খড় কাটা প্রভৃতি তো দূরের কথা।

অন্যমনা

বামের প্রিয় কর্ম্ম ঠাকুর পূজা করা, তারা তারা বলিয়া নাচিয়া গাহিয়া বেড়ান। তাহাতেও শৃঙ্খলা নাই, মন্ত্র নাই, শুদ্ধাচার নাই। করবী, কল্কে, ঘেটু প্রভৃতি যে ফুল পাইলেন তুলিলেন! সেইখানে জয় তারা মা নে বলিয়া ছড়াইয়া দিলেন। কচু পাতে আম জাম বা ফুলের নৈবেদ্য সাজাইয়া মাঠে ব গাছের তলায় মাকে প্রাণের ভাষায় প্রাণের আগ্রহে নিবেদন করিয়া দিলেন। কখন আম গাছে উঠিয়া ফল আগে খাইয়া মিষ্ট লাগিয়াছে, "তারা মা খা বলিয়া আর এক কামড় দিলেন।" কখনও দাস্য ভাব কখনও পুত্র ভাব, কখনও বা শ্রীদাম সুদামের ভাব।

তারা পূজা

মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া তারাপীঠে যান। তারা মাকে দেখিয়া আসেন। স্বীয় ভাবী রাজ্য মহাশ্মশানে বেড়ান, ভাবী সিংহাসন বসিষ্ঠের আসন সাদরে দেখেন। তারা মার পাদপদ্মখানিতে বনফুল, বিল্বদল প্রভৃতি ছড়াইয়া দেন। তারাপীঠের সাধকদিগকে ভক্তি করেন। মোক্ষদানন্দ তাঁহাকে ভালবাসেন। শ্মশানেশ্বর মহাপুরুষ ভাবিগুরু ব্রজবাসী

তারাপীঠে

কৈলাসপতি ক্ষ্যাপাও তাঁহাকে পুত্রবৎ আদর যত্ন করেন। তিনি ক্ষ্যাপার গাঁজা সাজেন, প্রসাদ পান। কৈলাসপতি সময়ে সময়ে আটলায় আসিলে বাম তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন, অবহিতচিত্তে তাঁহার বচনসুধা পান করেন। একদিন বাম মাকে না বলিয়া নিজবাড়ীর নারায়ণশীলা তারাপীঠে আনিয়া শিমুলতলায় তারা মার পাদপদ্মে রাখেন। বাটীতে পূজার সময় শিলার খোঁজ পড়িল। শিলা নাই, বামও নাই। সকলেই বলিল এ বামের কাজ। সংবাদ পাওয়া গেল, যে বাম তারাপীঠে। সেথা হইতে বামকে শালগ্রাম শিলাসহ আনা হইল।

মাতৃতাড়নে

মা কখনও বামকে এই সময় ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। বাম কখনও নির্জ্জনে তারাধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, কখনও বা তারা তারা রবে ঘর ফাটাইতেন। কখনও বা তাঁর চক্ষুরূর্দ্ধগত, মুখ দিয়া ফেণ নির্গত হইতেছে দেখিয়া মা ভয়ে দ্বার খুলিয়া দিতেন।

৯। দৈবীসম্পৎ

সত্ত্ব-রজ-তমোগুণভেদে জীবের প্রকৃতি ত্রিবিধা। সাত্ত্বিক প্রকৃতি জ্ঞাননিষ্ঠ, রাজসিকপ্রকৃতি কর্ম্মনিষ্ঠ, তামসিক মোহনিষ্ঠ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভাব দৈব, রাজসিক প্রকৃতির ভাব রাক্ষস, তামসপ্রকৃতির ভাব আসুর। দৈবভাবের গুণাবলি দৈবসম্পৎ। গীতায় তাহার বিবরণ যথা :—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য পাণ্ডব॥

—১৬ অঃ ১-৩।

নির্ভীকতা সত্ত্বসংশুদ্ধি বা চিত্তের নির্ম্মলতা, আত্মজ্ঞানলাভে পরিনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞাদকর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায় বা বেদাভ্যাস, তপস্যা, সারল্য, অহিংসা, সত্য, ক্রোধাভাব, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, দয়া, লোভাভাব, মার্দ্দব অর্থাৎ অক্রুরতা, অকার্য্যকরণপ্রবৃত্তিতে লজ্জা, অচাপল্য অর্থাৎ ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচ, দ্রোহশূন্যতা, অত্যভিমানাভাব--এই ষড়্‌বিংশগুণ, হে পাণ্ডব! যিনি দৈবীসম্পৎ লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ দৈবভাবাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাতে প্রকাশ পায়। এই গুণ সমুদয়ই যোগশাস্ত্রের যমনিয়মাদ—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

—পাতঞ্জল, সাধন পাদে ৩০ সূং

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানি নিয়মাঃ।

—ঐ ঐ ৩২ সূং

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অলোভ, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শমদম, অপরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুপরিহার, এই কয়টি যমশব্দবাচ্য। ব্যাহ্যাভ্যন্তরশৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরচিন্তা এই কয়টি নিয়ম।

যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবাঙ্গানি"

—ঐ ঐ ২৯ সূং

অষ্টাঙ্গযোগের ফল কৈবল্য বা মোক্ষ।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে মোক্ষসাধন —

মোক্ষ সাধন

আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেষু বিবেকিতা।
তৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ॥
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্ব্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাং চ জীর্ণকাষায়ধারণম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্রালস্যবিবর্জ্জনম্।
শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্॥
নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযোগ্যমৃতীভবেৎ॥

—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৩য় অঃ।

গুরুসেবা, শাস্ত্রবিবেকিত্ব, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ, প্রিয়হিত বচন, রমণীদর্শনস্পর্শন পরিহার, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, পরিগ্রহত্যাগ, জীর্ণ গৈরিকবস্ত্র ধারণ, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার, তন্দ্রা বর্জ্জন, আলস্য বর্জ্জন, অনিত্যতা শুচিতাদি দোষানুশীলন, সূক্ষ্মজীববধাদি দোষদর্শন, প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, নিস্পৃহতা ও ইন্দ্রিয়সংযম। এই সকল উপায় দ্বারা জীব সম্যক্ শুদ্ধ হইয়া সত্ত্বপ্রধান হয় এবং শেষে অমরত্ব লাভ করে।

উক্ত গুণাবলির চারিটি প্রধান গুণ—শম দম তিতিক্ষা ও উপরতি বা বৈরাগ্যই—বেদান্তে সাধনচতুষ্টয় অর্থাৎ মোক্ষের চারিটি সাধন বলিয়া কথিত।

রাম মুক্তপুরুষ। উপরোক্ত মোক্ষসাধন তাঁহার সহজাত। বাল্যকাল হইতে উক্ত দৈবসম্পৎ তাঁহাতে ছিল। তিনি সত্য ও সারল্যের মূর্ত্তি, বৈরাগ্যের বিগ্রহ। বিষয়ভোগে কখনও তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তারামাই তাঁহার একমাত্র অনুরাগের বিষয়। জীবে দয়া, ধৃতি, নির্ভীকতা, অনৌদ্ধত্য, ওজস্বিতাদি যৌবনেই উন্মেষিত হয়। তন্ময়ত্ব তাঁহার ঈশ্বরপ্রণিধানের পরিচায়ক। কায়মনোবাক্যে গুরুকৈলাসপতির সেবাও করিয়াছেন। ইহা বৈদিকযুগ নহে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন ও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান করেন নাই। শাস্ত্রানুশীলন না করিলেও তৎফল বিবেকিত্ব এবং জ্ঞাননিষ্ঠার আভাস এই বয়সেও তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার মুগ্ধ বালক স্বভাব সত্ত্বসংশুদ্ধি বা চিত্ত নির্ম্মলতার নিকষ। শম দম ও তিতিক্ষার উল্লেখ অনাবশ্যক।

বিকাশ তরঙ্গ

১। সন্ন্যাস

অসারমুদ্দিশ্য যদাহ মাতা কুরুষ কর্ম্মেতি তস্যৈব পুত্রঃ।
সারার্থমাদায় জহৌ নিকেতং স নিত্যসন্ন্যাস্যপি লোকভূত্যৈ॥

অসার সংসারকর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া মাতা যে পুত্রকে কর্ম্ম করিতে বলেন, পুত্র তাহার সারার্থ অর্থাৎ সারকর্ম্মোদ্দেশপরত্ব গ্রহণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ সন্ন্যাসী হইলেও, লোকশিক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

সম্ পূর্ব্বক ন্যস্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে সন্ন্যাস শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার

যৌগিকার্থ সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ। গীতায় কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকে সন্ন্যাস এবং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকে ত্যাগ বলা হইয়াছে (১৮ অঃ ২ শ্লোঃ)। সন্ন্যাসীর শ্রৌত লক্ষণ ত্রিবিধৈষণাবিনির্ম্মুক্ত। বিত্তৈষণা অর্থাৎ ধনাদিকামনা, পুত্রৈষণা অর্থাৎ নামকামনা, লোকৈষণা অর্থাৎ পারত্রিক কল্যাণকামনা যিনি জয় করিয়াছেন তিনি সন্ন্যাসের অধিকারী।

শ্রৌত সন্ন্যাস লক্ষণ

সদনে বা কদনে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধির্যস্তু শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥

যিনি সর্ব্বদাই কি সদনে কি কদনে কি লোষ্ট্রে কি স্বর্ণে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ উত্তমাধম দ্রব্যে সমবুদ্ধি তিনি সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বিবিধ কাল শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কল্প।

ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহীভূত্বা বনীভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ
—জাবালোপনিষৎ, ৪র্থ খণ্ডে।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনে গৃহী, গার্হস্থ্য অবসানে বানপ্রস্থ, শেষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ বিধেয়।

স্মৃতি শ্রুতির প্রতিধ্বনি দিতেছেন—

অধীত্য বিধিবৎ বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বাচ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
—মনুসংহিতা ৬ অঃ, ৩৬ শ্লোঃ।

বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করতঃ শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া যথাশক্তি যজ্ঞাদি সম্পাদনের পর মোক্ষবিষয়ে মনোনিবেশ করিবে।

উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়ের উন্মেষের পূর্ব্বেই পঞ্চমবর্ষ হইতে অন্যূন চতুর্বিংশতিতম বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। তদ্দ্বারাও ভোগ বাসনা বিলুপ্ত না হইলে সমাবর্ত্তন ও দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্মপালন। তাহাও প্রবৃত্তিচরিতার্থ নহে। গৃহস্থাশ্রমে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির সুন্দর সম্মিলন। সেখানেও প্রবৃত্তিদমনের নিয়মাবলী। পুত্রার্থেই ভার্য্যাগ্রহণ। সৎপুত্র না জন্মিলে সমাজরক্ষা অসম্ভব। ভার্য্যা আবার পত্নী অর্থাৎ পতির সহধর্ম্মিনী হইবেন।

ক্রম সন্ন্যাসী

ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধ্যৈ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী।
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২১ অ০।

ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সম্যক্ সিদ্ধির জন্য ভার্য্যা ভর্ত্তার সহায়। যাগযজ্ঞাদি দ্বারা সমাজের ও নিজাত্মার কল্যাণসাধন করতঃ বয়সের সহিত সংযমের প্রভাবে ভোগবাসনা মলিন হইলে পঞ্চাশৎ বর্ষের পর সংসার হইতে অবসর গ্রহণ। ইহা শরীরের আরাম জন্য নহে, আত্মার উন্নতির জন্য। এ পথেও শিক্ষাক্রম। প্রথমে বানপ্রস্থ। পত্নীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে একাকী, নচেৎ সপত্নীক বনগমন। প্রথমাবস্থায় পর্ণকুটীরাদিতে বাস, ভূমিশয্যা, মুন্যন্নে জীবনধারণ, অগ্নিপক্বাশন বা কালপক্বভোজন ইত্যাদি ত্যাগের অনুশীলন। তখনও অগ্নিহোত্র চাতুর্মাস্য পৌর্ণমাস্যাদি ব্রত, দেবার্চ্চন, পিতৃপূজা, অতিথিসেবা প্রভৃতি করণীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সাগ্নিক তরুতলে বাস, অষ্টগ্রাস পর্য্যন্ত ভিক্ষা, অন্তর্যজন, এবং তৃতীয় অবস্থায় বায়ুভক্ষণবৃত্তি প্রভৃতি। এইরূপে মমত্ব লুপ্তপ্রায় হইলে সন্ন্যাস গ্রহণীয়। (মনুসংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা তৃতীয়াধ্যায়—বানপ্রস্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ইহা ক্রমসন্ন্যাস। আপস্তম্বাদিমতে চতুরাশ্রমই যথাক্রমে অবশ্য পালনীয়।

শ্রুতিতে সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বিতীয় কল্প।

যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহদ্বা, বনাদ্বা, অথ ব্রতী বা পুনরাব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিঃ অনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। (জাবালোপনিষৎ ৪র্থ খণ্ড)

অক্রম সন্ন্যাস

অনিয়ত সন্ন্যাসের ধারা অন্যরূপ (বিরক্ত হইলে) ব্রহ্মচর্য্য হইতে, পক্ষান্তরে গৃহস্থাশ্রম হইতে কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস লইবে। জন্মাবধি অধ্যয়নাদিব্রত পালনান্তে, কিংবা ব্রতাদি পালন না করিয়া, বিদ্যাব্রত সমাপন পূর্ব্বক সমাবর্ত্তনের জন্য স্নাত হইয়া, কিম্বা ঐরূপ স্নাত না হইয়া, পত্নীমরণে নিরগ্নি কিংবা পত্নী গ্রহণ ও অগ্ন্যাধান না করিয়া, এমন কি যে দিন বৈরাগ্য উদিত হইবে, সেদিন সন্ন্যাস লইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি এইরূপ সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। ইহা যুক্তিসঙ্গত। যদি ব্রহ্মচর্য্যপালনেই কিম্বা গার্হস্থ্য অবলম্বনেই কিম্বা স্বতঃ কাহারও শমদমাদি জাগিয়া বৈরাগ্য উদিত হয়, তিনি কেন সংসারে থাকিবেন ?

এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতে আতুর সন্ন্যাস নির্দ্দিষ্ট। তাহা বীরাধ্বানে, অনাশকে, জলপ্রবেশে, অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে ঘটিতে পারে।

যস্তু শাস্ত্রমনুস্মৃত্য বীর্য্যবান্ বাহিনীমুখে।
সম্মুখে বর্ত্ততে শূরঃ স স্বর্গান্ন নিবর্ত্ততে॥
বীরশয্যা চ বীরাধ্বা, বীরাসনস্থিতিঃ স্থিরা॥ অগ্নিপুরাণে

যে বীর শাস্ত্রানুসারে সন্মুখসমরে দেহপাত করেন তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হন। তাঁহার আচরণের নাম বীরাধ্ব, বীরশয্যা বা বীরাসনস্থিতি। তিনিও শরীরে নির্ম্মম সুতরাং সন্ন্যাসী। অনাশকাদির বর্ণনা আদিত্যপুরাণাদিতে আছে। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্থ বা মহাপাতকদূষিত হইয়া স্বীয় দেহপাতের সময় আসন্ন হইলে, স্বর্গাদি কামনায় অনশনে অগ্নিপ্রবেশে বা জলনিমজ্জনে বা উচ্চস্থান হইতে প্রপতন দ্বারা কিম্বা হিমালয়াদিতে মহাপ্রস্থান করতঃ দেহত্যাগ করেন তিনিই আতুর সন্ন্যাসী।

আতুর সন্ন্যাস

উপনিষদে জ্ঞানকর্ম্মানুসারেও সন্ন্যাসের ভেদ প্রদর্শিত—যথা জ্ঞান-সন্ন্যাস, বৈরাগ্য-সন্ন্যাস, কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও জ্ঞান-বৈরাগ্যসন্ন্যাস। পুরাণেও অনুরূপ ভেদ আছে।

জ্ঞান সন্ন্যাসাদি

যঃ সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ।
উচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ॥
বেদমেবাভ্যসেৎ নিত্যং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
উচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্ষুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
যস্তগ্নিমাত্মসাৎ কৃত্বা ব্রহ্মার্পণপরো দ্বিজঃ।
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং জ্ঞানীত্বভ্যধিকো মতঃ।
ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ॥

—কূর্ম্মপুরাণে ২৮ অ০।

যিনি সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিসর্ব্বদ্বন্দ্বসহ, নির্ভীক এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত তাঁহাকে জ্ঞানসন্ন্যাসী বলে। যিনি জিতেন্দ্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া নিত্যই বেদাভ্যাস করেন তিনি বেদসন্ন্যাসী। যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ছাড়িয়া সমস্তই ব্রহ্মার্পণ করতঃ সর্ব্বদা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী। ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোন কার্য্য নাই, বাহ্যবেশাদি চিহ্নও নাই। তিনিই যথার্থ বিদ্বান্।

গীতাতেও কর্ম্মসন্ন্যাস (৫ অ০ ২ শ্লো০) এবং যোগসন্ন্যাস (৪ অ০

১ শ্লো॰) এবং উভয়ের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত (৫ অ॰ ৪ শ্লো॰)। কর্ম্মসন্ন্যাস শব্দে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগ (১২ অ॰ ৬ শ্লো॰) বা নৈষ্কর্ম্ম (১৮ অ॰ ৪৯ শ্লো॰) বুঝায়। যোগসন্ন্যাসের নামান্তর কর্ম্মযোগ (৫ অ॰ ২ শ্লো॰)। ইহার অর্থ শ্রীভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মকরণ।

গীতায় সন্ন্যাস

শ্রৌত সন্ন্যাস গ্রহণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার যথা—প্রাজাপত্যেষ্টি বা আগ্নেয়ীষ্টি বা ত্রৈধাতবীয়েষ্টি করতঃ সমন্ত্রক আগ্ন্যাঘ্রাণ পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নিসমারোপণ অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগ। অগ্নি না থাকিলে অপ্ হোম করতঃ সমন্ত্রক পাত্র হইতে সাজ্যচরুভোজন। শেষে শিখাসূত্রত্যাগ। আতুরসন্ন্যাসেও সমর্থপক্ষে ঐরূপ বাহ্যানুষ্ঠান, অসমর্থপক্ষে উক্ত অনুষ্ঠান মানসিক। স্মৃতি মতে সার্ব্ববেদ সদক্ষিণ-প্রাজাপত্যেষ্টি করতঃ আত্মাতে অগ্নিসমারোপণপূর্ব্বক বোধায়নাদ্যুক্ত পুরশ্চরণ ও শ্রাদ্ধাদি বিধেয়।

বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ পদ্ধতি

জাবালোপনিষৎ সন্ন্যাসীকে শ্রেণীদ্বয়ে বিভাগ করিয়াছেন,—পরিব্রাট্ ও পরমহংস। পরিব্রাটের লক্ষণ যথা—

জাবালমতে

অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি। ৫ম খণ্ডে।

পরিব্রাট্

গৈরিকবসন, মুণ্ডিতকেশ, স্ত্রীসঙ্গত্যাগী, বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্ন অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, আদ্রোহী, ভিক্ষাজীবী হইলে পরিব্রাট্ ব্রহ্মলাভ করিবেন। তাঁহার ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য, জলপবিত্র প্রভৃতি সম্ভার ন্যায্য।

পরমহংসের পরিচয় যথা—

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং পাত্রং শিক্যং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎসর্ব্বং ভূঃস্বাহেতি অপ্সু পরিত্যজ্য আত্মানমন্বিচ্ছেৎ যথাজাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্ত্বব্রহ্মমার্গে সম্যক্-সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রো, লাভালাভে সমোভূত্বা * * * * অনিকেতবাসাপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠঃঅশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি। —জাবালোপনিষৎ ৬ খণ্ডে

পরমহংস

পরিব্রাজ্য নিয়ম পালনে ত্যাগ বদ্ধমূল হইলে সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডাদিও ত্যাগ করিবেন। কেবল ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকিবেন। তখন তিনি জন্মকালের ন্যায় উলঙ্গ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্পরিগ্রহ এবং শুদ্ধ। প্রাণধারণের জন্য একটি মাত্র গৃহস্থের বাটীতে শাস্ত্রোক্ত কালে অনাসক্তভাবে ভিক্ষা করিবেন। ঐ ভিক্ষাও পাত্রে লইবেন না। তিনি মুখ ব্যাদান করিলে গৃহস্থ যথাশক্তি কিঞ্চিৎ আহার তাঁহার মুখে দিবেন। ইহার নাম উদরপাত্র। লাভালাভে, ইষ্টানিষ্টে তিনি সমবুদ্ধি হইবেন। আত্মনিষ্ঠ হইয়া প্রাক্তনসংস্কার নির্মূলন করিবার প্রয়াস পাইবেন। বাসনা ক্ষয় হইলে দেহত্যাগ করিবেন। পরমহংসের উন্নতস্তরে নিয়মের তাদৃশ বন্ধন নাই।

তত্র পরমহংসা নাম সম্বর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতুদুর্ব্বাসঋভুনিদাঘ জড়ভরত-দত্তাত্রেয়-বৈতরকপ্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গাঅব্যক্তরূপা অনুন্মত্তাঃ উন্মত্তবদাচরন্তঃ।

—জাবালোপনিষৎ ৫ম খণ্ডে

ঐ পরমহংসগণের মধ্যে সম্বর্ত্তক প্রভৃতি চরমোন্নতগণের বেশ ও আচার আশ্রমবিরুদ্ধ। তাঁহারা উন্মত্ত না হইলেও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করেন। সম্বর্ত্ত প্রাক্তনসিদ্ধ। তিনি কোন আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

অপি চ স্মর্য্যতে। ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৮

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং নগ্নচর্য্যাদিযোগাৎ অনবেক্ষিতকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে। —শঙ্করভাষ্য।

সম্বর্ত্তাদি অব্যক্তাচার

অরুণপুত্র শ্বেতকেতু দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করতঃ অধ্যয়নহেতু পাণ্ডিত্যাভিমানপূর্ণ হইয়া গৃহে সমাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে পিতা জিজ্ঞাসা করেন—বৎস! এমন কি শিক্ষা করিয়াছ যাহা জানিতে পারিলে সর্ব্ব বিষয় জানা যায়। তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না। পুনরায় গুরুগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। তখন অরুণ শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মোপদেশ দিলেন। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই মহাবাক্য ঐ শ্বেতকেতুতেই প্রযুক্ত।

দুর্ব্বাসা অত্যন্ত কোপনস্বভাব, রুদ্রের অবতার। ঋভু ব্রহ্মার পুত্র। নিদাঘ ব্রহ্মনন্দনপুলস্ত্যের পুত্র, দেবিকাতীরবাস্তব্য ঋভুর শিষ্য। জড়ভরতাদি পুরাণপ্রসিদ্ধ। দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর অবতার, কার্ত্তবীর্য্যের গুরু, স্ত্রীমদিরাসেবী, কৌলাচারী।

সন্ন্যাসোপনিষদে সন্ন্যাসী ছয় প্রকার—কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত। কুটীচক সন্ন্যাসীর প্রথমাবস্থা। তখন শিখাসূত্র, গৃহেবাস, পিতৃশুশ্রূষাদি আছে। বহূদক দ্বিতীয় দশা। তিনিও শিখাসূত্রধারী, গৃহবাসী। মধ্যে মধ্যে তীর্থভ্রমণাদি করেন। ক্রমশঃ মমত্ব ক্ষীণ হইলে হংসত্বপ্রাপ্তি। তখনও শিখাসূত্র থাকিতে পারে। আর উন্নত হইলে পরমহংস। তখন শিখাসূত্র-ত্যাগ অর্থাৎ দেবার্চ্চন, পিতৃক্রিয়াদি সর্ব্ববিধ গৃহস্থ কৃত্যের অবসান। তুরীয়াতীত সর্ব্বত্যাগী, দিগম্বর, দেহমাত্রাবশিষ্ট। তিনিও বিধিনিষেধের অধীন। "অবধূতস্তনিয়ম"। অবধূতই চরম সন্ন্যাসী। তিনি বিধির কিঙ্কর নহেন। নারদ পরিব্রাজকাদিতেও এইরূপ সন্ন্যাসীভেদ। পরমহংসোপনিষদে সন্ন্যাসীর নাম পরমহংস। তাঁহার দুই শ্রেণী। পরমহংসের সুবর্ণাদি পরিগ্রহ নাই। কোন কোন শ্রুতি সন্ন্যাসীর সঞ্চয়ও স্বীকার করেন। অবধূতোপনিষদে অবধূতের ভোগও স্বীকৃত।

সন্ন্যাসোপনিষদাদির মতে কুটীচকাদি

অবধূত

শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিতে গেলে কুটীচক, বহূদক ও হংস পরিব্রাট্‌শ্রেণী-ভুক্ত; পরমহংস ও তুরীয়াতীত পরমহংসের প্রথম ও দ্বিতীয়, অবধূত পরমহংসের অন্তিম অবস্থা। পরিব্রাট্ অল্পবিস্তর সঞ্চয়, দেবার্চ্চন শিষ্যসংগ্রহাদি করিতে পারেন।

শ্রুতিসমন্বয়

পরিগ্রহ

কালান্তরোপভোগার্থং সঞ্চয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শুশ্রূষালাভপূজার্থং যজ্ঞার্থং বা পরিগ্রহঃ।
শিষ্যাণাং প্রতি কারুণ্যাৎ শিষ্যসংগ্রহ ঈরিত॥

—সন্ন্যাসোপনিষৎ

পরমহংসের প্রথম দশায় কৌপীনাদি যথাসম্ভব সম্ভার এবং স্বাধ্যায় থাকিবে। তাঁহার দ্বিতীয় দশার চিত্র যথা—

আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারঃ ন নিন্দা ন স্তুতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুঃ। নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রং ন ধ্যানং নোপাসনং ন চ লক্ষ্যং নালক্ষ্যং নাপৃথক্, নাহং ন ত্বং ন সর্ব্বং চ, জ্ঞানস্থিতিরেব ভিক্ষুঃ। —পরমহংসোপনিষৎ

ভিক্ষু দিগম্বর। তাঁহার নমস্কার অর্থাৎ দেবার্চ্চন নাই, স্বধাকার অর্থাৎ পিতৃকৃত্য নাই। তাঁহার স্তুতিনিন্দায়, আবাহন-বিসর্জ্জনে সমজ্ঞান। তাঁহার মন্ত্রজপ ধ্যান বা উপাসনার আবশ্যকতা নাই। তাঁহার কোন পার্থিব বিষয়ে

লক্ষ্য অলক্ষ্যও নাই। কি নির্জ্জনে কি জনসঙ্ঘে তিনি সমান থাকিবেন। তাঁহার আমি তুমি জ্ঞান নাই, বাহ্যজ্ঞানও নাই। ভিক্ষু জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ।

পাছে তাঁহার পতন হয় তজ্জন্য শ্রুতি তাঁর স্বর্ণাদি-পরিগ্রহ ও শিষ্যসংগ্রহ ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করিতেছেন।

সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং নাবলোকং চ। অবাধকঃ ক ইতি চেৎ বাধকোঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ স ব্রহ্মহা ভবতি।

—পরমহংসোপনিষৎ

ভিক্ষু কিছুতেই স্বর্ণাদি লইবেন না এবং লোকসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন। যদি বল তিনি ব্রহ্মবিৎ, তাঁহার পক্ষে আবার বাধক বা নিষেধ কি আছে? তদুত্তর এই যে তাঁহারও বাধক নিশ্চয়ই আছে। কারণ ভিক্ষু স্বর্ণকে রসের সহিত অর্থাৎ আসক্তির সহিত দেখিলেও তিনি ব্রহ্মঘাতী হন ইত্যাদি।

নিষ্পরিগ্রহ

তৃতীয় স্তরের পরমহংস বা অবধূত বিধিনিষেধের কিঙ্কর নহেন। তাঁহার ত্যাগ ও ভোগ উভয়ই তুল্য। ভোগ দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। তাঁহার ভোগ আসক্তিশূন্য। যথা—

রবিঃ সর্ব্বরসান্ প্রভুঙ্‌ক্তে হুতাশনশ্চাপি হি সর্ব্বভক্ষ্যঃ।
তথৈব যোগী বিষয়ান্ প্রভুঙ্‌ক্তে ন লিপ্যতে পুণ্যপাপৈশ্চশুদ্ধঃ॥

—অবধূতোপনিষৎ।

যেমন সূর্য্য কটু অম্লমধুরাদি ষড়রস আকর্ষণ করিয়াও বিকৃত হন না; যেমন হুতাশন পূতাপূত সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ অর্থাৎ ভস্মীভূত করিয়াও অপবিত্র হন না; তেমন যোগী অর্থাৎ অবধূত বিষয় উপভোগ করেন কিন্তু পাপপুণ্যে স্পৃষ্ট হন না। তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ।

নির্লিপ্তভোগ

গীতায় সন্ন্যাসীর নিত্যকর্ম্ম বিহিত কিন্তু তাহা ফলকামনাশূন্য হওয়া চাই।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ৬ষ্ঠ অ০ ১ম শ্লো০

যিনি ফল কামনা না করিয়া নিত্য কর্ম্ম করেন তিনি কর্ম্মযোগী ও সন্ন্যাসী। অগ্নিত্যাগী বা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
যজ্ঞোদানংতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে কর্ম্ম যখন দোষযুক্ত অর্থাৎ অদৃষ্টফলদ ও ক্ষয়ি, তাহা সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাজ্য। অপর পণ্ডিতগণ বলেন যে যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। এই দুই মতের সমাধান ভগবান্ এই করিয়াছেন যে যজ্ঞদানতপঃ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়।

ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৫অ০ ১০শ্লো০

যিনি ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন তাঁহার কর্ম্মফলে পাপ পুণ্য স্পর্শ হইতে পারে না। ইহা যুক্তিযুক্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইলে, আমার বলিয়া জ্ঞান না থাকিলে আমি সেই কর্ম্মফল কেন পাইব? যদি বলেন অগ্নিতে অঙ্গুলি না জানিয়া দিলেও অঙ্গুলি কি দগ্ধ হয় না? উত্তর এই যে অগ্নিও ব্রহ্ম, অঙ্গুলিও ব্রহ্ম, দহনও ব্রহ্ম, অনুভবও ব্রহ্মের—এই জ্ঞান হইলে দাহজনিত দুঃখানুভব আসিতে পারে না। ঐরূপভাবে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, তৎফলে জ্ঞাননিষ্ঠা বা ব্রহ্মলাভ। সুতরাং গীতার মতে চতুর্থাশ্রমীমাত্র সন্ন্যাসী নহেন। যে কেহ অধ্যাত্মচেতা হইয়া নিত্যকর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী। এইরূপ ভাবে যিনি কর্ম্ম না করেন তিনি সন্ন্যাসী নহেন। কর্ম্মফলসন্ন্যাসই সন্ন্যাস, কর্ম্মসন্ন্যাস সন্ন্যাস নহে। কর্ম্মফলসন্ন্যাসের ফলে শেষে কর্ম্মসন্ন্যাস আসিবে। ঐ অবস্থায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

গীতার সন্ন্যাসী

স্মৃতিতে সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু, যতি, মুনি ইত্যাদি। কুটীচকাদির অবান্তর ধর্ম্মভেদ স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। যতির পালনীয় ধর্ম্ম যথা—

সর্ব্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥

অপ্রমত্তশ্চরেৎ ভিক্ষাং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ॥
সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ বিহায় চ।
ভয়ং মৃতী হ্বত্বা চ ভূতানামমৃতীভবতি দ্বিজ॥
কর্ত্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেণ বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বাতন্ত্রকরণায় হি॥

—যাজ্ঞবল্ক্যে ৩য় অধ্যায়ে যতিপ্রকরণে

যতি সর্ব্বভূতহিতে রত এবং শমাদিগুণসম্পন্ন। তাঁহার বাহ্য সম্ভার ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু। তিনি সর্ব্বত্যাগী, আত্মারাম। কেবল ভিক্ষার জন্য প্রত্যহ সায়াহ্নে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া গ্রামে আসেন। কোন প্রমাদের কার্য্য করেন না। প্রাণযাত্রার উপযোগী ভিক্ষা গ্রহণ করেন। আশ্রমপীড়া না হয় সেইজন্য যে গ্রামে বহু ভিক্ষুক আছে সে গ্রামে যান না। তিনি সর্ব্বথা ইন্দ্রিয়সংযমী হন। আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ভিক্ষুর বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তিনি প্রাণায়াম, গায়ত্রীজপ, ধ্যানধারণাদি ও তপশ্চরণ, স্বাধ্যায়াদি করেন (মনুসংহিতার ৬ষ্ঠ অঃ)। মান লাভকে তিনি বিষবৎ দেখেন। তাঁহার শিষ্যসংগ্রহ নাই, পরধর্ম্মে উপেক্ষা নাই, বাগ্‌বিতণ্ডা নাই। তিনি স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান, সর্ব্বজীবে সমদর্শন। অষ্টাঙ্গমৈথুন তাঁহার বর্জ্জনীয়। স্ত্রীচিত্র পর্য্যন্ত তাঁহার দ্রষ্টব্য নহে।

স্মার্ত্ত সন্ন্যাসী

ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাং চ ন স্পৃশেৎ যঃ স ভিক্ষুকঃ। যতিধর্ম্মনির্ণয়ে।

যতির পরিগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা—

কৌপীনাচ্ছাদনং বাসো কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥

যতি লজ্জানিবারণের জন্য কৌপীন, শীতনিবারণের জন্য একখানি কন্থা ও পাদুকাযুগল লইবেন, তদধিক লইবেন না। মিতাক্ষরাধৃতবচনমতে তিনি অধ্যাত্মপুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারেন। যতির মঠাধিপত্য নাই।

সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী যতির্যদি মঠাধিপঃ।
তস্যৈব নিষ্কৃতি র্নাস্তি চাণ্ডালাৎ জনগর্হিতা॥ হেমাদ্রিধৃত দেবলবচনম্।

যতি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। যদি তিনি লোভে মঠাধিপতি হন তাঁহার নিষ্কৃতি নাই ; সর্ব্বজননিন্দিত চণ্ডাল অপেক্ষা তিনি হীন হন।

যতির ব্রত ও উপব্রত—

অহিংসা সত্যমস্তেয্যং মৈথুনস্য চ বর্জ্জনম্। প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতবচনম্।

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য ও অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জ্জন যতির ব্রত। অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, অপ্রমাদ, শৌচ ও আহার শুদ্ধি যতির উপব্রত।

ব্রতোপভঙ্গে যতির পাতক—

মঞ্চকং শুক্লবস্ত্রং চ স্ত্রীকথা লৌল্যমেব চ।
দিবাস্বাপশ্চ যানং চ যতীনাং পততানি ষট্॥

—যতিধর্ম্মনির্ণয়ধৃত বচনম্।

খট্বায় শয়ন, শুক্লবস্ত্রপরিধান, রমণীবিষয়িণী কথা, তৎ সঙ্গমে লোভ, দিবসে নিদ্রা, যানারোহণ, এই ছয়টি যতির পাতক।

পাতকবিশেষে যতির প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ বিহিত। প্রায়শ্চিত্তের ফল সম্বন্ধে স্মৃতির মতভেদ আছে। পাপের শক্তি দ্বিবিধা—নরকোৎপাদিকা, ব্যবহার-বিরোধিকা। মিতক্ষরাদি মতে জ্ঞানকৃতপাপে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নরকোৎপাদিকা-শক্তির নাশ হয় না, ব্যবহারবিরোধিকাশক্তির নাশ হয়। অজ্ঞানকৃতপাপে প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই নষ্ট করে।

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে॥

—যাজ্ঞবল্ক্যে ৩ অ০ ২২৬ শ্লো০।

রঘুনন্দন "ব্যবহার্য্য" এই পাঠের পরিবর্ত্তে "অব্যবহার্য্য" পাঠ ধরিয়া বলেন যে মহাপাতকাদিতেও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পারত্রিক শুদ্ধি হয়, ঐহিক শুদ্ধি হয় না। ভবদেবমতে উক্ত বচনে অব্যবহার্য্যপদ নিন্দার্থক। শূলপাণি ব্যবহার্য্য ও অব্যবহার্য্য উভয়বিধ পাঠ ধরিয়াছেন। তন্মতে ব্যবহার্য্য পাঠের অর্থ এই যে অজ্ঞানকৃতপাপে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জ্ঞানকৃতপাপের ক্ষয় হয় না কিন্তু ব্যবহার্য্য মাত্র হয়।

যতির প্রায়শ্চিত্ত

ঐরূপ অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে অর্দ্ধ পাপ ক্ষয় হয় ও তদনুষ্ঠাতার সহিত সম্ভাষণ-স্পর্শনাদি লঘু ব্যবহার দোষের হয় না। অব্যবহার্য্য পাঠের তিনি এইরূপ

অর্থ করেন যে শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তকরণে পাপক্ষয় নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ব্যবহার্য্য হয় না।

সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ করতঃ পুনরাবর্ত্তন বা পুনগার্হস্থ্যাশ্রমগ্রহণ অর্থাৎ দার-পরিগ্রহ করিলে যতির আরূঢ়পতিত এই সংজ্ঞা হয়। আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে,—ব্রতোপব্রত ভঙ্গেও যতি আরূঢ়পতিত হন। তাহা সমীচীন বোধ হয় না।

উত্তমাং বৃত্তিমাশ্রিত্য পুনরাবর্ত্তয়েৎ যদি।
আরূঢ়পতিতো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

—যতিধর্ম্মধৃতমনুবিষ্ণুবচন।

আরূঢ়পতিতের নামান্তর প্রব্রজ্যাবসিত, স্বধর্ম্মচ্যুত। আরূঢ়পতনের নাম প্রত্যাবর্ত্তন, অবরোহ, প্রত্যাপত্তি ইত্যাদি। মিতাক্ষরামতে প্রত্যাপত্তির

আরূঢ়পতিত

অর্থ গার্হস্থ্যাশ্রম পরিগ্রহ। "প্রত্যাপত্তির্গার্হস্থ্যাশ্রম-পরিগ্রহঃ (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে ২৮০ শ্লোক)। শঙ্করাচার্য্যমতে আরূঢ়পতিত সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্তফলে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ঘটে কিন্তু ঐহিক শুদ্ধি বা ব্যবহার্য্যতা হয় না।

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ। —ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৪৩। শঙ্করভাষ্য দ্রঃ।

ইহার অনুকূল শ্রুতি—"অরণ্যমীয়াৎ ন পুনরেয়াৎ" অরণ্যে যাইবে অর্থাৎ সন্ন্যাস লইবে। তাহা হইতে পুনরায় গার্হস্থে আসিবে না। শাস্ত্রে আরোহ অর্থাৎ উর্দ্ধগতি বা উর্দ্ধাশ্রমপ্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে, অবরোহ বা উর্দ্ধাশ্রম হইতে নিম্নাশ্রমপ্রাপ্তির বিধান নাই।

প্রব্রজ্যাবসিতের দণ্ড বিপ্রের পক্ষে নির্ব্বাসন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দাসত্ব।

প্রব্রজ্যাবসিতা যত্র ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নির্ব্বাসং কারয়েৎ বিপ্রং দাসত্বং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যে ২য় অ০ ১৮৩ শ্লো০

প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত বচন তথা।

এ স্থলেও মিতাক্ষরার মত যে প্রায়শ্চিত্ত না করিলেই ঐরূপ দণ্ড। যতি সন্ন্যাসশ্রম ত্যাগ করিয়া তৎ পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তিনি দণ্ডার্হ নহেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতঃ প্রব্রজ্যাসিত হইবার পর গৃহীত পত্নী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। দক্ষের মতে যিনি পারিব্রাজ্য

বা সন্ন্যাস লইয়া স্বধর্ম্মে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে না থাকেন অর্থাৎ পুনরায় গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করেন, রাজা তাঁহার ললাটে কুক্কুরের নখ অঙ্কিত করিয়া নিষ্কাশিত করেন।

পারিব্রাজ্যং গৃহীত্বা তু যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি।
শ্বপদেনাঙ্কয়িত্বা তং রাজা শীঘ্রং বিবাসয়েৎ॥
—দক্ষ সংহিতা ৭ম অ০ ৩৪ শ্লো০

প্রব্রজ্যাপালনের ফল—

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণেবাবতিষ্ঠতে॥ —মনু ৬ষ্ঠ অ০

এইরূপ বিধিনিষেধপরিপালনপূর্ব্বক ধীরে সকল অঙ্গ ত্যাগ করিয়া শীতোষ্ণাদি সর্ব্বদ্বন্দ্বপরিহার করিলে যতি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

সন্ন্যাসের ফল

উপরোক্ত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সন্ন্যাসী কলিযুগের প্রারম্ভে যে অত্যন্ত বিরল হইয়াছিলেন তাহা উর্দ্ধরেতসাশ্রম সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে জৈমিনিবাদরায়ণের বিপ্রতিপত্তিতে ব্যক্ত। শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের প্রথম কথোপকথনেও বুঝা যায় যে কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ একরূপ অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কলিযুগে শ্রৌত সন্ন্যাস

বৃহন্নারদীয়াদি পুরাণে কলিকালে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে নিষেধও বর্ত্তমান যুগে শ্রৌত সন্ন্যাসের অনুপযোগিতার ও বিরলতার সাক্ষ্য দিতেছে। শঙ্করাচার্য্য কলিকালে সন্ন্যাসের পুনঃ প্রবর্ত্তক। তাঁহার প্রয়াসেও বৈদিক সন্ন্যাসীর পূর্ণ ত্যাগ আসে নাই। আচার্য্য স্বয়ং যথাজাতরূপধর, উদর পাত্র, বাদবিতণ্ডাশূন্য পরধর্ম্মঘট্টনপরীহারী তুল্যনিন্দাস্তুতি ছিলেন না। তাঁহার শিষ্যবর্গ মঠাধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এখনও গোবর্দ্ধনাদিমঠের জগদ্গুরু শঙ্কর শ্রৌতসন্ন্যাসীর ত্যাগ লন নাই। তাঁহাদের স্বর্ণ ছত্র, রৌপ্য পাদুকা, সিংহাসন, হস্তিঅশ্বযানবাহনাদি, শিষ্য সেবক দাস প্রভৃতি শ্রৌত সন্ন্যাসের বিরোধী। কলির সন্ন্যাস মুখ্য নহে, ভক্তি। স্মৃতিমতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পক্ষে কলিকালে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ।

কলিতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসই সম্ভবপর এবং সম্প্রচলিত। শঙ্কর সম্প্রদায়ের

যোগ-ভোগ তান্ত্রিক-সন্ন্যাসপ্রভাবের পরিচায়ক। অধিকাংশ তন্ত্রমতে কলিতে বৈদিক সন্ন্যাস বা দণ্ড ধারণ নাই।

তান্ত্রিক সন্ন্যাস

মহানির্ব্বাণাদি মতে বর্ত্তমান যুগে আশ্রম দুই,—গার্হস্থ ও ভৈক্ষুক। বর্ণ পাঁচ,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সামান্য। জাতমাত্র মনুষ্য গৃহস্থসংস্কারগ্রহণে গার্হস্থাশ্রমী। ভৈক্ষুকাশ্রমের নামান্তর অবধূতাশ্রম। তন্ত্রোক্তপদ্ধতিমতে অবধূতাশ্রমগ্রহণের নাম সন্ন্যাসগ্রহণ। সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু, যতি ও অবধূত।

গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চাপি আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি বা প্রিয়ে ॥ ৮ ॥
ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্ত দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥
শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১

—মহানির্ব্বাণে ৮ উ॰।

নির্ব্বাণতন্ত্রমতে সন্ন্যাস দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য সন্ন্যাসে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। তাহাতে দণ্ড ধারণ আছে। গৌণ সন্ন্যাস সর্ব্ববর্ণপর। তাহাতে দণ্ড ধারণ নাই। মুখ্য সন্ন্যাসীর নাম সন্ন্যাসী, গৌণ সন্ন্যাসীর নাম অবধূত। অবধূতের সাধারণতঃ বাহ্য লিঙ্গ—লম্বিতকেশ, রুদ্রাক্ষমালা, সিন্দুর-বিন্দু প্রভৃতি (নির্ব্বাণতন্ত্রের ১৩ পটল ও ১৪ পটল দ্রষ্টব্য)। যোগিনীতন্ত্রমতে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাসাশ্রম। তদ্-গ্রহণে সর্ব্ববর্ণের অধিকার থাকিলেও শূদ্রাবধূত ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা ভৈরবী গ্রহণ করিতে পারেন না (যোগীতন্ত্রে ৬ষ্ঠ)। কুলার্ণবাদিতে যে কৌলের পক্ষে সন্ন্যাসব্রতধারণ নিষিদ্ধ তাহা শ্রৌত সন্ন্যাসপরব্যাখ্যেয়।

তন্ত্রেও সন্ন্যাস গ্রহণের কাল দ্বিবিধ। প্রথম গার্হস্থসমাপনান্তে, দ্বিতীয় বৈরাগ্যোৎপত্তিতে। গার্হস্থাশ্রমধর্ম্মপালনে ইন্দ্রিয়সংযমাদি হয়, এবং তদপালনে সমাজের ক্ষতি। সুতরাং গার্হস্থ যথাবিধি পালনীয়। কিন্তু বৈরাগ্যই যখন সন্ন্যাসের মূল সুতরাং তন্ত্রও বৈরাগ্যোদয়ে সন্ন্যাস স্বীকার করেন।

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥

—মহানির্ব্বাণে অ০ ১৫ শ্লো০

জন্মিবামাত্র মনুষ্য গৃহস্থ হন কিন্তু দশবিধ সংস্কারের কোন সংস্কার পাইলে গৃহস্থাশ্রমী হন। হে মহেশ্বরি! প্রথমে গৃহস্থধর্ম্ম পালনীয়। কিন্তু যখনই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয় তখন সকল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসশ্রম গ্রহণীয়। প্রথম শ্লোকটীতে ক্রম সন্ন্যাস, দ্বিতীয়টীতে অক্রম সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে।

সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদ্গচ্ছেৎ নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

—মহানির্ব্বাণে ৮ম অ০ ২২৫ শ্লো০

গৃহধর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শত্রুগণকে পরিতুষ্ট করিয়া মমতাশূন্য নিষ্কাম হইয়া বিশেষরূপে ইন্দ্রিয় জয় ঘটিলে গৃহ ত্যাগ করণীয়। এইরূপ বচন ক্রম-সন্ন্যাসপর অক্রম সন্ন্যাসের বাধক নহে।

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাং।
ত্যক্ত্বাসর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রবজন্নারকী ভবেৎ ॥

—মহানির্ব্বাণে ৮ম অ. ২২৩ শ্লো.

বৃদ্ধ পিতামাতাকে, শিশুসন্তানকে, ধর্ম্মপত্নীকে, অসমর্থ বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলে নরকে যায়।

এই বচন ও অনুরূপ রচনাবলী ক্রমসন্ন্যাসের স্তুতিমাত্র; কারণ প্রতিপালনে অসমর্থ বন্ধু বা আত্মীয়কে ত্যাগ করিয়া যদি সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে কাহারও সন্ন্যাস সম্ভবপর হয় না।

এইরূপ ক্রমসন্ন্যাসের অর্থবাদ নারদ পরিব্রাজকাদি শ্রুতিতেও প্রদত্ত। শ্রৌতসন্ন্যাসের অক্রমত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং তন্ত্রেরও ক্রমসন্ন্যাসার্থবাদ অক্রমত্ব নিষেধক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আর মহানির্ব্বাণ বা নির্ব্বাণ-তন্ত্রের আপাততঃ গার্হস্থ্য প্রতিপাদনপর বচনের যথাশ্রুতার্থ ধরিলেও উপনয়ন সংস্কার দ্বারাই মহানির্ব্বাণমতে গৃহস্থাশ্রমিতা প্রাপ্তি। দারগ্রহণই গার্হস্থ্য প্রাপক নহে।

ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্।
প্রাপ্তা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয় ॥

—মহানির্ব্বাণে ৯ম অ. ২২২ শ্লো.

আচার্য্য উপনেতব্য মানবকে জিজ্ঞাসা করিবেন তোমার কি আশ্রম? মানবক আচার্যের পদযুগল ধারণ করতঃ বলিবেন আমাকে আশ্রমী করুন। আচার্য্য তখন তাঁহাকে সব্যাহৃতি গায়ত্রী দিয়া বলিবেন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে তোমার শরীর পবিত্র হইয়াছে। আর তোমার ব্রহ্মচর্য্যবেশের আবশ্যক নাই, তুমি তাহা পরিত্যাগ কর। তুমি গৃহস্থাশ্রম পাইয়াছ। সেই আশ্রমের বিহিত পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি কর।

উপনয়নে গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্তি

নির্ব্বাণতন্ত্রে ১৩ পটলে মুখ্য সন্ন্যাসগ্রহণ পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত। ঐ বিধি গৌণসন্ন্যাসেও প্রযোজ্য। অবধূতাশ্রমধারণের জন্য শৈবসংস্কারবিধি মহানির্ব্বাণের অষ্টমোল্লাসে লিখিত। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—দৈবতর্পণ, পিতৃতর্পণ, ঋষিতর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ, আত্মশ্রাদ্ধ, ত্র্যম্বকমন্ত্র-জপ, ব্যাহৃতিহোম, প্রাণহোম, তত্ত্বহোম, শিখাসূত্রহোমাদি ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকের সন্ন্যাসগ্রহণে উক্ত অনুষ্ঠানাদির আবশ্যকতা নাই। কেবল নিজমন্ত্রে শিখাচ্ছেদ।

তান্ত্রিক সন্ন্যাস পদ্ধতি

অবধূত প্রথমতঃ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। ব্যক্তাবধূতের শাস্ত্রোক্ত বাহ্যলিঙ্গ থাকিবে। অব্যক্তাবধূতের বেশ গৃহস্থবৎ। অবধূত গৃহেও থাকিতে পারেন, গৃহত্যাগও করিতে পারেন। গৃহস্থিত অবধূতের নাম গৃহানুগ। গৃহত্যাগীর নাম চিতানুগ। কোন কোন তন্ত্রে অবধূতকে যতি ও যোগী বলা হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্রে যোগীশব্দে ষট্‌চক্রভেদক পশ্বাচারী যোগী মাত্র বুঝায়। নিরুত্তরতন্ত্রে যোগী বা অবধূত ত্রিবিধ—ভক্ত, সালম্ব ও নিরালম্ব। মহানির্ব্বাণে অবধূতের ভেদ প্রথমতঃ জ্ঞানতারতম্যানুসারে। জ্ঞানদুর্ব্বল স্বজাতিচিহ্ন রাখিয়া গৃহে থাকিয়া আত্ম-শোধনের জন্য জ্ঞান সাধন করিবেন (১৪ উ. ১৫০-৫১ শ্লো.)। মহানির্ব্বাণে অবধূতের অন্য চারিপ্রকার ভেদ দেখা যায়। আদৌ ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূত। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মাবধূত। শক্তিমন্ত্রোপাসক পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া সন্ন্যাস লইলে শৈবাবধূত। তন্ত্রান্তরে শৈবাবধূতের নাম

অবধূতভেদ

শাক্তাবধূত বা কৌলাবধূত। পূর্ণাপূর্ণভেদে ব্রাহ্ম ও শৈব অবধূত আবার দ্বিপ্রকার! অপূর্ণের নামান্তর পরিব্রাট্, পূর্ণের নাম পরমহংস। পরিব্রাট্ গৃহী বা উদাসীন। পরমহংস সন্ত্যক্তগৃহ।

—মহানির্ব্বাণে ১৪ উ. ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ শ্লো.।

শৈবপরিব্রাট্, ব্রাহ্মপরিব্রাট্ শৈবপরমহংস, ব্রাহ্মপরমহংস—এই চারি শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্তের পারিভাষিক সংজ্ঞা হংস। সকলেই কুলযোগী বা কুলসন্ন্যাসী।

—মহানির্ব্বাণে ১৪ উ. ১৭২, ১৭৪ শ্লো।

তান্ত্রিকসন্ন্যাসীও যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, অসঞ্চয়ী, নির্লোভ, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তাঁহার অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যায়ন ও তত্ত্ববিচার আছে।

—মহানির্ব্বাণে ৮ম উ. ২৮২ শ্লো.

শ্রৌত ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসী

তাঁহার দৈবে অর্থাৎ সকামযাগাদিতে, পিত্রে অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে. আর্ষে অর্থাৎ অপরাবিদ্যার অনুশীলনে অধিকার নাই।

—মহানির্ব্বাণে ৯ম উ. ১৬৬ শ্লো.

তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ যথা—

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়াঃ।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

—মহানির্ব্বাণে ৮ম উ. ২৭৯ শ্লো.

তিনি ধাতু অর্থাৎ ধনাদি লইবেন না। পরনিন্দা, অনৃত, স্ত্রীলোকের সহিত কেলি, রেতঃপাত, পরদ্রোহবর্জ্জন করিবেন।

এ সব বিষয়ে শ্রৌত ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর তুল্যরূপতা। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবধূত বিধায় বীর কৌল সন্ন্যাসী বাহ্য পঞ্চতত্ত্ব লইতে পারেন। কেহ কেহ বলিতে চান যে সর্ব্ববিধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর বাহ্যপঞ্চতত্ত্বগ্রহণ অধিকার নাই। তাহা তন্ত্রাভিমত বলা যায় না। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে হংসনামক ব্রাহ্মাবধূতেরই পক্ষে মৈথুনতত্ত্বসেবন নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ তন্ত্রের বিধান যথা—

সম্বিদাসেবনং কুর্য্যাৎ সদা কারণসেবনম্। —নির্ব্বাণতন্ত্রে ২৪ পটলে।

সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই সম্বিদা অর্থাৎ ভাঙ্গ খাইবেন এবং সর্ব্বদাই কারণ বা মদ খাইবেন।

পঞ্চতত্ত্ব সেবন

ত্রায়তে হি কুলদ্রব্যং কুলযোগীশ্বরার্পিতম্।

—কুলার্ণবে ৯ উল্লাসে।

যদি কুলযোগীশ্বর অর্থাৎ কৌলাচারী অবধূতকে কুলদ্রব্য দেওয়া যায় তাহা দাতার ত্রাণ ঘটায়।

এইরূপ স্থলে পঞ্চতত্ত্ব যে বাহ্য তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্ব্বচক্রেষু কামিনী॥

—নিরুত্তরতন্ত্রে ১০ পটলে।

ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বীরচক্রে এবং কুলযোগী সর্ব্বচক্রেই কামিনীপূজা করিবেন, অর্থাৎ ভৈরবীকে পঞ্চমকার দিবেন ও তাঁহার প্রসাদ পাইবেন।

সর্ব্বমদ্যং সর্ব্বশুদ্ধিং সর্ব্বমীনং কুলেশ্বরি।
সর্ব্বমুদ্রাং সর্ব্বপুষ্পং স্বয়ম্ভুস্থমং তথা।
প্রদদ্যাৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ॥

—নিরুত্তরতন্ত্রে ১০ পটলে।

সাধকশ্রেষ্ঠ শব্দে যতি বা অবধূতকে বুঝাইতেছে।

কৌলাবলীতন্ত্রের ২২ উল্লাসে এবং অন্যান্য বীরমার্গের তন্ত্র সমূহে অবধূতের যেরূপ আচার নির্দ্দিষ্ট, তাহাতে বীরাচারী অবধূতের প্রাকৃতপঞ্চতত্ত্বসেবনে বাধা নাই এবং তাহা সম্প্রদায় অনুমোদিত। পশ্বাচারী ও দিব্যাচারী অবধূতের পঞ্চতত্ত্বসাধন মানস। আচার ও পঞ্চতত্ত্বের পরিচয় স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। এই পর্য্যন্ত এ স্থলে বক্তব্য যে তান্ত্রিকের বীরাচারে প্রাকৃতপঞ্চতত্ত্বসেবন সাধনার জন্য, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য নহে। তাহার উদ্দেশ্য মহৎ, মাত্রাও আছে। অনিয়ত সেবনে প্রত্যবায়। ঐ প্রত্যবায়ে তন্ত্র প্রায়শ্চিত্তের এমন কি দণ্ডের বিধান করিয়াছে।

অবধূতের ভোগ আদৌ কামাত্মক নহে। গীতার যোগীর ন্যায় তিনি অনাসক্তভাবে ভোগ করিবেন।

অবধূতের নিষ্কাম ভোগ

ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥

—মহানির্ব্বাণে ৯ উঃ ১৭৮ শ্লোক।

ইন্দ্রিয়ই কর্ম্ম করিতেছে অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় মনঃপ্রণোদিত হইয়া রূপশব্দাদি গ্রহণে এবং বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় কথনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত। আত্মা নির্লিপ্ত কেবলমাত্র দ্রষ্টা। অবধূত এইরূপ ভাবিবেন।

তন্ত্র সমন্বয়ে অবধূতের তিনশ্রেণী দাঁড়ায়। প্রথম অপূর্ণ বা জ্ঞান দুর্ব্বল বা ভক্ত। এই শ্রেণী বৈদিক কুটীচক ও বহূদকের তুল্য। ইঁহাদের স্বজাতি-চিহ্নধারণ, গৃহে স্থিতি, স্বাধ্যায়াদি বিহিত। দ্বিতীয় শ্রেণী পূর্ণ বা জ্ঞানী। পূর্ণের কোন গৃহকৃত্য নাই। পূর্ণ আবার জ্ঞানতারতম্যানুসারে সালম্ব বা নিরালম্ব। সালম্বই পরিব্রাট্। তিনি শ্রুতির হংস পরমহংস ও তুরীয়াতীতের সদৃশ। ইঁহাদেরও সাধনা আছে, বিধিনিষেধ আছে। তৃতীয় নিরালম্ব সর্ব্বদা ব্রহ্মময়, বাহ্য সাধন বিহীন, বিধি নিষেধের অতীত, স্বেচ্ছাচারী। তিনিই শ্রুতির অবধূত। শ্রুতির ন্যায় তন্ত্র তাঁহাকে অব্যক্তাচার, অব্যক্তলিঙ্গ বলিয়াছে। (কুলার্ণবে) তাঁহার বেশের ও আচরণের কোন নিয়ম নাই। তিনি কুলযোগীশ্বর। তাঁহার ভক্ষাভক্ষ্য বিচার নাই। তিনি কিছুতেই অশুচি হন না, তিনি পাপপুণ্যে বদ্ধ নন, তাঁহার জন্ম নাই।

> যেন কেনাপি বেশেন যেন কেনাপ্যলক্ষিতঃ।
> যত্র কুত্রাশ্রমে তিষ্ঠন্ কুলযোগীশ্বরঃ সদা॥
> সর্ব্বস্পর্শো যথা বায়ুঃ যথাকাশশ্চ সর্ব্বগঃ।
> সর্ব্বভক্ষ্যো যথা বহ্নিস্তথা যোগী সদা শুচিঃ॥
> তথা ম্লেচ্ছগৃহান্নাদি যোগিহস্তগতং শুচি।
> ক্ষীয়তে ন চ পাপেন বধ্যতে ন চ জন্মনা॥ —কৌলাবলী।

বায়ু যেমন সর্ব্ববস্তু স্পর্শ করিয়াও, আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইলেও, অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ হইয়াও শুচি, যোগী সেইরূপ সদা শুচি। ম্লেচ্ছগৃহের ও অন্ন প্রভৃতি যোগীহস্তস্পর্শে শুচি হয়। যোগী পাপ দ্বারা ক্ষীণ হন না, জন্ম দ্বারাও বদ্ধ নহেন। অবধূত চূড়ামণি মতে তিনি দ্বিতীয় মহেশ।

বাম স্বভাবতঃ সন্ন্যাসী ও পূর্ণজ্ঞানী। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ কেবল লোক-শিক্ষার জন্য। দ্বিজের পক্ষে উপনয়নের পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণীয় নহে, তাই উপনয়ন লন। মাতার অনুমতি ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। তজ্জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জীবনীতে কুম্ভীরাক্রমণাদি ঘটনা। শ্রীগৌর অনেক বুঝাইয়া মাতার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বাম আমার গুপ্তাবতার। তিনি মাতৃনিয়োগের সদর্থকল্পনে উহা প্রাপ্ত হন। সংসারের কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না দেখিয়া মা তাঁহাকে প্রথম প্রথম তাড়না করেন। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় মাতা পুত্রকে বুঝাইয়া

শ্রীবামের গৃহত্যাগ

বলেন "বাবা! কাজ কর।" মাতা সাংসারিক কর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। অসংসারী বালক তাহা অসাংসারিক কর্ম্মপর বুঝিয়া গৃহত্যাগ করেন।

রামের সন্ন্যাস শ্রৌত নহে তান্ত্রিক বটে। দারপরিগ্রহ করেন নাই বলিয়া তাঁহার তান্ত্রিক সন্ন্যাসে অধিকার ছিল না ইহা অপসিদ্ধান্ত। উপনয়ন দ্বারাই তাঁহার গৃহস্থ আশ্রমিত্বপালন হইয়াছিল। তিনি ব্যক্তাবধূত, চিতানুগ। সুতরাং গৃহত্যাগ করেন, দৈবার্ষপিতৃকৃত্যাদি ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মাবধূতের শিখাসূত্রহোমাদি বাহ্য শৈবসংস্কারের আবশ্যক হয় নাই। পূর্ণব্রহ্মাবধূত বা হংসযতির কতক লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশ পায়। তিনি বাহ্যতঃ বীরভাবী ও বীরাচারী ছিলেন। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে বাহ্য মৈথুন স্বীকার করেন নাই। ইহাও তন্ত্র সম্মত।

তন্ত্রে সাধনার দুই কুল, কালীকুল ও শ্রীকুল। কালীকুলে বীরাচার। ইহাতে নীলক্রম ও চীনক্রমাদি। নীলক্রমে শুষ্ক পন্থা, চীনক্রমে আর্দ্র পন্থা আর্দ্রপন্থীর প্রাকৃত মৈথুন। শুষ্কপন্থীর অন্তর্মৈথুন। শুষ্কপন্থী সময়মার্গী, তিনি যোগীর ন্যায় সহস্রারে কুণ্ডলিনীর মিলনে পরমমৈথুনানন্দ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মেলনে সামরস্যজনিত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

শুষ্কাহ্লী

আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং নীত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রে কুণ্ডলীশক্তিং সামরস্যসুখোদয়ঃ॥ —কুলার্ণবে।

কুণ্ডলিনীশক্তিকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বার বার লইয়া চৈতন্যরূপচন্দ্রের সহিত মিলাইয়া উভয়ের সমানরসতাপ্রযুক্ত যোগী ব্রহ্মানন্দ পান। রামের পঞ্চমমকার বর্জ্জনের কারণ বোধ হয় লোকশিক্ষা। সন্ন্যাসীর বাহ্যমৈথুন সংসারীর চক্ষে বিসদৃশ। রাম শ্মশানে বসিয়াও সংসারীর উদ্ধার জন্য সংসারীকে আকর্ষণ করিয়া ত্যাগ শিক্ষা দেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগই আমাদের নিকট ত্যাগের নিকষ। তাই তিনি ঐ দুইটী ত্যাগ করেন। তিনি যে অন্তর্মৈথুনশীল তাহার আভাসও দিতেন। তিনি বলিতেন "তারাই আশ্চর্য্য ভৈরবী"। ডাবুকের কৈলাসপতি আর্দ্রপন্থী ছিলেন। এ যুগে উহা লোকশিক্ষার বিরোধী ইহা জানাইবার জন্যই কি রাম তাঁহাকে বলিতেন "কৈলাসপতি রাজা গোঁসাই"? মৈথুনবর্জ্জন ভিন্ন রাম আর কোন বাহ্যানুষ্ঠানে

কোন বিধিনিষেধ মানিতেন না। তিনি নিত্য প্রাকৃতচতুর্মকারে বাহ্যযজন করিতেন না। কুলকুণ্ডলিনীতে কারণহোম করিতেন বটে, কিন্তু তাহার কিঙ্কর ছিলেন না। কারণের লাভালাভ তাঁহার পক্ষে সমান ছিল। পরমার্থতঃ তাঁহার দিব্যভাব, দিব্যাচার। তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

২। দীক্ষা

স দ্বারকাং প্লাবনপূরভীষণাং তীর্ণঃ শ্মশানে ভবসিন্ধুপারগঃ।
গুরুশ্চ তস্মৈ প্রতিভাং প্রথানুগং দিদেশ লোকোত্তরবেধদীক্ষয়া॥

ভবসাগরের পরপারগত সেই বাম বন্যাপ্লাবনপ্রবাহে ভীষণ দ্বারকা নদী উত্তীর্ণ হইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং তৎকালেই সনাতনপ্রথানুসারে শ্রীগুরু অলৌকিক বেধদীক্ষা দ্বারা তাঁহাকে প্রাতিভজ্ঞান দান করিলেন।

মুক্তবিহঙ্গম

আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতে বাম জন্মের মত গৃহ ছাড়িয়া তারাপীঠের দিকে ছুটিলেন। শাক্যসিংহাদির ন্যায় যৌবনে তিনি নিগড়বদ্ধ হন নাই যে যুবতী রমণী বা সুকুমার কুমারের জন্য তাঁহার মন টলিবে। গ্রামপার হইয়া মাঠে পড়িলেন। পথ অভ্যস্ত। তারাপীঠ ক্রোশ মাত্র দূরে। তারামন্দিরের চূড়া শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন। কতবার ঐ মন্দিরের চূড়া দূর হইতে তাঁহার নয়নপথে পড়িয়াছে। আজ তাঁহার অন্যভাব। জননী কাজ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি আজ কাজে চলিয়াছেন। আজ দুধুমার কোল ছাড়িয়া সনাতনী তারামার কোলে যাইতেছেন। আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার ভাবহিল্লোল সংসার কীট আমরা কি বুঝিব? কি বর্ণনা করিব? আজ তিনি নিজক্ষেত্রে নিজজনের সহিত নিজকার্য্যে ব্রতী হইবেন।

বামকে ধরে কে? দ্রুতপদে মুক্তিপথে ছুটিতেছেন। মাঠ পার হইয়া কবিচন্দ্রপুর গ্রামে পড়িলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কবিচন্দ্রপুরের পূর্ব্বসীমায় উপস্থিত।

নদীপার

কল্লোলিনী দ্বারকা কলকল নাদে বহিয়া যাইতেছে। পরপারে তারাপীঠ। নদীতে বান ডাকিয়াছে। যে বাম ভবনদীর কাণ্ডারী তাঁহার গতি কি সামান্য নদী রোধ করিতে পারে? তিনি

ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে সাঁতার দিয়া মহাশ্মশানে উঠিলেন। ঐ শ্মশানে কৈলাসপতি ক্ষ্যাপার ঘাটে দাঁড়াইলেন। বাঁধা ঘাট নাই। বালির চড়ায় ভাঙ্গা ঘাট। কৈলাসপতি ঐ স্থান দিয়া দ্বারকার পরপারে যাতায়াত করিতেন বলিয়া উহা তাঁহার ঘাট বলিয়া খ্যাত। বামের সম্মুখে মহাশ্মশান বন্যায় মগ্ন। বাম কি ভাবিতেছেন এই আমার আলয়; এই শ্মশানের শবশিবাই আমার অনুচর, ইহার চিতাভস্মই আমার চন্দনপরাগ, ইহার শবকন্থাই আমার বিচিত্রাম্বর, ইহার নৃমুণ্ডমালাই আমার মতির মালা! তিনি যে বাম। বাম লীলার প্রকাশ জন্য আসিয়াছেন। স্বার্থমুগ্ধ কামকিঙ্কর জগতে নিস্বার্থত্যাগের আদর্শ চিত্র দিবার জন্য তাঁহার অবতরণ। অগৃহী হইয়াও বিংশতিবৎসর গৃহে ছিলেন। যথেষ্ট হইয়াছে। এইবার অন্তর্বাহ্যতঃ গৃহত্যাগ।

মহাশ্মশানে

হঠাৎ কণ্ঠধ্বনি উঠিল—"ব্রাহ্মণ বালক দাঁড়াও, তুমি পাইবার অধিকারী।" অল্পবয়স্ক বামের ঘোর ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখেন পরপারে ব্রজবাসী কৈলাসপতি ক্ষ্যাপা। তিনি তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব। তিনি বসিষ্ঠাসনের অধিকারী। তিনিই এ শ্মশানের অধীশ্বর। বাম তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট। বহুদিন হইতে তিনি বামকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছেন। বামের লগ্ন আসিয়াছে। তিনিও ঐ মুহূর্তে উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে অপর তীর হইতে খর স্রোতস্বিনী দ্বারকার উপর দিয়া খড়ম পায়ে এপারে আসিলেন। বাম বলিতেন—"কি আশ্চর্য্য শক্তি। গুরু বানের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইলেন।"

গুরুসম্মিলন

জড়প্রকৃতির উপাসকগণ ও তাঁহাদের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ জ্ঞানাভিমানিগণ একথা সহজে বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন—জলের উপর দিয়া বিনা নৌকাদি সাহায্যে মানুষ কিরূপে চলিবে। দণ্ডায়মান মানুষ যতখানি জল অপসারিত করে তাহার ওজন মানুষের ওজন অপেক্ষা কম। গুরুত্ব প্রযুক্ত মানুষ ডুবিয়া যাইবে। গুরুত্বের কারণ মাধ্যাকর্ষণ। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য-জগতেও মাধ্যাকর্ষণবাদ সংশয়িত। তৎপরিবর্ত্তে দ্রব্যের লঘুগুরুত্ব আপেক্ষিকবাদ স্থাপিত। মানুষ দীর্ঘ প্রাণায়াম দ্বারা নিজের গুরুত্বকে লঘু করিতে পারেন। এ কৌশল ভারতের যোগিগণ জানিতেন। ঐ দীর্ঘ প্রাণায়ামের প্রভাবে কুমারিলভট্ট উচ্চ পর্ব্বত হইতে

জলে হণ্টন

ভূতলে অবতরণ করিয়া বৌদ্ধভিক্ষুকদিগকে বিস্মিত ও নিজের শিষ্যত্ব স্বীকার করাইয়া ছিলেন। পদ্মপাদও গুরুর আহ্বানে গুরুভক্তিবলে ঐ প্রাণায়াম কৌশল অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইয়া পদব্রজে জলের উপর নদী পার হন।

কৈলাসপতি নদী পার হইয়া বামের নিকট আসিলেন। তিনি বামকে পূর্ব্ব হইতে ভালবাসিতেন। গুরুশিষ্যসম্বন্ধ অদ্ভুত স্নেহপ্রেমভক্তিময়। বাম স্বতঃসিদ্ধ মুক্তপুরুষ হইলেও লোকসংগ্রহার্থ তাঁহার গুরুকরণ আবশ্যক। ভক্তচূড়ামণি ধ্রুব ভক্তিবলে ভগবানকে বশ করিলেন। কিন্তু ভগবান্ নারদকে অগ্রে পাঠাইয়া ধ্রুবকে দীক্ষা দিয়া পরে দর্শন দিলেন। এই পৌরাণিক কথার অর্থ আছে। কৈলাস-পতির স্নেহসাগর আজ নির্ম্মল বামচন্দ্র দর্শনে উথলিয়া উঠিয়াছে। কত আদর কত যত্ন দেখাইয়া তিনি তাঁহার হস্ত ধরিলেন। পার্শ্বে তুলসী বৃক্ষ ছিল। তাহা দেখাইয়া বলিলেন 'এটা কি মরা না জীবন্ত।' বাম দেখিলেন তাহা শুষ্ক। তিনি উত্তর দিলেন—'বাবা! এটা যে শুক্‌নো'! গুরু বলিলেন "তুলসী জিউ, তুলসী জিউ, তুলসী জিউ।" তিন দিন পরে তুলসী মুঞ্জরিল।

স্পর্শ

স্পর্শচ্ছলে গুরু শিষ্যকে মহাশ্মশানে পরমতত্ত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা দিলেন। ইহাকে তন্ত্রে স্পর্শ দীক্ষা বলে।

হস্তে গুরুং শিবং ধ্যাত্বা জপন্ মূলাঙ্গমালিনীম্।
গুরুঃ স্পৃশেৎ স্বশিষ্যং যৎস্পর্শদীক্ষা ভবেদিয়ম্॥ —কুলার্ণবে ১৪ উঃ

পরাৎপর-গুরু-শিবশঙ্করকে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র মন্ত্রে মনে সর্ব্বাঙ্গে জপ করিতে করিতে শ্রীগুরু যদি শিষ্যকে স্পর্শ করিয়া শক্তিপ্রয়োগ করেন এবং শিষ্যের হৃদয়ে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ স্ফুরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য আসে, সেই দীক্ষাকে স্পর্শদীক্ষা বলা যায়। ইহা অলৌকিক বেধদীক্ষা। এই দীক্ষাচিত্র ভাবহিল্লোলময় নহে। ইহাতে ভক্তি চাপল্য নাই। মন্ত্রপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা নাই। বিশিষ্ট মন্ত্র দিবার জন্য শ্রীগুরুকে অনুরোধ নাই। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীগুরুর উপর অটল বিশ্বাস, ঐকান্তিক নির্ভরতা আছে।

দীক্ষা

৩। আদর্শ শিষ্য

গুরোরঙ্ঘ্রির্মোক্ষমূলং গুরুর্ব্রহ্মেতি দর্শয়ন্।
সোঽভূদন্বর্থতঃ শিষ্যঃ সম্ভবেঽস্মিন্ জগদ্‌গুরুঃ॥

শ্রীগুরুর পাদপদ্মই মোক্ষের মূল, শ্রীগুরুই পরব্রহ্ম ইহা জগতে প্রকাশকরতঃ সেই জগদ্‌গুরু রাম এই অবতারে আদর্শশিষ্য হইয়াছিলেন।

গুরুভাব বড় গভীর। মাদৃশ অধম সে ভাবের কি পরিচয় দিবে? জীব পাশবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন। শিব পাপমুক্ত, অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জীবচিত্তে সেই অপরিচ্ছিন্ন শিবতত্ত্ব আসিতে পারে না। জীবচিত্তের যে পরিমাণ প্রসার বাড়িবে, সেই পরিমাণ সেই অনন্তের ছবি পড়িতে পারে। চিত্তপ্রসারের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাবলে জীব শিব হইতে পারে। সেই শিক্ষার দাতা গুরু। যাবতীয় সাংসারিক বিদ্যার জন্য যখন গুরু আবশ্যক, তখন অতিমৃত্যুবিদ্যার জন্য যে গুরুর প্রয়োজন ইহা বলা বাহুল্য। ঐ গুরু পরিচ্ছিন্ন জীবের বোধগম্য অথচ অপরিচ্ছিন্ন অনন্তব্রহ্মের সহিত পরিচিত হওয়া চাই। তিনি যেন এক হস্তে জীবকে ও অপর হস্তে ব্রহ্মকে ধরিয়া আছেন এবং জীবকে ধীরে ধীরে ব্রহ্মের নিকট পৌছাইয়া দিতেছেন। শ্রীগুরুর এই প্রথমভাব। এই অবস্থার জ্ঞাপক মন্ত্র—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্ব যে ব্রহ্মদ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই ব্রহ্মের স্বরূপ যে গুরু দেখাইয়া দেন তাঁকে ভূয়োভূয়ো নমস্কার।

এ অবস্থায় জীবকে, ইষ্ট ও মধ্যবর্ত্তি গুরু—তিনের পৃথক্ সত্ত্বা স্বীকৃত। গুরুই ঈশাতন্ত্রের ঈশা, শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের শিব। যিশুভক্তগণ এ ভাব না বুঝিয়া ভারতের গুরুশিষ্যভাবকে উপহাস করেন। শিষ্যের প্রেম প্রগাঢ় হইলে, শ্রীগুরুর মহিমা হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলে, তিনি দেখিবেন যে শ্রীগুরুই স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্তা। তাঁহারই শক্তি বলে এই ব্রহ্মাণ্ড উঠিতেছে, তাঁহাতে থাকিয়াই চলিতেছে, এবং তাহাতেই লীন হইতেছে। এই বিশ্ব সেই গুরুর অর্থাৎ মহাশক্তিরই লীলা। তখন গুরুই পরব্রহ্ম ইহার আভাস আসিবে। সুতরাং গুরুই ব্রহ্মা,

পথ প্রদর্শক

গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবাদিদেব। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
ত্রিশক্তিক
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সত্ত্বরজতমোরূপ গুরুকেই পরাৎপর ব্রহ্ম জানিবে। সেই গুরুর শ্রীচরণে সতত প্রণত থাকিবে। এখনও জীবব্রহ্মে মিশামিশি হয় নাই, মিশিবার উপক্রম, ব্রহ্মশক্তির উদ্ভাস মাত্র। মিলনের দশাও গুরুগীতা দিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্॥
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি॥

হে সদ্গুরো! তুমি সেই মহতো মহীয়ান্, চিদানন্দময়। তুমিই জীবের পরমসুখদাতা। তুমি কৈবল্যময়। চৈতন্যই তোমার মূর্ত্তি। তুমি শীতোষ্ণাদি যাবতীয় দ্বন্দ্ব বা বিরুদ্ধভাবের অতীত। আকাশই তোমার কথঞ্চিৎ ব্যাপক ভাবাদির ব্যঞ্জক। তত্ত্বমসি প্রভৃতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক মহাবাক্য তটস্থলক্ষণা দ্বারা তোমাকে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করিতেছে। তুমিই একমাত্র নিত্য, নির্ম্মল, অচল পদার্থ। তুমি সর্ব্বদা জাগরূক। তুমি সর্ব্বভাবের অতীত ও ত্রিগুণশূন্য। কে তোমার স্বরূপ জানে? তোমাকে সগুণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করি।

পরব্রহ্ম

নিপুণভাবে দেখিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধক ভাবও গুরু, সেই ব্রহ্মভাবের স্ফুরণও গুরু এবং ব্রহ্মীভূত ভাবও গুরু। বাম জগদ্গুরু বামের অবতার হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ শিষ্যচিত্র দেখাইয়াছেন। শতমুখে তিনি গুরুর গুণগান করিতেন। গুরু ও তারা তাঁহার নিকট পৃথক্ ছিলেন না। শাস্ত্রে বলে ইষ্ট, মন্ত্র ও গুরু তিনই এক। যিনি তিনকে এক করিতে পারেন তিনিই যথার্থ শিষ্য, তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই পরম সিদ্ধিলাভ করেন।

স্বয়ংসিদ্ধ বাম তন্ত্রোক্ত স্বীয় বাণী স্বয়ং পালন করিয়া তন্ত্রের সারবত্তা দেখাইয়াছেন। নরাকৃতি বামের ধৃতমূর্ত্ত ভাব। ধন্য প্রভু, তুমি আদর্শ শিষ্য, তুমিই আদর্শ গুরু।

কিমিদং নমু তাত কল্পিতং জননীমর্ম্মবিদারণং ত্বয়া।
অভিমানমসাম্প্রতং ত্যজন্ গৃহমেহি ত্বরিতং সুবোধ মে ॥
ক্ব তপঃ ক্ব বয়স্তবেদৃশং ক্ব শবা গারমিদং ভয়াকুলম্।
ভবিতা তব জীবিকা কথং বদ কস্তামিহ পালয়িষ্যতি ॥
ইতি কাতর মাতৃভারতী করুণাকুল্যবহাপি বালকম্।
ন শশাক বিকম্পিতুং মনাগপি তারাস্থিরবদ্ধমানসম্ ॥

যাদু! জননীর মর্ম বিদারক একি তোমার সংকল্প? আমার প্রতি তোমার অভিমান সাজে না। তুমি আমার সুবোধ সন্তান, শীঘ্র গৃহে চল! কঠোর তপস্যাই বা কোথা তোমার এরূপ কোমল বয়সই বা কোথা? এ যে ভীষণ শ্মশান, বল এখানে কে তোমার আহারাদি দিবে? কে তোমায় দেখিবে? মাতার করুণা প্রবাহিনী এইরূপ বাণীও সেই তারারূপসনাতনী মাতৃগত স্থির সঙ্কল্প বালককে বিচলিত করিতে পারিল না।

ব্যাকুলা জননী

এ দিকে বাম যথাসময়ে গৃহে না আসায় জননী উদ্বিগ্ন হইলেন। বোকা ছেলে কাজ করিতে পারে না। কাজ করিতে না পারায় কেন তাকে তিরস্কার করিলাম। বোধ হয় সে অভিমানে আসিতেছে না। কিম্বা হাউড়ো কোথায় বসিয়া আছে। ঘর সংসার মনে নাই। এইরূপ ভাবিয়া স্নেহময়ী মাতা আকুল। ঘর বার করিতেছেন, খুঁজিবার জন্য লোক পাঠাইতেছেন। শেষে সংবাদ পাইলেন বাম তারাপীঠে গিয়াছে। কাতর প্রাণা তারাপীঠে ছুটিয়া আসিলেন। বামকে পাইয়া তাঁহার স্নেহ প্রস্রবণ ছুটিল। বাম কোন উত্তর দিলেন না। মা মনে করিলেন বামের বড় অভিমান হইয়াছে। ছেলের অভিমান ভাঙ্গাইতে মাতা কত চেষ্টা করিলেন। বলিলেন যদি তারাপীঠ ভালবাস, তা তো ঘরের

প্রত্যায়ন প্রয়াস

কাছে। যখন ইচ্ছা তখনি এসো। একেবারে ঘর আঁধার করে শ্মশানে বসো না। বাপরে তোর সন্ন্যাসের বয়স নয়। তুই যে আমার দুধের ছেলে। এ যে মহাশ্মশান, ভীষণ স্থান। কে তোকে এখানে দেখিবে? কে খাওয়াবে? কে তোর মুখপানে চাইবে? কেন বাবা তোর এ বয়সে এমন মতি। তোর কি তপস্যার বয়স? বাবা! এ শ্মশানে কত দানা দৈত্য আছে! তুই কি থাকিতে পারিবি? রাত্রে

ভয় পাবি। ভয় পেলে কে তোকে সাহস দেবে? শরীরের আধি ব্যাধি আছে। কে তোর চিকিৎসা করিবে?"

পাণ্ডা যাত্রী প্রভৃতি সমবেত ব্যক্তিরাও বামকে বুঝাইতে লাগিলেন। "তোমার অল্প বয়স। ধর্মোপার্জনের যথেষ্ট সময় আছে। পিতার মৃত্যুতে সংসারের ভার তোমার উপর পড়িয়াছে। সংসার প্রতিপালন তোমার কর্তব্য। কর্তব্যবিমুখ হইলে পাপ হয়। তুমি পুণ্য করিতে যাইতেছ। মার প্রাণ পুড়িবে, তাহাতে কি পুণ্য হইবে? পিতা মাতার অনুমতি না হইলে সন্ন্যাস হয় না। পিতামাতাই প্রত্যক্ষ দেবতা। পিতা গিয়াছেন মাতার আদেশ পালন কর। মার সেবা কর। তুমি বড়। তুমিই মা বাপের কাজ করিতে অধিকারী। মার সেবাই পরম ধর্ম।"

ধর্মোপদেশ

জননীর মমতাময়ী বাণী, আগন্তুকের মৌখিক ধর্মোপদেশ বামরূপী বামকে টলাইতে পারিল না। তাঁহার লগ্ন আসিয়াছে। তিনি আর গৃহে থাকিলেন না। তাঁহার জীবন-নাটকের প্রস্তাবনা গৃহলীলা শেষ হইয়াছে। শ্মশানলীলার প্রথমাঙ্ক আরব্ধ। হিমালয় চূর্ণ হইতে পারে, গ্রহ সকল কক্ষচ্যুত হইতে পারে, বাম নিজ সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি যে গীতার স্থিরমতি। তাঁহার বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, একমাত্র তারানিষ্ঠা। সে বুদ্ধি তো বহুশাখা ও অনন্তা নহে যে ভোগমুখে শতদিকে ছুটিবে।

বাম সংসারের জীব নহেন। সুতরাং সংসারীর ন্যায় মাতার নিকট স্বীয় ঋণ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন না। চাহিলে মাতার মায়া আরও বাড়িত। এমন কৃতজ্ঞ গুণী পুত্রকে কিরূপে বিদায় দিব ভাবিয়া জননী অত্যন্ত অধীরা হইতেন। বাম জ্ঞানী হইলেও ধৃতমুগ্ধভাব। বিশেষ তখন তিনি প্রকাশ হইতে অনিচ্ছুক। মৌখিকী শিক্ষা তিনি কখনও জীবনে দেন নাই। তিনি তারামার উপর শুধুমার সান্ত্বনার ভার দিয়া নীরবে রহিলেন। তারা মাকে জানাইলেন—"মা। আমার গর্ভধারিণী মায়ায় মুগ্ধ। তুমি মা মহামায়া। তোমার মায়াতেই তাঁহার এই দশা। তোমার মায়া সংবরণ কর। তারা মা কথা শুনিলেন। ক্ষ্যাপা কৈলাসপতি বাবা বক্তা হইলেন। তিনি বুঝাইলেন "মা! তোমার এ পুত্র পরম বৈরাগ্যময় পুরুষ। এ কখনও সংসারী হইতে পারে না। সংসারে

থাকিলেও ইহার দ্বারা সংসারের কোন কাজ চলিবে না। অন্যপথে এ বড় হইবে। যদি একে যথার্থ ভালবাস, সে পথে একে যেতে দাও। তাতে তোমার তিনকুলের মঙ্গল। আর তোমার পুত্রের সকল ভার আমি লইলাম।" কৈলাসপতিকে ঐ প্রদেশের সকলে দেবতাজ্ঞান করিত। তাঁহার কথায় কেহ প্রতিবাদ করিতে পারিল না। রামের মানসিকী শক্তি বলে এবং রামের গুরুর প্রবোধ বাণীতে মাতা রাজকুমারী দেবীর মায়া মমতা কাটিয়া গেল। পুত্রের কল্যাণের জন্য পুত্রকে কৈলাসপতির করে সঁপিয়া চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া মাতা শূন্যপ্রাণে শূন্যময়ীর শূন্যময় শ্মশান হইতে ফিরিলেন।

৫। অনিকেত দ্বন্দ্বসহ

শরীরযাত্রাদিষু নির্ব্যপেক্ষো বিসোঢ়বাতাতপশীতবর্ষঃ।
নভোবিতানং শশিসূর্য্যদীপং মহাশ্মশানং বিভুরধ্যুবাস॥

শরীরযাত্রাদি বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া, শীত বাত আতপ ও বৃষ্টি প্রভৃতি সম্যক্ সহ্য করিয়া বিভু রাম শ্মশানরূপ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। আকাশই সেই গৃহের ছাদ; চন্দ্র ও সূর্য্য সেই গৃহের প্রদীপ।

আত্মীয় লাভ

জননী বিদায়ের পর রাম নিশ্চিন্ত হইলেন। পিতা মাতা ও ভ্রাতার অভাব বোধ হয় নাই। জন্মদাতা পিতার পরিবর্ত্তে জ্ঞানদাতা পিতা, দুধমার পরিবর্ত্তে তারা মা, কলিযুগের ঈর্ষাপরায়ণ ভ্রাতার পরিবর্ত্তে প্রেমময় ধর্ম্মভ্রাতা পাইলেন। সংসারাবস্থাতে বন্ধু বান্ধবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অল্পই ছিল। তারাসেবকগণই সেই স্থান অধিকার করিলেন।

তারামার চরণ ভিন্ন জন্মাবধি তাঁহার অপর কোন লক্ষ্য ছিল না। সংসারের পীড়নে কখনও তিনি সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় বলিয়া বোধ হয় যৌবনোদ্গমে অকৃতদার থাকিয়া সংসার ত্যাগ করেন।

মর্কট বৈরাগ্য

কয়জন এই সংসারকে যথার্থ দুঃখের আধার ও অসার মনে করে। স্থূল রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দভোগে জীব মজিয়া আছে। একভোগ প্রতিকূল হইলে, অন্য ভোগে আনন্দের অনুসন্ধান করিতে ছুটে।

আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহঙ্গনানাম্
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।—মেঘদূতে পূ. মে.

মোহমুগ্ধ জীব সূক্ষ্ম জগতের বিমলানন্দ ভুলিয়া গিয়াছে। সে আনন্দ তাহার চক্ষে আকাশকুসুম। বাম সেই সূক্ষ্ম জগতের অধিপতি। স্থূল জগতের লোককে সেই সূক্ষ্ম জগতের দিকে ফিরাইবার জন্য স্থূলদেহ ধারণ করিয়াছেন।

বীতচিন্ত

সুতরাং স্থূলভোগে পদাঘাত করিয়া শ্মশানে বসিলেন। কিরূপে স্বীয় উদরপূরণ হইবে, কিরূপে দারুণ শীতে শীত নিবারণ করা যাইবে, বর্ষার অবিরল ধারায় কোথায় আশ্রয় লইবেন, কিরূপে সংসারে মান যশ পাইবেন ইত্যাদি চিন্তা বামের হৃদয়ে উঠিল না।

তারাপীঠে আসিয়া পর্ণকুটীর বাঁধিলেন না। কোন লোকালয়েও আশ্রয় লইলেন না। শরীরযাত্রাদি বিষয়ে দৃষ্টি নাই। ভৈরবী লইলেন না। একা আসিয়াছেন। একাই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন।

অনিকেত

তাঁহার হৃদয় ক্ষুদ্র নহে। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রয়োজন নাই। নিখিল বিশ্ব তাঁহার গৃহ। বিশ্বজননী তাঁহার গৃহের কর্ত্রী। অনন্ত গগনই তাঁহার গৃহের ছাদ। চন্দ্রসূর্য্যাদি সে গৃহের দীপাবলি। তাই তিনি মহাশ্মশানে অনাবৃত স্থলে পড়িয়া থাকেন। বর্ষার মুষলধারা মাথার উপর দিয়া যাইতেছে। প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপে দেহ পুড়িতেছে। দারুণ শীতের প্রকোপে শরীর কণ্টকিত। তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি সদানন্দময়ীর ধ্যানানন্দে মগ্ন। ইচ্ছা হইলে রাত্রে তারামন্দিরের অলিন্দে রহিলেন। নচেৎ তারাবাটীর বিরামখানায় বা জোৎকুণ্ডের ঘাটে বা সিমুলতলায় রাত্রিদিন কাটিল। ইহাকেই বলে অনিকেত দ্বন্দ্বসহ।

৬। নির্যোগক্ষেম

নির্যোগক্ষেম এষ বামো মদেকশরণ ইতি তারিণী।
বিদধে বৃত্তিমেতস্য নিজভোগাৎ করুণাময়ী কিম্॥

এই বাম যোগক্ষেমে উদাসীন, একান্ত আমার শরণাগত ইহা ভাবিয়া কি করুণাময়ী তারা নিজ ভোগ হইতে উহার বৃত্তিবিধান করিলেন?

অপ্রাপ্তপ্রাপ্তির নাম যোগ এবং প্রাপ্তের রক্ষণই ক্ষেম। জীব কামী। তাহার বহু ইষ্ট, তাহার বহু অভাব। সেই অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির জন্য সে দিনরাত্র কত কল্পনা জল্পনা ও চেষ্টা করিতেছে। কতক ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে। অনেক মনোরথ মনে মিলাইতেছে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলাম, তাহা রাখিবার জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করিলাম, তবু অর্থ নিত্য ক্ষয় হইতে লাগিল।

যোগক্ষেমের আয়াস

বিত্তানামর্জ্জনে দুঃখমর্জ্জিতানাং চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্॥

অর্থের অর্জ্জনে কত আয়াস, কত দুঃখ। সেই বিত্তের রক্ষণে আবার অধিকতর দুঃখ। তাহার নাশেও দুঃখ ব্যয়েও দুঃখ। ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। মাছ ধরিতে গিয়া আমাদের কাদা ঘাঁটা সার হয়। অনিত্যফল-লোভে নিত্যবস্তু হারাই।

আর একদল লোক আছেন তাঁহারা এসব অনিত্যসুখকর ফল চান না। তাঁহারা চান কেবল নিত্যানন্দময় ফলদাতাকে। সেই সুখীগণকেই উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

—গীতা ৯অ. ২২ শ্লো.

যাঁহারা আমা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া আমাকেই সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, সেই সকল সতত মদেকনিষ্ঠগণের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ আমিই করি। তাঁহারা যে তাঁহাকে ভিন্ন জানেন না, তিনি না তাঁহাদের মুখ পানে চাহিলে কে চাহিবে? তাই তিনি তাঁহাদের শরীর যাত্রাদি কিসে হয় দেখেন।

ভগবান্‌নিষ্ঠার ফল

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শরীর না থাকিলে ধর্ম্মসাধন কিরূপে হইবে? বাম তারা ভিন্ন জানেন না। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তারামার চরণে আপনাকে বিকাইয়াছেন। তারামা তাঁহার উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। তখন দুর্গাদাস সরকার তারাপীঠে নাটোররাজের পক্ষে তারাসেবা পরিদর্শনের জন্য প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার বাড়ী আটলা গ্রামে। তিনি বামের প্রতিবেশী।

উভয়ের পরিবারবর্গমধ্যে পুরুষানুক্রমে ঘনিষ্ঠতা। সর্ব্বানন্দ দুর্গাদাসের পিতাকে পিতৃব্যবৎ দেখিতেন। দুর্গাদাসও সর্ব্বানন্দকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। বাম তাঁহাকে সরকার কাকা বলিতেন। বামের বাল্যজীবন দুর্গাদাসের বাটীতে কাটিয়াছে। তাঁহার বাটীতেই কৈলাসপতি ক্ষ্যাপার সহিত বামের সম্মিলন। তিনি বামকে শৈশবাবধি সংসারে অলিপ্ত দেখিয়াছেন। তাঁহাতে প্রেমভক্তির লক্ষণ পাইয়াছেন। তাঁহার উন্মনাভাব যে প্রেমোন্মাদের পূর্ব্বাভাস ইহা পূর্ব্বে ভাল বুঝিতে না পারিলেও এক্ষণে সংসারত্যাগ করিয়া শ্মশানে বসায় কতক বুঝিতে পারিয়াছেন। বামের পূর্ণ বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার অনুমাত্র সংশয় নাই। রামকৃষ্ণ তারামার যে সেবা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সাধকদেরই জন্য। বামের ন্যায় সাধক বিরল। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গাদাস বামের জন্য তারামার প্রসাদ ব্যবস্থা করিলেন। যাহাতে বামের জননীরও সাহায্য হয় তজ্জন্য বামের মাসিক বৃত্তি চার টাকা স্থির হইল।

শরীরযাত্রার ব্যবস্থা

৭। তারাপরিচারক

তারাহিতং মনো বামো নাধাতুমশকৎ ক্ষণম্।
তারার্চ্চনস্যাপি বাহ্যসম্ভারাহরণাদিকে ॥

বাম যে মন তারাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা ক্ষণকালের জন্যও তারাপূজার পুষ্পাদি বাহ্যোপকরণ সংগ্রহে নিয়োগ করিতে পারিলেন না।

বৃত্তি ব্যবস্থা রক্ষার জন্য দুর্গাদাস সরকার বামের উপর তারাপূজার ফুল তোলার ভার দিলেন। এ কার্য্য অতি সহজ এবং সময়সাপেক্ষ নহে, সাধনের পরিপন্থিও নহে প্রত্যুত ভক্তগণের অভিপ্রেত। কিন্তু বাম বাহ্য কর্ম্মের অতীত। তাঁহার কখনও বাহ্য পূজা ছিল না। পত্র পুষ্পাদি দিয়া তারামার পূজায় তাঁহার আবশ্যকতা ছিল না। তিনি কোলের ছেলে, তারা তাঁহার মা। কোলের ছেলে কি মাকে বিল্বপত্রে বা গঙ্গাজলে পূজা করে? ছেলে কেবল মাকে চায়। বামের প্রাণ তারামা ছাড়া আর কিছু চায় না। তাঁহার আর কিছু ভাল লাগে না। লোকাচারবশতঃ তিনি ফুল তোলা কাজে প্রতিবাদ করিলেন না। প্রাতে ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিতে যান। কোনদিন ফুল তুলিয়া

আনেন ও তারামার পূজায় দেন। আবার কোন দিন গাছতলায় সাজিহাতে ২।৩ ঘণ্টা আনমনে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকেন। কি ভাবেন তিনি জানেন ও তারা মা জানেন। বোধ হয় কুসুমে মার মাধুরীর আভাস পাইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্যময়ীর মাধুরী ভাবিয়া বিভোর হন। কুসুমের হাসি দেখিয়া কুসুমহাসিনীকে মানস মন্দিরে বসাইয়া কুসুমে সাজাইয়া তাঁহার শোভা দর্শনে মুগ্ধ মন। ফুল আনিতে ভুলিয়া যান। তারামার পূজাকাল উপস্থিত। বাম আসেন নাই। ফুল নাই। ক্ষ্যাপা বাম কোথায় খোঁজ পড়ে। দেখা যায় বাম গাছ তলায়। হাতের সাজি হাতে। হাঁকাহাঁকির পর বামের হুঁস হয় ফুল তুলিতে আসিয়াছেন।

পুষ্প চয়ন

তাড়াতাড়ি ফুল তুলিয়া মন্দিরে গেলেন। বাম ধমক্ খাইলেন। কোন কোন দিন এরূপ ঘটে যে মার পূজক ক্রুদ্ধ হইয়া সাজি কাড়িয়া নিজে ফুল তুলিয়া লইয়া যান। দুর্গাদাসের নিকট বামের নামে অভিযোগ আসিতে থাকে। তিনি বামকে ডাকিয়া সাবধান করেন। কিন্তু বামের দোষ সারে না।

স্বভাবো মূর্দ্ধি বর্ত্ততে। স্বভাব সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। তাহা ছাড়া যায় না। বাম তারাময়, কর্ম্মময় নহেন। দুর্গাদাস বামের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলে তিরস্কার করিতেন, উপদেশ দিতেন যে কাজ করিয়া খাইতে হয়। বাম নিরুত্তর থাকিতেন। কবির ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে গেলে

ভৎর্সনা

তদলব্ধপদং হৃদি ভাবঘনে
প্রতিযাতমিবাস্তিকমস্ত গুরোঃ ॥

তাঁহার হৃদয় তারাভাবের ঘন বর্ম্মে আচ্ছাদিত। ঐ সব উপদেশ তাহাতে স্থান পাইত না বরঞ্চ উপদেষ্টার নিকট ফিরিয়া যাইত।

দুর্গাদাস মনে করিলেন বোধ হয় ফুল তোলা বামের অভিপ্রেত নয়, তাই সে এরূপ করে। তিনি বলিলেন "আচ্ছা বাম! তুই মন্দিরে পূজার আয়োজন করিয়া দিস্।" কোন কোন দিন বাম তাহা করেন। আবার কোন দিন বা মন্দিরে ঢুকিয়াই বিভোর হইয়া বসিয়া থাকেন। কে পূজার আয়োজন করে? কে চন্দন ঘসে? কেই বা নৈবেদ্য সাজায়? পাণ্ডারা সব করিয়া লন। তাঁহারা প্রথম প্রথম

পূজার আয়োজন

দুর্গাদাসকে বলিতেন না। পরে দুর্গাদাস বামের ব্যাপার সব অবগত হইলেন। একদিন বাম তারামার দুধ জ্বাল দিতে গেলেন। উনুনে কড়া চাপাইয়া দুধ ঢালিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি কি ভাবিতেছেন গোস্তন্য যদি এত মধুর, তারামার স্তন্য কতই মধুর? হতভাগ্য জীব কেন সে স্তন্য পান করিতে চেষ্টা করে না? তিনি কি তাঁহার প্রিয় জননীর সেই স্তন্য পান করিয়া আত্মহারা? এদিকে দুধ ধরিয়া পুড়িয়া গেল। ধরাগন্ধে পাকশালা আমোদিত। পাচকাদির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল। তাহারা ছুটিয়া আসিল। দেখিল, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বাম নিস্তব্ধ; সম্মুখে উনানের উপর কটাহে দুগ্ধ শুষ্কপ্রায় ও স্বল্পাবশিষ্ট। বামকে ভৎর্সনা করিয়া পাকশালা হইতে বাহির করিয়া দিল। আবার দুগ্ধ আনিয়া তারামার জন্য পাক করা হইল।

দুগ্ধপাক

দুর্গাদাস সংবাদ পাইলেন। বারবার পরীক্ষায় তিনি বামের তন্ময়ত্ব কিছু উপলব্ধি করিলেন। তখন তিনি আদেশ দিলেন বাম কোন কাজেই আসিবে না, তাহাকে বিশেষ কোন কাজের ভার দিও না। যখন তাহার যে কাজ ইচ্ছা হইবে সে তাহাই করিবে। বামের আপাততঃ সংসারের কাজ ঘুচিল। গর্ভধারিণীর অনুমতি লইয়া তিনি নিজকাজে তারামার স্থানে আসিয়াছিলেন। সে কাজ তারামার বাহ্য সেবা নহে; সে কাজ তারামার চরণে আত্মনিবেদন। ফুলতোলা প্রভৃতি কাজে মন দিলে সে কাজ হয় না, শান্তি আসে না। তাই বাম ও সব কাজে মন দিতে পারিলেন না।

কর্ম্মাতীত

৮। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়

নিবন্ধনে জীবিকায়াস্তথা তস্যা নিবর্ত্তনে।
ন লক্ষিতঃ শ্রীবামস্য স্বল্পোঽপ্যাকারবিভ্রমঃ॥

তারাপ্রসাদ হইতে জীবিকার ব্যবস্থা হইলে এবং সেই প্রসাদনিষেধে জীবিকার সংশয় হইলেও বামের কিছুমাত্র হর্ষবিষাদজনিত আকার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

তারা পরিচারকরূপে কিছুকাল কাটিলে নাটোরের ছোট তরফের জনৈক কর্ম্মচারী মৈত্র মহাশয় তারাপীঠে আসিলেন। তারাপীঠের কাছারি মুর্শিদাবাদের দেবোত্তর কাছারির অধীন। ঐখানকার নায়েব মধ্যে মধ্যে তারাপীঠ পরিদর্শনে আসিতেন। বিশেষতঃ ৺শারদীয়া পূজার পর চতুর্দ্দশীমেলায় তাঁহাকে তারা পূজার সময় উপস্থিত থাকিতে হইত। বর্ষা শেষে যখন বঙ্গজননী শারদসাজে আনন্দময়ী বিশ্বজননীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন তখন বঙ্গে আনন্দের স্রোত বহে। এই আনন্দের কালে শস্যপূর্ণ বীরভূমে দেবীপক্ষের চতুর্দ্দশীতে তারাপীঠে উৎসব আরম্ভ হয়। তৎপরবর্ত্তী বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে উৎসব চলে। চতুর্দ্দশীর মেলায় তারাপীঠ উৎফুল্ল। কত সাধু সজ্জন ভক্ত সম্মিলিত হন। আনন্দনাথ ঐ সময়ে শাস্ত্রব্যাখ্যার প্রবর্ত্তন করেন। মোক্ষদানন্দের পর তাহা উঠিয়া যায়। কিন্তু বামের প্রভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার অভাব বুঝা যায় নাই। কত তাপিত জীব বামের চরণছায়ায় ঐ সময়ে শান্তি পাইয়াছে। এক্ষণে চতুর্দ্দশী মেলা কেবল প্রাণহীন মদিরাপানের উৎসবে পরিণত।

বঙ্গে শরৎ

চতুর্দ্দশীর মেলা

নাটোরের কর্ম্মচারী মৈত্র মহাশয় তারাপীঠে আসিলে কোন কোন পাণ্ডা দুর্গাদাসের নামে লাগাইতে গিয়া অপদার্থ বামাচরণকে বৃথা বেতন দেওয়ার কথা তুলিলেন। মৈত্রও স্বচক্ষে দেখিলেন বাম বিশেষ কাজ করেন না। মুর্শিদাবাদ কাছারিতে মৈত্র মহাশয়ের একজন পাচকের আবশ্যকতা ছিল। তিনি ভাবিলেন এই সুবর্ণ সুযোগ। বামাচরণ সদ্‌ব্রাহ্মণ, যুবা, বলিষ্ঠ, অর্থলালসাশূন্য। তাঁহাকেই পাচকপদে বরণ করিলেন। বাম সেই বরণ স্বীকার করিলেন কিনা কোন নিদর্শন না পাইয়া তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইলেন। বাম তখনও নিরুত্তর। দুর্গাদাস সরকার দ্বারা অনুরোধ করা হইল। তাহাতেও বাম কথা কহিলেন না। পদস্থের চাটুকার সর্ব্বত্র সুলভ। জনৈক পাণ্ডা নায়েববাবুর মনোরঞ্জন জন্য বামকে সম্মত করিবার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লইলেন। বেদের হাঁচি সাপে চিনে। পাণ্ডারা বামের ধাত জানিত। ঐ পাণ্ডা বামকে বলিল, "ক্ষ্যাপা, এখানে তারামার কাছে আছিস্, গঙ্গামার কাছে যাবি না?" বাম তাহাতে গঙ্গাদর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই ছলে বামকে মৈত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথপুর কাছারিতে লইয়া গেলেন।

আবাহন

মৈত্র ভাবিলেন ভাল সওদা হইয়াছে। কয়েকদিন পরেই বুঝিলেন যে, দিল্লীর লাড্ডু খরিদ করিয়াছেন। বামকে অন্নপাকে নিযুক্ত করিলেন। তারাময় বাম চুল্লীর নিকট ধ্যানস্থ। অন্নদগ্ধ হইয়া গেল। মৈত্র মনে করিলেন বাম কথনও পাক করেন নাই, সুতরাং কিছুদিন শিখাইলে শিখিবেন।

তিনি পাকপ্রণালীর উপদেশ দিলেন, সঙ্গে লইয়া দুই তিন দিন পাক-প্রণালী দেখাইলেন। তাহাতেও বাম শিখিতে পারিলেন না। অন্ন কোনদিন অর্দ্ধসিদ্ধ, কোনদিন অতিসিদ্ধ থাকে। ব্যঞ্জন কোনদিন অলবণ, কোনদিন বা লবণাধিক্যে অভোজ্য হয়। এইরূপ মাসাবধি চলিল। বাম নিত্য গঙ্গাস্নানে যান, নিত্যই গঙ্গা মাকে বলেন, "মা আমাকে তারাপীঠে পাঠাইয়া দে"। ক্রমে এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে মৈত্র বামকে বিদায় দিলেন। তাঁহার ধারণা হইল যে বাম ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেন না। সুতরাং তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তারাপীঠে আদেশ পাঠাইলেন যেন বামকে কোন বেতন বা তারামার ভোগ হইতে প্রসাদ দেওয়া না হয়।

বিসর্জ্জন

প্রভুর এ লীলারহস্য কি তিনিই জানেন! যেজন তাঁহাকে যেভাবে আশা করে সেইজনকে তিনি সেইভাবে ধরা দেন। তজ্জন্য কি মৈত্রের পাচকত্ব দিন কতক করিলেন? ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বকর্ম্মাতীত—ইহা জানাইবার জন্যই কি তাহা ত্যাগ করিলেন? মোহান্ধ জীব তাহাকে সহজে চিনিতে পারে না, তাহাই কি মৈত্রের চরিত্রে প্রকাশ করিলেন? সে যাহা হউক তাঁহার পক্ষে আবাহন ও বিসর্জ্জন সমান।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণিস্থিতঃ॥ —গীতা ৫।২০

যাহার বুদ্ধি চাঞ্চল্য বিনষ্ট, যাঁহার মোহ বিদূরিত, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি প্রিয়লাভেও প্রহৃষ্ট নহেন, অপ্রিয়াপাতেও উদ্বেজিত হন না। তিনি প্রিয়াপ্রিয়ের অতীত শ্রেয়ঃ লাভ করিয়াছেন। সকলই তাঁহার চক্ষে পরমপ্রিয়তমের লীলা অতএব শ্রেয়ঃ। বাম ঐ শ্রেয়োভাক্। তিনি তারামার বাহ্যপ্রসাদে লোলুপ নহেন। তারামার প্রসাদ হইতে কে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? তারামা তাঁহার শরীর-যাত্রার ভার লইয়াছেন। নিজ ভোগ হইতে বৃত্তি বন্ধন করিয়াছিলেন। তাহা কাড়িয়া লইলেও বাম অস্থির হইবার পাত্র নহেন ইহা জগতে

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়

দেখাইলেন। যাত্রিগণ দ্বারা এবার তাঁহার অশ্বস্তনিক বৃত্তি করিলেন। বামই যথার্থ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়, নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয়।

৯। সমদর্শন

তারাময়মিদং সর্ব্বমিতি জাননমহামতিঃ।
পরমপ্রেমিকো বামঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

বাম মহামনা বিশ্বপ্রেমিক। চরাচর সমস্তই তারাময় এই জ্ঞানও তাঁহার বিদ্যমান। সুতরাং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সর্ব্বজীবে, তুচ্ছাতুচ্ছ লোষ্ট্রকাঞ্চনাদিতে তিনি সমদৃষ্টি।

কামক্রোধাদি বলি দিয়া হৃদয়ের ঔদার্য্য আনিতে না পারিলে জীবে প্রেম আসে না। তাই নীতিবিদ্‌গণ বলিতেছেন—

উদারতা

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥ —পঞ্চতন্ত্রে।

ইনি আমার আপন, কিম্বা ইনি আমার পর, এইরূপ গণনা সংকীর্ণমনা ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। উদারচরিত্রগণের পক্ষে নিখিলধরাবাসি জীব আপন।

ইহা সমদর্শনের প্রথম সোপান। আমি তুমি ভাব ডুবাইবার ইহা প্রথম প্রয়াস। ইহার নামান্তরই জীবে করুণা ও মৈত্রী।

ভক্তির বলেও বিশ্বপ্রেমের বিকাশ হয়। তদবস্থা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

—অন্নপূর্ণাস্তোত্রে।

বিশ্বপ্রেম

পার্ব্বতীই মাতা, চৈতন্যময় মহেশ্বরই পিতা, শিবভক্তগণই বান্ধব, ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ। জীবের যখন এরূপ ভাব আসে যে সকলেই এক মাতার ও এক পিতার সন্তান, তখন সকল জীবই তাঁহার আত্মীয়, এবং সর্ব্বস্থানই তাঁহার স্বদেশ হইয়া পড়ে।

অদ্বৈতজ্ঞানের ফলও সমদর্শন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ —গীতা ৫।১৮

বিনীত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আমাদের প্রিয়, মহোপকারিণী গোমাতাও আমাদের সকলের আদরের পাত্র। মহাবল হস্তী আমাদের বহুকর্ম্মে প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমরা উহাদিগকে ভালবাসি। কুক্কুর উপকারী হইলেও অমেধ্যভোজী, দংষ্ট্রাবিষ ইত্যাদি কারণে আমাদের অস্পৃশ্য। ঐ কুক্কুরভোজী চণ্ডালও আমাদের চক্ষে হেয়। কিন্তু পণ্ডিতের চক্ষে সকলই সমান। পণ্ডিত শব্দের বর্ত্তমানে অধোগতি হইয়াছে। পাঠশালার গুরুমহাশয় পণ্ডিত। সাহিত্যাদিমাত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত অগ্রগণ্য। পণ্ডিত শব্দের যৌগিক অর্থ—পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যাঁহার জন্মিয়াছে। বেদই জ্ঞান। সেই জ্ঞানের আকর বলিয়া ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব বেদ পদবাচ্য। বেদের চরম আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রুতি বলিতেছেন—

ব্রহ্মজ্ঞান

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা॥—কৈবল্যোপনিষৎ।

যিনি আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত আপনাতে সম্যক্ অনুভব করেন, তিনিই সেই পরমব্রহ্ম লাভ করেন। অন্য উপায়ে ঐ সুদুর্লভ ধন পাওয়া যায় না। যাঁহার চক্ষে সমস্তই চৈতন্যময়, তাঁহার ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত। তিনি পূর্ণ সমদর্শী। নরাকার বামের হৃদয় স্বভাবতঃ অতি উদার। আত্মপরগণনা সে হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার চক্ষে সকলেই তারামার সন্ততি। সুতরাং করুণা, মুদিতা, মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম তাঁহাতে বাল্যাবধি বদ্ধমূল। তিনি শ্রুতির জ্ঞানভাব এ কালের উপযোগী নহে বলিয়াই হউক বা অন্য কারণে হউক বিশেষ প্রকাশ না করিলেও, তাহা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ। শ্মশানে বসিবার পরই সমদর্শিত্ব তাঁহাতে বিকশিত হয়। তিনি শ্মশানের শৃগালকুক্কুরাদিকেও প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। সকল জীবই তাঁহার আপনার, কেহ তাঁহার পর ছিল না।

উদারচিত্ত

সমদর্শী

সদাই সমাধিযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত।
কুক্কুর চণ্ডাল দ্বিজে সমদৃষ্টি তাঁর॥

প্রকাশের পর ঐ প্রেমদৃষ্টি প্রকট হইয়াছিল। ভক্ত শিষ্য তাঁহার যেরূপ

প্রিয়, কালু, ভুলু, শ্বেতফুল প্রভৃতি সারমেয়গণও তাঁহার সেইরূপ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তগণের মধ্যে ইনি উচ্চজাতীয়, ইনি নীচজাতীয় এরূপ ভেদ-জ্ঞান তাঁহার ছিল না। মল্লারপুরের সারদা জাতিতে শুঁড়ি। তিনি বাবার প্রিয়শিষ্য। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নন্দ পাটনি জাতিতে ডোম। তিনি বাবার প্রিয় সহচর। সারদাকে শুঁড়িজ্ঞান করায় বাবা অন্য প্রিয় শিষ্য সুবোধকে জ্ঞান দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা বলেন,

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপশ্বাধমঃ॥

চণ্ডাল হরিভক্ত হইলে দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তি-শূন্য দ্বিজও চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভক্তির মহিমা ঐরূপই বটে। কিন্তু ভজনীয় বাম ভক্তিরও অপেক্ষা রাখিতেন না। ভক্ত, অভক্ত, পুণ্যবান্, পাপী, ধনী, নির্ধন সকলেই তাঁহার প্রিয়পাত্র। পাপী ও তাপী বোধহয় প্রিয়তর। ক্ষুদ্রকামী আর্ত্তদিগকে কখন কখন ভয় দেখাইতেন বটে, কিন্তু তাহা পিতা যেমন সন্তানের মঙ্গল জন্য তাড়না করেন তদ্রূপ তাড়না মাত্র। বাম যথার্থই কল্পতরু। তাঁহার পদছায়া যে জীব চাহিয়াছেন, তাঁহাকেই জাতিবর্ণগুণাদি নির্ব্বিশেষে তিনি পদাশ্রয় দিয়াছেন। তৎফলে সেই জীব পূত হইয়াছেন। সেই জীবের স্পর্শে কত জীব পবিত্র হইতেছেন।

করুণাময়

জাতি কুল বিদ্যা তপ ধর্ম্ম জ্ঞান ব্রত জপ
কিছুর অপেক্ষা না করে।
শ্রীচরণ আশ্রয় কোন মতে কেহ পায়
সেই ত্রিপাবন শক্তি ধরে॥

তদাশ্রয়ফল

বামের শ্রীপদস্পর্শের পর এই নরাধমের হৃদয়ে সমদর্শন-ভাব ক্ষণতরে জাগে।

(গুরো) এমন দিন কি হবে।
যবে তারা তারা তারা বলে এ দিন যাবে।
কামিনী কাঞ্চনে নাহি রবে আকিঞ্চন।
বিষয় বাসনারাশি দিব বিসর্জ্জন।
ত্যজি রাগ অভিমান করিব ভ্রমণ
আপনপর ভেদজ্ঞান কিছু না রবে॥

১০। কামজয়ী

মাং বিশ্বজেতারমসৌ পুরস্তাদ্ধৃষ্টং কটাক্ষেণ দদাহ রুষ্টঃ।
উজ্জীবয়ামাস পুনঃ প্রসন্ন ইতি স্মরঃ পর্য্যাচবন্ন্‌বামম্ ॥

আমি বিশ্ববিজয়ী এইরূপ গর্ব্বভরে ইঁহাকে সামান্য দেব ভাবিয়া ইঁহার প্রতি ধৃষ্টতাচরণ করিলে দেবাদিদেব এই বাম রুষ্ট হইয়া আমাকে কটাক্ষপাতে দগ্ধ করিয়াছিলেন, আবার আমার পত্নীর বিনয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে প্রত্যুজ্জীবিত করেন এইরূপ স্মরণ করিয়া কাম নররূপবামের কিঙ্করত্ব স্বীকার করেন।

সর্ব্বজীবে কাম বা ইচ্ছা বর্ত্তমান। কখনও তাহার অভিব্যক্তি কখনও তাহার সুপ্তি। ভোগের জন্য কামের অভিব্যক্তি। ইহা কামের প্রবৃত্তিপথ। এইপথে ভোগমুখ কামের বিস্তার। সুখের জন্য জীবের প্রবৃত্তি বটে কিন্তু সুখ সর্ব্বসময় ঘটে না এবং সুখ ঘটিলেও তাহা দুঃখমিশ্রিত হয়। প্রবৃত্তিজ কর্ম্মের ফলে পুনশ্চ মনোবুদ্ধিতে সংস্কার বা বাসনা জন্মে। ঐ

সংসার ও মোক্ষদ্বার

বাসনাবশতঃ ভোগের জন্য জীবের সংসৃতি বা পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি। গতাগতির অনন্ত ক্লেশভোগে শেষে জীবের ভোগত্যাগের ইচ্ছা আসে। তাহাই নিবৃত্তি। ঐ পথে বাসনাক্ষয়ে শান্তি ও মুক্তি ঘটে। সুতরাং কাম সংসারের দ্বার এবং মোক্ষের দ্বার।

কামই ক্রিয়াশক্তিমূল সুতরাং রজোগুণাত্মক। কিন্তু প্রবৃত্তি পথে রজোগুণ তমোভাবাপন্ন, নিবৃত্তিপথে রজঃ সত্ত্বভাবাপন্ন। উভয়বিধ কামের নামান্তর মন্মথ, মদন, মার ইত্যাদি। কি প্রবৃত্তিপ্রবণ কি

মার

নিবৃত্তিপ্রবণ কাম মনোমথন এবং মনোমাদন। ভোগের জন্য ব্যাকুলতা বা উন্মত্ততা সর্ব্বজনেই প্রকট। শান্তির জন্য মনের ব্যাকুলতা বা উন্মত্ততা বিরল হইলেও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কাম মন্মথ ও মদন। কামই প্রবৃত্তির দিকে লইয়া পুরুষের চৈতন্যকে মোহিত করিয়া তাঁহার সহজ নির্ম্মলত্ব লোপ করে এবং নিবৃত্তির দিকে টানিয়া সমলজীবকে ধৌত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে নির্ম্মল করে। তন্ত্রের ভাষায় কাম শিবত্বমারক জীবত্ব বিধায়ক, এবং জীবত্বমারক শিবত্ববিধায়ক। সুতরাং কাম মার নামে বিদিত।

ভোগমুখীন কামসম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥

—গীতা ৩।৩৭

এই কাম রজোগুণসমুদ্ভূত। কামই প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই কাম এবং এই ক্রোধ উভয়ই দুষ্পূরণীয় এবং মহাপাপের মূল। ভোগবাসনার তৃপ্তি নাই। ভোগবাসনা হইতে যত অনর্থ, যত পাপ।

ভোগমুখীন কাম

ত্যাগমুখীন কাম

ত্যাগমুখীন কাম দোষের নহে।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।

—গীতা ৭।১১

হে ভরতবংশপ্রধান। ধর্ম্মের অবিরোধী কামই আমি। কামই ক্রিয়াশক্তিপ্রেরক। সুতরাং দর্শনমতে ঈশ্বরেও কাম আছে। তিনি লীলাপ্রবণ হন। তাঁহারও লীলা কামসঙ্কল্প প্রণোদিত। তাঁর সিসৃক্ষা বা সৃষ্টিকামনা হইতে এই সৃষ্টি। তাঁহারই ইচ্ছায় লয়। ঈশ্বরে ও জীবে কামসম্বন্ধে প্রভেদ এই যে ঈশ্বর কামের বশ নহেন, জীব কামের বশ। কামবশিত্ব ধর্মবিরোধী ও দুঃখের আকর। কামেশিত্ব ধর্ম্মাবিরোধী ও শান্তির মূল। শান্তির জন্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামের জয় আবশ্যক। কামজয় কামের নাশ নহে, কামের আত্মবশ্য-করণ। কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি। এইজন্য কামজয়ের কৌশল ইন্দ্রিয়সংযম। তজ্জন্য কর্ম্মমার্গ। তদন্তে ভক্ত ভক্তিমার্গে, জ্ঞানী জ্ঞানমার্গে এবং যোগী যোগমার্গে সমূলভোগকামনাক্ষয়ে নিঃশ্রেয়স লাভ করেন।

জীবে ও ঈশ্বরে কাম

কামজয়

এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৭।৩৩।

এইরূপে ষড়্বর্গ অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ কিংবা কামক্রোধাদি ষট্ সম্যক্ জয় করতঃ ভক্ত ঈশ্বরে অনুরাগ করেন, যাহাতে বাসুদেব অর্থাৎ সর্ব্বময় শ্রীভগবানে রতি জন্মে। ঐ রতির ফল যথা,—

ভক্তিমার্গ

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধনস্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তিপ্রয়োগেন সমেত্যধোক্ষজম্ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৭।৩৬।

তখন উৎকট ভক্তির বলে জীবের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়, তাঁহার আশয় বা ইচ্ছা ও আকৃতি ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহার সংসারবীজ অর্থাৎ মোহ ও অনুশয় অর্থাৎ বাসনা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। তখন জীব সেই অধোক্ষজ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় প্রেমময় শ্রীবাসুদেবে মিলিত হন। এইরূপ মিলনে পরমানন্দ। জ্ঞানমার্গের ধারা যথা—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
—কঠোপনিষৎ ৩।৯

জ্ঞানমার্গ

যাঁহার বিজ্ঞানরূপ সারথি মনোরূপ প্রগ্রহ দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ তুরঙ্গগণকে সৎপথে চালিত করেন, তিনি গন্তব্য পথের পরপারে গমন করেন। ঐ পরপারই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ স্বরূপ।

যোগমার্গেও যম নিয়মাদি সাধনে ইন্দ্রিয়জয় অনন্তর ধ্যানধারণা সমাধি দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশের ও ক্লেশকর কর্ম্মের নিবৃত্তি। তৎফলে নির্মল জ্ঞানের উদয় ও গুণপরিণামক্রম সমাপ্তি। তখন গুণবিকার অভাববশতঃ চিচ্ছক্তির বৃত্তিনিবৃত্তি এবং স্বরূপাবস্থানরূপ কৈবল্যলাভ। পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে—

যোগমার্গ

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ২৯ ॥
তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎজ্ঞেয়মল্পম্ ॥
ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩২॥
পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥৩২

সুগতমার্গ

ঋষিগণের উক্ত মার্গত্রয় অন্বয়মুখী অর্থাৎ অখণ্ডৈক সচ্চিদানন্দালম্বন। সুগত পথ ব্যতিরেকমুখী অর্থাৎ শূন্যাবলম্বন। সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, জ্ঞানং জ্ঞানং জ্ঞানং, শূন্যং শূন্যং শূন্যং ভাবনাত্রয়ে প্রথম ইন্দ্রিয়সংযম পরে সর্ব্বাশয় নিরোধে বাসনাক্ষয়।

সন্তকায়ো সন্তবাচো সন্তবা সুসমাহিতো।
বন্তলোকামিসো ভিক্‌খু উপসন্তো তি বুচ্চতি ॥

—ধম্মপদে ভিক্‌খুবগে ১৯ শ্লো°

যাঁহার শরীর, বাক্য ও চিত্ত শমগুণোপেত; যিনি সমাধিনিষ্ঠ, যাঁহার সংসারবাসনা বান্ত অর্থাৎ নষ্ট সেই ভিক্ষুসন্ন্যাসী উপশান্ত অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বলিয়া খ্যাত।

বাসনাক্ষয়ই পূর্ণকামজয়। ভক্তের বাসনাক্ষয়ের প্রকার এইরূপ যে সমস্তই সেই পরাৎপরের ইচ্ছাধীন, ভক্তের নিজেচ্ছা কিছু নাই। সুতরাং ভক্তই বলিতে পারেন,—

ভক্তের বাসনা ক্ষয়

সর্ব্বস্থ বুদ্ধিরূপেণ জনস্থ হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

—মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৯১।৭

অয়ি লীলাময়ি চৈতন্যরূপিণি নারায়ণি! তুমি মা সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বুদ্ধি-রূপে বিরাজমানা। তুমিই তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালনা করতঃ স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান কর।

ত্বয়া হৃষীকেষ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

—দুর্যোধন গীতা

হে হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরিচালক! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যাহা করাইতেছ আমি তাহাই করিতেছি।

জ্ঞানী বাসনাক্ষয়ে ব্রহ্মময় ও পর্য্যাপ্তকাম।

জ্ঞানীর বাসনাক্ষয়

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।২

যিনি ভোগকামনা করেন তিনি তত্তৎ কামনাফলে তদনুরূপ জন্ম পান। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে পূর্ণকাম ও কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কামনা এই জন্মেই সম্যক্ বিলীন।

যোগীর বাসনাক্ষয়ে চিত্তের বৃত্তিনিরোধে স্বরূপাবস্থানহেতু বৃত্তিরূপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামের অভাব। সুগতের বাসনাক্ষয়ে অনন্তশূন্যত্বজাগরণে ঐরূপ কামের নাশ। সকল পথে একরকম ফল— সংস্থিতিরোধ, পর্য্যাপ্তকামতা এবং পরমানন্দলাভ।

বাসনক্ষয়ে যে শারীর ও মানস কর্ম্ম থাকে তাহা সকাম নহে। ক্ষীণাশয়-ভক্তের অবস্থা।

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

—ভাগবতে ১১।২।৪৮

যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও সমস্তই বিশ্বব্যাপক ভগবানের লীলা এই বোধে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে উত্তেজিত বা হৃষ্ট হন না, তিনিই ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শারীর কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহার ভগবৎসেবন থাকে। কিন্তু সেই সেবন ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক না হওয়ায় তিনি তদ্দ্বারা বদ্ধ নহেন। সকলই শ্রীহরির মূর্ত্তি বোধে তিনি সকলকে প্রণাম করেন। তাঁহার ভক্তি বিষ্ণু প্রীত্যর্থ, স্বার্থ নহে। তিনি মুক্তিও কামনা করেন না। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন—

নিষ্কাম ভক্তের কর্ম্ম

আত্মপ্রীতিহেতু যাহা তারে কহি কাম
কৃষ্ণপ্রীতিহেতু যাহা তাহাই নিষ্কাম।

জ্ঞানীর কর্ম্মধারা—

জ্ঞানীর ধর্ম্ম

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়োঽপ্যন্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তৃরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্ততাম্॥

—পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে ২৬৬ শ্লোঃ।

আমি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে যদি আমার লৌকিক বা শাস্ত্রীয় বা অন্য কোনপ্রকার কর্ম্ম ঘটে ঘটুক। অবধূতের কর্ম্মধারা—

ওঁ তৎসন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোঽহমস্মীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাদাত্মোচিত কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমশ্রিতঃ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ১৪।১৫২

সমস্তই সেই সনাতনী পরমা চিচ্ছক্তির লীলাবোধে ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সোঽহং ভাবে ভাবিত হইয়া বৈরাগ্যালম্বন-

অবধূত কর্ম্ম

পূর্ব্বক অবধূত আম্নোচিত কর্ম্ম করেন। তদ্দ্বারা তিনি লিপ্ত হন না।

কামজয়ের প্রথম সোপান প্রবৃত্তি দমন। তাহাতে আরোহণ দুরূহ, শেষসোপান বাসনাক্ষয়ে আরোহণ অতীব দুরূহ। তাই পুরাণাদিতে চতুরানন ব্রহ্মাদি দেবগণও কামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কেবল দুইটি দেবদেব হরি ও হর জিতকাম। হরি মদনমোহন, হর মদনারি। হরির ভোগে যোগ, সুতরাং তিনি কামের বশ নন। হর যোগী, ত্যাগী ; অতএব মদনভস্ম করিলেন। কামের ত্রিকোটী পরিবার। রুদ্রের এককোটী পরিবার তথাপি কাম রুদ্রের নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু কামের আত্যন্তিক নাশ নাই। ক্ষুদ্রবিষয়ক কামনা নষ্ট হইয়া বাসনাক্ষয়ে পূর্ণকামত্ব আসে। তজ্জন্যই পুরাণ কামকে রুদ্রের জ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন।

পৌরাণিকী কথা

জগৎপতিরনির্দ্দেশ্যঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ।
হৃচ্ছয়ঃ সর্ব্বভূতানাং জ্যেষ্ঠো রুদ্রাদপিপ্রভুঃ॥

—মহাভারত অনুশাসনে ৮৫।১৭।

কামের নাশ নাই জানাইবার জন্যই পুরাণের উপাখ্যান এই যে, তৎপত্নী রতির স্তবে হর কামকে পুনরুজ্জীবিত করতঃ দেবগণের হিতার্থ রতিপতিকে স্তম্ভিত করিয়া কুমারের জন্ম দিলেন।

নররূপী বাম পূর্ণত্যাগী, যোগী ও পূর্ণকামজয়ী। তিনি চিরকুমার, ঊর্দ্ধরেতা। তিনি কখনও বাহ্যভৈরবী গ্রহণ করেন নাই। কত নারী ভৈরবী সাজে তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তিনি তাহাদের হাবে ভাবে, বাক্যে ও সেবায় ভোলেন নাই। জনৈক ভৈরবী তাঁহাকে ভুলাইতে না পারিয়া শেষে মদনগোঁসাইকে ভুলান। তদুপাখ্যান অন্তরঙ্গে দেওয়া হইল। শ্রীবামের প্রকাশের পর এক সুন্দরী রমণী ভৈরবী বেশে বামের নিকট আসিয়া পদসেবার ছলে আশ্রয় চাহিয়া প্রলোভিত

প্রলোভন

করিল। অন্তর্যামী বাম তাহার অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়া কামাতুরাকে বলেন, "মা! আমার পদসেবার প্রয়োজন নাই, তুমি অন্যত্র যাও"। ভৈরবীবেশা তাহা না শুনিয়া যখন আগ্রহ দেখাইলেন তখন

রাম তাহার আশয় বুঝিয়াছেন ইঙ্গিত করিলেন—"মা! এখানে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবার নয়।" কামিনী মনে করিল উহা রামের প্রাণের কথা নহে, সুতরাং নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখাইতে লাগিল। প্রভু দেখিলেন যে পাপাশয়কে ভয় না দেখাইলে সে নিবৃত্তি হইবে না। কঠিন রোগে বীর্য্যবৎ ঔষধ আবশ্যক। রাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দাঁড়াতো বেটী, চিম্‌টা আন্‌চি"। সহজেই রাম ভৈরবাকৃতি। কৃতককোপে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। নারী ভীতা হইয়া চরণে পড়িল। তাহার ভাবান্তর হইয়াছে। অসৎ রতির পরিবর্ত্তে তাহার হৃদয়ে প্রভুর কৃপায় সদ্রতি বা ভক্তি আসিয়াছে। রাম প্রীত হইলেন। কাচের পরিবর্ত্তে কাঞ্চন পাইয়া আনন্দিত মনে নারী চলিয়া গেল।

সময়ান্তরে রামকে কামজয়ের কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হয়। তারাপীঠের তহশীলদার নীলমাধব রামকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য এক রূপবতী কুলটাকে নিযুক্ত করে। সে বারবিলাসিনী কয়েকদিন নানা ছলনায় রামকে ভুলাইতে না পারিয়া শেষে ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগ করিল। রাম নিশীথে যোগনিদ্রায় শয়ান।

পরীক্ষা

বারাঙ্গনা আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। অন্তর্য্যামী রাম সমস্তই বুঝিয়াছেন। তিনি নিদ্রার ভাব ছাড়েন নাই। নির্লজ্জা রামের অঙ্গ বিশেষ অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু তদঙ্গের স্থানে কোন চিহ্ন না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়াছে। তখন রাম যেন জাগিলেন এবং 'মা এসেছিস' বলিয়া সন্তানভাবে তার স্তনপান করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্তনপান লীলা গোকুলেও পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। কংসপ্রেরিতা পূতনা মোহিনীমূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে যশোদাগৃহে গিয়া কত আদর দেখাইয়া এবং

স্তনপান লীলা

যশোদাকে ভুলাইয়া তাঁহার নীলমণিকে বক্ষে লইয়া বিষদিগ্ধ স্তন শিশুর মুখে দিলে, শিশু ভগবান তাহার স্তন দুই করে নিপীড়িত করতঃ স্তন্যের সহিত পূতনার প্রাণ পর্য্যন্ত পান করেন।

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বনং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসন্বিতোঽপিবৎ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬।১০

করুণালীলায় জীবোদ্ধার জন্য রামের বর্ত্তমান অবতার। প্রভু এ যুগের পূতনাকে প্রাণে বধ করিলেন না। প্রভুর আকর্ষণে স্তন্য হইতে রুধির বহির্গত হইল।

"মরি মরি" চীৎকার করতঃ নারী মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইলে রাম স্তন ছাড়িয়া বলিলেন—"যা মা, ছেলের সঙ্গে আর এরূপ করিস্ না।" পুণ্যকরস্পর্শে বারবনিতার পাপক্ষয় হইয়াছে। ভক্তি উদ্রিক্ত। তিনি শ্রীরামের পাদপদ্মে লুটাইতেছেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন "বাবা! আমার কি হবে? আমি যে বড় পাপী।" করুণাময় তাকে আশ্বাস দিলেন—"এখন যাও মা। তারা মা তোমায় কৃপা করিবেন।" ঐ রামা তদবধি অসৎ বৃত্তি ছাড়িয়া তারাচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া শুদ্ধা হন। এই বিচিত্র লীলায় স্থানীয় গৃহিগণ বুঝিলেন রাম কামজয়ী। তাঁহার দেহরক্ষার পর কেহ কেহ তাঁহার ভৈরবী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না।

নিষ্কাম

তাঁহার সর্ব্ববাসনা ক্ষয় হইয়াছিল। ইহা তাঁহার সমস্ত জীবনে প্রকাশ। ধনৈষণাদি কোন এষণা তাঁহার কখনও হৃদয়ে স্থান পায় নাই। অন্তরে পূর্ণ জ্ঞানভাব রাখিয়া বাহিরে তিনি তারাভক্তির আদর্শ দেখাইয়াছেন। তারাপদই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান, তারাপদই সর্ব্বস্বধন। তিনি অন্য সমস্ত ধনে নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার। তারাপদকামনা জীবের বন্ধন নহে। তাঁহার অন্তর্ভাব ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ অখণ্ড চিদানন্দভাবে অবস্থান; সুতরাং তিনি পূর্ণ নিষ্কাম। জীবকে ভক্তিভাবের দ্বারা ঐ ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রেরণা জন্য তাঁহার অবতরণ। তাঁহার বাহ্যলীলাও স্বার্থ-প্রণোদিত নয়। অর্থযশোগৌরবাদির আশায় তিনি বদ্ধজীবকে কৃপা করেন নাই। তাঁহার দেহে অধ্যাস প্রায় ছিল না। অধ্যাসের লেশ যাহা দেখা যাইত তাহা জীবকল্যাণহেতু। জ্ঞানভাব অহঙ্কৃতির ব্যঞ্জক বলিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, নচেৎ তাঁহার মুখে ভগবদ্বাণী শোভা পাইত—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি॥ —গীতা ৩,২২

হে পার্থ! এই ত্রিভুবনে আমার কোন কর্ত্তব্য বা কোন প্রাপ্তব্য নাই। আমার করণীয় কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, সকলই পাইয়াছি। তথাপি আমি জগতের জন্য লীলাশ্রয়ে কর্ম্ম করি। রামের কর্ম্মও সন্ন্যাসীর কর্ম্ম, সংসারীর কর্ম্ম

নহে। কারণ তিনি এ অবতারে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া আসিয়াছিলেন, কৃষ্ণাদিবৎ ভূভারহরণ করিতে গৃহী হন নাই।

বিকাশ তরঙ্গ

১। সর্ব্বধর্ম্মময়

তর্ত্তুং ঘোরং দুস্তরং মোহসিন্ধুং
নানা ধর্ম্মা নির্ম্মিতাঃ সেতুরূপাঃ।
আপ্তৈরার্যপ্রাপ্তিভির্ভক্তমুখ্যৈ
রামোধর্ম্মদ্বেষশূন্যস্ততোঽভূৎ॥

এই ঘোর দুস্তর মোহ সাগর পার করিবার জন্য ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাশূণ্য তত্ত্বদর্শী প্রতিভাশালী মুখ্য ভক্তগণই কালে কালে নানা সেতুস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মেরই উপযোগিতা আছে বলিয়া শ্রীরাম নরাবতারেও কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষভাব দেখান নাই।

সেই এক অনন্ত ভগবান্ বাহ্যজগতে নানারূপে ও জীবহৃদয়ে নানাভাবে অভিব্যক্ত। কেহ তাঁহার অনন্ত শক্তি, কেহ তাঁহার অনন্ত প্রেম, কেহ তাঁহার অনন্ত দয়া, প্রভৃতি গুণ দেখিয়া বিমোহিত। কেহ বা তাঁহার গুণাতীত মহাভাবে বিভোর। যে জীব তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়া আনন্দিত হন, সেই ভাবই সেই জীবের প্রিয়। প্রিয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মনের ধর্ম্ম। এই পক্ষপাতিত্ব হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যখন জীব অনন্ত ও তাহাদের প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন, তখন ধর্ম্মসম্প্রদায়বাহুল্য অনিবার্য্য। কিন্তু যখন সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয় তখনই অনর্থ। যখন জীব নিজভাবে এমন উন্মত্ত হয় যে অন্যের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অন্যভাবে ভাবিত উপাসকগণকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন মনে করিয়া ঘৃণা করে, তখনই বাদবিতণ্ডাময়ী ধর্ম্মবিপত্তি। আবার যখন অন্যভাবের সাধকগণকে বলপূর্ব্বক নিজভাবে আনিবার জন্য প্রয়াস

পায় তখনই ধর্মবাধা। এই ধর্মবাধা হইতে নানাবিধ উৎপীড়ন, অত্যাচার, রক্তপাত, হত্যা প্রভৃতি ধর্মের নামে অধর্মলীলা ঘটে।

সাম্প্রদায়িকতা

অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ধর্মের নামে মানুষ পৃথিবীকে বারবার রক্তে প্লাবিত করিয়াছে।

আর্য্য ঋষিগণ সেই বিষময় ফল নিবারণ জন্য অন্যধর্মাবলম্বিগণকে স্বীয় ধর্মে আনিবার জন্য কোন প্ররোচনা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে সর্ব্বপ্রকার সাধনাই সেই এক সাধ্যের দিকে লইয়া যায়। কোন ধর্ম্মই নিন্দনীয় নহে। যিনি সর্ব্বধর্মে আস্থাবান্ তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ।

আর্য্যভাব

যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

—মহাভারতে বনপর্ব্বাণি ২০৫।৩৫।

যে ধর্ম্মবিৎ প্রাজ্ঞের চক্ষে সকল লোকই আত্মবৎ; সমস্ত কর্ম্মেই যাঁহার রতি আছে তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

অবশ্য সাধনার ভেদ আছে। নিম্নস্তরের সাধন হইতে উচ্চস্তরের সাধনে জীবকে আনিবার জন্য ঋষিগণ নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহারা ক্রমশঃ মনকে বুঝাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হঠপূর্ব্ব জীবকে একভাব হইতে অন্যভাবে বিচলিত করিবার পক্ষে তাঁহারা বড়ই বিরোধী।

উদারতা

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

জ্ঞানী অজ্ঞান কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ করাইবেন না (বরং) স্বয়ং অবহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ তাঁহাদিগকে সৎকর্ম্ম করাইবেন।

এই উদার নীতির জন্য ভারতে ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতা থাকিলেও তাহার ফলে বিশেষ রক্তপাতাদি ঘটে নাই। সম্প্রদায়মধ্যে বাদ বিতণ্ডা মাত্র চলিয়াছে। কর্ম্মবাদী কর্ম্মকে, জ্ঞানবাদী জ্ঞানকে ও ভক্তিবাদী ভক্তিকেই নিঃশ্রেয়সের একমাত্র পথ নির্দ্দেশ করিয়া নিজ নিজ বাদের জয়পতাকা উড়াইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই এক ব্রহ্মসূত্রের ও গীতার দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য। হরিহরগৌরীগণপতিসূর্য্যাদিসাধ্যভেদেও সম্প্রদায়ভেদ।

পুরাণাদির প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের বলে বা মৌলিক শ্লোকের অপব্যাখ্যা মূলে কোন কোন বৈষ্ণব কিরূপ সাম্প্রদায়িকতা করিয়াছেন তন্নিদর্শন যথা—

অন্যদেবস্য নির্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদিকং দ্বিজ।
সাত্বতৈস্ত ন তদ্গ্রাহ্যং সুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ॥—ভক্তমাল

অন্য দেবতার ভক্ষ্যপেয়াদি নির্মাল্য বৈষ্ণবগণের অগ্রাহ্য এবং তাহা সুরাতুল্য। তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সঙ্কীর্ণতা

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥—ভক্তমাল

বিষ্ণুরই নৈবেদ্যকে দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ পাবন বলিয়া মনে করেন। অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

শাক্ততন্ত্রে তদুত্তর—

শক্তিযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধোঽভূন্নগনন্দিনি॥

—শক্তিসারাগমসর্ব্বস্বে

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

—মহানির্ব্বাণে ২।৯

শক্তিবীজ সহিত মন্ত্রজপ বিধেয়, কেবল অর্থাৎ শক্তিবীজশূন্য মন্ত্র জপ করা উচিত নহে। সাবিত্রীমন্ত্রজপে ব্রহ্মা সিদ্ধ হন। কলিকালে তন্ত্রপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি বৈদিকাদি অন্য পথে যান তাঁহার গতি নাই ইহা সত্য, ইহা সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

শক্তিমার্গরতো ভূত্বা যোঽন্যমার্গে প্রধাবতি।
ন চ শাক্তাস্তস্য বক্ত্রং পরিপশ্যন্তি শঙ্করি॥
বিনা তন্ত্রাদ্ বিনা মন্ত্রাদ্ বিনা যন্ত্রান্মহেশ্বরি।
ন চ ভুক্তি র্ন মুক্তিশ্চ জায়তে বরবর্ণিনি॥

*   *

তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রবক্তারং নিন্দন্তি তান্ত্রিকীং ক্রিয়াম্।
যে জনা ভৈরবাস্তেষাং মাংসাস্থিচর্ব্বণোদ্যতাঃ॥

যে সাধক শাক্তপথে প্রবৃত্ত হইয়া অন্য পথে যান, শাক্তগণ তাঁহার মুখ দর্শন

করেন না। তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্র বিনা ভোগও নাই মুক্তিও নাই। যাহারা তন্ত্রের বা তন্ত্রবক্তার বা তান্ত্রিকী ক্রিয়ার নিন্দা করে, ভৈরবেরা তাহাদের মাংসচর্ব্বণে উদ্যত হয়।

এই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার শ্লোক প্রৌঢ়বাদমাত্র। ইহাদের তাৎপর্য্য একনিষ্ঠা, দেবতান্তরনিন্দা নহে। কিন্তু ইহাদের মর্ম্মবোধ অভাব ফলে ধর্ম্মদ্বেষ ঘটিয়াছে। যথার্থ সাধক দ্বেষাতীত।

ঐ দ্বেষাদ্বেষির হাত এড়াইবার জন্য আধুনিক কোন মহাপুরুষকে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি নানামতে সাধনা করিতে শোনা যায়। শ্রীবামের ঐ দ্বেষ আদৌ ছিল না। শাস্ত্রীয় বাম যেমন শ্মশানে চিতাভস্মাদি মাখিয়া শাক্তাচারে রত হইয়া পরম শাক্ত এবং পরম বৈষ্ণব, নররূপী বামও সেইরূপ শাক্ত বৈষ্ণবসমন্বয়। তিনি তারা বলিতেও যেমন আত্মহারা, হরি বলিতেও তদ্রূপ! সম্প্রদায়িকতাদোষ যাহাতে তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে না আসে তজ্জন্য তিনি শাক্ত ভক্তগণের নিকট হরিগুণগান এবং বৈষ্ণব ভক্তদের নিকট তারাগুণগান করিতেন। এই অধমকে তিনি গৌরাঙ্গভাব দেখান এবং বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ৺অবিনাশচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে তিনি অন্তর্দীক্ষায় তারা-নামের ঝঙ্কার তোলেন। মহম্মদি ও খৃষ্টিয়াদি ধর্ম্মেরও প্রতি প্রভুর কোন বিদ্বেষভাব কখন দেখা যায় নাই। তিনি প্রিয়সন্তান ছোট ক্ষ্যাপাকে "মিঞাজি তস্‌লিমাৎ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং মহম্মদি সরার গুপ্ততম সাধন বিবৃত করেন। এই অধমও প্রভুর কৃপায় সনাতনী মাতার ছায়া পাইয়া ধন্য হইয়াছে। বামের প্রসাদে মহাপুরুষদিগের প্রতি এ দীনেরও শ্রদ্ধা আসিয়াছে এবং তাঁহাদের সাধনতত্ত্বও কিছু কিছু এ দাস বুঝিতেছে।

বামের ভাব

সর্ব্বধর্ম্মের উদ্দেশ্যই ভগবৎপ্রাপ্তি। সর্ব্বধর্ম্মেই জ্ঞান ও ভক্তির সাধন। জ্ঞান ও ভক্তির পরিণতির জন্য বাহ্যানুষ্ঠান। কোন ধর্ম্মই হেয় নহে। যিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত, সেই সমাজের ধর্ম্মই তাঁহার সেই ভাবের পরিপোষক বলিয়া তাঁহার পক্ষে আশু ফলপ্রদ হইতে পারে। কিন্তু অন্য সমাজের ধর্ম্ম ও সাধন তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম বিকাশের পরিপন্থী নহে।

সাধনোপযোগিতা

১২। পাশ মুক্ত

স্পৃশেন্নৈশতমঃস্তোমস্তমোহৃদম্ দিবাকরং।
পশুত্বঘটকা পাশা ন তু বামং জগৎপতিম্॥

নৈশতমোরাশির পক্ষে তমোহর দিবাকরকে স্পর্শ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সেই জগতের পতিপদবাচ্য বামকে পশুত্বঘটক অজ্ঞানাদি কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। পাশশব্দ জীবাত্মার বন্ধকভাবার্থে প্রচলিত। অবিদ্যাই বেদান্তের পাশ। পাশশব্দ শাক্ত ও শৈব দর্শনের পারিভাষিক সংজ্ঞা। শৈবদর্শনমতে পদার্থ ত্রিবিধ—পতি, পাশ ও পশু। স্বতন্ত্র নিত্য নিরতিশয় শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মাই পতি। তাঁহার নামান্তর শিব। বদ্ধজীব পশু। অন্য দর্শনে পরমাত্মার শক্তি সৃষ্টিস্থিতিলয় আত্মিকা ত্রিবিধা। শৈবতন্ত্রে আরও দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত যথা—আবরণী ও অনুগ্রাহিকা। আবরণীশক্তিই পাশ। তাহা পঞ্চবিধ যথা—বল, মল, মায়া, বিন্দু ও কর্ম্ম। বল পতির পরাশক্তি। বলের দুইদিক্—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা পতির অনুগ্রাহিকা, অবিদ্যা আবরণী শক্তি। অবিদ্যা দ্বারা পতি জীবকে বদ্ধ করেন এবং বিদ্যার দ্বারা পাশমুক্ত করেন। সুতরাং বিদ্যা স্বয়ং পাশ হইতে পারে না। এইজন্য কোন কোন শৈবাগমে মলাদি চতুর্ব্বিধ পাশ স্বীকৃত। অবিদ্যার ফলই মল। চৈতন্যকে আবৃত করে বলিয়া মলের অন্য নাম আবৃতি। তাহা পঞ্চবিধ।

মিথ্যাজ্ঞানমধর্ম্মশ্চ শক্তিহের্তুশ্চ্যুতিস্তথা।
পশুত্বমূলং পঞ্চৈতে তন্ত্রে হেয়া বিবক্ষিতা॥

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনে।

মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম্ম, শক্তি, হেতু ও চ্যুতি এই পঞ্চ মলই পশুত্বের মূল। অতএব ইহা ত্যাজ্য। মলের ক্রিয়াই মায়া। এই মায়া অনন্ত জীবকে অভিভূত করে। সুতরাং তাহার নাম ঈশ। পতি যখন মায়াময় হন তখন তাঁহার নাম বিন্দু। এই বিন্দুও ঠিক পাশ নহে। মায়ারই সৃষ্টি কর্ম্ম। তদ্দ্বারা জীব সংসারে ঘূর্ণায়মান। জীবের ভোগ জন্য পতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ তত্ত্বময় ভোগায়তন সৃষ্টি করেন। সাংখ্যের প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ঐ শৈবতত্ত্বসমূহের অন্তর্গত। কলা, নিয়তি, কাল, দিক্, সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি অতিরিক্ত নবতত্ত্ব শৈবাগমে স্বীকৃত। ঐ ভোগায়তনের

সংজ্ঞা পুর্য্যষ্টক। জীব সকল বা সমল। তদ্ব্যতীরেকী জীব নিষ্কল বা নির্ম্মল। মিথ্যাজ্ঞানাদিপ্রযুক্ত জীবের সহিত পুর্য্যষ্টকের সম্বন্ধ। তদ্বিপর্য্যাসে অর্থাৎ সত্যজ্ঞানাদির উদ্ভাসে ঐ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রলয়ে কলাপর্য্যন্ত পুর্য্যষ্টক স্বতঃ শিবে বিলীন হয় এবং জীব প্রমুক্ত হয় বটে কিন্তু জীবের সংস্কার থাকে। সুতরাং পুনরায় পুর্য্যষ্টক সৃষ্টিতে জীব সকল বা সমল পশু হন। পূর্ণজ্ঞানবলেই ঐ সংস্কারের লোপ হইলে জীবের পশুত্ব যায়। তখন জীব শিবত্ব পান। জীবের এইরূপ দুইভাব পতির ও পশুর অন্তর্গত বলিয়া জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জীবের পশুত্ব কোন মতে কেবল পতির ইচ্ছাধীন, কোন মতে উহা জীবের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে পতির অধীন। শৈবাগমের সহিত শাক্তাগমের তত্ত্ব বিষয়ে মতান্তর না থাকিলেও জনসাধারণের বোধের জন্য শাক্তাগমের অষ্টবিধ পাশ যথা—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমঃ।
কুলং শীলং তথা জাতিঃ অষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥—কুলার্ণবে

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল এবং জাতি এই আটটি পাশরূপে কীর্ত্তিত। এই আটটি মনোধর্ম্ম মনঃসঙ্কোচক। ইহারা মনকে যেন বাঁধিয়া রাখে। তাই ইহাদের নাম পাশ। এই সব সঙ্কোচ দূরীভূত না হইলে মন উদার ভাব প্রাপ্ত হয় না।

অষ্টপাশ

সঙ্কুচিত মনঃ জীবাত্মাতে প্রতিফলিত হইলে আত্মা আপনাকে সঙ্কোচিত বলিয়া ভাবেন। সেই ভাবনাই পরিচ্ছিন্ন জীবভাব। ঘৃণাদি সকলগুলিই মিথ্যাজ্ঞানের বিকার মদ বা অহঙ্কার হইতে জন্মে। আমি ভাল, ইনি মন্দ, আমি শুচি, ইনি অশুচি, আমি বড়, ইনি ছোট ইত্যাদি অহমিকা হইতে ঘৃণার উদয়। ঘৃণিত আমি পরের নিকট ঘৃণিত হইয়াছি ইত্যাদি জ্ঞানই লজ্জার কারণ। এইরূপ হেয় হইলে আমার মান সম্ভ্রম যাইবে কিংবা অন্য কোন কারণে শরীরাদির অনিষ্ট হইতে পারে ইত্যাদি অনিষ্টপাতের আশঙ্কাই ভয়।

ঘৃণা ভয় লজ্জা ভয়

অনিষ্টপাতে মনের প্রতিকূল বেদনাই শোক। সেই অনিষ্ট নিবারণ জন্য নিজ কুকর্ম্মাদি গোপনেচ্ছা জুগুপ্সা। আমি কুলীন, শীলবান্, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠজাতিতে জন্মিয়াছি ইত্যাদিও অভিমানের বিলাস। এই সব সঙ্কোচ সংসারের সহচর।

শোক জুগুপ্সা
কুল শীল

সমাজবদ্ধ দেবগণ এমন কি শ্রীভগবৎ অবতারগণও সঙ্কোচের অধীন বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত। কেবল ত্যাগের আদর্শ দেবাদিদেব বাম নিঃসঙ্কোচ। মায়ামনুজ বামও পাশমুক্ত। পাছে পাশবদ্ধ হন বলিয়া প্রভু সংসারে কখনই লিপ্ত ছিলেন না। তিনি নিরভিমান। সুতরাং কুলশীল জাতি ইত্যাদি পাশ তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহার যত অভিমান অনন্ত চিদানন্দময়ী তারার উপর। সুতরাং সে অভিমান সঙ্কোচক নহে বরঞ্চ বিকাশক। সকলই তাঁহার চক্ষে তারা মূর্ত্তি। তিনি কোন জীবকে নীচজ্ঞান করিতেন না। সুতরাং তাঁহার ঘৃণা ছিল না। কুক্কুরাদি যাহা আমাদের চক্ষে অস্পৃশ্য তাহাদের সহিত একত্র ভোজনেও তাঁহার কখনও দ্বিধা হইত না। তিনি কোন জীবের কখনও অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না। তজ্জন্য তাঁহার কোন জীব হইতে অনিষ্টপাত শঙ্কা বা অনিষ্টপাতজনিত শোক আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার অসচ্চিন্তা ছিল না, তদ্‌গোপনের কারণও ছিল না। তিনি কখন লোকনিন্দা করেন নাই। কেহ তাঁহার ভাব না বুঝিয়া নিন্দা করিলে তিনি নিজ মহত্বস্থাপনের কোন চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার হৃদয় স্বতঃপূত। লজ্জার উদয় তাঁহার হৃদয়ে সম্ভবপর ছিল না।

তিনি বাম তাঁহার কোন কাম বিকার আসিত না। কুলের কুলবধুগণও তাঁহাকে দিগম্বর দেখিয়া লজ্জা পাইতেন না। তিনি মদ্য পান, গঞ্জিকা সেবন

পাশমুক্ত

করিতেন বটে কিন্তু আত্মতৃপ্তির জন্য নহে। মদ বা গঞ্জিকা তাঁহার তারামগ্ন মনকে বিচলিত করিতে অসমর্থ ইহা দেখাইবার জন্যই তাঁহার মদ্যাদিসেবন। মদিরা সেবনে তিনি কখনও মত্ত হন নাই বা তারাধ্যান হইতে বিচ্যুত হন নাই। হৃদয়দৌর্ব্বল্য রূপ ভয় তাঁহার ছিল না। মহাশ্মশানে মহানিশায় তিনি কেলি করিয়াছেন। সকলই তারামা; সুতরাং তাঁহাকে কে ভয় দেখাইবে? শাক্ততন্ত্রে ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মহামায়া বরাভয়পাশধারিণী অর্থাৎ তাঁহারাই জীবকে ভোগদ্বারা বদ্ধ করেন এবং মহাবিদ্যারূপ অনুগ্রাহিকশক্তিদ্বারা পাশমুক্ত করেন। বাম সেই মহাবিদ্যার একান্ত শরণাগত। তাঁহাকে মহামায়া অবিদ্যামূর্ত্তি দেখান নাই। পরাশক্তির অনুগ্রাহক ভাবই তিনি পাইয়াছিলেন।

শৈবাগমের পাশ অর্থাৎ মল প্রভৃতি তাঁহাতে স্থান পায় নাই। তিনি

আজীবন কখনও মিথ্যাজ্ঞানের অনুশীলন করেন নাই। সচ্চিদানন্দময়ী তারার ধ্যানে আত্মহারা ছিলেন। তাঁহাতে মিথ্যাজ্ঞানাদির অবকাশ থাকিতে পারে না। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই তিনি সেই তারার পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কখনও স্বর্গাদি কোন পারত্রিক বা ঐশ্বর্য্যাদি কোন ঐহিক ফল কামনা করেন নাই। তাঁহার বন্ধন অসম্ভব। পরাশক্তিভজনের অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবার জন্য এবং সেই আনন্দভাবের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাশবদ্ধ জীবকে দিয়া পাশমুক্ত করিবার জন্যই তাঁহার পুর্য্যষ্টকধারণ।

১৩। আত্মারাম

রমমাণশ্চিদানন্দে তারাব্রহ্মস্বরূপিণি।
আত্মারামঃ পরানন্দো রামঃ শরীরবানপি॥

তারাই ব্রহ্ম, তারাই আত্মা—তারাই চিদানন্দ অর্থাৎ চৈতন্যময়ী ও আনন্দময়ী। সেই তারাতে যে রাম সর্ব্বদা বিহার করেন তিনি দেহী হইলেও পরমানন্দময় আত্মারাম।

সুখদুঃখানুভূতি জীবের স্বতঃসিদ্ধ। ইষ্টলাভে প্রফুল্লতা সুখ; ইষ্টবিঘাতে বা অনিষ্টাপাতে বিষন্নতা দুঃখ। ন্যায়মতে বাধনা বা তাপ দুঃখের লক্ষণ।

বাধনালক্ষণং দুঃখম্। —ন্যায়সূত্র ১।১।২১

দর্শনের ভাষায় সুখ অনুকূলবেদন; দুঃখ প্রতিকূলবেদন। ন্যায় ও
সুখ ও দুঃখ
বৈশেষিকমতে আত্মা দ্রব্য; সুখ ও দুঃখ তদাশ্রিত গুণ যাহা দ্বারা আত্মার অনুমিতি হয়।

রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাঃ সংখ্যাঃপরিমাণানি পৃথকত্বং
সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ
সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চগুণাঃ। —বৈশেষিক দর্শনে ১।১।৬

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ,
ন্যায়মত
পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই কয়েকটী গুণ।

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।—ন্যায়সূত্র ১।১।১০

পরমাত্মাতে সুখ ও দুঃখ দ্বেষ নাই। তাঁহার জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্ন নিত্য।

জীবাত্মার জ্ঞানেচ্ছাদি ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগজন্য, তাহা ধ্বংসশীল। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ। অনুমিতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য। সুখ ও দুঃখ জ্ঞানাতিরিক্ত। তদনুভব আত্মমনঃসংযোগসাপেক্ষ। এই সংযোগ অপ্রাপ্তপ্রাপকরূপ সম্বন্ধ নহে, বৃত্তিনিয়ামকরূপ বিশিষ্টসম্বন্ধ। আত্মারিক্ত পদার্থে আত্মীয়ত্ববোধরূপ অহঙ্কার বা মিথ্যাজ্ঞান ঐ সংযোগের হেতু। পরমাণু এবং আত্মা প্রভৃতি নিত্য। পরমাণু-সংযোগাদি সৃষ্টি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর আরাধনাদি দ্বারা পদার্থনিচয়ের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে রাগদ্বেষরূপ দোষাপগমে জীবন্মুক্তি। ক্রমে বাসনার বা প্রবৃত্তির নাশে

ন্যায়মত

জন্মাপায়ে দুঃখাত্যন্তধ্বংসরূপ আত্মারঅপবর্গ বা সর্ব্ববিপ্রয়োগ ও সর্ব্বোপরম। তখন আত্মা শান্ত। তাঁহার বৃত্তিজজ্ঞানাদি গুণ নাই, কিন্তু তদধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে। দুঃখ নাই, সুখ সংবেদন নাই।

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্। —বৈশেষিক দর্শন ১।১।৪

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।
—ন্যায়সূত্র ১।১।২

অপবর্গঃ—শান্তঃনবয়ং সর্ব্ববিপ্রয়োগঃসর্ব্বোপরমঃ। —ভাষ্য

দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ। —ন্যায়সূত্র ৪।২।১

দোষনিমিত্তংরূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতাঃ॥ —ন্যায়সূত্র ৪।২।২

সোঽয়মধ্যাত্মং বহির্বিবিক্তচিত্তো বিহরন্ মুক্ত ইত্যুচ্যতে। —ভাষ্য

মীমাংসাসূত্রে যজ্ঞাধিকারমুখে আত্মার কর্তৃত্ব ও স্বর্গাদিভোগিত্ব স্বীকৃত। ভাষ্যবার্ত্তিকাদিতে আত্মবাদাদিসন্নিবেশে মীমাংসা দর্শনত্বে পরিণত। তন্মতে

মীমাংসামত

জ্ঞানেচ্ছাদি অহংপ্রত্যয়জ্ঞেয় জ্ঞাতার বা আত্মার গুণ হইলেও তদনুভূতি বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধাধীন হওয়ায় কর্ম্মসহকৃত তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে তৎসম্বন্ধবিলয়ে রাগদ্বেষাপায়ে জীবন্মুক্তি, পরে প্রারব্ধক্ষয়ে শরীরপাতে জ্ঞানাদিগুণোচ্ছেদে দুঃখহীন, জ্ঞানশক্তিমাত্রাবস্থানরূপ পরমমোক্ষ। তাহাতে আনন্দাভিব্যক্তি নাই।

স্বয়ংবেদ্যঃ স সম্ভবতীত্যাদি ভাষ্যে। অহংপ্রত্যয়বিজ্ঞেয়ো জ্ঞাতানঃ সর্ব্বদৈব হি ইতি শ্লোকবার্ত্তিকে মুক্তস্যজ্ঞানস্যাভাবো জ্ঞানশক্তিমাত্রাবস্থানম্। তস্মাৎ নিঃসম্বন্ধো নিরানন্দো মোক্ষ ইতি শাস্ত্রদীপিকায়াম্।

সাংখ্যমতে চিৎ জড়াত্মক জগতে দুইটি মূলতত্ত্ব আছে। চেতন, নিষ্ক্রিয় ও পরিণামশূন্য পুরুষ এবং জড়া সক্রিয়া ও পরিণামশীলা সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি। নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ সক্রিয় জড় প্রকৃতির অয়স্কান্ত-সান্নিধ্যে অয়সের ন্যায় সংক্ষোভ উপস্থিত হইলে মহৎতত্ত্ব বা অধ্যবসায়াত্মিকা চিদুপরাগযুক্তা বুদ্ধি, বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে স্বাত্ত্বিক সংকল্পবিকল্পাত্মক মনঃ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তামসিক শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধনামক পঞ্চতন্মাত্রা জন্মে। পঞ্চতন্মাত্রার বিকার ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। স্বত্ত্বগুণ প্রীত্যাত্মক বা সুখময়, রজোগুণ অপ্রীত্যাত্মক বা দুঃখময়, তমোগুণ বিষাদাত্মক বা মোহময়। সর্ব্ববিধ ত্রিগুণাত্মক বিষয়ই সুখদুঃখমোহময়। এতন্মতে সুখ ও দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম্ম। নিঃসঙ্গ পুরুষের সুখদুঃখানুভূতি ঔপাধিক। যেমন রক্তজবার প্রতিবিম্বে শ্বেতস্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়, সেইরূপ অবিবেকবশতঃ প্রকৃতির সহিত বিশিষ্ট সংযোগে প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখ দুঃখ পুরুষে উপসংক্রান্ত হইলে পুরুষের সুখদুঃখাভিমান হয়। পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এই বিবেকে রাগদ্বেষাপায়ে জীবন্মুক্তি। জ্ঞানপরিপাকে দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরম মোক্ষ। তখন পুরুষ শুদ্ধবুদ্ধ নিরানন্দ। যথা সাংখ্যদর্শনে—

সাংখ্যমত

> তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। ১।৯৬
> প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্। ১।১২৭
> ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্যোদৃতে। ১।১৯
> তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্। ১।৫৫
> প্রধানাবিবেকাদন্যা বিবেকস্য তদ্ধানে হানম্। ১।৫৭
> নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ। ৫।৬৬
> তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
> ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব সরোরুমাঃ॥

যোগশাস্ত্র সেশ্বরসাংখ্য। প্রকৃতির পরিণাম ঈশ্বরাধীন। পুরুষ দৃশিমাত্র অর্থাৎ কেবল চৈতন্যস্বরূপ। জ্ঞাতৃত্বও তাঁহার ঔপাধিক। স্বাতিরিক্ত সত্ত্বাদি-গুণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধজ্ঞান অবিবেক বা বিপর্য্যাস। তদ্বশতঃ সত্ত্বপুরুষ-সংযোগ। তখন পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা এবং প্রকৃতি ও তৎসৃষ্টপদার্থ দৃশ্য ও ভোগ্য। দ্রষ্টৃত্বাদ্যভিমান অস্মিতা। ক্রমে ইষ্টানিষ্টত্ববোধে রাগ ও দ্বেষ

এবং ইষ্টানিষ্টজনিত শঙ্কা বা অভিনিবেশ আসে।. অবিদ্যাদিপঞ্চ ক্লেশ। ক্লেশমূলই কর্ম্ম এবং তৎপরিণাম জন্ম বাসনা ভোগাদি। অস্মিতাপ্রযুক্ত সুখ-দুঃখিত্বাভিমান। সুখ ও দুঃখ চিত্তের পরিণাম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। সংসারের ক্ষণিক ও দুঃখসম্ভিন্ন সুখেও দুঃখভাবনা বিবেকীর কর্ত্তব্য। দুঃখই হেয়।

যোগমত

সত্ত্বাদিগুণ হইতে পুরুষ পৃথক্ এই জ্ঞান সত্ত্বান্যথাখ্যাতি বা বিবেক। তদ্দ্বারা পুরুষের অবিদ্যাপনয়ে জীবন্মুক্তি। ক্রমে সর্ব্বাবরণবিনির্মুক্তজ্ঞানোদয়ে দৃশিমাত্রাবস্থান বা কৈবল্যপ্রতিষ্ঠা। ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্যই তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানাদি সাধনম্। যথা যোগসূত্রে—

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃসংযোগো হেয়হেতুঃ। ২।১৭
প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থংদৃশ্যম্। ২।১৮
দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃশুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। ২।২০
স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ। ২।২৩
তস্যহেতুরবিদ্যা। ২।২৪
তদভাবে সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্। ২।২৫
অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। ২।৩
সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। ২।১৩
তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। ২।১
সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ। ২।২

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ সাধারণতঃ বেদান্ত মত বলিয়া গণিত। তন্মতে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও স্বাভিন্ন সদসৎ অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য-শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবিকৃত থাকিয়া মায়াবী মায়াজালের ন্যায় বস্তুশূন্য জগৎ বিস্তারপূর্ব্বক নানাবুদ্ধিরূপাধারে চিদাভাসরূপে নানাজীবভাব ধারণ করেন। শুক্তিতে রজতবৎ চিদাত্মকে দেহেন্দ্রিয় অন্তঃকরণধর্ম্ম জীব অনাদি কাল হইতে আরোপ করিয়া কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমানে সংসারী। ব্রহ্মাত্মৈক্য-রূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ঐ আরোপের বা অধ্যাসের নিবৃত্তিতে জীব প্রথমে জীবন্মুক্ত পরে প্রারব্ধক্ষয়ে প্রপঞ্চবিলয়ে অশরীর পূর্ণব্রহ্মরূপ পরম মোক্ষ। উভয়বিধ মোক্ষে আত্মা সচ্চিদানন্দময় আত্মারাম।

অস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য

তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ, তদ্বিপর্য্যয়েণবিষয়িণঃ। তদ্ধর্ম্মাণাংচ বিষয়েঽধ্যাসোমিথ্যা।** কোঽয়মধ্যাসো নামেতি? উচ্যতে।

স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বাদৃষ্টাবভাসঃ।** তথাচ লোকেঽনুভবঃ শুক্তিকা রজতবদবভাসতে।** তমেবংলক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতিমন্যন্তে। তদ্বিবেকেন বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেনাণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে।**

বেদান্ত মত

মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদ্ভবতি॥ —সূত্রভাষ্যে ১।১।৪

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগৎ উৎপত্তিকারণং মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং মায়াবীবমায়য়া, প্রসারিতস্য জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেবোপসংহারকারণমবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য।

—সূত্রভাষ্যে ২।১।১

শঙ্কর সম্প্রদায়ের আনন্দনির্ব্বাচন পঞ্চদশী প্রভৃতিতে বিস্তারিত। চিদানন্দময় প্রতিবিম্বযুক্ত ব্রহ্মশক্তিরূপা প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণা। তাহা দ্বিধা শুদ্ধসত্ত্বা মায়া; অশুদ্ধসত্ত্বা অবিদ্যা। গুণভেদে অবিদ্যা ত্রিবিধা—অসত্তা জাড্য ও দুঃখ। দুঃখ ঐহিক আমুষ্মিক। নিখিল পদার্থে ব্রহ্মশক্তির প্রাতিভাসিক সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ বর্ত্তমান। সত্তার অনুভূতি সর্ব্বত্র স্পষ্ট। চৈতন্যের ও আনন্দের অনুভূতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের উপর নির্ভর। আনন্দ প্রধানতঃ দ্বিধা শুদ্ধ ও মিশ্র। বিশুদ্ধানন্দানুভূতির ত্রিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট—(১) যোগ (২) আত্মবিচার (৩) অদ্বৈতভাবনা। সাধনভেদে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের নাম যোগানন্দ, আত্মানন্দ এবং অদ্বয়ানন্দ। ঐ আনন্দত্রয় বৃত্তির অতীত। মিশ্রানন্দ ধীবৃত্তির গোচর। তাহা দ্বিবিধ—বিষয়ানন্দ এবং বিদ্যানন্দ। বিষয়ে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ বর্ত্তমান আনন্দের নাম বিষয়ানন্দ। পরবিদ্যাশীলনে উপলব্ধ আনন্দ বিদ্যানন্দ। ইহা চতুর্ব্বিধ—দুঃখাভাব, কামাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা।

আনন্দ

নারদপঞ্চরাত্রাদিমূলক বৈষ্ণবাগমে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ পদার্থ। জীবেশ্বরভেদে চিৎ দ্বিধা। ঈশ্বরই স্বতন্ত্র। জীবও জড় তদধীন। ঈশ্বর কেবল সচ্চিদানন্দময় নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি অশেষ গুণবান্। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি। উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে

দ্বৈতবাদি মাধ্বাচার্য্য মতে পঞ্চবিধভেদ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদি নিম্বার্কমতে ভেদাভেদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি রামানুজমতে ঈশ্বরের সহিত প্রকারতারূপে জীবজড়ের ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ অভেদ। ঐশীশক্তি বা ইচ্ছাই অবিদ্যা। জীব নির্ম্মল চেতন হইলেও অনাদিকর্ম্মবাসনাবশতঃ জগৎসঙ্গে সুখদুঃখাভিমানী ও সংসারী। জীবের অধিকারভেদে ঈশ্বরের অর্চ্চাদিপঞ্চরূপের উপাসনাফলে ভগবৎপ্রসাদে মাধ্বমতে ভগবৎসামীপ্য, রামানুজানুসারে পুরুষোত্তমপদপ্রাপ্তি। প্রাচীনমতে সামীপ্যসালোক্যসার্ষ্টিস্বারূপ্য ভেদে মুক্তি চতুর্বিধা। জীবন্মুক্তি পরমুক্তি রূপ মুক্তির ক্রমও স্বীকৃত। জীব সকলমতে নিত্যদাস। ভগবচ্চিন্তনে তাহার ভাগবতানন্দভোগ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্বসম্প্রদায়ী কিন্তু মুক্তি তাঁহাদের পুরুষার্থ নহে, প্রেমই পুরুষার্থ।

বৈষ্ণবমত

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥
স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষহশেষসদ্‌গুণঃ॥
মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তির্মোহিনীতিচ।
প্রকৃতির্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে।
বিষ্ণোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দৈরেতৈরুদীর্য্যতে॥
প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ স্বানন্দলক্ষণা।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারা নিযতির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্‌যস্মাৎ স হরিরেকরাট্‌॥

পাশুপতাদিভেদে মাহেশ্বরগণের চতুঃসম্প্রদায়। সকলকেই বৈদিকাচার্য্যগণ সেশ্বরসাংখ্য মধ্যে গণনা করেন। পাশুপতমতে পদার্থ পঞ্চ—কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। কারণ দ্বিবিধ— পতি ও প্রকৃতি। পতি স্বতন্ত্র তিনি নিত্য নিরতিশয়ক্রিয়া শক্তিসম্পন্ন। কার্য্য ত্রিবিধ—বিদ্যা, কলা ও পশু। বোধাবোধ স্বভাবভেদে বিদ্যা দ্বিধা। বোধস্বভাবা বিবেকাবিবেক প্রবৃত্তিভেদে দ্বিবিধা। বিবেকপ্রবৃত্তির নামান্তর চিত্ত। চিত্ত দ্বারা জীবের বৃত্তিজজ্ঞান। চেতন পরতন্ত্রা অচেতনপদার্থের নাম কলা; তাহা পুনরায় কারণাখ্যা ও কার্য্যাখ্যা। অধ্যবসায় অভিমানসঙ্কল্পবৃত্তি বুদ্ধি অহঙ্কার মনোরূপ অন্তকরণত্রয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় কারণ কলা পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও গন্ধাদি

পঞ্চ গুণ কার্য্যকলা। পশু দ্বিবিধ—সাঞ্জন বা সমল এবং নিরঞ্জন বা নির্ম্মল। শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধী সাঞ্জন পশু সংসারী জীব। তাহার চিত্ত বিবিধ অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হইলে পতির সহিত যোগে অর্থাৎ তদেকচিত্ততায় পতির প্রসাদে নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিলাভে নিরঞ্জনতারূপ মোক্ষলাভ। পাশমুক্ত হিল্লোলে শৈবমত বিস্তারিত। প্রথম যোগভোগাত্মক জীবন্মোক্ষ এবং পরিশেষে প্রারব্ধক্ষয়ে দুঃখান্তক মাহেশ্বর্য্যরূপ পরমমোক্ষ।

পাশুপতমত

শাক্তাগমে শক্তি ও চৈতন্য পৃথক্ নহে। উভয়াত্মিকা চণকাকারা সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি সাকারা-নিরাকারা সগুণাতীতা সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী। তিনি অবিদ্যাবিদ্যারূপে জীবের বন্ধমোক্ষহেতু। তাঁহার আরাধনার ফল ভোগস্বর্গাপবর্গ। জীবাত্মা তাঁহার স্ফুলিঙ্গস্বরূপ অতএব সচ্চিদানন্দশক্তিময়। পরমা প্রকৃতির দ্বিধা ভেদ পরা ও অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণা মহতত্ত্বাদির জননী। নিখিল পদার্থে পরমকারণের সচ্চিদানন্দশক্তি বর্ত্তমান। গুণতারতম্যে সচ্চিদানন্দশক্তির অভিব্যক্তি। পরমা প্রকৃতির লীলা বস্তুশূন্য মায়া না হইলেও পারমার্থিকী না হওয়ায় মায়াতুল্যা। সুতরাং তাঁহাকে মহামায়া বলা হয়। তাঁহার দৈবগুণময় মায়াসৃষ্টির সৌন্দর্য্যাদিতে জীব মুগ্ধ হইয়া ভোগ চাহিলে কল্পতরুস্বরূপা মহামায়া ভোগ দেন। রাগদ্বেষবশতঃ সুখদুঃখাভিমানী জীব সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান ও ভোগ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অপবর্গ চাহিলে করুণাময়ী অপবর্গ দেন। তদ্গতচিত্ততার ফলে জীবের তত্ত্বজ্ঞানে যোগভোগাত্মক চিদানন্দশক্তিময় জীবন্মোক্ষ ও পরে পরম মোক্ষ। জীবের ত্রিবিধ ভাব—পশু, বীর ও দিব্য। ভাব ভেদে মোক্ষের ভেদ। পশুভাবীর মোক্ষ বৈষ্ণবশৈবমোক্ষসদৃশ সামীপ্য সালোক্য সার্ষ্টিসারূপ্য মহৈশ্বর্য্যের সমন্বয়। বীরদিব্যভাবীর মোক্ষ সাযুজ্য হইলেও তাহা অদ্বৈতবাদীর মোক্ষ হইতে বিশিষ্ট। শাক্তমত বেদাগমের পূর্ণ সমন্বয়।

শাক্তমত

অচিন্ত্যাপি সাকারশক্তিরূপা প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্ত্তিঃ।
গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥
বিশুদ্ধা পরা চিন্ময়ী স্বপ্রকাশামৃতানন্দরূপা জগদ্ব্যাপিকা চ।
তবেদৃগ্বিধা যা নিজাকারমূর্ত্তিঃ কিমস্মাভিরন্তর্হৃদি ধ্যায়িতব্যা॥

—মহাকালসংহিতা॥ ১৯

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা ॥
চণকাকৃতিবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপিকা।
অনাদিরূপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ ॥
জ্বলদগ্নির্যথা দেবি স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
তস্মাশ্চ্যুতঃ পরো বিন্দুর্যদাভূম্যৌপতত্যপি ॥
তদৈব সহসা দেবী শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি।
স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে।
চতুরশীতিলক্ষংহি জন্ম প্রাপ্নোতি সোঽব্যয়ঃ ॥ —নির্ব্বাণতন্ত্রে
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বংসর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রীহর্ত্রী চ পালিকা ॥ —মহানির্ব্বাণে
সাবিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।
আরাধিতা সৈবনৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ —মার্কণ্ডেয় পুরাণে

আত্মনিষ্ঠতা, আত্মক্রীড়া ও আত্মানন্দ আত্মারামশব্দের যৌগিকার্থ। পরমেশ্বরই আদি আত্মারাম। তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মক্রীড় ও আত্মানন্দময়।

ভূয়এব বিবিৎস্যামি ভগবানাত্মমায়য়া।
যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্বিভাব্যমধীশ্বরৈঃ ॥
যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিং পরঃ পুমান্ ॥
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়াং করোতি বিকরোতি চ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৩।৬,৭

পরীক্ষিৎ গুরু শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভগবান আত্মমায়া বিস্তার করতঃ যেরূপে এই বিশ্বসৃষ্টি করেন সেই ব্রহ্মাদিপ্রজাপতিগণের দুর্বোধ্য তত্ত্ব আমি জানিতে ইচ্ছা করি। সেই প্রভু মহাশক্তিমান্। তিনি শক্তির আশ্রয়ে

আত্মাকে ক্রীড়া করাইয়া সৃষ্টি ও লয় করেন। অবতীর্ণ হইলেও ভগবান আত্মারাম থাকেন। লোকদৃষ্টিতে তাঁহার ভক্তসহ ক্রীড়া হইলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্তই তাঁর শক্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া সেই ক্রীড়া তাঁহার আত্মক্রীড়া।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৯।৪২

গোপীগণের উক্তরূপ করুণ বিলাপ শুনিয়া আত্মারাম ভগবান তাঁহাদের প্রতি সদয় হইয়া রাস বিহার করিলেন।

জীবাত্মার স্বরূপে, আত্মারামত্বে ও মুক্তিতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং আমরা জীবাত্মার স্বরূপ ও মোক্ষ বিষয়ে মতাবলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। তাহাদের মধ্যে বিরোধ বিরোধাভাসমাত্র। একই পদার্থ জীবের মানসিক ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সুখময় ও দুঃখময় হইয়া থাকে। যে রাকা সুধাকর, রোলম্বরুত, কোকিল-কূজন, বসন্ত প্রভৃতি নায়কনায়িকার মিলনে মধুময়, তাহাই উহাদের বিরহদশায় বিষময়। সুখদুঃখাদি দশা বিষয়ের ধর্ম্ম বা গুণ হইলে তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটিত না। এইরূপ ভাবুকগণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া ন্যায়বৈশেষিক বলিয়াছেন যে সুখ ও দুঃখ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমগত গুণ নহে, আত্মগতগুণ। কিন্তু প্রণিধানে বুঝায় যে শব্দাদি বিষয়ও

সমন্বয়

সুখদুঃখময়। কটুতিক্তাদি রস, পূতিগন্ধাদি প্রফুল্লচিত্তের উদ্বেজক। সুগন্ধাদি বিষণ্ণ চিত্তকেও প্রফুল্ল করে। অগ্নিস্পর্শে দাহজনিত ব্যথা চিত্তভাবের উপর অল্পই নির্ভর করে। আবার ইহাও ঠিক যে সম্পূর্ণরূপে মনঃ প্রত্যাহৃত হইলে শীতোষ্ণাদি দ্রব্যস্পর্শেও সুখ-দুঃখবোধ থাকে না। সুতরাং সাংখ্য সুখদুঃখকে প্রকৃতির অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়ের এবং চিত্তের উভয়ের ধর্ম্ম বলেন। আরও বৃত্তিজ জ্ঞানেচ্ছাদি আত্মগুণ হউক কিংবা চিত্তের ধর্ম্ম হউক মোক্ষে আত্মার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অভাব সর্ব্বসম্মত। ন্যায়বৈশেষিকের জ্ঞান অধিষ্ঠাতৃত্ব ও মীমাংসকের জ্ঞানশক্তি নামান্তরমাত্র। সাংখ্যাদির চৈতন্য বৃত্তিজজ্ঞান নহে; প্রত্যুত তদবভাসক জ্ঞান-শক্তির পূর্ণ বিকাশ। আত্মস্বরূপ বা বিদেহ আত্মারাম আত্মা কেবল চৈতন্যময় সত্তা হইলে মুক্তাবস্থায় তাহাতে আনন্দ থাকিতে পারে না। শাস্ত্র ভূয়োভূয় বলিতেছেন যে মুক্তাত্মা পরমানন্দময় এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দানুভূতি

আছে। তাই বেদান্তমতে আত্মা সচ্চিদানন্দ। অন্যান্য দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি দ্বারা আনন্দের সিদ্ধিপ্রয়াস প্রৌঢ়বাদমাত্র। আত্মার আনন্দ স্বভাব মৈত্রেয়ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদাদি দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত শ্রুতি গৌণানন্দ প্রতিপাদনপর নহে। শ্রুতি শুদ্ধাত্মার অকরণচৈতন্য আনন্দবৎ শক্তিও স্বীকার করেন।

পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল্ ক্রিয়াচ।

বিদেহাত্মারাম

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ অঃ ৮ শ্লোঃ

অপাণিপাদো জবনো'গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃসশৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

অতএব শক্তিতন্ত্রের সমন্বয় এই যে সচ্চিদানন্দশক্তিমত্তা মুক্তাত্মার স্বরূপ। তাহাই বিদেহাত্মারামত্ব।

জীবন্মুক্তি দর্শনাগমের বিপ্রতিপত্তি নাই। কর্ম্মের বা ভক্তির বলে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে রাগদ্বেষাপগমে জীবন্মুক্তি সর্ব্বসম্মতা॥ তখন শরীরসম্বন্ধ শিথিল। বৃত্তিজ জ্ঞানাদি থাকিলে জীবন্মুক্ত নির্লিপ্ত। প্রতিসন্ধান, অনুবন্ধ, ফলাকাঙ্ক্ষাদি না থাকায় তাঁহার নূতন কর্ম্মসঞ্চয় নাই। তখন তিনি কেবল প্রকৃতির লীলাদ্রষ্টা। প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের জন্য তাঁহার শরীরধারণ। তাঁহার শারীর কর্ম্মভোগে সুখদুঃখাদিবোধ থাকে না বলিলেই হয়। জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ—আত্মনিষ্ঠ ও পরমাত্মনিষ্ঠ। আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানপ্রধান। পরমাত্মনিষ্ঠ ভক্তিপ্রধান। জীবন্মুক্তের যোগানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ থাকায় আত্মারামত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

জীবন্মুক্তারাম

সমাধিনির্ধৃতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরাতদা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥

—পঞ্চদশীধৃতঃ।

সমাধি দ্বারা চিত্তের মল নষ্ট হইলে আত্মনিষ্ঠ চিত্তের যে সুখোদয় হয় তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। তাহা কেবল অন্তঃকরণ দ্বারা বুঝা যায়।

যোগানন্দ

এই আনন্দই যোগানন্দ। প্রকৃতিলয় পর্য্যন্ত ঘটিলেও যোগীর ব্যুত্থান বা সমাধিভঙ্গ ঘটে না। সমাধিভঙ্গে আনন্দ থাকে না। চৈতন্যলয়ে বা কৈবল্যে

আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন ও নিরুপাধি। তাহাই ব্রহ্মানন্দ বা অদ্বয়ানন্দ। তাহার পরিচয় যথা—

মানসে প্রবিলীনে তু যৎ সুখং চাত্মসাক্ষিকম্।
তদ্‌ব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং সা গতির্লোক এব চ॥

—মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।২৪

ব্রহ্মানন্দ

মানস বা চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইলে আত্মসাক্ষিক অর্থাৎ স্বসংবেদ্য যে পরমানন্দ তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত বা নিত্য, তাহাই শুক্র বা জ্ঞানজ্যোতিঃ। তাহাই জীবের পরমগতি, তাহাই জীবের শ্রেষ্ঠ লোক বা অবস্থা।

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত অহংব্রহ্মাস্মিভাবনা দ্বারা নিজাত্মাকে অনন্ত প্রসারিত করিয়া তাহাতে অন্তর্বাহ্য জগৎ প্রলীন করিয়া দেয়। ভক্ত জীবন্মুক্ত নিজাত্মাকে অনন্ত পরমাত্মাতে বিলীন করেন। গীতায় জ্ঞানী জীবন্মুক্তের নাম যুক্ত।

যুক্ত

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচতে তদা॥—গীতা ৬।১৮

যখন স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্ত সর্ব্বকামনা পরিত্যাগে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মাতে সম্যক্ অবস্থিত হয়, তখন জীব যুক্ত নামে অভিহিত হয়। এই যোগের প্রথম ফল ব্রহ্মভূতত্ব ও পরমানন্দ প্রাপ্তি।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ —গীতা ৬।২৭

আত্মারাম

এই যোগীর মন প্রশমিত। রজোগুণ ধ্বস্ত। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও নির্ম্মল। তিনি উত্তমানন্দ লাভ করেন। ব্রহ্মভূতত্ব হইলে ব্রহ্মসংস্পর্শজ পরমানন্দ উথলিয়া উঠে। জ্ঞানী জীবন্মুক্তের গতি ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মে বিলয়—

ব্রহ্মনির্ব্বাণ

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব চ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥—গীতা ৫।২৪

যোগী আত্মনিষ্ঠ; তিনি বাহ্যপদার্থে সুখ চান না। তিনি অন্তরের নিত্যানন্দ পান। তজ্জন্য তিনি আত্মাতে রমণশীল। তাঁহার অন্তর্জ্যোতি বা পরমার্থ জ্ঞান উদ্ভাসিত। তিনি ব্রহ্মভূত, এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন।

ভক্তের যোগধারা শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবহুতিসংবাদে প্রদত্ত। তিনি ভগবন্মূর্ত্তিতে চিত্তনিবেশ করেন। তৎফলে যখন সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে তখন তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। ক্রমে তিনি আত্মহারা হইলে সেই বিশিষ্ট রূপবিলয়ে বিশ্বরূপ ও ভগবদ্ভাব জাগ্রত হয়। সেই মহাভাব মহানন্দময়। শেষে তিনি পরমাত্মনিষ্ঠ হইয়া পরমাত্মাতে বিহার করেন। তিনিও পরমানন্দময়। দেহস্থ বসনের প্রতি মদিরা মদান্ধের ন্যায় তাঁহার দেহাদির প্রতি লক্ষ্য নাই। পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম। প্রারব্ধক্ষয়ে শরীর পাতে চরম মোক্ষ।

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্‌হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥
মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥
সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
ভক্তাত্মারাম
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥
দেহঞ্চ তন্ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসোযথা পরিহৃতং মদিরামদান্ধঃ॥
দেহোঽপি দৈববশগঃ খলুকর্ম্মযাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুন র্নভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৮।৩৪-৮

ভক্তির এমনই মাধুর্য্য যে জ্ঞানী ব্রহ্মভূত হইয়াও ভক্তির আস্বাদনে তৎপর

হন। তখন তাঁহার ভক্তি পরা অহৈতুকী। তৎকালে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ভগবৎপ্রবেশ।

ভগবৎ প্রাপ্তি

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

—গীতা ১৮।৫৪-৫৫

যিনি ব্রহ্মভাব পাইয়াছেন তাঁহার আত্মা সর্ব্বদাই প্রসন্ন। তিনি ইষ্টালাভে শোক করেন না। বাহ্যপদার্থে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শন। তিনি পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। ভক্তির বলে তিনি ভগবৎস্বরূপ জানিতে পারেন এবং তাহা জানিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ হন। ইহাই ভক্তাত্মারামের গতি। আত্মারামের কোন বাহ্য কর্ম্ম নাই।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ —গীতা ৩।১৭

যিনি আত্মাতেই রত, যিনি আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত, যিনি আত্মাতেই পরিতোষ প্রাপ্ত, তাঁহার বাহ্য কর্ম্ম নাই। তিনি জ্ঞানযোগী হইলে আত্মচিন্তনপর, ভক্তিযোগী হইলে পরমাত্মচিন্তনপর। তাঁহার এমন বাহ্য প্রাপ্তব্য কিছুই নাই যাহার জন্য তাঁহাকে বাহ্যকর্ম্ম করিতে হইবে। তবে লোকশিক্ষার জন্য ভক্তাত্মারাম বাহ্য ভগবৎসেবন করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তাত্মারামের তান্ত্রিক চিত্র কথা—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি॥
অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ॥
মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ॥
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখেঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিঃস্পৃহঃ।
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ॥
নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ।

বিগতামর্ষভীর্দ্দান্তো নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ ॥
শোকদ্বেষবিনির্ম্মুক্তঃ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা।
নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী ॥

—মহানির্ব্বাণে।

জীবন্মুক্তাত্মারামের পূর্ণ লক্ষণ রামে ছিল। তিনি শীতবাতাতপসহ, অনিকেত, নিঃসঙ্গ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, বিধিনিষেধাতীত, নির্যোগক্ষেম; সমদুঃখঃসুখ, সদানন্দ, নিঃসঙ্কল্প, তুল্যমানাপমান, দ্বন্দ্বাতীত সন্ন্যাসী। অন্তর্ভাবে তিনি আত্মনিষ্ঠ পরম জ্ঞানী। লোকশিক্ষার জন্য তিনি তারাস্বরূপপরমাত্মনিষ্ঠভক্ত। তাঁহার বাহ্য বিষয়ে অভিলাষ ছিল না। তিনি পার্থিব সুখ ও দুঃখে অবিচলিত। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ সর্ব্বদাই কুল কুল বহিত। তিনি সমদর্শন, প্রসারাত্মা, ব্রহ্মভূত হইয়াও ব্রহ্মময়ী তারার প্রতি অহৈতুকী পরাভক্তি আজীবন রাখেন। তাঁহার বাহ্যকর্ম্মও ছিল না। তিনি যথার্থ পরমানন্দময়ীকে জানিয়াছিলেন। তাঁহার চরণই তিনি "স্থূল" করিয়াছিলেন। সহজে তাঁহার বিষয়ে ভুল হইয়াছিল। তারানামামৃতপানে রজনীদিনে তাঁহার আঁখি ঢুলু ঢুলু ছিল। তিনি পরমানন্দময় এবং প্রাণিহিতে রত; দুঃখময় সংসারে পরমানন্দের স্বাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার দেহাবস্থায় সঙ্গ পাইয়াছেন, এমন কি বিদেহাবস্থাতেও তাঁহাকে যিনি স্মরণ করেন তিনিই আনন্দামৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। রাম জ্ঞানভক্তিসমন্বিত জীবন্মুক্ত পূর্ণাত্মারাম।

বাহ্যানুষ্ঠান

সোঽস্তর্ভূর্মানন্দতৃপ্তো নৈষীৎ সুখলবং বহিঃ।
সুধাকরসুধায়াং হি চকোরো ভাবনির্ভরঃ॥

নিজ পরমানন্দ দ্বারা তৃপ্ত সেই রাম বাহিরে ক্ষণিক সুখ লেশের অন্বেষণ করেন নাই। তিনি চকোর, সুধাকরের সুধাতেই নিবিষ্টচিত্ত।

সন্ন্যাসালোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বাহা স্বধা অর্থাৎ দেবার্চ্চন ও পিতৃযজ্ঞাদি কোন বাহ্যানুষ্ঠান বিহিত নাই। আবার যে সন্ন্যাসী আত্মারাম তাঁহার ঐরূপ কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ॥
—গীতা ৩।১৮

সেই আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত পুরুষের কর্ম্মকরণের প্রয়োজন নাই। তাঁহার কোন কর্ম্ম সম্পন্ন না হইলেও কিছু আসে যায় না। তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধি কোন ভূতেরই উপর নির্ভর করে না।

আত্মরামের বাহ্যানুষ্ঠান

পরমানন্দলাভই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিত্যানন্দ আত্মনিহিত। বহির্মুখী জীব অন্তর্মুখী না হইলে আত্মানন্দ পাইতে পারে না। অন্তর্মুখীন করিবার জন্যই শাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধিকর বিধিনিষেধ। বাহ্যানুষ্ঠানই বিধিনিষেধাত্মক। যিনি অন্তর্মুখী আত্মপ্রতিষ্ঠ তিনি বিধিনিষেধের অতীত। বাম আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট নিত্য সন্ন্যাসী। তাঁহার চিত্ত স্বতঃ শুদ্ধ। চিত্তশুদ্ধিকর বাহ্যানুষ্ঠান তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই।

তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিতেন। কিন্তু স্বস্তিকাদি আসনে বসিয়া ইষ্ট ও গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করতঃ জপ সমাপন পূর্ব্বক—

ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিবিধায়িনে।
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে॥
—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে

—ইত্যাদি মন্ত্রে গুরু বা ইষ্ট প্রণাম করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। তিনি আদর্শ গুরুভক্ত ও গুরুতত্ত্বের পারদ্রষ্টা। গুরু চিন্তা তাঁহার নিরন্তরা। গুরুশক্তি যে চিন্ময়ী আদ্যা মহাশক্তি ইহা তাঁহার সম্যক উপলব্ধ ছিল। ক্ষণিক তত্ত্বপলব্ধির জন্য নিদ্রাক্রোড়ে বিশ্রামের পর জগজ্জাগরণের পূর্ব্বে ঐ অপার্থিব ভাবে মনকে প্রস্তুত করিবার তাঁহার আবশ্যকতা ছিল না।

গুরুচিন্তা

তিনি প্রাতঃকৃত্য প্রায়ই প্রাতঃকালে করিতেন। যেদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত সেদিন বলিতেন "তারামা মাখন দিয়াছেন", যেদিন পরিষ্কার হইত না সেদিন বলিতেন "তারামা কুচ্‌লে বড়ি করেছেন।" প্রাণাপানসমানোদানব্যানাদি পঞ্চ বায়ুর কার্য্য তারামারই কার্য্য বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন। শৌচান্তে জলাশয়ে সমন্ত্রক স্নান

প্রাতঃকৃত্য

সূর্য্যার্ঘাদিদানও তাঁহার ছিল না। কখনও প্রাতে, কখনও মধ্যাহ্নে জীবৎকুণ্ডে না হয় দ্বারকায় স্নান ঘটিত। কখনও কুণ্ডকে অনেকক্ষণ জল মগ্ন থাকিতেন। শরীর যতক্ষণ না বিবর্ণ হইত ততক্ষণ স্নান চলিত। তাঁহার আসনমূদ্রাদি সিদ্ধপুরুষগণও বুঝিতে পারেন নাই। কখন দ্বারকার বন্যাস্রোতেও স্থিরভাবে ভাসমান থাকিতেন। এ মুদ্রাও অসাধারণী। ত্রৈলঙ্গ স্বামী খরস্রোতোগঙ্গাবক্ষে বারাণসীতে এইরূপ কখন কখন ভাসিতেন। বাম জলে কুলযন্ত্রাদি লিখিয়া মস্তকে জল ছিটাইতেন না। ক্ষিতি হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত কুল। ঐ কুল যে তারাযন্ত্রে যন্ত্রিত বামের তাহা করামলকবৎ আয়ত্ত। তাঁহার পক্ষে জলে ঐরূপ যন্ত্রাদির অঙ্কন কি শোভা পায়?

স্নান

স্নানান্তে শুচিবাস, তিলক, শিখাবন্ধন, সন্ধ্যাবন্দন, দেবর্ষিপিতৃতর্পণাদি বাহ্যকৃত্য বামের দেখা যাইত না। বাম সদাশুচি, সদানন্দ। তাঁহার প্রফুল্লকর শুচিভাবোদ্দীপক শুচিবস্ত্রাদিধারণ নিষ্প্রয়োজন। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও তদতীত পরম পদার্থ সেই সচ্চিদানন্দময়ের কণিকা মাত্র এইরূপ সম্যক্ ধ্যানই সন্ধ্যা। বামের সেই সম্যক্ ধ্যান সহজ। তিনি বিশ্বের কল্যাণে সর্ব্বদা জাগরূক। সুতরাং তিনি মুখে "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি বা হং যং বং লং রং ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাদি জীবের কল্যাণের জন্য শোধন করিতেন না। আপনি সন্ধ্যা কেন করেন না, প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতে পারিতেন—

সন্ধ্যা

হৃদাকাশে চিদাভাসঃ প্রতিভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥

আমার হৃদয়রূপাকাশে অখণ্ড জ্ঞানের জ্যোতিঃ নিরন্তরই দেদীপ্যমান। তাহার উদয় বা অস্ত আমি দেখিতে পাই না। দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলেই সন্ধ্যা করণীয়া। আমার সে সন্ধি অনুভব না হওয়ায় সন্ধ্যাক্ষণ বোধ হয় না এবং সন্ধ্যাবন্দনের অবসর পাই না।

কবিও সেই কথা বলিয়াছেন—

"সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়"।

বামের সন্ধ্যার কতক সন্ধান ব্রহ্মোপনিষদে পাওয়া যায়।

"যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানম্ সন্ধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥
নিরোদকা নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্ কায়ক্লেশবৰ্জ্জিতা।
সন্ধিনী সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যাহ্যেকদণ্ডিনাম্॥

আত্মা যে বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে সংযত করিয়া পরমাত্মার সহিত যোগ করিয়া দেন সেই ধ্যানাবস্থাই সন্ধ্যা। তজ্জন্যই সন্ধ্যার বন্দনা দ্বিজাতির কর্ত্তব্য! একদণ্ডী অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সন্ধ্যা নিরোদকা অর্থাৎ বাহ্যানুষ্ঠানশূন্যা। তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণাদি কায়িকক্লেশ নাই। তাহা সর্ব্বভূতের সন্ধিনী অর্থাৎ ব্রহ্মৈক্যবোধিকা।

তর্পণ তর্পণের উদ্দেশ্য আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জীবের তৃপ্তিসাধন। পরমানন্দময়ের সহিত সম্মিলনই তৃপ্তির মুখ্য দ্বার। যে বাম সেই পরামানন্দময়ে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহার আনন্দময় চিন্তায় জগৎ আনন্দময়, তিনি কেন

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসো সুরাঃ

ইত্যাদি বাহ্যমন্ত্রে জীবের বাহ্যতৃপ্তি সাধনে যত্নবান হইবেন?

পূজাপাঠ ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম জীবের অবোধ্য। গুণময় ব্রহ্মই উপাস্য। তাঁর কারুণ্যমহিমাদিই গুণ। ঐ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিলে জীবের হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির উদয় হয়। ভক্তির উৎসই পূজন, স্তোত্র প্রভৃতি। তৎশ্রবণে পাষণ্ডেরও হৃদয়ে ক্ষণিক ভাবাবেশ হয়। তৎফলে চিন্তাজ্বরজর্জ্জরিত দুঃখময় সংসারী জীব ক্ষণকালের জন্য দুঃখ বিস্মৃত হইয়া আনন্দময়ভাবে পড়ে। যে বামের প্রাণমনঃ সেই অনন্ত মহিমাময়ীর সদানন্দভাবে সদাই বিভোর, তিনি সেই ক্ষণিকানন্দময়ভাব-জাগরণের জন্য বাহ্যপূজাপাঠাদি কেন করিবেন? প্রতি নিশ্বাসে, প্রতিপলে, প্রতিচিন্তায় তিনি মার গুণানুভব ও গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রেমানন্দে প্রমত্ত। তবে জীবের ভক্তিভাব জাগাইবার জন্য কখন কখন

দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণং প্রিয়াম্
সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম্॥
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

—প্রভৃতি স্তোত্র পড়িতেন।

গীর্ব্বাণী ওজস্বিনী হইলেও মাতৃভাষার ন্যায় সাধারণের হৃদয়স্পর্শিনী নহে। তাই রামপ্রসাদাদির হৃদয়োচ্ছ্বাস মাতৃভাষায়। সেই উচ্ছ্বাসে বঙ্গবাসীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত। বাম কখন সেই উচ্ছ্বাসময়ী স্বরলহরী তুলিয়া কখন বা জয় তারা জয় দুর্গাদি নাদে মর্ত্ত্যধাম প্রেমের তরঙ্গে প্লাবিত করিতেন।

সঙ্গীত

যেমন বহির্জ্জগতে রাজদর্শন সহজে ঘটে না ও তৎপূর্ব্বে রাজকর্ম্মচারিদের উপাসনা আবশ্যক, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতেও ইষ্ট দেবতাদির দর্শন জন্য অগ্রে দ্বারদেবতাদির পূজা অর্থাৎ অভীষ্ট মহাভাবের জাগরণ জন্য পূর্ব্বে তৎপরিপোষক ভাবের উপলব্ধি চাই। সেই জাগরণের বিরোধী অসদ্ভাবই বিঘ্নকর ভূত-প্রেতাদি। তাহাদের অপসরণ জন্য দিক্‌বন্ধন। ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য পাঞ্চভৌতিক শরীরাদি ও পঞ্চভূতাদিতে চৈতন্যময় ভাবনা। রক্তমাংসের শরীরে মন রক্তাদিস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বায়ুর প্রভাবে ছুটিতেছে। ঐ স্রোত ঐ শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণায়ামাদি দ্বারা স্তব্ধ করিলে মন স্থির হয়। সদ্ভাবুক বামের মন সহজে শান্ত। সে মন ভক্তিস্রোত প্রবমান, রক্তাদিশরীরস্রোতে সে মন বিচলিত নহে। ঐ মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনকর ভূতশুদ্ধি, দিগ্বন্ধন, প্রাণায়ামাদি পিষ্টপেষণ মাত্র। অভীষ্ট মহাভাবের নিত্যোপলব্ধি তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্য দ্বারদেবতাদিপূজার বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার কেন থাকিবে? কখনও পুষ্পাদি লইয়া বাহ্যতঃ কোন মন্ত্র না পড়িয়া লোকশিক্ষার সদুদ্দেশ্যে ছড়াইয়া দিতেন মাত্র। জয় জয় তারাদি নামকীর্ত্তনও তজ্জন্য করিতেন। বামাচারও বাহ্যতঃ রাখিয়াছিলেন।

অর্চনা

নাম কীর্ত্তন

ভক্তাবতার

আজন্মতারা-চরণৈক-লক্ষ্যং
তারাময় প্রাণ-মনস্‌শরীরম্।
লোকোত্তরং ভক্তিময়াবতারং
বামাভিধানং পুরুষং নমামি॥

যিনি আজন্ম তারার চরণকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, যাঁহার প্রাণ, মন ও শরীর তারাময়, সেই অলৌকিক ভক্তিময় অবতার বাম নামক পুরুষকে প্রণাম করি।

পূজ্যে অনুরাগই ভক্তি শব্দের তাৎপর্য্য। ঈশ্বরই পরম পূজ্য। সুতরাং ঈশ্বরে অনুরাগই ভক্তির যথার্থ। প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র মতে ভক্তি দ্বিবিধা—পরা ও গৌণী। ঈশ্বরানুরক্তি পরা; তৎপরিপোষক বন্দনাদি গৌণী।

ভক্তির লক্ষণ

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। —শাণ্ডিল্য সূত্র ১।১।২

ভক্ত্যাভজনোপসংহারাৎ গৌণ্যাপরায়ৈতদ্ধেতুত্বাৎ।

—শাণ্ডিল্য সূত্র ২।২।১

ঈশ্বরে সেই অনুরক্তি পরাভক্তি। গীতায় ভক্ত্যাত্বনন্যয়া পার্থ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভজনের উপসংহার করায় ভজনাদি গৌণী ভক্তি। তাহা পরাভক্তির অঙ্গ।

পরা

বৎস! গুরুগৃহে কি শিক্ষা করিয়াছ? হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নের উত্তরে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ নবধা গৌণী ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩

বিষ্ণু বা বিশ্বব্যাপক চিদানন্দময়ে জীবের অনুরাগ অঙ্কুরিত হইলে প্রথম লক্ষণ তৎকথাশ্রবণ। শ্রবণের ফলে অনুরাগ বাড়িলে তাহা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখা দুর্ঘট হয়। তখন সেই অনুরাগ উচ্ছ্বলিত হইয়া উপাস্যের গুণকীর্ত্তনে প্রকাশ পায়। কীর্ত্তনের ফলে ভজনীয়ের মধুর নাম রূপ ও গুণ ভক্তের মর্ম্মে মর্ম্মে বসিয়া তাহা সতত স্মৃতিপটে জাগরূক থাকে এবং মাধুর্য্যধুর্য্যের শ্রীপদসেবনে চিত্ত ব্যাকুল হয়। কেবল মানসিক পদ সেবায় ভক্তের প্রাণ তৃপ্তি পায় না; তজ্জন্যই তিনি অর্চ্চন বা বাহ্য পূজায় ব্যাপৃত হন। সর্ব্ব সৌন্দর্য্যসার পুষ্পাদি অর্চ্চনের উপকরণ। পূজ্যকে কেবল তাহা প্রদান করিলেই মনস্তুষ্টি আসে না, মস্তকও বারম্বার তাঁহাকে নমস্কার করিতে অবনত হয়।

নবধা গৌণী

নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব। —গীতা ১১।৪০

হে সর্ব্বময়! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, পশ্চাতে নমস্কার করি, সর্ব্বদিকে তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপ বন্দন হেতু দাস্য ভাব জাগে।

দাস্তের পর সখ্য; শেষ আত্মনিবেদন। এই নবধা ভক্তির পৌরাণিক-আদর্শ, যথা—

নয়টি আদর্শ

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে

পরীক্ষিৎ

অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরানামশরজ্বালায় উত্তরার গর্ভ দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিরূপে তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবগণের কুলতন্তু অভিমন্যুকুমারকে রক্ষা করেন। বিষ্ণুর প্রসাদে বালক প্রাণ পাওয়ায় উঁহার নাম বিষ্ণুরাত হয়। তিনি গর্ভাবস্থায় যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি বিলোপ হয় নাই। তজ্জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর শৈশবে মনুষ্য দেখিলেই ঐ মনুষ্য সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ কিনা পরীক্ষা করিতেন বলিয়া পরীক্ষিৎ নামে অভিহিত হন।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১২ অঃ

শুকদেব

শ্রীহরি তাঁহার পৈতৃক ধন, ভক্তি তাঁহার সহজাত; তিনি মহাভাগবত। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার ভক্তি প্রসর পায় নাই। ব্রহ্মশাপে জীবনের অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইলে তাঁহার ভগবৎপ্রেম পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রায়োপবেশনে সপ্ত দিবারাত্র পরম ভাগবত শাশ্বত ব্রহ্মচারি শ্রীশুকদেবের মুখে তাপিত জীবের সন্তর্পণ শ্রীমৎ ভগবৎকথামৃত শ্রবণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তাই পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর গুণ শ্রবণে ও শুকদেব তৎকথনে আদর্শ ভক্ত।

প্রহ্লাদ

বালক প্রহ্লাদ কিছুতেই বিষ্ণুভজন ত্যাগ করিলেন না। পিতা তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য হস্তিপদতলে, অগ্নিকুণ্ডে, এবং পর্ব্বতশিখর হইতে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত করাইলেন। প্রহ্লাদ মরিলেন না। কালকূটবিষ প্রয়োগেও প্রহ্লাদের প্রাণ গেল না। তাহার কারণ বিষ্ণুপুরাণ দিয়াছেন যে বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ সমস্তই বিষ্ণুময় ভাবিতেন। তাঁহার চক্ষে হস্তীও বিষ্ণু, অগ্নিও বিষ্ণু, পর্ব্বতও বিষ্ণু, কালকূটও বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণুই

তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। এই বিষ্ণুময় ভাবনাবশতঃ তিনি সতত স্মরণের আদর্শ।

মহাপ্রলয়ে কারণরূপ ক্ষীরোদ সাগরে নিজ লীলাময় অনন্তশয্যায় শ্রীবিষ্ণু যোগনিদ্রা সমাপন্ন। তখন কোন ব্যক্ত পদার্থ নাই। কেবল নিজ অর্দ্ধাঙ্গী

লক্ষ্মী

মহাশক্তি লক্ষ্মী নিত্য সহচরী বর্ত্তমানা। তখনও তিনি হৃদয়বল্লভের পদসেবা অর্থাৎ পদ্ধতির অনুশীলন করিতেছেন। ইহাই পদসেবনের পরাকাষ্ঠা।

বেণ রাজার পাপে প্রজা উৎখাত, সমাজ বিধ্বস্ত, পৃথিবী শস্যহীনা মরু-

পৃথু

ভূমিতে পরিণতা। কৃপাপরবশ মুনিগণ সমাজের কল্যাণ জন্য শ্রীহরিকে কাতর প্রাণে ডাকিলেন। ভক্তবৎসল দয়াময় শ্রীহরি বেণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমাং মোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১৪

সৌতি শৌনকাদি মুনিগণকে শ্রীবিষ্ণুর অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিলেন, "হে বিপ্রগণ! নরপতি পৃথু শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার। এই অবতারে তিনি গোরূপধারিণী পৃথিবী হইতে শস্যাদি রত্নজাত দোহন করেন বলিয়া তিনি উশত্তম অর্থাৎ প্রজাবর্গের প্রিয়তম হন। পৃথু সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রজারঞ্জন রাজা। তাঁহার গুণে সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং পৃথিবী কামদুঘা হন। তিনি নানাবিধ যাগযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের পূজা করেন বলিয়া তিনি অর্চ্চনার নিদর্শন।"

অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত। সম্বন্ধগোরব ভুলিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে

অক্রুর

সর্ব্বদা কৃষ্ণের নিকট প্রণত। তিনি বন্দনার দৃষ্টান্ত।

শ্রীমহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত দাস। রাম ভিন্ন কাহাকেও প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রঘুপতিরূপ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া নিশিদিন

মহাবীর

দাসভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছেন। বাহ্যতঃ রাম-কার্য্যে প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনিই দাস শিরোমণি।

পাণ্ডবগণ সকলেই কৃষ্ণের পরমভক্ত। কিন্তু অর্জ্জুনের ভজন সখ্যভাবে।

তিনি নারায়ণের পুরাতন সহচর নরঋষি। উভয়ে প্রাচীনকালে বদরিকাশ্রমে যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়াছেন। কলির প্রারম্ভে ভূভার-হরণ করিবার জন্য উভয়ে অবতীর্ণ। কৃষ্ণই অর্জ্জুনের বল বুদ্ধি ভরসা। কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে কুরুক্ষেত্রজয়ী গাণ্ডীবী গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন সখ্যভক্তির দৃষ্টান্ত।

অর্জ্জুন

বলি প্রহ্লাদের বংশধর; বিষ্ণুভক্তি তাঁহার মজ্জাগত। যখন বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহার নিকট ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রার্থনা করিলেন, তখন বলিরাজের পুরোহিত ত্রিকালদর্শী ভার্গব বলিকে জানাইয়া দিলেন যে ঐ বামন সেই গোলকবিহারী দেবগণের হিতার্থে অবতীর্ণ হইয়া অসুররাজ্য ছলে অধিকার করিবার জন্য আসিয়াছেন। বলি তাহাতেও ঐ বামনকে যথাসর্ব্বস্ব দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন যে তাঁহার যাহা কিছু আছে সমস্তই পুরুষোত্তমের প্রসাদ। যদি সেই পুরুষোত্তমের দেওয়া নিধি পুরুষোত্তম যে কোনরূপেই হউক গ্রহণ করেন তাহা হইলে জন্মকর্ম্ম সফল হইবে। হাসিমুখে তিনি বামনরূপি শ্রীহরিকে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পাতালে বাস করিলেন। ইহা আত্মনিবেদনের পরিচয়স্থল।

বলি

বৈষ্ণবগণ ভক্তির বহুবিধ ভেদ দেখাইয়াছেন। ভক্তি প্রথমতঃ বিহিতা বা শাস্ত্রসম্মতা, অবিহিতা বা শাস্ত্রাবরুদ্ধা। বিহিতা ভক্তি সনিমিত্তা বা সকামা এবং অনিমিত্তা বা অকামা। অনিমিত্তাই ভাগবতী ভক্তি। তাহা দ্বিধা—মিশ্রা ও শুদ্ধা। মিশ্রা ত্রিধা—কর্ম্মমিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা। কর্ম্মমিশ্রা সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসী। সাত্ত্বিকী ত্রিবিধা—কর্ম্মক্ষয়াৰ্থা, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থা, বিধিসিদ্ধার্থা। কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা পুনঃ উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা। এই সমস্ত ভক্তি সগুণা। নির্গুণা ভক্তি অর্থাৎ ভক্তির জন্য ভক্তি শুদ্ধা। শুদ্ধভক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও চান না। ভগবৎ-সেবনেই তাঁহার অহেতুক অনুরাগ। বোপদেবের মুক্তাফলে এই সকল ভেদ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও ভক্তির নানা ভেদ প্রদর্শিত। ভক্তির মহিমা অপার। কর্ম্মমার্গ বহুলায়াস-সাধ্য। জ্ঞানমার্গ প্রথমতঃ নীরস ও দুর্গম। অচিন্ত্য অব্যক্তে মন সমাধান দেহীর পক্ষে দুরূহ। জ্ঞানের পরিপাকে আনন্দ আছে। ভক্তিপথ সরল ও সরস। ব্রহ্মসিদ্ধিকাম যোগিগণের পক্ষেও ভক্তিসদৃশ শিব পন্থা নাই।

ভক্তির ভেদ

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতে ৩,২৫।১৮

তাই আত্মারাম পরমহংসগণও অহৈতুকীভক্তি পরিপোষণ করেন

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৭।১০

এই কারণে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি সুদুর্লভা।

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ং কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করোবঃ ॥
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ ন ভক্তিযোগম্ ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তাবতার বলিয়া বিখ্যাত। তিনি কৈশোরে বিদ্যারসে চঞ্চল ছিলেন; তখন তাঁহাতে ভক্তির লক্ষণ ব্যক্ত হয় নাই। যৌবনোদ্গমে পবিত্র গয়াধামে শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মদর্শনে ও তন্মহিমা শ্রবণে তাঁহার ভক্তিসরস্বতী উচ্ছ্বলিত হইয়া ভারতের পাপপঙ্ক ধৌত করিল। ভাবাবেশে কানাই নাটশালায় তিনি মুরলীধরকে দেখিতে পাইয়া ধরিবার জন্য ছুটিলেন। শ্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁহার বিরহভাব জাগিল; অর্দ্ধোন্মাদদশা ঘটিল। তদ্দর্শনে স্নেহময়ী শচীমাতা অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হঠাৎ নবধা লক্ষণের অদৃষ্টপূর্ব্ব পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত হন। ভাবের পরিপাকে শ্রীগৌরের বাহ্যোন্মত্ততা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইল। ভক্তসঙ্গে নদীয়ায় কীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ হইল। যখন প্রভুর জ্ঞানভাব উদ্রিক্ত হইত তখন ভক্তি বিকার লুকাইত। তখন "মুঞী সেই মুঞী সেই" বলিতেন—অদ্বৈত ভাব জাগিত। তখন ভক্তগণের পূজা লইতেন, তাঁহাদের প্রাক্তন জন্মকর্ম্মের পরিচয় দিতেন। এমন কি জননীর মস্তকেও পদার্পণ করিতেন। সন্ন্যাসের পর হইতে শ্রীচৈতন্য জ্ঞানভাব সংযত

শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি

জ্ঞান

করিয়া প্রেমভাব বর্দ্ধিত করিলেন। কচিৎ কচিৎ নাম প্রচার জন্ত সার্ব্বভৌমাদিকে ষড়্ভুজাদি বিভূতি দেখাইলেন বটে, কিন্তু প্রেমের বন্তায় ভারত ভাসাইলেন। প্রচার কার্য্য সমাপ্ত হইল। তাঁহার বিরহের গভীর আর্ত্তি দেখা দিল। তখন তিনি রাধার পূর্ণভাবে ভাবিত। ভাবের ভরে নীল সমুদ্রকে নিজ প্রিয়তম নীলমণিজ্ঞানে তাহাতে ঝাঁপ দিতেন। ভাবের প্রভাবে কখন কখন তাঁহার শরীরের শিরামুখ দিয়া রক্ত ছুটিত। কখনও বা সন্ধিস্থলসকল শিথিল হইয়া তিনি দীর্ঘাকার হইতেন। তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না।

প্রেম

শ্রীবামের ভক্তি আজন্ম তীব্র। জন্মাবধিই তাঁহার প্রেমোন্মাদ ভাব। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব হইতেই তিনি ক্ষ্যাপা ভক্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার ভক্তি আজীবন একরূপই ছিল। ঐ ভক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। তিনি আপূর্য্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ। তাঁহাতে জ্ঞানগঙ্গা, ভক্তিযমুনা ও শ্রদ্ধাসরস্বতী—ত্রিধারাই মিলিত। অন্যান্ত কত শত সদ্ভাব নদ ঐ সাগরে পতিত হইলেও ঐ সাগর কখন উদ্বেল হইত না। তিনি জ্ঞানভক্তির সমন্বয়। জ্ঞানকে গুপ্ত রাখিলেও কখন তাহা ছাড়েন নাই। জ্ঞান তাঁহার ভক্তির অঙ্গ। কচিৎ বিশিষ্ট ভক্তের নিকট জ্ঞানভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিই তাঁহাতে আজীবন প্রকট থাকে। ভক্তিভাবভেদের মধ্যে মাতৃভাবই পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতে বিকশিত। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে তারামায়ের বীর সন্তান ও কৃপাসিদ্ধ বলিত। অশ্রুস্বেদকম্পাদি ভক্তির সাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহাতে বড় প্রকাশ পায় নাই। কখন তারানামকীর্ত্তনে ভক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র দেখা যাইত; কখন অশ্রুধারাও পড়িত, কিন্তু হুঙ্কার, তর্জ্জন গর্জ্জন, লম্প ঝম্প, ভূমিলুণ্ঠন ইত্যাদি হইত না। ইহার কারণ ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় তিনি যোগীশ্বর বিধায় তাঁহার দেহমনোরূপ যন্ত্র ভক্তিগঙ্গার প্রবলবেগধারণে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে গোস্বামিপ্রবর ভক্তিজনিত বহির্বিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কাহার ভক্তিভাব প্রবল না হইলেও অল্পেই দেহের বিকার উপস্থিত হয়। তাহাদের ভক্তি পিচ্ছিল। কাহার ভক্তির প্রাবল্যেই সাত্ত্বিক লক্ষণের প্রাবল্য দেখা যায়। ইহা অসমীচীন নহে। ভক্তির গভীরতা

শ্রীবামের ভক্তি

জ্ঞান

সাত্ত্বিকলক্ষণ

বিচার

থাকিলেও শারীরিক বিকৃতি ঘটে না। দেহের ও মনের গঠনানুসারে বিকৃতির বিকাশ হয়।

শ্রবণাদি নবধা ভক্তিলক্ষণই শ্রীবামে দেখা গিয়াছে। স্মরণ ও আত্ম-নিবেদন তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রেমা ভক্তি নহে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্‌বোধে ভজনা করেন নাই, নন্দ-নন্দনবোধে তাঁহাকে মনপ্রাণ কুল গৌরব সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞান-মিশ্রা নহে। তাহা চরম প্রেমের চিত্র। শ্রীবামের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা হইলেও শুদ্ধা প্রেমভক্তি। তিনি তারার প্রকৃততত্ত্ব অবগত থাকিয়াও মাতৃভাবে তারার ভজনা করিয়াছিলেন। তারা তাঁহার চক্ষে দার্শনিকের কল্পনা ছিল না। তাঁহার জ্ঞাননয়নে তারা অরূপা হইলেও সরূপা, বিশ্বাতীতা হইলেও বিশ্বময়ী। সেই জগজ্জননী তাঁহার প্রেমনয়নে মাতৃস্বরূপা। যত কিছু আবেদন নিবেদন সেই মাতারই নিকট, যত কিছু মান অভিমান সেই মাতারই উপর। যত কিছু সাধ আহ্লাদ তিনি সেই মাতাকে লইয়া করিতেন। তাঁহার শয়নে তারা, গমনে তারা, অশনে তারা, ভূষণে তারা। ভক্তকবির নিম্নলিখিত কল্পনাচিত্র বামের প্রকৃত বাহ্য স্থায়ী ভাব।

প্রেম

মাতৃভাব

আর কিছু নাই সংসার মাঝে শ্যামা শুধু সার রে।
আমার মন কালী ধন কালী কালী আমার প্রাণ রে।
কেহ সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্য ভার রে।
(আমার) দরিদ্রের ধন ও রাঙা চরণ করেছি হৃদয়ে হার রে।
এ তনু ধারণে এ তিন ভুবনে যাতনা নাহিক কার রে।
স্মরিলে সে মুখ পাসরি যে দুখ এই গুণ শ্যামা মার রে।
কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত আসিতেছ বারে বারে রে।
এবার মায়ের চরণ কররে শরণ অনায়াসে হবি পার রে।

পরমার্থতঃ বামের তারাই ধন, তারাই দেহ, তারাই প্রাণ, তারাই মন, তারাই আত্মা। তিনি ধন জন, সুখ, ভোগ বিলাস কিছুই চান নাই। তারামার চরণই তাঁহার হৃদয়ের হার ছিল। সেই চরণই তাঁহার আশা ভরসা, গতি মুক্তি, পরম পুরুষার্থ। তারামার

তারাই সর্বস্ব

শ্রীমুখ স্মরণেই তিনি ত্রিতাপাতীত, পরমানন্দময়। তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি যে প্রেমাভক্তি তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীগণের পরম প্রেমাস্পদ; তারাও বামের সেইরূপ পরম প্রেমাস্পদ ছিলেন। গোপী প্রেমে যেমন কামগন্ধ ছিল না, শ্রীবামের প্রেমও তদ্রূপ। শিশুর ন্যায় তিনি তারা মাকে অকপটে ভালবাসিয়াছিলেন। গোপীগণের অন্তর্ব্বাহ্য কান্ত ভাব, বামে বাহ্যতঃ মাতৃভাব আভ্যন্তরীণ অদ্বৈতভাব। সেই অদ্বৈতভাবও প্রেমময়। তিনি বার বার এ সংসারে মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় আসেন নাই। বদ্ধজীবের উদ্ধার জন্য কখন কখন মায়াধীশ হইয়া আসিয়াছেন। তারার চরণে জীবের মতি দৃঢ় করিয়া জন্ম মরণাদি ঘুচাইবার জন্য তাঁহার ভক্তিময় অবতার।

ভক্তির বিগ্রহ

বিকাশ তরঙ্গ

১। নামজপ

মধুরং সাধনং ভক্তেশ্চক্রভেদে সহায়কম্।
নাদসিদ্ধিকরং পুণ্যং তারানাম জগৌ গুরুঃ ॥

ভক্তির সরল অথচ মধুর সাধন, ষট্চক্র ভেদে উপযোগি, নাদসিদ্ধিকর, পবিত্র তারানাম কলির জীবকে শিখাইবার জন্য গুরুবাম গান করিতেন।

ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন ভক্তির প্রধান সাধন। বৈদিক যুগ হইতেই শব্দোপাসনা প্রচলিত। শব্দই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের প্রতীক। প্রণবার্থের চিন্তনের ন্যায়, প্রণবশব্দের জপও সাধন।

শব্দোপাসনা

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। —ছান্দোগ্য ১।১।১

ওঁ এই অক্ষরই সামের উদ্গীথ। ইহার উপাসনা করিবে।

ভক্তিশাস্ত্র প্রণবজপের সহিত নামজপেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"নাম্নেতি জৈমিনিঃ সম্ভবাৎ" —শাণ্ডিল্য সূত্র ৬১।

জৈমিনিমতে যজ্ঞাদির ন্যায় নামজপ দ্বারা পরাভক্তি আসে।

ভাগবতে নামসংকীর্ত্তন কলির যজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১১।৫।৩২

ভগবান্ কোন যুগে কোন রূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার নাম কখন কি প্রকার? নিমি নৃপতি এই প্রশ্ন করিলে শ্রীকরভাজন এই উত্তর করিলেন যে সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাবল্কলধর, উপবীতী, কৃষ্ণাজিনবাসা ও অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধারী। তাঁহার নাম হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠপুরুষ ইত্যাদি। ভক্তগণ শম দম তপস্যা দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, হিরণ্যকেশ, ত্রিমেখল ও ত্রয়ীময়। তাঁহার নাম বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, উরুক্রম ইত্যাদি। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার যজন। দ্বাপরে তিনি শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্মকর ভবং ছত্রচামরাদিরাজলক্ষণে লক্ষিত। তাঁহার নাম বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি। বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মে তাঁহার পূজন। কলিযুগে তিনি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেহকান্তিতে অকৃষ্ণ, অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল। তাঁহার অঙ্গ অতি মনোহর। কৌস্তুভাদি মণি তাঁহার উপাঙ্গ বা অলঙ্কার, সুদর্শনাদি তাঁহার অস্ত্র, সনক সনন্দনাদি তাঁহার পার্শ্বচর। সুবুদ্ধি-ভক্তগণ নামকীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। আমরা স্বামিপাদ সম্মত ব্যাখ্যা লইয়াছি। তিনি ত্বিষাকৃষ্ণশব্দের কৃষ্ণাবতার এই বৈকল্পিক অর্থও ধরিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ এই শ্লোকই তাঁহার কৃষ্ণাবতারত্বের প্রমাণ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যান্তর করেন, যথা—যিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণের স্বরূপ, কিন্তু দেহকান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁহার উপাঙ্গ, অবিদ্যাচ্ছেদক ভগবন্নামাদি যাঁহার অস্ত্র, গোবিন্দ-গদাধরাদি যাঁহার পার্ষদ সেই গৌরচন্দ্রকে কলির সুচতুর ভক্তগণ নাম কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা প্রীত করেন। (লঘুভাগবতামৃতটীকা ও চৈতন্য ভাগবত।)

সংকীর্ত্তনযজ্ঞ

কলিতে সংকীর্ত্তনই চতুর্ব্বর্গলাভের দ্বার।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।৩৬

কলিতে বহুদোষ থাকিলেও ইহার এই এক মহাগুণ যে এই কালে অল্প সাধনেই সিদ্ধিলাভ হয়। সেই জন্য গুণদোষজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যগণ কলির প্রশংসা করিয়া থাকেন অর্থাৎ কলিতে জন্মগ্রহণ করেন।

সর্ব্বার্থপ্রাপ্তি

কলিতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারাই সকল স্বার্থলাভ হয়। শাক্ততন্ত্রে বাহ্য-পূজার সঙ্গে স্তবকবচাদি পাঠের বিধান আছে।

পূজাকালে পঠেৎ যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ।

এই ভণিতা প্রায় সমস্ত স্তোত্রেই দেখা যায়। স্তোত্রপাঠই মহামায়া ভগবতীর নামগুণকীর্ত্তন। নামমহিমা অন্যত্রও ঘোষিত।

নামযাজী

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে নামযজনের প্রাবল্য। তদ্ভক্ত হরিদাস প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বজীবের উদ্ধার কামনায় লক্ষ হরিনাম করিতেন।

যতক্ষণ প্রভুর বাহ্য জ্ঞান থাকিত ততক্ষণ তিনি নামকীর্ত্তনে বা নামজপে লোকশিক্ষার জন্য রত থাকিতেন। শ্রীবাসাদি তাঁহার পার্ষদগণ সকলেই নামযাজী। তৎসম্প্রদায়মতে নাম ও নামী অভিন্ন। এমন কি "হরির চেয়ে হরিনামের আরও মাহাত্ম্য।"

নামযজনের ফলে ভক্তির উদ্রেক। শব্দ অর্থের সঙ্কেত মাত্র হইলেও যুগযুগান্তর ঐ সঙ্কেত ঐ অর্থে প্রচলিত থাকায় শব্দবলে তদর্থ স্বতঃ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য পূর্ব্ব মীমাংসা শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। কবিও বাগর্থকে পার্ব্বতী পরমেশ্বরের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ বলিয়াছেন।

আলঙ্কারিকের মতে শব্দে তদর্থবোধিকা অভিধাদি শক্তি নিহিত। শ্রীহরি শ্রীতারাদি শব্দ শ্রীভগবন্নামরূপে আবহমান কাল প্রসিদ্ধ। উক্ত নামাবলির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তত্তৎ নাম উচ্চারণে স্মৃতিপটে তত্তৎ মূর্ত্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী। তৎ উদয়ে এবং তৎনামাবলি

ভক্ত্যুদ্রেক

স্মরণে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তি অনিবার্য্য। আবার যখন মনে হয় যে ঐ নামসাধনে কত শত রত্নাকর বাল্মীকিত্ব লাভ করিয়াছেন, মহাপাপী অজামিলাদিও নারায়ণ নামকীর্ত্তনে মুক্তি পাইয়াছেন তখন পাষাণ হৃদয়ও প্রেমরসে গলিয়া যায়। স্বরের মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়। যখন মধুর স্বরে নাম স্ফুরিত হয় তখন সুর লয় সমন্বিত ঝঙ্কারে মন আনন্দ হিল্লোলে তালে তালে যেন নাচিতে থাকে। সেই আনন্দে বিভোর হইলে কীর্ত্তনীয়ার দশাপ্রাপ্তি ঘটে।

নামজপ ও নামকীর্ত্তন ষট্‌চক্রভেদেরও সহায়। নামই বর্ণমালা। বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত এইরূপ—

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
স দীর্ণো মূর্দ্ধ্ন্যভিহতো যক্ত্ৰমাপন্ন মারুতঃ।
বর্ণান্ জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা মতঃ॥
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রমাণতঃ॥

আত্মা বা দেহী চিচ্ছক্তি প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা পদার্থ বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হন। এই অবস্থাই ভাব নামে খ্যাত। আত্মার এই ভাব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা হইলে, আত্মা মনকে প্রেরণ করেন। মন কায়াগ্নিকে অর্থাৎ শরীরের তেজকে আঘাত করিলে, ঐ তেজ বায়ুকে আলোড়িত করে। সেই বায়ু উদ্রিক্ত হইয়া মূর্দ্ধায় প্রতিহত হইলে মুখবিবরে আসিয়া বর্ণোৎপাদন করে।

বর্ণোৎপত্তি

স্বরকালস্থানাদিভেদে বর্ণ পঞ্চপ্রকার।

বায়ুর গতি সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধমুখীন।

সমীরিতাঃ সমীরেণ সুষুম্নাপথনির্গতাঃ
ব্যক্তিং প্রয়ান্তি বদনে কণ্ঠাদিস্থানভেদতঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম।

বায়ু কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রেরিত হইয়া সুষুম্নাপথ দিয়া নির্গত হইলে শব্দ মুখে প্রবেশ করতঃ কণ্ঠাদি স্থানভেদে বর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

জীবদেহে চৈতন্যশক্তি কুণ্ডলিনীতে নিহিত। তড়িৎ কড়ারবর্ণা ভুজঙ্গরূপা কুণ্ডলিনী সুষুম্নার অধস্তন মূলাধারচক্রে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার সঙ্গমস্থলে মুখ রাখিয়া অর্দ্ধনিদ্রিতা। কুণ্ডলিনীর স্পন্দনেই এ দেহের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্পন্দন। ঐ কুণ্ডলিনীর স্পন্দনে শারীর তেজঃ বিঘট্টন ও বায়ুর উদ্রেক হয়।

কুণ্ডলিনী

কুণ্ডলিনী বর্ণের জননী অতএব মন্ত্রময়ী।

দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।
গুণিতা সর্ব্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা।
বিশ্বাত্মনা প্রবুদ্ধ্যা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ॥

—সারদাতিলকে।

হরি, রাম, শিব, তারা, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ বর্ণময়। ঐ সকল শব্দের

উচ্চারণে আত্মার, বুদ্ধির, মনের ও শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ঐ সকল বর্ণকূটের বৈশিষ্ট্য এই যে সুষুম্নার ভিন্ন ভিন্ন চক্রে উহারা বিশিষ্টভাবে ঘাতপ্রতিঘাত করে। তার ফলে ষট্‌চক্রভেদ ও কুণ্ডলীজাগরণ। মন্ত্রজপেরও সেই ফল। মন্ত্রজপে বা নামকর্ত্তনে সুষুম্নার স্পন্দন কল্পনামাত্র নহে। প্রণিধান করিলেই সাধক তাহা অনুভব করেন।

ষট্‌চক্রভেদ

নামযজ্ঞের অন্য ফল নাদসিদ্ধি। তন্ত্রে তাহা বিশদীকৃত। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। তাহার সার এই যে নির্গুণ সচ্চিদানন্দই শিব। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে শিবের অভিন্ন চিৎশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়। ঐ পরাশক্তির প্রেরণাই নাদ বা ক্রিয়াশক্তি। তাহা হইতে বিন্দু বা জগতের বীজরূপিণী চিৎষড়াত্মিকা প্রকৃতি জন্মে। ঐ প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টিকর সংক্ষোভই শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত। ইহা শব্দতন্মাত্রাদি জড়ের এবং জ্ঞানাদি চিৎঅবভাসের হেতু বলিয়া উহার নাম শব্দব্রহ্ম। শরীরে কুণ্ডলিনী শক্তিই শব্দব্রহ্মময়ী। তিনি ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াময়ী। ভাব প্রকাশের ইচ্ছা হইলে কুণ্ডলিনীর স্পন্দনে শরীরে শব্দ-তন্মাত্রার উৎপত্তি। তাহার ধ্বনির স্থূলভাব শব্দনাদ। ঐ নাদ অভিব্যক্ত হইলে শব্দনিষ্পত্তি বা প্রথম ব্যক্ত শব্দ। তাহা দ্বিধাভেদে স্বর বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাত্মক অনুস্বর।

শব্দব্রহ্ম

শক্তি, ধ্বনি, শব্দনাদ

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ।
বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবোজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ॥
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীৎ শক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধানায়াঃ শব্দশব্দার্থকারণম্
প্রকৃতের্বিন্দুরূপিণ্যাঃ শব্দব্রহ্মাভবৎ পরম্।

* * * *

দ্বিচত্বারিংশতা মূলে গুণিতা বিশ্বনায়িকা।
সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ॥
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মাৎ স্থিবোধিকা।
ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ॥

—সারদাতিলকে।

অন্তত্রও শব্দনিষ্পত্তির ক্রম যথা—প্রথমে শব্দ কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দশায় জন্মে। তাহাই শব্দের সূক্ষ্মা অনপায়িনী প্রবৃত্তি। তদনন্তর বায়ু উদীর্ণ হইয়া সুষুম্নার স্পন্দনে ঐ শব্দতরঙ্গ যোগিগম্যা হয় বলিয়া তাহা দ্যোতিতার্থা, স্বয়ংপ্রকাশা বা পশ্যন্তী নাম প্রাপ্ত হয়। বায়ুতরঙ্গ হৃৎকমলে বা অনাহত চক্রে উঠিলে তাহা নাদরূপিণী হইয়া নিজশোত্রগোচরা মধ্যমা নাম ধরে। শেষে কণ্ঠাদিস্থানে বিঘট্টিত হইয়া বহির্গত হইলে তাহা বাহ্য গোচর হয়। ঐ শব্দনিষ্পত্তিপ্রবৃত্তি বৈখরী।

শব্দের চতুর্বিধ প্রবৃত্তি

সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীমধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রাস্বরূপিণী।
অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদুদ্গচ্ছন্ত্যূর্দ্ধগামিনী ॥
স্বয়ংপ্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী ॥
ততঃ সংজল্পমাত্রা স্যাদবিভক্তোর্দ্ধগামিনী।
সৈবোরঃকণ্ঠতালুস্থা শিরোর্দ্রাণবদস্থিতা ॥
জিহ্বামূলোষ্ঠনির্ধূতসর্ব্ববর্ণপরিগ্রহা।
শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী ॥
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াত্মাসৌ তেজোরূপা গুণাত্মিকা।
ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাম্ ॥
বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী ॥

দ্বিতীয় নাদ বা শব্দনাদ অনাহত চক্রে বায়ুর স্পন্দনজনিত সুতরাং নামজপে ও নামকীর্ত্তনে নাদসিদ্ধি। ষড়্জাদিস্বরসাধকও ক্রমে এই নাদসিদ্ধিলাভ করেন। শব্দব্রহ্মময় নাদ দ্বারা নামযাজী প্রতি লোমে আদিনাদেও বিলীন হইতে পারেন।

নাদসিদ্ধি

তারাই চিন্ময়ী চিৎঅভিন্না শক্তি। তাঁহার প্রেরণাই তাঁহার নাম বা আদি নাদ। ঐ চিন্ময়ী ক্রিয়াশক্তির হিল্লোলেই জগৎ উৎপত্তি। অঘটনঘটন-পটীয়সী নিজ শক্তির প্রেমে মাতোয়ারা শিব চৈতন্য অলক্ষ্য অগম্য স্থানে বসিয়া অর্থাৎ পঞ্চশূন্যাত্মক ভাব লইয়া সেই নামের ঝঙ্কার তুলেন অর্থাৎ শক্তির প্রেরণা করেন। চতুর্থ শূন্যাবস্থা অর্থাৎ তুরীয় দশাতেও* ঐ নামী ও নাম অভিন্ন, ত্রিশূন্যে অর্থাৎ জীবগম্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ঐ নাম

বা নাদ নির্গুণ। উহা হইতে সৃষ্টিক্রম যথা—কলা, নাদ, বিন্দু, গুণত্রয়, শব্দব্রহ্ম, বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, মনঃ, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চভূত। ঐ নামসাধনায় প্রতিলোমে সংসার বন্ধন মোচন হয়।

শৈশব হইতেই বামের ভক্তি প্রকট সুতরাং নামকীর্ত্তন তাঁহার সহজাত। শ্রীগৌরের নামকীর্ত্তনে পদ্ধতি এইরূপ দেখা যায় যে কখন তিনি কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরি হরি, রাধা রাধা বলিতেন। কখন বা ছন্দোবন্ধে—

শ্রীগৌরের নামকীর্ত্তন

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরে হরে।
কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব পাহি মাম্।
রামরাঘব রামরাঘব রামরাঘব রক্ষ মাম্॥

ইত্যাদি তারকব্রহ্মনামাবলী কীর্ত্তন করিতেন।

কখন বা ভক্ত সঙ্গে তাল লয়ে "হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণযাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন" নাম গান করিতেন।

বামের বামা গতি। তাঁহার নাম কীর্ত্তনেও কোন শৃঙ্খলা ছিল না। কখন জয় তারা, জয় দুর্গা বা জয় কালী নাম উচ্চৈঃস্বরে করিতেন। হরিসংকীর্ত্তনেও মিশিয়া হরি হরি বলিতেন। নাম করিতে করিতে চক্ষুঃ দিয়া অবিরল প্রেমধারা বিগলিত হইয়া অঙ্গ পুলকিত, মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইত। তাঁহার মনোবীণার তারানামের ঝঙ্কার অনবরতই ছিল। সে ঝঙ্কার মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইত মাত্র। তাতে তাল লয় মান না থাকিলেও তাহা অমৃতময়। তাহা নাদসিদ্ধ ভক্তের গুরুগম্ভীর ভক্তিধ্বনি। যখন নিস্তব্ধ নিশীথে তিনি তারামন্দিরের বিরামখানায় প্রাণের কপাট খুলিয়া "জয় তারা জয় তারা" ধ্বনি তুলিতেন, সেই স্বরলহরী "আলোড়ি চন্দ্রোলোক শারদ" অসীম গগন ছাপাইয়া উঠিত। তারাপীঠ হইতে ক্রোশাধিক দূরস্থিত খরুণ গ্রামে ঐ সিদ্ধকণ্ঠের স্নিগ্ধ মুরজনির্ঘোষ শ্রুত হইত। তাহা শুনিয়া পরে খরুণবাসী রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুত্রকলত্র-ধনৈষণাদি ত্যাগ করিয়া বামের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যিনি শ্রীমুখের তারা নাম শুনিয়াছেন তিনি এ জনমে আর সে নাম ভুলিতে পারিবেন না।

শ্রীবামের নাম কীর্ত্তন

সতীব নাথং শরীরান্তরস্থং প্রভেব পর্ব্বাত্যয়লক্ষ্যমিন্দুম্।
আজানদেবং মনুজাবতারং রামং প্রপেদে স্বত এব সিদ্ধিঃ।

সতী যেমন জন্মান্তরগত পতিকে, কৌমুদী যেমন পর্ব্বাত্যয়ে অর্থাৎ অমাবস্যায় নিখিলকলাক্ষয়ের পর উদীয়মান নবেন্দুকে, সিদ্ধি তদ্রূপ সেই আজানদেব রামকে মানবাবতারেও স্বতঃ আশ্রয় করিয়াছিল।

সিদ্ধি শব্দের যৌগিকার্থ সফলতা। শাস্ত্রে সিদ্ধিশব্দ যোগারূঢ়। সমাধির ফলে জীবের নানা অলৌকিক শক্তি জাগে যথা, অতীত অনাগতজ্ঞান, সর্ব্বভূতরুতজ্ঞান, পূর্ব্বজাতিজ্ঞান পরচিত্তজ্ঞান, অন্তর্ধান, ভুবনজ্ঞান, ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তি, কায়স্থৈর্য্য, কায়িকবল, মনোজবিতা, পরকায়াপ্রবেশ, উৎক্রান্তি, ভূতজয়, ইন্দ্রিয়জয়, মৈত্র্যাদিপরাকাষ্ঠা ইত্যাদি। পাতঞ্জলদর্শনাদিতে উক্ত শক্তিলাভের উপায়াদি বিবৃত। যোগশাস্ত্রোক্তসিদ্ধি অষ্টধা বিভক্ত।

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যাং মহিমা তথা।
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ তথা কামাবসায়িতা॥

অণিমা অর্থাৎ পরমাণুরূপতা, লঘিমা অর্থাৎ তুলাদিবৎ লঘুত্বপ্রাপ্তি, প্রাকাম্য অর্থাৎ ইচ্ছায় অনভিঘাত, মহিমা অর্থাৎ অতিগুরুত্ব বা অতিদীর্ঘত্ব, ঈশিত্ব অর্থাৎ শরীরান্তঃকরণাদির উপর পূর্ণাধিপত্য, বশিত্ব অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উপর প্রভাব, কামাবসায়িতা অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই ইচ্ছাপূরণ।

যে যোগী এই সমস্ত শক্তি লাভ করেন তিনিই সিদ্ধ। কিন্তু সিদ্ধি মুক্তি নহে। সিদ্ধিতেও বৈরাগ্য আসিলে রাগাদিবীজরূপ অবিদ্যাক্ষয়ে কৈবল্যলাভই যোগসম্মত পরম পুরুষার্থ। সাংখ্যের সিদ্ধি অষ্টবিধা।

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিধা॥ —সাংখ্যকারিকা।৫১

দুঃখ ত্রিবিধ :—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। দুঃখত্রয়ের বিঘাত অর্থাৎ আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বিনাশই মুখ্য ত্রিবিধ সিদ্ধি। অবশিষ্ট পঞ্চসিদ্ধি ত্রিবিধদুঃখবিঘাতের উপায়মাত্র। সুতরাং তাহারা গৌণসিদ্ধি। গৌণসিদ্ধিসমূহের মধ্যেও কার্য্যকারণভাব বর্ত্তমান। অধ্যয়ন অর্থাৎ বিধিবৎগুরুমুখ হইতে অধ্যাত্মবিদ্যার অক্ষরগ্রহণই প্রথমা সিদ্ধি। ইহার

নামান্তর তার। তজ্জনিত অর্থজ্ঞানই শব্দ বা সুতার নাম্নী দ্বিতীয়া সিদ্ধি। বৈদিকমতের শ্রবণই সাংখ্যের তার ও সুতার। আগমাবিরোধিতর্ক দ্বারা অপরোক্ষবিষয়পরীক্ষাই উহ বা তারতারনামা তৃতীয়া সিদ্ধি। ইহাই বেদের মনন। ইহা দ্বারা সংশয় নিরাকরণপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বজ্ঞানোন্মেষ ঘটে। স্বয়ং পরীক্ষিততত্ত্বের দার্ঢ্য হেতু গুরুশিষ্যাদির সংবাদই সুহৃৎপ্রাপ্তিরূপ চতুর্থী সিদ্ধি। তাহার নামান্তর রম্যক। দানশব্দার্থ শোধন অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের নিরন্তর দীর্ঘকাল পরিশীলনফল। ইহাই সদামুদিতা নাম্নী পঞ্চমী গৌণসিদ্ধি। ইহাই বেদের নিদিধ্যাসন। তদ্দারা ক্রমশঃ দুঃখত্রয় অপঘাতরূপ মুখ্যসিদ্ধিত্রয়লাভ ঘটে। সিদ্ধির পরিপন্থী ত্রিবিধ—

বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান, অশক্তি, ও তুষ্টি। বিপর্য্যয় অবিদ্যাস্মিতাদিভেদে পঞ্চধা। ইন্দ্রিয়বৈকল্যবুদ্ধিবিপর্য্যয়ভেদে অশক্তিও অষ্টাবিংশতিবিধা এবং আধ্যাত্মিক্যাদিভেদে তুষ্টি নবধা। প্রত্যয়সর্গে সিদ্ধি উপাদেয় হইলেও তৎদ্বারা কৈবল্যলাভ ঘটে না। নিরন্তর তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা "নাহং নমে" ইত্যাকার বিশুদ্ধ কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মুক্তি।

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি নহে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥

—সাংখ্যকারিকা। ৬৪

বেদান্তমতেও অষ্টসিদ্ধি হেয়। আত্মবিবেকই মুক্তির পথ। তাহাই উপাদেয়। তদভ্যাসেই অন্বয়ব্যতিরেকযুক্তি দ্বারা জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিত্রয় অবস্থাত্মক প্রপঞ্চপ্রকাশক কূটস্থব্রহ্মচৈতন্যের সহিত আত্মৈক্যবোধে সর্ব্ববন্ধ মোক্ষ।

চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদিপ্রেপ্সয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া॥—পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে ২০৭

* * *

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎপ্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২১২॥

শাক্তাগমে সিদ্ধি দ্বিবিধ—মন্ত্রসিদ্ধি ও মহাসিদ্ধি। সাধনাজনিত

শক্তি-বিশেষের নাম মন্ত্রসিদ্ধি। তাহার স্তর ত্রিবিধ—উত্তম মধ্যম ও অধম।

মনোরথানামক্লেশসিদ্ধিরুত্তমলক্ষণম্
মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্দেবতাদর্শনং তথা ॥
প্রয়োগস্যাক্লেশসিদ্ধিঃ সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরম্ ॥
পরকায়প্রবেশশ্চ পুরপ্রবেশনং তথা।
ঊর্দ্ধোৎক্রমণমেবং হি চরাচরপুরে গতিঃ ॥
খেচরীমেলনঞ্চৈব তৎকথাশ্রবণাদিকম্।
ভূছিদ্রাণি প্রপশ্যেত্তু তদুত্তমস্য লক্ষণম্ ॥
খ্যাতির্বাহনভূম্যাদিলাভঃ সুচিরজীবনম্।
নৃপানাং তদগণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকেষু চমৎকারকরঃ সুখী।
রোগাপহরণং দৃষ্ট্যা বিষাপহরণং তথা ॥
পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্ব্বিধমযত্নতঃ।
বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা ॥
অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসনং ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জনম্।
সর্ব্বভূতেষনুকম্পা সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণোদয়ঃ।
ইত্যাদিগুণসম্পত্তির্মধ্যসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ॥
মহৈশ্বর্য্যং ধনিত্বং চ পুত্রদারাদিলক্ষণম্।
অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিণামাদিভূমিকা।
সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্রসংশয় ॥—তন্ত্রসারে ॥

অনায়াসে অভীষ্টসিদ্ধি মন্ত্রসিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। মৃত্যুনিবারণ, দেবতাদর্শন, এবং বিনাক্লেশে যাবতীয় প্রয়োগসিদ্ধি সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। পরশরীরে প্রবেশ, রুদ্ধপরকীয়পুরীতে প্রবেশ, শূন্যমার্গে উৎক্রমণ, সর্ব্বত্র অবাধগতি, অমরাদি খেচরীগণের সহিত মিলন, তাহাদিগের কথাশ্রবণাদি এবং ঘন ভূভাগেও ছিদ্রদর্শন উত্তম সিদ্ধির লক্ষণ। খ্যাতি যান ভূম্যাদিলাভ, দীর্ঘজীবন, রাজাকে ও রাজপুরুষকে বশীকরণ, সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকের নিকট অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়া সুখে কালযাপন, দৃষ্টিমাত্রে রোগাপহরণ ও বিষাপহরণ, চতুর্ব্বিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা, বৈরাগ্য, মুমুক্ষা, ত্যাগ, সর্ব্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গযোগা-

ভ্যাস, ভোগেচ্ছাবর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, এবং সার্ব্বজ্ঞাদিগুণের বিকাশ ইত্যাদি মধ্যমসিদ্ধির লক্ষণ। অতুলৈশ্বর্য্য, ধনসম্পৎ, এবং পুত্রদারাদিসুখ অধমসিদ্ধি। যিনি প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনি সাক্ষাৎ শিব।

উক্ত সিদ্ধির জন্য যোগশাস্ত্রে এবং তন্ত্রে নানাবিধ সাধনের উল্লেখ আছে। পরাসিদ্ধি বা মুক্তি বিশিষ্টসাধনসাপেক্ষা। রামকে যোগসাধন বা তান্ত্রিকসাধন করিতে দেওয়া যায় নাই। অথচ অষ্টসিদ্ধির পরিচয় তাঁহার যৌবন লীলায় এবং পরাসিদ্ধির পরিচয় তাঁহার প্রৌঢ়লীলায় ভূয়ো ভূয়ো সুব্যক্ত। উহার বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। প্রকাশের পর তাঁহার সিদ্ধিসম্বন্ধে আপামরজন-সাধারণ সন্দিহান ছিল না। তাঁহাকে তাই কৃপাসিদ্ধ বলিয়া সকলের ধারণা। আমাদের বিশ্বাস তিনি নিত্যসিদ্ধ আজানদেব। সিদ্ধিযোগ লইয়া তিনি জীবকল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন এবং কল্যাণব্রতোদ্‌যাপনে বিনা বিশিষ্ট-কর্ম্মসাধনেই স্বকীয়ভাব দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

অথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোকে আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসংপদ্যন্তে।

অথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক অজানদেবানামানন্দো যশ্চ শোত্রিয়োহবৃজিনোহ কামহতঃ।—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪ অ ৩৩ পরি।

পরমানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। সেই পরমানন্দের মাত্রা হিরণ্যগর্ভ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভোগ করেন। যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে সমৃদ্ধ অধিপতির ভোগসম্পন্ন তিনি মনুষ্যগণের পরমানন্দস্বরূপ। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হন তাঁহাদের আনন্দ উক্তরূপ অধিপতি মনুষ্যের শতগুণ। পিতৃলোকানন্দের শতগুণ আনন্দ গন্ধর্ব্ব-লোকে বর্ত্তমান। গন্ধর্ব্বলোকের শতগুণ আনন্দ কর্ম্মদেব লাভ করেন। যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তিনি কর্ম্মদেব। যিনি শ্রোত্রিয় পাপরহিত এবং জিতকাম, তিনি শ্রৌত কর্ম্ম বিনা দেবত্ব লাভ করেন। তাঁহারই আখ্যা আজানদেব। তাঁহার আনন্দ গন্ধর্ব্বলোকেরও শতগুণ। আজানদেবের শতগুণ আনন্দ প্রজাপতিলোক। যে শ্রোত্রিয় নিষ্পাপ নিষ্কাম হিরণ্যগর্ভোপাসনায় হিরণ্যগর্ভত্ব লাভ করেন তিনি প্রজাপতি। যে শ্রোত্রিয় তদূর্দ্ধগামী তিনি ব্রহ্মলোকের অধিবাসী অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন। রাম শ্রোত্রিয়, পাপরহিত ও জিতকাম। তাঁহার ব্রহ্মময় নিত্যসিদ্ধ আজানদেব ভাব সুব্যক্ত।

৩। অভিষেক

শ্মশানচারী দিবসে শ্মশানে ব্যপেতভীর্দর্শিতভীতিনাট্যঃ।
সিদ্ধোঽভিষেকগ্রহণেন শাস্ত্রং সম্বর্দ্ধয়ামাস গুরোশ্চ মিত্রম্॥

সেই নির্ভীক শ্মশানচারী সিদ্ধ মহাপুরুষ প্রকাশ্যদিবসে শ্মশানে বিভীষিকা-প্রদর্শনরূপ অভিনয় করতঃ অভিষেকস্বীকারে শাস্ত্রের ও গুরুবন্ধুর মর্য্যাদা বাড়াইলেন।

দীক্ষার পর মন্ত্রের সংস্কার আবশ্যক। তাহা দশবিধ
জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়াঃ॥ —গৌতমীয়তন্ত্রে।

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ' দীপন ও গুপ্তি এই দশবিধ মন্ত্রসংস্কার করণীয়।

অভিষেকের লক্ষণ—

তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনাভিষেকশ্চপ্রকীর্ত্তিতঃ।
অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেন্মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া॥ —বিশ্বসারে।

মন্ত্রে যতগুলি বর্ণ থাকে তৎসমসংখ্যক অশ্বত্থপল্লব দ্বারা তত্তন্মন্ত্রপ্রকরণের বিধানানুসারে শক্তি পক্ষে মধু, শৈবপক্ষে ঘৃত বা দুগ্ধ, বৈষ্ণব পক্ষে কর্পূরমিশ্রিত জল ও শুদ্ধজল "অমুকমন্ত্রমভিষিঞ্চামি" এই মন্ত্রে প্রতি মন্ত্রাক্ষরে সেচনের নাম মন্ত্রাভিষেক। অন্যান্য মন্ত্রসংস্কার বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না।

পুরশ্চরণের অঙ্গীভূত অন্যবিধ অভিষেক আছে।
জপহোমতর্পণাভিষেকো বিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিষ্যতে॥ —হংসমাহেশ্বরে।

জপ, হোম, তর্পণ অভিষেক এবং ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন ইহলোকে পুরশ্চরণনামে বিদিত। পুরশ্চরণে বিশিষ্ট মন্ত্রের বিশিষ্ট সংখ্যক জপের বিধান। সর্ব্ববিধমন্ত্রেই জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ তর্পণ, তর্পণের দশমাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন। মন্ত্র-ভেদে হোমের উপকরণ বিভিন্ন।

তারা তর্পণের ও তারাভিষেকের বিধি—

পুরশ্চরণাঙ্গীভূত অভিষেক

জলে চাবাহ্য বিধিবৎ পাদ্যাদ্যৈকদকাদ্যকৈঃ।
সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবীং পরিবারান্ সকৃৎ সকৃৎ॥
সন্তর্প্য বিধিবদ্ভক্ত্যা দশাংশং তর্পয়েৎ ততঃ।
পুনরেকৈকং সন্তর্প্য পরিবারাংস্তথা পুনঃ॥
তারিণীমভিষিঞ্চামি নমোমূর্দ্ধ্নিবিনিক্ষিপেৎ।
অভিষেকোঽয়মাখ্যাতঃ সর্ব্বপাপনিকৃন্তনঃ॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে ৪ পটলে।

ইষ্টদেবীকে জলে বিধিবৎ আবাহন করিয়া জলরূপ পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করতঃ ঐ দেবীর পরিবারবর্গস্থ প্রত্যেক দেবতার ভক্তিভরে বিধিবৎ পূজা পূর্ব্বক জপ হোমান্তে হোমের দশমাংশবার ইষ্টদেবীর তর্পণ করিবে। তর্পণ মন্ত্র "অমুকীং দেবীং তর্পয়ামি"। পরে পুনরায় উক্ত পরিবারবর্গের প্রত্যেককে সম্যক্ তর্পণ করিয়া সাধক আপনাকে দেবীময় ভাবিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "তারিণীমভিষিঞ্চামি নমঃ" বলিয়া তর্পণের দশমাংশবার নিজ মস্তকে সেই জল সেচন করিবেন। ইহাকে অভিষেক বলে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ ধ্বংস হয়।

উক্ত দ্বিবিধ অঙ্গীভূত সংস্কার ভিন্ন অন্যবিধ সাধনার মূলীভূত সংস্কারকেও অভিষেক বলে। শাক্তন্ত্রমতে শেষোক্ত অভিষেক প্রধানতঃ পঞ্চধা— শাক্তাভিষেক, ক্রমাভিষেক, কলাভিষেক, বিদ্যাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাভিষেক বা পুরশ্চরণাভিষেক সাধকের স্বয়ং করণীয়। শেষোক্ত শাক্তাভিষেকাদি গুরু বা গুরুকল্প পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা করণীয়।

শাক্তাভিষেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

শাক্তাভিষেক

বিরচ্য বিধিবদ্বিদ্বান্ মণ্ডলং সুমনোহরম্।
তস্মিন্ কলসমারোপ্য কাথতোয়ৈঃ প্রপূরয়েৎ॥
নিক্ষিপ্য নবরত্নানি তত্র গন্ধাষ্টকং পুনঃ।
আবাহ্য পূজয়েৎ তত্র দেবীমাবরণৈঃ সহ॥
কলসাগ্রে জপেন্মন্ত্রং সংখ্যয়া পূরণাবধি।
ততঃ পূর্ণং সমাধৃত্য গুরুদেবো বিধানতঃ॥
অভিষিঞ্চেৎ শিষ্যমূর্দ্ধ্নি কলসোদরবারিণা।
ততঃ শিষ্যঃ প্রযত্নেন ধনাদ্যৈস্তোষয়েৎ গুরুম্॥

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মান্তে শিষ্য স্বস্তিবাচনাদি করতঃ সঙ্কল্প পূর্ব্বক গুরুবরণ করিলে শ্রীগুরু শিষ্যের ইষ্টদেবতানুসারে সর্ব্বতোভদ্রাদিমণ্ডলের মধ্যে কোন মনোহর মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি বিধিবৎ ঘটস্থাপনাপূর্ব্বক ঐ ঘট পঞ্চবিধ কষায়জলে পরিপূর্ণ করিবেন। ঘটে নবরত্ন ও গন্ধাষ্টক নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে শিষ্যের ইষ্টদেবীকে আবাহন করতঃ তদীয় আবরণ দেবতা-মণ্ডলীসহ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিবেন। হোমান্তে শ্রীগুরু শিষ্যের মন্ত্র পূর্ণসংখ্যায় জপ করতঃ ঐ ঘট উত্তোলন করিয়া শিষ্যের মস্তক সেই ঘটের মন্ত্রপূত জলে অভিষিক্ত করিলে, শিষ্য ধনাদি দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন। ঐ ঘট সপ্রণব হংসকলমায়াবীজে চালিত করিতে হয়।

ঘটোত্তোলনের মন্ত্র যথা—

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন পূরয়াস্ত মনোরথম্॥

কলস! উঠ! তুমি মন্ত্রপূত হইয়া এক্ষণে ব্রহ্মভাবাপন্ন। তুমি দেবতা-স্বরূপ, তুমি সিদ্ধি দিতে পার। তোমার বারি এক্ষণে সর্ব্বতীর্থবারিতে পরিণত। সেই বারি দ্বারা তুমি ইহার অভিলাষ পূর্ণ কর।

পঞ্চপল্লব দ্বারা কুম্ভস্থিতজলে শিষ্যের মস্তকে অভিষেক বিহিত।

অভিষেকের মন্ত্র—

অস্য শাক্তাভিষেকমন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শক্তির্দেবতা সর্ব্বসঙ্কল্পসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

রাজরাজেশ্বরী শক্তির্ভৈরবী রুদ্রভৈরবী।
শ্মশানভৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী॥
ত্রিপুরা ত্রিকূটা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্রিপুরমালিকা॥
ত্রিপুরানন্দিনী দেবী তথৈব ত্রিপুরাত্তনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ইত্যাদি।

মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে দশবিধা মহাবিদ্যা, নবদুর্গা, ব্রহ্মাণ্যাদি মাতৃকা, ব্রহ্মাদি-দেবত্রয়, ইন্দ্রাদি দশদিক্পালগণ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, প্রকৃত্যাদিতত্ত্বনিচয়, জীবাত্মাদি আত্মগণ, গঙ্গাদিসরিৎ অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম চরাচর এবং তদধিষ্ঠাতৃভূত-সমূহ ও পরাপর দেবতাগণ সাধকের কল্যাণ বিধান করুন।

বিশিষ্টশক্তিমন্ত্রের সাধক তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাভিষেক করিয়া পুরশ্চরণান্তে শাক্তাভিষেকের পর ত্রিপুরা, তারা ও কালী মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তত্তন্মন্ত্রের অভিষেক ও পুরশ্চরণ করতঃ তৎতৎদেবীর শাক্তাভিষেক ক্রমে করিলে তাহা ক্রমাভিষেক। কালী তারা ও ত্রিপুরা ত্রিবিদ্যা। তাঁহাদের নাম ত্রিহায়ণী। সত্ত্ব রজঃ তমোজয়ই ত্রিবিদ্যাসাধন। ইহা বড়ই কঠিন। চণ্ডকৌশিক নাটকে বিশ্বামিত্রের ত্রিবিদ্যাসাধনে বিঘ্ন উট্টঙ্কিত। ত্রিবিদ্যাসাধনের পর সত্ত্ব রজঃ তমোগুণত্রয়ের জননী কলা জয় করিবার জন্য কলাভিষেক বিহিত। তৎপরে কলাতীত ব্রহ্মবিদ্যালিপ্সুর বিদ্যাভিষেক। শেষে পূর্ণত্বপ্রাপ্তিকাম ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করিলে শাক্তাবধূত হন। শাক্তাবধূত জ্ঞানপরিপাকে কৌলাবধূত, হংস, পরমহংসাদি নাম পান।

ক্রমাভিষেকাদি

শৈববৈষ্ণবাদি সর্ব্ব তন্ত্রেই অভিষেকের ব্যবস্থা। খৃষ্টধর্ম্মাদিতেও অভিষেক-প্রথা লক্ষিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইলে জর্ডন নদীর জল মস্তকে সমন্ত্রক দিবার বিধান দেখা যায়। প্রভু যিশুর প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বেও মন্ত্রপূত-জলে অভিষেকের উল্লেখ আছে। শ্রীগুরুর কৃপায় দীক্ষার ও অভিষেকের গূঢ়াভিসন্ধি যতদূর বুঝিয়াছি তাহার সঙ্কেত এই যে বাহ্যজগৎ শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধাত্মক। উক্ত পঞ্চগুণাত্মকতত্ত্বের নাম ক্ষিতি। শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক চতুর্গুণতত্ত্বের সংজ্ঞা অপ্, শব্দস্পর্শরূপাত্মক ত্রিগুণতত্ত্ব তেজঃ, শব্দস্পর্শাত্মক দ্বিগুণতত্ত্ব বায়ু, শব্দাত্মক একগুণতত্ত্ব আকাশ। উহারা সকলেই সেই পরমাত্মস্বরূপ মহাদেবের মূর্ত্তি। ক্ষিতির নাম সর্ব্ব, কারণ সমস্ত জগৎ পঞ্চ-গুণাত্মক। অপের নাম ভব, কারণ অপ্ ক্ষিতির প্রভব। তেজঃ বা অগ্নি রুদ্রনামে অভিহিত, কারণ তাহাই সংহারক। বায়ুর নাম উগ্র, কারণ বায়ু তেজেরও পরিচালক। আকাশের নাম ভীম, কারণ তাহা সর্ব্বব্যাপক আদি মহাভূত। তাই মহাদেবের নাম সর্ব্বভবরুদ্র উগ্র ভীম। জীব শব্দাদি-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তদ্ভোগাভিলাষে বদ্ধ হন। ঐ বন্ধনমোচন করিতে হইলে পঞ্চগুণে বিতৃষ্ণা আবশ্যক। তৃষ্ণার মূল রস বা আসক্তি। রসের প্রতীক অপ্। অপ্ দ্বারা অভিষেকের উদ্দেশ্য রসতত্ত্বজয়। ইহাই বৈতরণী পার। রসজয়ে আত্মতেজঃ প্রকাশ পায়। আত্মতেজঃপ্রোদ্দীপনই শক্তি-সঞ্চার। তজ্জন্য বেধদীক্ষা। তাহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে অগ্নিদীক্ষা বলিয়াছে।

শক্তিসঞ্চারফলে সাধক রুদ্রপদবাচ্য হন। আত্মশক্তিবৃদ্ধিতে তিনি উগ্র ও ভীম অর্থাৎ বায়ুজয়ী ও আকাশজয়ী হইয়া ভূতাধিপত্য পান। তৎপরে চিত্তজয়। ভীমকান্তভাব ভেদে চিত্তের নাম সূর্য্য বা সোম। জীবই যজমান।

বাম স্বয়ং সিদ্ধ হইলেও শাস্ত্রমর্য্যাদারক্ষার্থ পরমকৌল গুরুর নিকট বেধদীক্ষা লইয়া শ্রীগুরুর সেবা কয়েক বৎসর করিয়াছিলেন। গুরুকল্প মোক্ষদানন্দ বামকে শিষ্যবৎ দেখিতেন। বেধদীক্ষা হইলে অভিষেক নিষ্প্রয়োজন। তথাপি লোকশিক্ষার জন্য এবং গুরুপ্রতিম মোক্ষদানন্দের সম্বর্দ্ধনার্থ বাম বিভীষিকা লীলা আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি শ্মশান হইতে তারামন্দিরে ছুটিয়া আসিলেন ও প্রকাশ করিলেন যে শ্মশানে বিকটকায়া রাক্ষসী আছে। কেহ কেহ ভাবিলেন যে, ইহা গঞ্জিকাসেবনজনিত বামের মস্তিষ্কোত্তেজনার ফল। শ্রীগুরু কৈলাসপতি বুঝিলেন যে, ইহা বামের চক্ষুরুন্মীলনফলে সূক্ষ্মচ্ছায়াদর্শন। কিছুকাল পরে বাম আর একদিন জানাইলেন যে, শ্মশানে এক ভীষণ ব্যাঘ্র আসিয়াছে। শ্মশান কতকটা নদীর গর্ভে বালুকাময় পুলিনে ও কতকটা নদীর পূর্ব্বদিকে পতিত জমিতে অবস্থিত। তৎপার্শ্বে শিমুলতলা তরুগুল্মাচ্ছন্ন বটে কিন্তু তথায় কেহ কখনও ব্যাঘ্র দেখে নাই। শিমুলতলার চতুর্দ্দিকে পরিষ্কৃত স্থল। নদীর পরপারেও খোলা মাঠ। কোথাও জঙ্গল বা বন নাই। ব্যাঘ্র আসিবার সম্ভাবনা নাই এবং কখন তথায় ব্যাঘ্র আসিতে শুনাও যায় নাই। পল্লিবাসিগণ বিস্ময়ে লগুড়াদি লইয়া সাবধানে বাঘ দেখিতে গেল। কেহই বাঘ দেখিতে পাইল না। তাহারা বলিতে লাগিল ইহা "বামাক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি"। মোক্ষদানন্দের মনে হইল বাম বোধহয় সাধনব্যত্যয়ে এইরূপ বিভীষিকা দেখিতেছে। বামের মন্ত্রসংস্কার আবশ্যক এই বোধে তিনি অভিষেকের প্রস্তাব করিলেন। সিদ্ধকৌল কৈলাসপতি কোন অমত প্রকাশ না করায় মোক্ষদানন্দ বামকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। কেহ বলেন উহা শাক্তাভিষেক, কেহ বলেন উহা পূর্ণাভিষেক আসনাধিকারের পরে ঘটে। কোনমতে ইহা পূর্ব্বে হয়। মোক্ষদানন্দ দ্বারা বামের অভিষেক সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

৪। আসনাধিকার

মায়াবৃতাত্মানমচিন্ত্যতত্ত্বং বিজ্ঞায় বামং কিমুসিদ্ধনাথম্
সিদ্ধাসনং তে পরিপালয়েতিব্রুবন্ তিরোঽভূদ্গুরুরীঙ্গিতজ্ঞঃ।

বাম মায়াদ্বারা স্বরূপ আবৃত করায় তাঁহার তত্ত্ব পূর্ব্বে গুরুও জানিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া তত্ত্ব কথঞ্চিদুপলব্ধি করতঃ তাঁহাকে সিদ্ধনাথ বশিষ্ঠ বোধে "তবে তোমার আসন তুমি রক্ষা কর" বলিয়া কি গুরু অন্তর্হিত হইলেন?

তারাপীঠ বসিষ্ঠদেবের তপোবলেই তারাপীঠ। এখানে মহাশ্মশানে বসিষ্ঠ তারাসিদ্ধিলাভ করেন। সুতরাং ঐ মহাশ্মশানে বসিষ্ঠের আসন। উহার মহিমা শাক্ততন্ত্রে উদ্ঘোষিত। শক্তিসাধক এখনও ঐ পীঠে সাধনার জন্য ধাবিত হন। উন্নত সাধক ব্যতীত কেহ এখানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন না। সিদ্ধকৌল ব্যতীত ঐ পীঠের কেহ অধিকারী নন। একমাত্র বামই আধুনিককালে সমস্ত জীবন ঐ পীঠে অতিবাহিত করেন।

প্রকাশেচ্ছা

তিনি নিত্যসিদ্ধকৌল। তিনি বসিষ্ঠাসনের অধিকারী। তাঁহার ভাব এত গভীর যে সিদ্ধগুরুদেব কৈলাসপতিক্ষ্যাপাও তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। স্নেহ মহৎ আবরক। স্নেহবশতঃ নন্দ ও যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার পরিচয়েও ভগবত্তা বুঝেন নাই। কৈলাসপতি বামকে একনিষ্ঠ সাধক জ্ঞান করিতেন। বামের আত্মানন্দেবত্ব তিনিও হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। এই পীঠের মহিমা প্রদর্শন জন্য পীঠাধিকার প্রয়োজন। সুতরাং বাম শ্রীগুরুকে তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিলেন। বামের ধারা বিচিত্রা। ইঙ্গিতও বিচিত্র।

কৈলাসপতি ও মোক্ষদানন্দ উভয়ে মধ্যে মধ্যে মহানিশায় শিমূলতলার ঝোপড়ায় একত্র তত্ত্বালাপ করিতেন। গুরু পূর্ণ সিদ্ধ, উপগুরু সিদ্ধকল্প। উভয়ের ইন্দ্রিয়চয় উন্মোষিত। উভয়েরই দেবতাদর্শন ও দেবতালাপ ঘটিত। এইরূপ নিশীথে তাঁহারা অভীষ্ট দেবতাকে আবাহন করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময় বাম তথায় আসিলেন। তাঁহারা কথোপকথন হইতে বিরত হইলেন। বাম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাবা! কোন মার সহিত কথা কহিতেছিলেন? তাঁহারা কোন উত্তর দিলেন না।

তখন রাম তাঁহাদের আহূতা দেবীর নাম বলিলেন। ইহাতে উভয়েই ভা'বলেন রাম অনুমানে ধ'রিয়াছেন। রামের যে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে ও দেবতাদর্শনাদি ঘটে ইহা তাঁহারা বুঝেন নাই। রাম যে বুঝিয়াছেন তাহা ইঙ্গিত ক'রিয়া উক্ত দেবীর রূপবর্ণনা সংক্ষেপে করিলেন তথাপি তাঁহারা উহা রামের অনুমান ভা'বলেন। রাম তাঁহাদের কথোপকথনের আভাস দিলে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। "রাম! তুই কি করে বুঝ্‌লি" জিজ্ঞাসা করায় রাম উত্তর দিলেন—'তারা মা আমাকে বলিয়া দিলেন। ইহাতেও রামের নিত্যসিদ্ধিবিষয়ে তাঁহাদের ধারণা হইল না। কাকতালীয় ন্যায়ে রাম ভ'ক্তিভরে ইহা জানিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন।

প্রথমেঙ্গিত

প্রথমে'ঙ্গিতে গুরু বুঝিলেন না রাম প্রকারান্তরে অদ্ভুত ঈঙ্গিত করিলেন। গুরু প্রায় প্রতিদিন রামকে গাঁজা সাজিতে বলেন। রাম গাঁজা সাজিয়া আগুন চড়াইয়া কল্কে গুরুর সম্মুখে রাখেন। গুরু গঞ্জিকাও ঈষ্টদেবকে নিবেদন না করিয়া সেবন করেন না। তাঁহার ভাব গীতায় ব্যক্ত।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় কুরুষ তৎ মদর্পণম্॥ গীতা ৯।২৭

পার্থ! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যাহা দাও, যাহা হোম কর, যে তপোনুষ্ঠান কর না কেন, সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে।

ঈশ্বরার্পণই আরাধনা। জীব ঈশ্বরের শক্তিতে চালিত। সুতরাং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরাধনা। বদ্ধ জীবের সে বোধ নাই। তাহার বোধের জন্যই ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন। কৈলাসপতির সে বোধ থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বকর্ম্মই ঈষ্টদেবকে নিবেদন করিতেন। নিবেদনের পর তিনি গঞ্জিকা সেবন করিয়া রামকে প্রসাদ দিলে রাম তাহা লইতেন। রাম কখনও শ্রীগুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই।

আসনাধিকারের দিনে গুরু শিষ্যকে গঞ্জিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছেন। শিষ্যও পূর্ব্ববৎ আদেশ পালন করিলেন। গুরু মুদ্রিত নয়নে গঞ্জিকা ইষ্টকে নিবেদন করিতেছেন। ইত্যবসরে শিষ্য সেই গঞ্জিকা সেবন করিতে লাগিলেন। নয়নোন্মীলন করিয়া গুরু ঐ মর্য্যাদা অতিক্রম দৃষ্টে বিস্মিত হইলেন। তিনি ধীর। ক্রুদ্ধ হইলেন না। ইহার গভীর গূঢ় অর্থ আছে

ভাবিয়া তদন্বেষণে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্ষণমাত্র ধ্যানস্তিমিতলোচনে স্বপ্ত-মীনহ্রদের ন্যায় জাগ্রত হইয়া বলিলেন "বটে! তবে তুমি পাহারা দাও, আমি চলিলাম।" সেই নিশীথে গুরু তারাপীঠ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রাম বলিতেন শ্রীগুরু আকাশে উড়িয়া গেলেন। তদবধি কেহ তাঁহার কোন সন্ধান পায় নাই।

ইঙ্গিত যেমন গূঢ় আসনাধিকারও তেমন গূঢ়ভাবেই ঘটিল। ইহার কিছুকাল পরে রাম যখন উপগুরু মোক্ষদানন্দকে নিজ পরিচয় ইঙ্গিতে জানান তখন মোক্ষদানন্দ কৈলাসপতির অন্তর্ধানের কারণ বুঝিয়া প্রকাশ করেন যে, রামই বসিষ্ঠের অবতার জানিয়া কৈলাসপতি রামকে বসিষ্ঠাসন ছাড়িয়া দেন। রামকে তখন হইতে আপামর লোক বসিষ্ঠ বলিয়া চিনেন। কবির মতে বসিষ্ঠ শব্দের নির্ব্বচন বসিগণের শ্রেষ্ঠ। উপনিষদে বসিষ্ঠ শব্দ আছে।

বসিষ্ঠাবতার

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি। বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ।

— ছান্দোগ্য ৬।১।২।

যিনি বসিষ্ঠের তত্ত্ব জানেন তিনি আত্মীয়গণের বসিষ্ঠ জন। বাক্ই বসিষ্ঠ। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বসিষ্ঠশব্দের নিরুক্ত দিতেছেন।

"বসিষ্ঠং বসিতৃতমমাচ্ছাদয়িতৃতমং বস্তুমত্তমং বা"

বসিষ্ঠ বাসয়িতাগণের মধ্যে বা বসুদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তিনি সকলের আশ্রয় ও সর্ব্বধনে ধনী! রাম বসিষ্ঠ অর্থাৎ বসিগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি বসিষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী যোগীরাট্। তন্ত্রমতে বসিষ্ঠ কুলনাথগণের অন্যতম। তাঁহার নামান্তর সিদ্ধনাথ। রাম সেই কুলনাথ সিদ্ধনাথ।

কুলনাথ

মধ্য লহরী

প্রকাশ তরঙ্গ

১। কাশীযাত্রা

ধর্ম্মকেন্দ্রং ভারতস্য প্রত্নং সিদ্ধর্ষিসেবিতম্।
বারাণসীং যযৌ বামো মোক্ষদানন্দছন্দতঃ॥

উপগুরু মোক্ষদানন্দের নির্ব্বন্ধে অথচ কাশীধামে মোক্ষদপরমানন্দ ভাব কিরূপ তাহা প্রকাশ জন্য বাম সিদ্ধমুনিগণসেবিত ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মকেন্দ্র বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন।

বসিষ্ঠ দেবের সিদ্ধাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রথমে কেহ বামকে চিনিতে পারেন নাই। কিছুকাল পরে তিনি প্রকাশলীলার অবতারণা করিলেন। তাঁহার উপগুরু মোক্ষদানন্দ দণ্ডিসমাজ কর্ত্তৃক বৃথা লাঞ্ছিত হইয়া তারাপীঠে সপত্নীক কৌলসন্ন্যাসাবলম্বনে কয়েক বৎসর কালযাপন করিতেছিলেন। আন্দাজ সন ১২৭১ সালে মোক্ষদানন্দের কাশী দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগিল।

প্রস্তাব

বামকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে তারাময় বাম উত্তর দিলেন—"কর্ত্তা বাবা! তারামাকে জিজ্ঞাসা করিব।" বাম তারামাকে জানাইলেন, কিন্তু কোন আদেশ না পাইয়া তাঁহার মন দোলায়িত হইল! তথাপি উপগুরুর আগ্রহ যে বামকে কাশী দেখান! নিজের এবং বামের জন্য যাত্রীদের নিকট পাথেয় সংগ্রহও করিলেন।

যাত্রার দিন আসিল। বাম তারামার নিকট বিদায় লইলেন। তারামা প্রসন্নচিত্তে বিদায় দিলেন না। বাম যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

বিদায় গ্রহণ

মোক্ষদানন্দ তথাপি ছাড়িলেন না। তাঁহাকে বুঝাইলেন "তোমার নাম করিয়া কাশী-যাত্রার পাথেয় যাত্রীদের নিকট লইয়াছি। এক্ষণে তুমি না যাইলে আমি অপদস্থ হইব।" অগত্যা বাম যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

মোক্ষদানন্দের কম্বলাদি সাজসরঞ্জাম আছে; বামের কৌপীন সম্বল। বামের স্কন্ধে উপগুরুর দ্রব্য-বহন-ভার পড়িল; উভয়ে রামপুরহাটে যথা-সময়ে পৌছিলেন। বাম বোকা, তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে একধারে বসাইয়া মোক্ষদানন্দ টিকিট খরিদ করিতে গেলেন। কলের গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিল। যাত্রী নামিতেছে উঠিতেছে। মোক্ষদানন্দ দ্রব্যাদি লইয়া গাড়ীতে বসিলেন। বামের বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি নীরবে পূর্ব্বস্থানেই আছেন। উপগুরু তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতেছেন। তখন বাম তাঁহার দিকে চলিলেন। কামরা বন্ধ কিন্তু চাবি দেওয়া নাই। বাম দরজা খুলিতে পারিতেছেন না। রেলের কর্ম্মচারী জনৈক ফেরঙ্গ পুরুষ দরজা খুলিয়া বামকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। শেষ ঘণ্টা ও বাঁশী বাজিল। গাড়ী ছাড়িবার উপক্রমে হ্যাঁচকা টান লাগিল। বাম বিপরীতমুখে বসিয়াছেন! তিনি সম্মুখে পড়িয়া গেলেন, শিকে তাঁহাকে মাথা ঠুকিয়া গেল। মোক্ষদানন্দ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন "বোকা! গাড়ী চাপতে জান না। শিক্ ধরে বস।" বাম তারামার কাছে জানাইলেন 'মা কেন বোকা করলি।' বাঁশীর স্বর তাঁহার মধুর লাগিয়াছে। তিনি বলিতেন, "বাবা! সাহেব বাবাদের কি মোহন বাঁশী! বাম সাবধানে শিক্ ধরিয়া বসিয়াছেন। গাড়ী ছুটিতেছে, গড়্ গড়্ শব্দ হইতেছে; বামের কাণে যেন বাজিতেছে 'ওড় ওড় ওড় ওড়, ঝাপাকাটা, ঝাপাকাটা,' অর্থাৎ 'জীব! আর কেন বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় সংসার পিঞ্জরে আছে? সেই অনন্ত বিমানে ওড়। বার বার বলিতেছি 'ওড় ওড়! তোমার প্রেম-জ্ঞান-ময় পক্ষদ্বয় ছিন্ন নহে। তাহা তুমি চালিত কর।' পক্ষদ্বয়ের শব্দ কিরূপ হইবে?—'ঝাপা কাটা ঝাপা কাটা'—'এতদিন যে বাঁধন ছিল সে বাঁধন শীঘ্র কাটা গিয়াছে, শীঘ্র কাটা গিয়াছে, আর ভয় নাই।'

যানারোহণ

টিকিট সাবধানে রাখিবার জন্য মোক্ষদানন্দ তাহা বামের বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঐ টিকিট যে দেখাইতে হয় বাম তাহা জানেন না। মধ্য পথে টিকিট পরীক্ষার জন্য একজন ফেরঙ্গ উঠিলেন। "টিকিট্ টিকিট্" বলিয়া ছড়ি বাড়াইলে যাত্রিগণ যে যাহার টিকিট দেখাইলেন। বামের বাহ্যজ্ঞান নাই! তিনি দুই হাতে শিক্ ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন; তারামার আদুরে ছেলে তারামার সঙ্গে মনে

পত্রিকা প্রদর্শন

মনে খেলা করিতেছেন। সাহেব তাঁহাকে জাগাইবার জন্ম করস্থিত বেত্রদ্বারা সবলে ঠেলিলে রাম চমকাইয়া উঠিলেন। সাহেব কহিলেন, "টোমারা টিকিট কাঁহা?" রাম কথা বুঝিতে পারিলেন না; হাঁ করিয়া আছেন! মোক্ষদানন্দ হিন্দিতে বলিলেন, "ওর টিকিট কাপড়ে বাঁধা আছে।" তাহা খুলিয়া দেখাইলেন। প্রভুর কি সারল্য! তিনি সংসারে আসিয়াও সংসারী নহেন। ক্রমে উভয়ে কাশী ধামে পৌঁছিলেন। কাশী মোক্ষদানন্দের সুপরিচিত। তাঁহার বেদান্ত চর্চ্চা, বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি লীলার ভূমি। তাঁহার চক্ষে বারাণসী পুরাতন ধাত্রীবৎ প্রতীয়মান হইল।

কাশী ভাল লাগিবারও কথা। কি ইতিহাস, কি জ্ঞান চর্চ্চা, কি ধর্ম্ম, কি শিল্প, সকল দিক হইতেই কাশীর ন্যায় নগরী ভারতে নাই। বৈদিককাল হইতে নন্দগণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশী স্বাধীন রাজ্য ছিল। পুরাণ মতে চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র 'কাশী' নিজ নামে এই রাজ্য স্থাপন করেন। যদু বংশীয় স্বনাম প্রসিদ্ধ হৈহয়ের অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র 'মহিষ্মান্' নর্ম্মদা তীরে 'মাহীষ্মতী' নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। কাশীরাজ্য মাহিষ্মৎ-পুত্র ভদ্রশ্রেণ্যের করতলগত হইলে কিয়ৎকাল পরে ভদ্রশ্রেণ্যের বংশধরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাশীবংশীয় ধন্বন্তরির প্রপৌত্র দিবোদাস তাহা পুনরধিকৃত করেন। পুরাণে কথিত আছে যে ঐ সময় উমা মাতৃ গঞ্জনায় মহেশ্বরকে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া নিজ ভবনে তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলেন। তাহাতে মহেশ সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসীতে যাইবেন স্থির করিয়া তাহা জনশূন্য করিবার জন্য স্বীয় অনুচর নিকুম্ভকে আদেশ দেন। নিকুম্ভ ঐ ক্ষেত্রে বাস্তক নামক এক নাপিতকে নিজ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিবার জন্য স্বপ্নে আদেশ দিলে নরসুন্দর নৃপতি দিবোদাসের অনুমতি লইয়া নগরদ্বারে নিকুম্ভের মন্দিরাদি নির্ম্মাণান্তে পূজা করিতে থাকেন। শত শত নাগরিক নিকুম্ভকে মানসিক করিয়া সফলকাম হইলে রাজমহিষী সাধ্বী সুযশাও পুত্রলাভার্থ তাঁহার বহু পরিচর্য্যা করেন; কিন্তু পুত্র পাইলেন না। রাজা ক্রোধভরে নিকুম্ভের স্থান বিধ্বস্ত করিলেন। নিকুম্ভের অভিশাপে পুরী হইতে অধিবাসী-গণ পলাইয়া যায়। দিবোদাসও কাশী ত্যাগ করিয়া গোমতী তীরে অন্য রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করেন। তখন বারাণসী ক্ষেমক

কাশীর ইতিহাস

নামক রাক্ষসের আবাস হয়। * এই প্রবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে দৈব ঘটনায় হঠাৎ কাশী জনশূন্য হয়। ইত্যবসরে ভদ্রশ্রেণ্যের বংশধর দুর্দ্দম কাশী অধিকার করেন। পরে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন বা শত্রুজিৎ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। শত্রুজিতের দুই পুত্র, বৎস ও ভার্গ। বৎসের

বৈদিক যুগে

নামান্তর 'ঋতধ্বজ', তিনি কুবলয় বর্ণের দিব্যাশ্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার নাম কুবলয়াশ্ব হয়। তাঁহার পত্নী মদালসা ও পুত্র অলর্ক। কুবলয়াশ্ব ও মদালসার উপাখ্যান পুরাণে কীর্ত্তিত; মদালসা আদর্শ জননী; তাঁহার সংসার ধর্ম্মে ও মোক্ষ ধর্ম্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দ্বারা মোক্ষ পথের পথিক করেন। কুবলয়াশ্বের তৃতীয় পুত্র অলর্ককে সংসারে রাখেন; অলর্ক মাতার নিকট বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সত্য-সঙ্কল্প ও ব্রহ্মণ্য কাশী রাজ। তাঁহার রাজ্য-নাশ, দত্তাত্রেয়ের শিষ্যত্ব ও পুনঃ রাজ্যলাভের কীর্ত্তি পুরাণে বর্ণিত। তাঁহারই সম্বন্ধে গাথা, যথা—

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষ শতানি চ।
অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা॥ বিষ্ণুপুরাণ ৪।৮।

অলর্ক ভিন্ন অন্য কোন যুবা নৃপতি ষষ্টিবর্ষসহস্র ও ষষ্টিবর্ষশত পৃথিবী ভোগ করেন নাই।

অলর্কের দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগের প্রবাদ তাঁহার যশ ও সুশাসনের পরিচায়ক। এই সময় কাশীরাজ্যের গৌরবসূর্য্য তুঙ্গী। অলর্ক হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত কাশীর ভূপতিগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়। দ্বাদশ পুরুষ ভার্গভূমি, কুরুবংশীয় হস্তী, যদুবংশীয় দশাই ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কাশীর সহিত দাতা হরিশ্চন্দ্রের আত্মবলীয় স্মৃতি জড়িত।

রামায়ণ-কালে কাশেয়গণের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও কাশীপতি ইক্ষ্বাকুগণের মিত্র স্বাধীন রাজা ছিলেন। দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে নৃপতিগণের আহ্বান জন্য বসিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে বলিতেছেন—

* হরিবংশ ২৯ অঃ
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২০-৪১ অঃ

তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদ্বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ ॥

—রামায়ণ বালকাণ্ড, ১৩ অঃ, ২৩ শ্লো।

সেই প্রকারে আমাদের প্রতি প্রেমপরায়ণ সর্ব্বদা প্রিয়ভাষী সদাচারী দেবতুল্য কাশীপতিকে নিজে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে। এইরূপ সম্মান ইক্ষ্বাকুগণের কুটুম্ব মিথিলাধিপতি ও কেকয়াধিপতি, প্রিয়সখা অঙ্গরাজ রোমপাদ এবং শূর মগধাধিপতি পাইয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপগণ দূতদ্বারা আহূত হন।

রামায়ণ-কালে

মহাভারত-কালেও কাশীরাজ সম্ভ্রান্ত। ভীষ্ম কাশীরাজের সহিত সম্বন্ধ শ্লাঘ্য বিবেচনা করিয়াই তাঁহার কন্যাগণের স্বয়ম্বরে উপস্থিত হন এবং স্বীয় বাহুবলে রাজন্যমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করেন। অম্বিকা ও অম্বালিকা যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জননী।* কাশীরাজ বীর ছিলেন। ভীম, প্রাচীদিগ্ বিজয়ে কাশীরাজকে সম্মান প্রদর্শনে বশে আনেন। তৎপূর্ব্বে কাশীরাজ জরাসন্ধের পক্ষে ছিলেন, তিনি ভারত যুদ্ধে আহূত হইয়া পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করেন।

মহাভারত কালে

দুর্যোধনও যুদ্ধের পূর্ব্বে শত্রুপক্ষীয় শূরগণের মধ্যে কাশীরাজকে গণনা করিয়াছেন। তিনি ঐ যুদ্ধে নিজ প্রাণ আহুতি দেন।

বৌদ্ধ যুগেও কাশীরাজ প্রসেনজিৎ মগধাধিপতির ন্যায় বলশালী।

মহাপদ্মানন্দের সময় অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত কাশীরাজও মগধের সামন্ত হন। ইংরাজ রাজ্যের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কাশী সামন্ত রাজ্য ছিল। চৈৎ সিংহের পতনের পর উহা বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। এক্ষণে কাশী-নরেশের রাজধানী রামনগর কাশীর পরপারে প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি রামনগর ইংরাজের করদরাজ্য হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে

শাস্ত্র চর্চ্চায় কাশীর গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ; সমস্ত ভারতে বেদাভ্যাসশীলনের কেন্দ্র বলিয়াই কাশী রাজ্য নামে অভিহিত। কাশীর মাহাত্ম্য ধর্ম্ম। কাশী শিবপুরী মোক্ষধাম; শিব পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ স্কন্দ পুরাণের

* মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব

কাশী খণ্ডে কাশীর মহিমা বিঘোষিত। পূর্ব্বোক্ত নিকুম্ভ শাপে বারাণসী শূন্য হইবার পর মহেশ পার্ব্বতীকে লইয়া এই পুরীতে বাস করেন। এইখানে অবিমুক্তেশ্বরের লিঙ্গ স্থাপিত। কাশীস্থ অবিমুক্তেশ্বর দর্শনের ফল অনন্ত। এখানে মৃত্যু মোক্ষকর, তাই কত শত বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেহত্যাগের জন্য কাশীবাস করেন।

শিবপুরাণে কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। সেই পঞ্চক্রোশী কর্ম্মের পার করে বলিয়া কাশী নামে কথিত। এখানে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ নিত্য বিরাজমান। তিনি মহাপাতকীদেরও মুক্তিদাতা। জীব অন্যত্র সারূপ্য মুক্তি পান, এখানে উত্তমা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। যাহাদের কোথাও গতি নাই তাহাদের জন্যই বারাণসী পুরী। পঞ্চক্রোশী অতি পবিত্র, এমন কি কোটী হত্যা পাপও এখানে বিনষ্ট হয়। অমরেরাও এখানে মরণ কামনা করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সিদ্ধগণও এই কাশীর শ্লাঘা করেন। সকলেই কাশীর সেবা করিতেছেন। কাশীর মহিমা শতবর্ষ বলিয়াও ফুরান যায় না।

কাশীতত্ত্ব

কাশীতে ধর্ম্ম-স্রোত প্রবল। দেবদেবীর সংখ্যা বহু; বিশ্বেশ্বর, কেদারনাথ, বটুকভৈরব, কালভৈরব, বেণীমাধব, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, সঙ্কটা, বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিতা; পথে ঘাটে গৃহে গৃহে শিবলিঙ্গ। কত আশ্রম, কত মঠ, কত সাধু, কত সাধক, কত সিদ্ধ, কত যোগী, কত দণ্ডী, কত সন্ন্যাসী এখানে বর্ত্তমান। ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এখানে সমবেত। মহম্মদিগণের এবং যীশুভক্তদের উপাসনাগারসমূহে ভূষিত হইয়া কাশী ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী স্বরূপ হইয়াছে। এখানে সিদ্ধপুরুষদের অভাব নাই, অগস্ত্য হইতে ত্রৈলঙ্গস্বামী পর্য্যন্ত মহাপুরুষধারা অবিচ্ছিন্ন। কাশীতে দানের ঘটাও বর্ণনাতীত, পল্লীতে পল্লীতে ছত্র; অন্নপূর্ণার রাজ্যে উপবাসী থাকিতে দেয় না।

ধর্ম্মস্রোত

শিল্পেও কাশী ছোট নহে। বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণচূড় মন্দির, অন্নপূর্ণার স্বর্ণময়ী প্রতিমা, দেবালয়, প্রাসাদ, মানমন্দির প্রভৃতি ভারতের প্রশস্ত কারুকার্য্যের নিদর্শন। কাশীর সন্নিবেশ সুন্দর; পতিতপাবনী গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিশ্বনাথপুরীকে বেড়িয়া আছেন। গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশীর ঘাট প্রাসাদ-মালায় কি শোভা!

শিল্প

কত গৃহী, সন্ন্যাসী হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে স্নানপূজাদি করিতেছেন; প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মন্দিরে মন্দিরে ভক্তির উচ্ছ্বাস। কত দেশ হইতে কত লোক দ্বেষহিংসাদি ভুলিয়া হৃদয়ের ভক্তিধারা বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর চরণে ঢালিতেছেন। তাঁহাদের প্রেমময় ভাবে গদগদ স্বরে স্তোত্রাদি ঝঙ্কারে পাষাণহৃদয়েও ভক্তি জাগিয়া উঠে। বিশ্বেশ্বরের আরত্রিক দর্শনীয়। পূজারিগণের মন্ত্রপাঠ কি মধুর।

ভক্তি

কাশীর জলবায়ুও উত্তম। বাঙ্গালীটোলা প্রভৃতি পল্লী ভিন্ন অন্য স্থল পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধবিহীন। বাঙ্গালীটোলাতেও বৃদ্ধবৃদ্ধা দীর্ঘজীবী। গ্রীষ্মকালে বিসূচিকা দেখা দেয় বটে তথাপি মোটের উপর কাশী স্বাস্থ্যকর স্থান। এক কথায় কাশী আনন্দনগরী বটে। কত গৃহ কত মন্দির হইতে স্বরলহরী উঠিতেছে, কত নহবৎ সুধাবৃষ্টি করিতেছে।

স্বাস্থ্যাবাস

২। প্রত্যাবর্ত্তন

লাঞ্ছিতো গুরুকল্পেন পথি ক্লেশৈর্বিবাধিতঃ।
লালিতস্তারয়া দেব শ্মশানং স্বং সমাগতঃ॥

গুরুতুল্য মোক্ষদানন্দ কর্ত্তৃক অযথা লাঞ্ছিত হইয়া, পথে নানাক্লেশ ভুগিয়া, শেষে তারামার আদর পাইয়া বাম তারাপীঠে স্বীয় শ্মশানে আসিলেন। কাশী বামের ভাল লাগিল না। তারার ক্ষ্যাপা ছেলে অন্নপূর্ণার রাজ্যে তৃপ্তি পাইলেন না। বড় বিস্ময়ের কথা। যেথানে যুগ-যুগান্তর যাবৎ কত শত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, কত শত সিদ্ধ, সাধক বাস করিয়াছেন, যেথানে বাসের জন্য ভারতের আর্য্যগণ লোলুপ, যে ধাম বিশ্বেশ্বর শ্রীরামের রাজ্য, সেই ধামে বামরূপী বাম থাকিতে চাহিলেন না। রামপ্রসাদও একবারমাত্র কাশী যান। দ্বিতীয়বার কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি গাহিয়াছিলেন—

মনোভাব

কাজ কি আমার কাশী,
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গা বারাণসী।

ক্ষ্যাপারও কি ঐরূপ ভাব উদিত হইল? তিনি তথায় গিয়াই অন্নপূর্ণাদি দর্শনকরতঃ আবদার ধরিলেন তারাপীঠে ফিরিবেন। মোক্ষদানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও ক্ষ্যাপাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; বাম পাগল বটে কিন্তু 'সেয়ান পাগল বুঁচকি আগল'; তিনি ভুলিলেন না। তারাপীঠে ফিরিবার সুযোগও আসিল। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে মোক্ষদানন্দ বামকে সঙ্গে লইয়া এক ছত্রে খাইতে গেলেন। ছত্রাধ্যক্ষ মোক্ষদানন্দকে চিনিতেন। তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনাকরতঃ তাঁহার সঙ্গী যুবকের পরিচয় চাহিলেন। মোক্ষদানন্দ পরিচয় দিলেন—'ব্রাহ্মণের ছেলে, বাস তারাপীঠ, ভক্ত সন্ন্যাসী—।'

তারাবেদী

ছত্রধারী বামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমরা কোন বেদী?" বাম উত্তর দিলেন, "তারা বেদী।" এইত জ্ঞান ভক্তির কথা! তারাইত একমাত্র বেদ বা জ্ঞান, ঋগ্বেদাদি ত তারাবেদের ছায়ামাত্র। তারাবেদে নিষ্ঠাতেই ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে শত শত সত্যবেদ ফুটিয়া উঠে।

ছত্রাধ্যক্ষ বিস্মিত হইয়া অন্য প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা কোন্ গোত্র?" বাম বলিলেন, "তারা গোত্র!" বাম 'তারা-ময়', তারাই তাঁহার বেদ বা জ্ঞান, তারাই তাঁহার গোত্র বা আভিজাত্য। অধ্যক্ষ মনে করিলেন, 'বাম মূর্খ, নিজ গোত্র পর্য্যন্ত জানে না, পেটের দায়ে সন্ন্যাসী।' প্রভু! তুমি বহুরূপী, যাকে যেমন চিনাও সে তেমনি চিনে; কাহাকেও অতি সহজে ধরা দাও, কাহাকেও ধরা দাও না; তোমার গতি বিচিত্র! বামের প্রতি ছত্রধারীর শ্রদ্ধা আসিল না, তিনি বামের আজন্ম তারাময় প্রেম-ভাব কিছুই বুঝিলেন না, তাঁহাকে সাধারণ উদরভরি সাধুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা সহকারে ছত্রের উঠানে আপামর সাধারণের সঙ্গে অন্ন দেওয়াইলেন। নির্বিকার শ্মশানচারী বাম

নিরভিমান

সেই খানেই আনন্দের সহিত তারামার জয় দিয়া প্রসাদ পাইলেন। যিনি শৃগাল কুক্কুরের সহিত শ্মশানে শবমাংসও খাইতেন, তাঁহার আবার মানাপমান কি? মোক্ষদানন্দ পূর্ব্বে সংসারত্যাগ করিয়া বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণে দণ্ডী হইয়াছিলেন, পরে তারাপীঠে সস্ত্রীক কৌলসন্ন্যাস লইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভিমান যায় নাই; তিনি পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ, তদুপরি সাধক ও উচ্চশ্রেণীর লোক, এ ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল ছিল।

উপগুরুর ত্রুটি

তাই তিনি বিদ্যার ও জাতির গরিমায় সহচর বামকে ছাড়িয়া ছত্রের সম্মানসূচক উচ্চস্থানে দণ্ডিগণের সহিত ভোজন করিলেন।

আহারান্তে উভয়ে বাসায় ফিরিতেছেন। মোক্ষদানন্দ উপগুরু হইলেও 'দোষাবাচ্যা গুরোরপি' ন্যায়ে তাঁহার শিক্ষার জন্য বাম বলিলেন, "কর্ত্তাবাবা! আমি আর কাশীতে থাকিব না।" মোক্ষদানন্দ বলিলেন, "কেন?" বামের প্রত্যুত্তর হইল—"আমাকে অপমান করিলেন"; মোক্ষদানন্দ বলিলেন, "কিরূপে অপমান হইল?" বাম কহিলেন—"বুঝিয়া দেখুন।" এ স্বর কোমল গান্ধারের; মোক্ষদানন্দ একেবারে পঞ্চমে স্বর বাঁধিলেন, তিনি বলিলেন, মূর্খ! তুই নিজের গোত্র ও বেদের পরিচয় দিতে পারলি না, তোকে উঠানে খাইতে দিবে না ত দিবে কোথায়?" বাম তখন বিনয়ের সীমা অতিক্রম না করিয়া কহিলেন, "কর্ত্তাবাবা! বেদের কি ধার ধারি, তারামাই আমার বেদ।" মোক্ষদানন্দ আরও চটিয়া উঠিলেন— "তোর মনে অভিমান ভরা, উঠানে খাইতে দিয়াছে অপমান বোধ হইয়াছে, আবার মুখে বলা হচ্চে তারামা আমার সব!" বাম বলিলেন, "কর্ত্তাবাবা, আপনার অভিমান নাই? আমার সঙ্গে উঠানে কেন খাইতে পারিলেন না?"

তৎফল

মোক্ষদানন্দের এতদূর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল যে তিনি এক পাটী কাষ্ঠপাদুকা খুলিয়া বামকে সবলে প্রহার করিলেন। বামও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিয়া রেলষ্টেশনে আসিলেন। দেখিলেন এক রেলের সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে বলিলেন, "সাহেব বাবা, আমি রামপুরহাট যাব, আমায় গাড়ীতে তুলে দাও।" সাহেব বলিলেন—"টিকিট্‌কা রুপায়া দেও"। বাম বলিলেন, "বাবা! আমার টাকা নেই।" সাহেবটী গরম মেজাজের লোক নহেন! তিনি হাসিয়া হাঁটা পথ দেখাইয়া দিলেন—"তব সিধা সড়ক্ পাক্‌ড়ো।" বামও সেই পথ ধরিলেন।

তারামা পুত্রকে পথ দেখাইবার জন্য সেইক্ষণে একদল গোশকট-

সঙ্গীলাভ

চালকের সঙ্গে মিলাইলেন। উহারা কাশী হইতে পণ্য দ্রব্য লইয়া পাটনার দিকে যাইতেছিল, বামকে দেখিয়া তাহাদের দয়া আসিল। আলাপে পরিচয় হইল, বামের ভক্তিভাবে

তাহাদের হৃদয় গলিল। তাহারা তাঁহাকে গাড়ীতে লইল; পথে শক্তু (ছাতু), গুড় প্রভৃতি খাইতে দিল। আমরা এইরূপ ব্যক্তিদিগকে ইতর লোক বলি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কত উন্নত-প্রাণ মহানুভব আছেন। বাম সঙ্গে আসিলেন।

তাহারা বামকে বাংলার পথ দেখাইল। বাম একা পড়িলেন, পথ চলিতেছেন, কোন গ্রামে প্রবেশ করেন না, কাহারও বাটীতেও অতিথি হন না, কাহারও নিকট কিছু চান না, তারাপীঠই একমাত্র লক্ষ্য। দিবাভাগে চলেন; শ্রান্ত হইলে পথপার্শ্বে বৃক্ষতলেই বসেন ও শয়ন করেন। পথে দুই দিবস আহার জুটিল না, দুইটী বিল্বপত্রই দুই দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হইল। মনের তেজঃ আছে, কিন্তু শরীর ক্লান্ত, অন্নময় কোষ অন্ন বিনা ক্লিষ্টই হয়। সাধু হরিদাস প্রভৃতি হঠযোগী দেখাইয়াছেন বটে যে ৭।৮ মাসও অনাহারে প্রাণ যায় না, কিন্তু শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়। অনশনের তৃতীয় দিবসে বাম শ্রান্ত হইয়া পথের ধারে একটি কূপের নিকট বসিয়া আছেন। তারামার উপর অভিমান হইয়াছে; ক্লেশ পাইলে পুত্র মায়ের উপরও অভিমান করে। অভিমানভরে বলিতেছেন,—'বেটী! কেন আমায় কাশীতে আন্‌লি? কেন এত কষ্ট দিয়ে তারাপীঠে নিয়ে যাচ্ছিস্?' তারামার প্রাণে বাজিল; পুত্রকে যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে।' তারামা কৃষ্ণকায়া সিন্দুরসীমন্তিনী রমণীবেশে ভোজ্যদ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। বামের লক্ষ্য নাই; তিনি তারামার সঙ্গে আবদারের কথা কহিতেছেন। রমণী মৃদুমধুর স্বরে ডাকিলেন, "কে তুমি বাবা, এখানে একা বসে কি করছো?" বাম ফিরিয়া চাহিলেন; বুঝিলেন মার প্রাণে লেগেছে, তাই ছুটে এসেছে; অভিমানে নীরব রহিলেন। মা বলিলেন, "কেন বাবা, তুমি গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হও নাই? তাই তোমার এত কষ্ট হয়েছে।" তখন তারামার করুণাদর্শনে বামের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। মা সাদরে লুচি প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্য খাওয়াইলেন। এই ঘটনা বাম কুমারানন্দস্বামীকে নিজমুখে বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কুমারানন্দ বামকে জিজ্ঞাসা করেন—"বাবা! ঐ নারীই বুঝি তারামা?" বাম সব জানেন; তথাপি বিনয়মুগ্ধতায় বলিলেন—"কি জানি বাবা! তা হবে।"

অনশন

সমাদর

এই ঘটনার পর বামকে আর পথে অনশন করিতে হয় নাই। যথা-সময়ে কোন না কোন লোক আসিয়া ফলমূলাদি যোগাইত। কোন কোন দিন অন্নাদিরও ব্যবস্থা হইত। তিনি কাহারও বাটীতে আতিথ্য লইতেন না। তারামা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এখন তিনি তারামাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাতা ও পুত্র এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রমে বাম পদব্রজে বীরভূমের প্রধান নগর শিউড়িতে সন্ধ্যাকালে পৌছিলেন। তথায় দক্ষিণারঞ্জন বাবুর কালীবাটীতে রাত্রে অভ্যর্থিত হইয়া থাকেন। পরদিন সাঁইথায় আসিলে এক আড়তদার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভক্তিসহকারে আতিথ্যে বরণ করেন। ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া পরদিন তারাপীঠে পৌছিলেন।

তারাপীঠে

নিজরাজ্য শ্মশানে আসিয়া যেন আশ্বস্ত হইলেন। সিমূলতলায় গড়াগড়ি দিয়া আদুরে ছেলের মত কাঁদিতে লাগিলেন—'মা আমায় আর এখান থেকে সরিয়ে দিস্‌নি।' পাণ্ডারা বাবার প্রত্যাগমনে ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে, বাবা উত্তর করেন, "মোক্ষদানন্দ বাবা আমায় কাশী নিয়ে গেছলেন। সেখানে অন্নপূর্ণা মা আছেন, বিশ্বেশ্বর আছেন, আমার এই শ্মশানই ভাল।" পরে মোক্ষদানন্দ তারাপীঠে ফিরিলে ব্যাপার জানা গেল।

কাশী পুণ্যধাম বটে, কিন্তু পুণ্যধাম একণে পাপপঙ্কপূর্ণ। শাস্ত্রমতে কাশীতে আসিলে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়, কিন্তু কাশীর পাপ খণ্ডায় না। পুণ্য-স্থানের শুদ্ধিরক্ষার জন্যই ঐরূপ হিতকর বচন। দুঃখের বিষয় বিশ্বনাথের পুরীতে ব্যভিচারের অন্তঃস্রোত প্রবল। কাশীর পুণ্যকর্ম্মেও পুণ্যগন্ধের অভাব ঘটিয়াছে। ছত্রাদি রাজসিক দান। কাশী জ্ঞানের রাজ্য, কিন্তু সেই জ্ঞানেও তামসিকতা। বেদান্তাদি চর্চ্চার মূল যশোলিপ্সা বা অর্থোপার্জ্জন ; তাহার ফল পাণ্ডিত্যাভিমান।

কাশীর দোষ

এই অভিমানের প্রভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তিভাব বুঝিতে পারেন নাই। প্রকাশানন্দের নিকট তদীয় ছাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের গুণকীর্ত্তন করিলেন।

জ্ঞানাভিমান

মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে,
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখি যে তাঁহাতে।

নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তার গায়,
দুই নেত্রে অশ্রুবহে গঙ্গাধার প্রায়।
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন,
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৭

এই কথা শুনিয়া শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ হাসিলেন ও শ্রীগৌরাঙ্গকে উপহাস করিয়া বিপ্রকে উত্তর দিলেন,

সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহাইন্দ্রজালী
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব-কেলি।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৭।

বিদ্যামদের কি মাদকতা! পরমভক্তের ভক্তিভাব বিদ্যাভিমানীর চক্ষে ইন্দ্রজাল মাত্র। বিপ্র তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রভুর নিকট সে কথা প্রকাশ করিলে প্রভু বলিলেন—

ভাব কেলি বেচিতে আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব॥

সেবার প্রভুর ভাবকেলির গ্রাহক জুটিল না। তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। কাশীবাসীর প্রতি তাঁহার ভাবব্যত্যয় হইল না! শেষে বিনামূল্যে অমূল্যভাব প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেই দিলেন। কবিরাজ গোস্বামী হৃদয়ের আবেগ সহকারে এ ছবি আঁকিয়াছেন। প্রকাশানন্দের জ্ঞানের গর্ব্ব ভাঙ্গিল, ভক্তিসুধার আস্বাদ পাইলেন।

৩। গূঢ় কারণ

শ্রীভাবরসমাস্বাদ্য তারাভাবমধুব্রতঃ।
শ্রীপীঠং কিং জহৌ যোগী তারাপীঠায় নির্বৃতঃ।

সৃষ্টিলয়াতীত সচ্চিদানন্দময় তারাভাবের মধুকরস্বরূপ সর্ব্বত্যাগী যোগী পরিতৃপ্ত বাম কি শ্রীবিদ্যার পীঠ কাশীর ঐশ্বর্যভাবরূপ মধু কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া সত্বর তারাপীঠেই ফিরিলেন ?

কাশী কেন বামের ভাল লাগিল না ? তারাপীঠের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কি একদেশিতা ? এরূপ ভাব কি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ? ইত্যাদি প্রশ্ন আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। শ্রীবাম অদ্ভুত গুরু, তিনি দেহ রাখিয়াও সংশয়চ্ছেত্তা।

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।
—দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুস্তোত্র।

গুরুর ব্যাখ্যা নীরব, অথচ শিষ্যগণের সংশয় ছিন্ন হয়। প্রভু আমাদের সংশয় নিবারণ জন্য কাশী-তত্ত্বের আভাস দিয়াছেন।

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ জগত্যাং বস্তুমাত্রকং।
তৎ সর্ব্বঞ্চ যদা নাসীৎ পঞ্চক্রোশী তদা শুভা॥
তদেব কথয়াম্যদ্য তন্নির্ম্মাণং মুনীশ্বরাঃ।
আদৌ চ নির্গুণং তেজঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্॥
চিদানন্দস্বরূপঞ্চ নির্বিকারং সনাতনং।
কাশীতত্ত্ব ততশ্চ প্রকৃতির্দেবী সা পুরুষসমন্বিতা॥
আবাভ্যাং কিন্নু কর্ত্তব্যমাবাং কেনৈব নির্ম্মিতৌ।
ইতি সংশয়মাপন্নৌ প্রকৃতিপুরুষৌ যদা॥
তাভ্যাং বাণী সমুৎপন্না নির্গুণা পরমাত্মনঃ।
তপশ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং ততঃ সৃষ্টিরনুত্তমা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব তদৈতদূচতুস্তদা।
তপসশ্চ স্থলং কাস্তি কুত্র বা স্থীয়তেঽধুনা॥
ততশ্চ তেজসঃ সারং পঞ্চক্রোশাত্মকং শুভম্।
সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তং সুন্দরং নগরং যথা॥

নির্ম্মায় প্রেরিতং তাভ্যাং নির্গুণেন বিরাজিতম্।
অন্তরীক্ষে স্থিতং তচ্চ অধিষ্ঠায় হরিঃ স্বয়ং॥
তপশ্চচার বিধিবৎ সৃষ্টিকামস্তদাজ্ঞয়া।
তেনৈব বহুকালঞ্চ তপস্তপ্তং সুদারুণম্॥
তপসঃ করণাচ্চৈব শ্রমস্তস্য মহাত্মনঃ
ক্রমেণ জলধারাশ্চ বিবিধাশ্চাভবং স্তদা॥
তাভির্ব্যাপ্তঞ্চ সর্ব্বং বৈ নান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রদৃশ্যতে।
চিন্তিতং বিষ্ণুণা তচ্চ কিমহো হ্যেতদদ্ভুতম্॥
ইত্যাশ্চর্য্যং তদাদৃষ্ট্বা শিরসঃ কম্পনং কৃতম্।
ততশ্চ পতিতঃ কর্ণাৎ মণিশ্চ পুরতঃ প্রভোঃ॥
যত্রাসৌ পতিতশ্চৈব তত্রাসীৎ মণিকর্ণিকা।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা সা পঞ্চক্রোশী পুরাতনী॥
নির্গুণেন শিবনৈব ত্রিশূলেন ধৃতা তদা।
বিষ্ণুরপি চ তত্রৈব সুষাপ প্রকৃত্যা সহ॥
কিয়ৎকালং জলে তত্র সুপ্তোঽসৌ চ জনার্দ্দনঃ।
তন্নাভিকমলাজ্জাতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥
শিবাজ্ঞাঞ্চ সমাসাদ্য সৃষ্টিঞ্চ কৃতবাংস্তদা।
কাশীতত্ত্ব যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যতে চাত্র ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরম্।
তদ্ব্যাপ্তং হি বিশেষেণ শিবেন তেজসা তদা।
চেতনাচেতনং যচ্চ ব্যাপ্তমাসীন্মুনীশ্বরাঃ॥
ততশ্চ সৃষ্টিকার্য্যঞ্চ প্রাবর্ত্তত সমন্ততঃ।
ভুবনানি চ জাতানি গোলোকে তৎ চতুর্দ্দশ॥

—শিবপুরাণ।

এই জগতে যাহা কিছু বস্তু দেখা যায় সেই সকল যখন ছিল না তখন মঙ্গলময়ী পঞ্চক্রোশী ছিল। হে মুনিবরগণ, অদ্য সেই পঞ্চক্রোশীর নির্ম্মাণ বৃত্তান্ত বলিব! প্রথমে নিগুণ তেজঃ ছিল, তাহাই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, চিদানন্দস্বরূপ, নির্ব্বিকার ও সনাতন। তাহা হইতে পুরুষের সহিত প্রকৃতিদেবী নির্গত হন। তাঁহারা এইরূপ সংশয়াপন্ন হইলেন যে আমাদের কি কর্ত্তব্য, আমাদের কে নির্ম্মাণ করিলেন! তখন তাঁহাদের প্রতি

পরমাত্মার আদেশ বাণী হইল, 'তপস্যাই তোমাদের কর্ত্তব্য, তাহা হইতে উত্তম সৃষ্টি ঘটিবে।' প্রকৃতি ও পুরুষ বলিলেন, 'তপস্যার স্থল নাই, কোথায় বা আমরা এক্ষণে থাকি?' তদানন্তর তেজঃসারভূত পঞ্চক্রোশাত্মক শুভ সর্ব্বোপকরণযুক্ত সুন্দর নগরসদৃশ পদার্থ নির্ম্মাণ হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের নিকট প্রেরিত হইল। তাহাতে নির্গুণ বিরাজমান। অন্তরীক্ষে অবস্থিত সেই নগরে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং হরি সৃষ্টি বাসনায় পরমাত্মার বিধিবৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি সুদারুণ তপস্যা করিলেন। তপশ্চরণে সেই মহাত্মার শ্রম হইল। শ্রমের ফলে তখন বিবিধ জলধারা বহির্গত হইল। সেই জলধারা দ্বারা তখন সর্ব্ববস্তু ব্যাপ্ত; অন্য কিছুই দেখা যাইতেছে না। বিষ্ণু ভাবিলেন, 'একি অদ্ভুত ব্যাপার!' সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া প্রভু শিরঃ কম্পিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহার কর্ণ হইতে সম্মুখে মণিময় কুণ্ডল পতিত হইল। যেখানে উহা পড়িল উহাই মণিকর্ণিকা। প্রাচীনা সেই পঞ্চক্রোশী জলস্রোতে প্লাবিতা হইলে নির্গুণ শিব তখন তাহা ত্রিশূলে ধরিলেন। বিষ্ণু প্রকৃতির সহিত সেইখানে নিদ্রিত হইলেন। জনার্দ্দন কিছুকাল তথায় ঘুমাইলেন; তাঁহার নাভি হইতে কমল উঠিল। সেই কমলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্মিলেন। তিনি শিবাজ্ঞা পাইয়া সৃষ্টি করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমসহ যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই বিশিষ্ট শিবতেজঃ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। হে মুনীশ্বরগণ! যাহা কিছু চেতন ও অচেতন সকলই ব্যাপ্ত হইল। তৎপরে চারিদিকে সৃষ্টি-কার্য আরব্ধ হইল। গোলোকে চতুর্দ্দশ ভুবন জন্মিল। উক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রীরাম সময়ান্তরে প্রকাশ করাইবেন। আপাততঃ এই বক্তব্য যে পঞ্চক্রোশী কাশী ভূততলের নগরী নহে। উহা পঞ্চক্রোশাত্মক প্রপঞ্চ। ঐ পঞ্চকোষই সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব। পঞ্চভূতাত্মককোষ, পঞ্চতন্মাত্রাত্মককোষ, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মককোষ, পঞ্চজ্ঞানাত্মককোষ ও চিত্তকোষ। সম্যক প্রকাশমান বলিয়া কাশী নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে আকর্ষণী ও বিকর্ষণীশক্তি নিহিত। তদ্বলেই সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে। সেই আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ব্যাপিকা শক্তির অধীশ্বর হরি বা বিষ্ণু। তাঁহার প্রেরক নির্গুণ শিব। শিবই বিষ্ণুকে সৃষ্টির জন্য উক্ত পঞ্চকোষ বা পঞ্চক্রোশী কাশী নির্ম্মাণ করিয়া পাঠাইলেন। বিষ্ণু তদবলম্বনে কিরূপ সৃষ্টি করিব এই ধ্যানে মগ্ন হইলেন;

উহা পুরাণের ভাষায় বিষ্ণুর কারণ-সমুদ্রে যোগ নিদ্রা। সৃষ্টিকৌশল লাভ করিলে সৃষ্টির ইচ্ছা ও সৃষ্টির কল্পনা প্রকট হইল। কল্পনাবিষয়ীভূত বিশ্বই পদ্ম। তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জন্ম। সেই ব্রহ্মা আবার তপস্যার ফলে উক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ পঞ্চক্রোশী কাশী নির্গুণ শিবের সত্ত্বরজস্তমোময় ত্রিশূলে অবস্থিত। সৃষ্টির পর উহা চতুর্দ্দশভুবনে অবরোপিত।

পঞ্চক্রোশী কাশী বুঝিতে পারিলে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত বুঝা যায়। কাশী-বিদ্যাই প্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিলয় বিদ্যা। ঐ বিদ্যাকালেই জীবের অষ্টসিদ্ধি। পুরাণ সেই কথাই বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষির আখ্যায়িকায় প্রকাশ করিতেছেন।

কাশীবিদ্যা

এই কাশীবিদ্যা অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিলয়বিদ্যাকে তন্ত্র তৃতীয়া বিদ্যা অর্থাৎ ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যা বলেন। সৃষ্টি নিত্য নূতনা। তাহা কেবল জড়শক্তির বিকাশ নহে, চিৎজড়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন। তাই তৎকর্ত্রী চিন্ময়ী ষোড়শী। সৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকট বলিয়া ষোড়শী রাজরাজেশ্বরী, তিনিই সত্ত্বরজস্তমো-গুণময়ী ত্রিপুরা। তিনি প্রপঞ্চের পোষণী অন্নপূর্ণা; সেই অন্নপূর্ণা কাশী-পুরাধীশ্বরী। শিব যখন নির্গুণ তখন অন্নপূর্ণার ধার ধারেন না। যখন সগুণ তখন কিন্তু অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। যতদিন শঙ্করাচার্য্য যতি ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন ততদিন একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। যখন তিনি ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলেন, তখন বিভূতিপ্রদর্শন, দিগ্বিজয়, সম্প্রদায় গঠনাদি জন্য চিন্ময়ী প্রকৃতির আশ্রয় লইলেন। তখনই তিনি ত্রিপুরা উপাসক; তখনই কাশীক্ষেত্রে আসিলেন। তখনই আনন্দলহরী স্তোত্র ছুটিল; তখনই অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন,

শ্রীবিদ্যা

অন্নপূর্ণে! সদাপূর্ণে! শঙ্করপ্রাণবল্লভে!
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি !!

হে অন্নপূর্ণে! হে সদাপূর্ণে! হে শঙ্করপ্রাণপ্রিয়ে! হে পার্ব্বতি! জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দাও।

ভূতলের কাশীধাম এই কাশীবিদ্যার সিদ্ধগণের ক্ষেত্র বলিয়া কাশী নামে পরিচিত। তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি ঐ পুরীতে খেলিয়াছে। সংসারী জীব ঐ ক্ষেত্রে যাইলে ঐ শক্তির প্রভাবে উৎকর্ষতালাভ করে। কাশীতীর্থের এই মাহাত্ম্য ; সে সূক্ষ্মশক্তি পাত্রবিশেষে প্রবল ও মলিন হয়। কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী ছিলেন ও বটুল পাঁড়ে ছিলেন। কাশী তৃতীয়াবিদ্যা সাধকের প্রিয়ক্ষেত্র। কিন্তু তারা বা কালীবিদ্যাসাধকের উহা ক্ষেত্র নহে। তৃতীয়া বিদ্যাসাধনেও মুক্তি আছে, এজন্য কাশী মোক্ষধামও বটে। কিন্তু মোক্ষেরও ক্রম আছে ; মাহেশ্বরী প্রধানতঃ সৃষ্টিপ্রবণা, কর্ম্মাত্মিকা। কালী লয়মুখী কর্ম্মনাশা। তাই কালীসাধক রামপ্রসাদের তৃতীয়বার কাশী যাইতে মন সরে নাই।

তারা বিদ্যা

তারা ত্রাণবিদ্যা, সৃষ্টিলয়াতীতা সচ্চিদানন্দাত্মিকা। তারা-বিদ্যাধিকারী বামেরও কাশী ভাল লাগে নাই। কাশীক্ষেত্রের ভাব তিনি শীঘ্রই আয়ত্ত করিয়া স্বীয় ভাবের ক্ষেত্র তারাপীঠে ত্যাগের লীলার জন্য ফিরিলেন।

৪। কালনেমি ভৈরবী

নেন্দ্রিয়লৌল্যলেশেঽপি ভৈরবী সাধনং হিতম্।
তস্মাদ্বামেঙ্গিতমুল্লঙ্ঘ্য সাধকো মদনো মৃতঃ॥

ইন্দ্রিয় চাপল্যের লেশমাত্র থাকিতেও তন্ত্রের ভৈরবী সাধন হিতকর নহে। তাই বামের ইঙ্গিত অবহেলা করিয়া সাধক মদন মরণ প্রাপ্ত হন।

কাশী হইতে বামের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মদন গোঁসাই নামক জনৈক সাধক তারাপীঠে শিমূলতলায় সাধনার জন্য আসেন। মুর্শিদাবাদ কাঁদির অন্তর্গত আলিগ্রাম ভরতপুরে তাঁহার নিবাস। কাঁদির সিদ্ধান্ত বংশে তিনি বিবাহ করেন। সংসার ছাড়িয়া তিনি ডাবুকের কৈলাসপতি গোঁসাইয়ের শরণাপন্ন হন। তখন কৈলাসপতি তারাপীঠের শ্মশানে অনুষ্ঠান করেন এবং দক্ষিণ-

গ্রামেও ভক্তালয়ে থাকেন। পরে তিনি ভাবুকের শিব মন্দিরাদি সংস্কার করিয়া ভাবুকের কৈলাসপতি নাম প্রাপ্ত হন। কৈলাসপতি তাঁহাকে নানা পরীক্ষার পর আশ্রয় দেন। দীক্ষাগ্রহণান্তে মদন তারাপীঠে বসিলেন। কৈলাসপতিকে বাম ভক্তি করিতেন, তাঁহার ভোগ-ভাব থাকায় তাঁহাকে 'রাজাগোঁসাই' বলিতেন। মদনের সাধনাবিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া বাম তাঁহার উত্তরসাধকতা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। বামের

মদন

প্রকাশ্য সাধনা নাই ; মদন তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই ; কিন্তু বামের আকর্ষণীশক্তিতে পড়িয়াছেন। কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় বামকে ভালবাসিয়াছেন। বাম কল্পতরু! মদন যখন তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভাবে চায়, তিনি তাই মদনকে 'দাদা গোঁসাই' বলিতেন। বামের ন্যায় তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। উভয়ে মহাশ্মশান হইতে মড়ার তালাই, দড়ি, বাঁশ প্রভৃতি লইয়া শিমুলতলায়-একখানি ছোট ঘর তুলিলেন। বাম তাহার নাম রাখিলেন "যোগেন্দ্র ঝোপড়া"। উভয়ে

সাধনা

সেইখানে রাত্রে শবদাহ কাষ্ঠে ধুনি জ্বালাইয়া জগদম্বার চিন্তাতে এবং দিবসে ভক্তি-সঙ্গীতে আনন্দে কালযাপন করিতেন। মদন সাধনপথে সুন্দর অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু এই পথে নানা কণ্টক, প্রতিপদে সাধকের পরীক্ষা ; মধ্যে মধ্যে পতন। এই তত্ত্ব পুরাণে বিশ্বামিত্র-মেনকা দিব্য উপাখ্যানে প্রকটিত।

কাম প্রলোভন সহ্য করা বড়ই কঠিন।

> শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
> কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সযুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ —গীতা ৫।২০।

যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগকে সহ্য করিতে পারেন সেই মনুষ্যই যোগী, তিনিই সুখী।

যদি সত্যযুগের দৃঢ়মতি সাধক প্রলোভনবিমুগ্ধ হন, কলিযুগের দুর্ব্বলচিত্ত সাধক যে ঐ মোহমুগ্ধ হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি ? মদন দাদা অচিরেই

বিঘ্ন

কঠোর পরীক্ষায় পড়িলেন এবং উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে বীরভূমের বসুয়া বিষ্ণুপুর হইতে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা পাগলিনী অবস্থায় তারাপীঠে আসিলেন। বাম তাঁহাকে

দেখিয়াই মদন দাদাকে বলিলেন "দাদা! এই যে ভৈরবী আসিয়াছেন ইনি কালনেমি ভৈরবী। দাদা সাবধান!" তথাপি মদন সাবধান হইতে পারিলেন না। রমণী পূর্ণযৌবনা। মদন দাদার মন টলিল। মদন তাঁহাকে ভৈরবীরূপে গ্রহণ করিলেন।

তন্ত্রে ভৈরবী গ্রহণ ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা বীরসাধকের পক্ষে বিহিত। পশুভাবে শুদ্ধাচারে সাধনায় বৈদিক বিধি নিষেধ পালন, প্রলোভন পরিহার। ইহা যেন দুর্গ মধ্য হইতে যুদ্ধ। বীরাচারে প্রলোভনের সহিত সম্মুখ-সমর। ইহা কামবৃত্তিচরিতার্থ নহে, প্রত্যুত কামাদিজয়জন্য সাধনা। কামাদির বিষয়সেবন, অথচ কামাদি দমন। পশ্বাচারে মদ্যাদি পরিত্যাজ্য। বীরাচারে কালাকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনায় মাত্রানুসারে তাহা গ্রাহ্য। পশ্বাচারে রমণীপ্রসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। বীরাচারে রমণীসঙ্গ। ঐ রমণীসঙ্গের উদ্দেশ্য কবি বর্ণনা করিয়াছেন:—

ভৈরবী সাধন

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ। —কুমারসম্ভব ১ম স।

বিকারের কারণ থাকিতেও যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই ধীর।

তন্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া কামকিঙ্কর জীব ভৈরবী-সাধনা লইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কলির জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য রাম স্বয়ং বামাবতার হইয়াও ভৈরবী গ্রহণে বিমুখ ছিলেন। তিনি বলিতেন 'তারামাই আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী।' কথার কি গভীর অর্থ! তারামা 'রতিকামোপরি পদমর্দ্দনকরী।' তিনিই রতি এবং কামকে পদদলিত করিয়া মদনারি শ্রীরামের ভৈরবী পদবাচ্যা হইয়াছেন। যে নারী এ সংসারে ঐ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রতি কামকে দলিত করিতে পারেন তিনিই ভৈরবী হইতে পারেন। রামের ন্যায় নিষ্কাম, শ্মশানচারী, সর্ব্বত্যাগী না হইলে পুরুষও ভৈরবী আখ্যা পাইবার অধিকারী নন। হরগৌরী লীলাই ভৈরব ভৈরবী লীলা। উঁহাদের নিত্য মিলন অথচ কামগন্ধ নাই। ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য আছে? জগৎপিতার ও জগৎমাতার লীলা বিচিত্র।

মদন দাদা ভৈরব হইবার উপযুক্ত নন। পাগলীমাও ভৈরবী ছিলেন

না। উভয়ের আকর্ষণ নিষ্কাম নহে, সাধনার জন্য নহে। সুতরাং কামের দ্বার অপাকৃত হইল। বহুপূর্ব্বে রাজর্ষি যযাতি কামতৃষ্ণার তথ্য গাহিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ —মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

কাম কখনও কামের উপভোগে শমিত হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাহুতিতে অনলের ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়।

মদন দাদা এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। মধুকর এক পুষ্পের রসে তৃপ্ত হয় না, পুষ্পান্তরে যায়। দিনকতক পরে মদন দাদা ঐ ভৈরবীর রসে তৃপ্ত হইলেন না। উভয়ের মধ্যে কলহ বাধিল। ভৈরবী উড়িয়া গেলেন। মদন দাদাও অন্যান্য ভৈরবী করণে ব্যাকুল হইলেন। মন একবার কলঙ্কিত হইলে সেই কলঙ্ক ধৌত করা কঠিন। কর্ম্ম শেষ হয় বটে কিন্তু মনে তজ্জনিত সংস্কার থাকিয়া যায়। মদন দাদার যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিল। অনেকেরই তিনি বিরাগভাজন হইলেন। তিনি ভিক্ষার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নিত্য বাহির হইতেন। এখন তাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল। একদিন প্রহারেণ ধনঞ্জয় হইল। সংবাদ আসিল তারাপীঠ ও তারাপুরের মধ্যবর্তী বেজুড়িয়ার মাঠে মদন দাদা অজ্ঞান অবস্থায় পতিত। বাম শুনিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভু করুণাময়, সর্ব্বজীবে তাঁহার প্রেম।

পতন

মদনকে দাদা বলিয়াছেন। বন্ধুকৃত্য শিখাইবার জন্য নিষ্কাম বামও বন্ধুর সাহায্যে ছুটিলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উহা ভৈরবী গ্রহণের কুফল। পাগলী মার প্রতি যখন মদনের আকর্ষণ হয় তখন ঐ মাকে বাম কালনেমি ভৈরবী নাম দিয়াছিলেন। কালনেমি রাবণের সর্ব্বনাশ করে বলিয়া, কথকঠাকুরগণ বর্ণনা করেন। ইনিও মদনের সর্ব্বনাশ করিলেন। বেজুড়িয়ার মাঠে বন্ধুকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া বাম তাঁহাকে আশ্রমে আনিবার প্রয়াস পাইলেন। তখন বামের শরীরে মত্ত হস্তীর ন্যায় বল। তিনি একাই মদনকে স্কন্ধে তুলিয়া শিমূল তলার যোগেন্দ্র ঝোপ দ্বার আনিলেন এবং যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন।

দিবারাত্রি পরে মদনের জ্ঞান আসিল। তিনি মহাপুরুষের আশ্রিত; আবার সাক্ষাৎ বাম তাঁহার প্রতি সদয়। হঠাৎ তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল।

তাহার ফলও পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুতাপ আসিল। তিনি স্বীয় গুরু কৈলাসপতি গোঁসাইকে দেখিতে চাহিলেন। বাম বুঝিয়াছেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। দক্ষিণগ্রামে কৈলাসপতি তখন ছিলেন না। স্থূলে গুরুর সহিত মদনের মিলন হইল না। স্থূল দৃষ্টিতে তাহা দুঃখের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শনে তাহা ভাল। কবি গাহিয়াছেন—

অনুতাপ

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

সঙ্গম বা বিরহ এই উভয়ের মধ্যে বিরহই ভাল। সঙ্গমে একা তার সহিত মিলন, বিরহে জগৎ তন্ময় হয়। স্থূল বিরহে অনুরাগ বাড়ে এবং অনুক্ষণ সূক্ষ্ম মিলন ঘটে। মদন দাদার সুন্দর ভাব আসিয়াছে। অনুতাপানলে তাঁহার মনের মল দগ্ধ হইয়াছে। মনু বলেন—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্তস্তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্তঃ পূয়তে তু সঃ॥

যদি পাপ করিয়া মনঃ সন্তপ্ত হয় তাহা হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আর ঐরূপ কার্য্য করিব না এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

অবসান

হা গুরো বলিয়া মদন অনবরত কাঁদিতেছেন। গুরুর সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে এবং শ্রীবামের মুখে তারা নাম শুনিতে শুনিতে মদন ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। বাম মদন দাদাকে সমাধি দিলেন। বামের চেষ্টায় পরে ঐ সমাধির উপর একটি ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মদন দাদার কলেবর ত্যাগকালে তাঁহার পত্নী শ্বশুরগৃহে ছিলেন। হৃদয়ে হৃদয়ে বিচিত্র আকর্ষণ! দুইটী যন্ত্র এক সুরে বাঁধা থাকিলে যেমন একটীতে আঘাত করিলে অপরটী বাজে তেমনি দুই হৃদয় একরূপ হইলে একে আঘাত লাগিলে অপরটীতেও আঘাত লাগে। ব্যবধানাদি বাধা মানে না। বিলাতী কবি সেই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন—

Star to star vibrates light ; may soul to soul
Strike thro' a finer element of her own ?

যদি তারকা আকাশে তারকান্তরে কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতে পারে তবে আত্মা আত্মান্তরে স্বীয় সূক্ষ্মাকাশের মধ্য দিয়া কেন আঘাত করিতে পারিবে না ?

পতির অশুভ সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে সতীর প্রাণে অশুভ গাহিয়াছে। তিনি শ্বশ্রূদেবীকে বলিলেন, "মা ! তোমার বেটা কি করিল ?" সেইদিনই সাধ্বী শয্যা লইলেন, সে শয্যা হইতে আর উঠিলেন না। তৃতীয় দিবসে স্বামীর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে এ তৃষিত মরু ছাড়িয়া শ্রীগুরুর রসাল নন্দনে স্বামীর সহিত মিলিতা হইলেন। ধন্য ভারত নারী ! ধন্য তোমার পাতিব্রত্য !

৫। স্বপ্নাদেশ

পরীক্ষ্য ভূয়োঽপ্যুপবাসবহ্নৌ বামং ভবানীসমুদীরয়ন্তী।
নাটোররাজ্ঞ্যে মহিমানমস্য স্বপ্নোপদেশেন ববন্ধবৃত্তিম্ ॥

পুনরায় বামকে উপবাসরূপ বহ্নিতে পরীক্ষা করিয়া ভবানী তাঁহার মহিমা নাটোরের রাণীর নিকট স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রকাশ করতঃ তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়াছিলেন।

এই সময় বীরভূমে অনাবৃষ্টি বশতঃ ধান্যাদি জন্মিল না। তন্নিবন্ধন শস্য-শ্যামলা বঙ্গলক্ষ্মীর ভাণ্ডার বীরভূমও দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের কবলে পতিত হয়। হঠাৎ চাউলের মূল্য টাকায় সাতসের (কাঁচি) হইল। পাঁচটাকা চাউলের মণে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ঘটে। ত্রিহুত দুর্ভিক্ষেও প্রায় এরূপ মূল্য ছিল।

দুর্ভিক্ষে

বীরভূমেও অজন্মায় হাহাকার পড়িল। শিমূলতলায় যাত্রী আদৌ নাই। তখন বামের নাম প্রচার হয় নাই, তাঁহাকে দেখিতে ধনাঢ্য যাত্রী যাইত না। তারামায়ের প্রসাদও বামের বন্ধ

হইয়াছিল। সুতরাং বামের আহার তারামা সবদিন জুটান না। প্রিয় সন্তানকে আবার পরীক্ষায় ফেলিলেন।

মোক্ষদানন্দেরও অবস্থা অচল। কাশীতে গিয়া হস্ত রিক্ত। তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে। এই অকালে দুইটী প্রাণীর অন্ন সংস্থান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছে। ভাবুকের কৈলাসপতি একদিন আসিলেন এবং মোক্ষদানন্দ ও বামকে দক্ষিণগ্রামে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা গেলেন। কৈলাসপতি তখন প্রকট হইতেছেন, তাঁহার কতকগুলি অবস্থাপন্ন শিষ্য। তজ্জন্য বাম তাঁহাকে "রাজা গোঁসাই" বলিতেন। বাম ও মোক্ষদানন্দ কয়েকদিন কৈলাসপতির অতিথি হইলেন। কৈলাসপতি স্বীয় শিষ্যমণ্ডলী ও আগন্তুকগণ সহ গৃহী শিষ্যগণের বাটীতে ফিরিতেন। মোক্ষদানন্দ উহা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনায় আর আতিথ্য লইলেন না। বামকেও যাইতে নিষেধ করিলেন।

উপবাস

তারামা দুইদিন বামের আহার জুটাইলেন না। তিনি নীরবে অনশনে শ্মশানে বার চিন্তায় দুইদিন কাটাইলেন। তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি আনন্দময়ীকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ভক্তবীরই প্রাণের প্রাণ হইতে বলিতে পারেন—

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি!

হে ভবরাণি! তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি।

তারামা বামকে বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বাম অনন্যশরণ। আর কি তিনি থাকিতে পারেন! ভক্তের শরীর রক্ষার ভার লইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

করুণাময়ী মহাশক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। নিজের ব্যবস্থা নিজে করিতে যাই। যখন নিজের চেষ্টায় তাহা পারি না তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানে দোষারোপ করি। আর যদি চেষ্টা সফল হয়, নিজে কৃতিত্ব লই। আমরা চিন্তাতেও আনিতে পারি না যে ভগবান অলৌকিক উপায়ে আমাদের পুরুষকার ব্যতীত আমাদের কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন।

স্বপ্নাদেশ

অস্মাদৃশ লোকের চক্ষুরুন্মীলনের জন্যই বামের উপবাসের দ্বিতীয় রাত্রে নাটোরের রাণী অন্নদাসুন্দরীকে তারামা স্বপ্নাদেশ দিলেন যে "আমি তারাপীঠে দুইদিন উপবাসী"। রাণীমা প্রাতে

উঠিয়া এই স্বপ্ন-কথা প্রকাশ করিয়া তারাপীঠে সংবাদ লইতে বলিলেন। মুর্শিদাবাদে রঘুনাথগঞ্জের কাছারিতে তারযোগে সংবাদ দেওয়া হইল। তখন ভারত মৈত্র ঐ কাছারির নায়েক। তিনি তারাপীঠে আসিলেন; তদন্ত করিলেন। জানিলেন, ভোগ যেমন হয় তেমনি হইয়াছে, কোন ক্রটী হয় নাই। কিন্তু প্রকাশ পাইল যে দুই তিন দিন বাম অনশনে আছেন।

তদন্ত

তিনি বামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে তারামার বাহ্য প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু তৎপরে বামের ভাবদর্শনে তাঁহাকে তারামার ভক্ত বলিয়া জানিতে পারেন। বামের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্ষ্যাপা তুমি কি উপবাসী আছ?" বাম বলিলেন "হাঁ বাবা! তারামা কিছু দেন না।" তাঁহার পক্ষে সকলই তারামার কার্য্য। বামকে তারামার প্রসাদ দেওয়া হইল।

মৈত্র নাটোরে এই সংবাদ প্রেরণ করিলে তথা হইতে আদেশ আসিল যেন নিত্য মধ্যাহ্নে তারামার অন্নপ্রসাদ ও সায়াহ্নে তারামার আরতির পর প্রসাদ বামকে দেওয়া হয়। তারামা তিনবার অগ্নি-পরীক্ষার পর বামের আজীবন আহারের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি মন্দিরে আসিলে তথায়

বৃত্তি বন্ধন

তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইত; শ্মশানে বা অন্যত্র থাকিলে এক থালা অন্নপ্রসাদ তাঁহার নিকট মধ্যাহ্নে প্রেরিত হইত। রাত্রেও যৎসামান্য দুগ্ধাদি দেওয়া হইত। পরে প্রণামী-স্বরূপ তাঁহার জন্য মাসিক চার টাকা দিবার বিধান হয়। মাতা জীবমানে তাঁহাকে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইত। পরে কনিষ্ঠ সহোদর রামের অর্থাভাব হইলে রাম লইতেন। প্রভুর শেষদশায় ঐ টাকা নাটোরের তহশীলদার তাঁহার নামে খাতায় জমা করিতেন মাত্র; সে টাকা আর দেওয়া হয় নাই।

৬। পরিচয়

চপলমিব বিভুং তং ভর্ৎসয়ন্ শিষ্যবোধা-
দবিদিতবিভুতত্ত্বঃ শাস্ত্রবিৎ কর্ম্মনিষ্ঠঃ।
উপগুরুরনুভূয় প্রাণরোধং তদানীং
বিভুপরিচয়লেশং চন্দ্রচূড়াদবাপ ॥

সেই বিভু বামকে চপলের ন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়া তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হওয়ায় সেই বিভুর তত্ত্ব না জানিয়া শাস্ত্রপাঠী বাহ্যাচারনিষ্ঠ উপগুরু মোক্ষদানন্দ তাঁহাকে শিষ্যবোধে ভর্ৎসনা করিলে অনুভব করিলেন যেন স্বীয় শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণ বহির্গত হইতেছে। সেই সময়েই চন্দ্রচূড়ের নিকট বাম যে সাক্ষাৎ শিব তদ্বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন।

তারামার স্বপ্নাদেশে শ্রীবামের মহিমা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইল। পাণ্ডারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিলেন। মোক্ষদানন্দের অবস্থা অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। যেমন অদ্বৈতাচার্য্য সংসার হরিভক্তি-বিহীন দেখিয়া শ্রীহরিকে আনাইব প্রতিজ্ঞা করিয়া কত কাঁদিয়াছিলেন, কত উপবাস করিয়াছিলেন, কত তুলসী দিয়াছিলেন, তদ্রূপ মোক্ষদানন্দও জীবগণকে শক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ ও শক্তিভক্তিবিমুখ দেখিয়া বড়ই বিমনা ছিলেন। বসিষ্ঠের ন্যায় মহাপুরুষ অবতীর্ণ না হইলে শাক্ততত্ত্ব মহিমা প্রচার হইবে না তাঁহার ধারণা ছিল। অদ্বৈত নিমাইকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠের সহচর। মোক্ষদানন্দও শ্রীবামের গুরু ব্রজবাসী কৈলাসপতির সহচর। অদ্বৈত যেমন বিশ্বরূপের সহিত গীতা ভাগবতাদি চর্চ্চা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন, মোক্ষদানন্দও সেইরূপ কৈলাসপতির সহিত তন্ত্রচর্চ্চায় ধন্য হইতেন। বালক নিমাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপকে অদ্বৈতের বাটী হইতে ডাকিতে যাইতেন, অদ্বৈত নিমাইয়ের অনুপম রূপলাবণ্যের ও সারল্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। মোক্ষদানন্দও সেইরূপ শ্রীবামের ত্যাগভক্তি প্রেমাদি সন্দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। অধিকন্তু শ্রীবামের তিনি অভিষেকাদি করিয়া তাঁহার উপগুরুস্থানীয় হন। যেমন অদ্বৈত শ্রীগৌরের অবতারত্বে সন্দিগ্ধ হন, মোক্ষদানন্দও শ্রীবামের অবতারত্ব বুঝেন নাই। গয়া হইতে উদ্বোধনের পর শ্রীগৌর নবদ্বীপে আসিয়া স্বপ্নে অদ্বৈতকে

তুলনা

একটু আভাস দেন। দাসঠাকুর প্রাণের ভাষায় ঐ ব্যাপার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হৈল সভাকার মন॥
পরম সন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে।
সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥
* * * *
শুনিঞা অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥
"মোর আজুকার কথা শুন ভাইসব।
নিশিতে দেখিনু আজি কিছু অনুভব॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন।
উঠহ আচার্য্য ঝাট করহ ভোজন॥
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥
আর কেন দুঃখ ভাব পাইলে সকল।
যে লাগি সঙ্কল্প কৈলে, সে হৈল সফল॥
আভাস যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলে "কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন॥
যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক।
তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিবে অনুভব॥

ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়
আরবার আসিবাঙ ভোজন বেলায় ॥
চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর ॥
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥"

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর একদিন গদাধরের সঙ্গে শ্রীগৌর অদ্বৈতের বাটী আসিলেন। অদ্বৈত দুইভুজ আস্ফালন করিয়া 'হরি হরি' বলিতেছিলেন ও প্রেমাবেগে কখন হাসিতে কখন কাঁদিতে ছিলেন। শ্রীগৌর ঐ ভাব দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। অদ্বৈত তখন এই মোর প্রাণনাথ জানিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা ভাবস্থ গৌরচন্দ্রকে বিষ্ণুবোধে পরম ভক্তিভরে পূজা করতঃ প্রণাম করিলেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

তাঁহার ভাব জানিবার জন্য গদাধর তাহা দেখিয়া জিহ্বা কামড়াইলেন ও হাসিয়া বলিলেন "বালকের প্রতি আপনার ন্যায় প্রবীণের এরূপ আচরণ যুক্তিযুক্ত নয়।" অদ্বৈত উত্তর করিলেন "গদাধর! বালক জানিবা কথোদিনে।" বিশ্বম্ভরের বাহ্যজ্ঞান হইল; তিনি অদ্বৈতের পদধূলি লইলেন ও স্তুতি করিলেন।

অদ্বৈত গৌরকে এইরূপ চিনিয়াও আবার সংশয়ে পড়িলেন, পরীক্ষার ইচ্ছা হইল। তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং ভাবিলেন যদি গৌর কৃষ্ণের অবতার হন, তাঁহার মনোভাব জানিয়া তাঁহাকে আনিতে পাঠাইবেন। ইহার কিছু পরেই গৌর শ্রীবাসের নিকট প্রকট হইলেন। ভক্ত সঙ্গে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলনও ঘটিল। তিনি অদ্বৈতের মনোভাব জানিতে পারিয়া রামাঞি পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তখনও অদ্বৈতের ভাবাবেশ ছিল। তখনও যেন পরীক্ষার ভাব আছে।

সংশয়

অদ্বৈত বোলয়ে শুন রামাঞি পণ্ডিত।
মোর প্রভু হেন তবে আমার প্রতীত॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহেরে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেয় আমার মাথায়॥

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়।

অদ্বৈত সস্ত্রীক নবদ্বীপে আসিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুক্কায়িত রহিলেন; রামাই পণ্ডিতকে বলিলেন তুমি শ্রীগৌরকে বলিও যে অদ্বৈত আসিল না। প্রভু তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি শ্রীবাসের গৃহে ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া কহিলেন—

পরীক্ষা

নাঢ়া আইসে নাঢ়া আইসে", বলে বার বার।
"নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরান্ দেখিবার॥

* * *

নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাঞিরে॥
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইলা তোরে॥"
"নাঢ়া আইসে" বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিয়াও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায়॥
এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

রামাঞি পণ্ডিতের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অদ্বৈত মহানন্দে সস্ত্রীক শ্রীবাসের বাটীতে আসিলেন। দূর হইতে তিনি গোরারায়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র তাহাতে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় শ্রীবৎসকৌস্তভাদি শোভিত শ্রীমূর্ত্তি দেখিলেন।

জিনিয়া কন্দর্পকোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় বালক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥

শ্রীপ্রকাশ

দুই বাহু কোটী কলসের স্তম্ভ জিনি।
তহিঁ দিয়া অলঙ্কার রত্নের শ্রেণী ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে ॥
কোটী মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে।
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহাপ্রভুর চারিদিকে কত শত দেবদেবী দিব্য স্তুতি পাঠ করিতেছেন। এই মহাঠাকুরাণ দেখিয়া অদ্বৈত বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু নিজ মুখে প্রকাশ করিলেন :—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে ॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে ॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হইতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে ॥

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই শুনিয়া অদ্বৈত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—

"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈলু যত অভিলাষ ॥

আজি মোর জন্ম দেহ সফল সকল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ যুগল॥
যোযে মাত্র চারিবেদ যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে॥
মোর কিছু শক্তি নাই তোমার করুণা।
তোমা বই জীব উদ্ধারিবে কোন জনা॥"

বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রেমে ভাসিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে পূজা করিতে আদেশ দিলেন। অদ্বৈত শ্রীচরণ সুবাসিত জলে ধোয়াইয়া গন্ধ পুষ্প তুলসী প্রভৃতি চরণে দিলেন, দীপাদি উপচারে মনের সাধে প্রেম নীরে বুক ভাসাইয়া পূজা, স্তুতি ও প্রণাম করিলেন। চরণতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈতের মস্তকে চরণ দিলেন।

অদ্বৈতের আনন্দ ধরে না। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে কীর্ত্তন গাহিয়া নৃত্য করিতে বলিলেন। অদ্বৈত আনন্দে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও যোগ দিলেন। নিত্যানন্দে ও অদ্বৈতে প্রেমের কলহ ঘটিল। শ্রীচৈতন্য আপনার গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়া বর মাগিতে বলিলেন। অদ্বৈত বলিলেন সাক্ষাতে যখন শ্রীভগবান দেখিলাম তখন আর কি বর চাহিব?' প্রভু আবার নিজ অবতারত্ব নিজে জ্ঞাপন করিলেন। অদ্বৈত বর মাগিলেন, সকলে যেন চৈতন্য গুণ গাহিয়া প্রেমোন্মত্ত হন।' প্রভু তাহা স্বীকার করিলেন।

পূজা

দাসঠাকুর ভক্তপ্রধানের নিকট শ্রীগৌরের প্রকাশ এইরূপ বলিয়াছেন। দেখা যাউক শ্রীরাম স্বীয় অদ্বৈতের নিকট কিরূপ প্রকাশ হইলেন। তারামার স্বপ্নকথা শুনিয়া মোক্ষদানন্দ ভাবিলেন 'শ্রীরাম কি সাক্ষাৎ শ্রীরাম?' রামের মোহিনী মায়াতে আবার ভুলিয়া গেলেন। রাম যে তাঁহার শিষ্য স্থানীয়, সে কি রামাবতার হইতে পারে? এইরূপ ভাব আসিল। তবে সে তারার প্রিয় সন্তান, তাই তারা তাহার অন্নের জন্য স্বপ্ন দিয়াছেন, এইরূপ মনে করিলেন। আমার প্রভু ধৃতমুগ্ধভাব। তাই মোক্ষদানন্দেরই নিকট গূঢ় প্রকাশের জন্য অদ্ভুত খেলা খেলিলেন। আনুমানিক সন ১২৭৩ সালে একদিন প্রাতে চন্দ্রচূড়ের মন্দিরে মোক্ষদানন্দ পুষ্পাদি দিয়া পূজা করতঃ ধ্যান করিতেছেন।

বাম মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃদুস্বরে কহিলেন "কর্ত্তা বাবা! একটু গাঁজা দিবেন না?" মোক্ষদানন্দ উত্তর দিলেন না। দুই তিন বার বাম তাঁহাকে ঐরূপ বলিলেন। মোক্ষদানন্দের বিরক্তি বোধ হইল। তিনি ধ্যান করিতে পারিতেছেন না; সুতরাং বামকে তিরস্কার করিলেন "মূর্খ! এই কি গাঁজা চাহিবার সময়? কেবল গাঁজা ও মদ,—আর কিছু চিন্তা নাই?" বাম নীরবে মন্দির দ্বার হইতে সরিয়া মন্দিরের অলিন্দে বসিলেন। মোক্ষদানন্দও চক্ষু বুজিয়া ধ্যানের চেষ্টা পাইলেন। ক্ষণেক পরেই তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ তাঁহার জিহ্বা ভিতরে টানিতেছেন, যেন তাঁহার শ্বাস রোধ হইতেছে। প্রাণ যায় যায়। মনে মনে চন্দ্রচূড়কে ডাকিতেছেন 'বাবা! রক্ষা কর! রক্ষা কর!' তাঁহার মানস নয়নে শিবলিঙ্গের উপর রজত-গিরিনিভ ত্রিশূলধারী, ফণিভূষণ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—'অপরাধ করিয়াছ। তার ফল পাওয়া চাই।' মোক্ষদানন্দ মনে মনে উত্তর দিতেছে 'কই বাবা! কি অপরাধ করিলাম?' চন্দ্রচূড় প্রত্যুত্তর করিলেন 'এই যে আমাকে ভর্ৎসনা করিল।' মোক্ষদানন্দ অপরাধ মার্জ্জনার জন্য নীরবে বামকে জানাইলেন। জিহ্বা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া গেল, শ্বাসরোধের অনুভব দূর হইল। তিনি আর ধ্যানে বসিলেন না। আসন হইতে উঠিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। দেখেন বাম বসিয়া আছেন। বামকে বলিলেন— "আয় বাম! গাঁজা দেই।" গাঁজা আনাইয়া নিজে সাজিয়া বামকে খাওয়াইলেন ও বলিলেন "বাম! তোকে এতদিন চিনিতে পারি নাই। সংশয় হইয়াছিল; এখন সংশয় গেল। তুই এ পীঠের ভৈরব।" বাম বিনয় মুগ্ধ। তিনি ও কথায় কোনও উত্তর না দিয়া কেবল বলিলেন—"কর্ত্তা বাবা! বড় ভাল লোক, গাঁজা দিলেন। কি দিব্য গাঁজা। কেমন সুন্দর বাবার ভোগ হইল।" মোক্ষদানন্দ তখন বামের প্রতি ভক্তিভাবে গদগদ। তাঁহার ইচ্ছা বামকে বাহ্যপূজা ও স্তুতি করেন। কিন্তু বামের তাহা অভিপ্রেত নহে। বাম সংসারত্যাগী হইলেও সমাজের মর্য্যাদা রক্ষক। উপগুরুর অর্চ্চনা লইলেন না।

ইঙ্গিত

৭। শাল্মলী দহন

কণ্টকাকীর্ণ সংসারপ্রতীকং শাল্মলীং দহন্।
তন্ত্রোক্তিং পালয়ামাস সিদ্ধোবামঃ কলৌ নরঃ ॥

কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী বৃক্ষই কণ্টকাকীর্ণ অর্থাৎ দুঃখময় সংসারের প্রতিবিম্ব। তাহা দগ্ধ করতঃ কলিযুগে নররূপী সিদ্ধ বাম তন্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পালন করিয়াছিলেন।

তারাপীঠের শ্মশানে একটি প্রকাণ্ড বহু প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। প্রবাদ ঐ তরুমূলে বসিষ্ঠদেব তারাসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রে ঐ শাল্মলীর উল্লেখ আছে। ঐ বৃক্ষ বসিষ্ঠসম্প্রদায়ের প্রিয়। উহার জন্যই ঐ শ্মশানের সিদ্ধস্থান 'শিমূলতলা' নামে পরিচিত। কালক্রমে ঐ পাদপ শুষ্ক হইয়া যায়। কুমারানন্দ স্বামী উহার শুষ্কতা সম্বন্ধে এই গল্প বলিতেন যে ডাবুকের কৈলাসপতি নিজ শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া ঐ শিমুলতলায় জপ আরম্ভ করেন। দুইদিন জপের পর তৃতীয় মহানিশায় একটি শিবা তথায় উপস্থিত হয়। কৈলাসপতি তাহাকে একটু কারণ মন্ত্রপূত করিয়া দেন। কিন্তু শিবাটি তাহা গ্রহণ না করায় কৈলাসপতির জপসিদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় হয়। কয়েকদিবস পরে ধ্যানাবস্থায় অন্ধকারে ঐ স্থানে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কোন এক জীব লেহন করতঃ পলায়ন করে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভয়ানক জ্বর আসে। তিনি তাই অভিশাপ দেন যে শিমূলতলায় যখন তপোবিঘ্নকারী ভূতের উৎপাত হইয়াছে তখন ঐ শিমূলগাছ শুখাইয়া যাইবে। তদবধি তাহাও শুষ্ক হইয়া আসে। আমরা তদন্তে জানিয়াছি যে, ঐ শিমূল বিটপী তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক হইয়াছিল। উহার আয়তন এত বৃহৎ ছিল যে দুইজন লোকও চতুর্হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক উহার মণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে পারিত না। উহার কোটরে দুইজন ব্যক্তি লুকায়িত থাকিতে পারিত। উহা শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান ছিল। তন্ত্রে ঐ তরুর উল্লেখ আছে। তাং সন ১২৭৪ সালে একদিন রাত্রে গঞ্জিকা সেবন করিয়া ঐ বৃক্ষের কোটরে বাম অগ্নি বিসর্জ্জন করেন। তুরিতানন্দরসিকগণ জানেন যে তুরিতানন্দে কত অল্প অগ্নি সংযোগ আবশ্যক এবং তৎসেবনের পর যে অগ্নি একরূপ নির্ব্বাপিত হয়। ইতিপূর্ব্বে

শাল্মলীতরু

কত সাধক ঐ শিমুলতলায় গঞ্জিকা সেবনান্তে উক্ত শাল্মলী কোটরে অগ্নি ঢালিয়াছেন। কোনদিন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে নাই। ঐ দিন অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। কয়েক ঘণ্টা পরে বৃক্ষের শিরোভাগ হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ঐ দেশে তখন পাটের কল হয় নাই। কল থাকিলে দূর হইতে লোক মনে করিত যে পাটকলের উচ্চ চিমনি দিয়া ধূম বাহির হইতেছে। পরদিন প্রাতে বহ্নিদেবের লেলিহান জিহ্বা গগনে প্রসারিত হইতেছে।

অগ্নিদাহ

পাণ্ডাদের বসতি শিমূলতলা হইতে অনতিদূরে। মধ্যে জীবৎকুণ্ড ও তারামার মন্দির বাটী। পাণ্ডাপল্লীতে ঘরগুলি খড়ে নির্মিত। তাঁহাদের ভয় হইল যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে বায়ু প্রবাহিত হইলে তাঁহাদের গৃহে অগ্নি লাগিবে। তাঁহারা হৈ হৈ করিতে লাগিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত করা অসম্ভব। অনুসন্ধানে তাঁহারা জানিলেন যে এ ক্ষ্যাপার কাজ। ক্ষ্যাপার উপর তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এখনও তাঁহারা বামের মহিমা দেখেন নাই! ভগবান ধরা দিলেও অন্ধ জীব সহজে তাঁহাকে চিনিতে পারে না! শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে দুর্য্যোধনের ধারণা হইয়াছিল যে উহা মায়াবীর মায়া। অর্জুন অনুরূপচিত্র দেখিয়া ভক্তিগদগদ!

মধ্যে মধ্যে পাণ্ডারা বামের প্রতি অত্যাচার করিতেন। প্রভু করুণাময়, কিছু বলিতেন না। অগ্নিদাহে পাণ্ডারা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে তিনি ছুটিয়া সরলপুরের মাঠে পলাইলেন। তথায় দাঁড়াইয়া তিনি শিমুল গাছের দিকে চাহিয়া দেখেন যে অগ্নিঝলকের মধ্যে তারামা বিরাজিত।

তারামূর্ত্তি

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্॥
খড়্গাকর্ত্রী সমাযুক্ত সব্যেতরভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিদ্বয়ান্বিতাম॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রয়ভূষিতাং॥
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
সাবেশ-স্মেরবদনাং স্বালঙ্কারবিভূষিতাম্॥

তারামাকে এইরূপে ধ্যান করিবে—তিনি প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ তাঁহার বামপদ অগ্রবর্ত্তি ও দক্ষিণপদ পরোবর্ত্তি। তিনি ঘোরা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, খর্ব্বা ও লম্বোদরী। তাঁহার কটিদেশে ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান, তাঁহার নব যৌবন; তিনি লেলিহানাদি পঞ্চ মুদ্রা সংযুতা; তাঁহার চতুর্ভুজ; জিহ্বা লকলক করিতেছে। তিনি অতিভীষণা হইলেও বরদাত্রী। তাঁহার ঊর্দ্ধ ও অধঃ দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ কর্ত্তরী এবং ঐরূপ বাম করদ্বয়ে কপাল ও পদ্ম রহিয়াছে। তাঁহার শিরোভাগে সর্পাকারে অক্ষোভ্য ঋষি বিরাজিত এবং একটী পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ জটা দোদুল্যমান; তাঁহার লোচনত্রয় বাল সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। তিনি প্রজ্জ্বলমান চিতার মধ্যে অবস্থিতা। তাঁহার ভীষণ দশন। মুখখানি ভাবাবেশে সহাস্য; স্ত্রীঅঙ্গোচিত নানালঙ্কারে তিনি ভূষিতা। বামার ঐ ভীমকান্ত রূপ দর্শনে বামের হৃদয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সাগরের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়াছে। চক্ষু দিয়া দর দর ধারা, মুখে গদ্গদ মা মা রব,—তিনি করতালি দিতেছেন। জীবের মঙ্গলতরে মাকে বলিলেন—"দেখিস মা! যেন কারো ঘরে আগুন লাগাসনি।" মা কি সে কথা না শুনিয়া থাকিতে পারেন? পরক্ষণেই দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে হঠাৎ ঝড়ের এক ঝটকা আসিল এবং শিমুলগাছের জলন্ত উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া সরলপুরের মাঠে ক্ষ্যাপার নিকট পড়িল। অবশিষ্ট অংশ দুই তিন দিন ধরিয়া পুড়িয়াছিল। কাহারো কোন ক্ষতি হয় নাই। ভস্মরাশি শিমুল-মূলে স্তূপাকার হইল মাত্র। এমন কি উহার সন্নিহিত মোক্ষদানন্দের যোগেন্দ্র ঝোপড়াও পোড়ে নাই।

জীবে দয়া

মোক্ষদানন্দ শাল্মলী দহন তন্ত্রে পড়িয়াছিলেন যে কলিকালে বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধপুরুষ শাল্মলী বৃক্ষ দগ্ধ করিবেন। তিনি পূর্ব্বে চন্দ্রচূড়মন্দিরে বামের বিভূতির আভাস পাইয়াছিলেন। শাল্মলী দহনে বুঝিলেন বাম পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পরমার্থতঃ বাম আজন্মসিদ্ধ। সংসার শ্ব অর্থাৎ আগামী দিনেও থাকে না। প্রতিপলে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই অনিত্যতা প্রযুক্ত সংসারকে উপনিষদাদিতে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হইয়াছে:

শাল্মলী তত্ত্ব

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ এষোঽশ্বত্থোঽসনাতনঃ।

—কঠোপনিষৎ ৬।১

এই অনিত্য অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে ও শাখা নিম্নমুখে প্রসারিত। সংসার দুঃখ-বহুল। তজ্জন্য শাক্ততন্ত্রমতে কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী ইহার উপমান। রাম ঐ কণ্টকময় সংসার হইতে মুক্ত। ইহা খ্যাপনের জন্যই তন্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সপ্রমাণ করিলেন।

৮। মাতৃভক্তি

পিতুরপ্যধিকা মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী।
ইতি রামঃ সহায়োঽভূন্মাতুরন্ত্যেষ্টিকর্ম্মণি ॥

মাতৃদেবী পিতৃদেব অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়া এবং স্বর্গ অপেক্ষাও গৌরবান্বিতা. এই কারণে সন্ন্যাসী হইয়াও রাম মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সহায় হইয়াছিলেন। মাতৃ-হৃদয়ে সন্তান-স্নেহের ন্যায় সন্তান-হৃদয়ে মাতার প্রতি ভক্তি জীবের ধর্ম্ম। কি পশু কি পক্ষী কি কীট কি পতঙ্গ কি মানুষ সকলেই অন্ততঃ শৈশবে মাতৃভক্ত। মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব; তাঁহার বিচারবুদ্ধি অন্য জীবাপেক্ষা অধিক। যখন জ্ঞানের বিকাশে তিনি ভাবেন যে জননী হইতেই জগৎ দেখিয়াছেন, জননীর অকৃত্রিম স্নেহ না পাইলে বাঁচিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার জননীর প্রতি ভক্তি শৈশবান্তেও লোপ পায় না। তিনি তখন গাহিয়া থাকেন:—

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।
তস্মাদ্ধি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ ॥

গর্ভে ধারণ ও লালনপালন হেতু পিতা অপেক্ষা মাতা গরীয়সী। সেই কারণে ত্রিভুবনে মাতৃতুল্য গুরু নাই। জীবনে ও মরণে মাতার সেবা করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। পাষাণ-দ্রাবণ মাতৃষোড়শীমন্ত্র ঐ ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস। ঐ ভাব মনুষ্য সমাজের বিশেষত্ব। অসংসারী হইয়াও রাম পরম মাতৃভক্ত; তবে তাঁহার কর্ম্ম ও আমাদের কর্ম্মে প্রভেদ এই যে তিনি কর্ম্মে আসক্ত নহেন।

মাতৃভক্তি

সক্তাঃকর্ম্মাণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ — গীতা ৩২৪

হে ভরতকুলোদ্ভব! অজ্ঞানীরা আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, জ্ঞানীরা লোকশিক্ষার জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন।

মাতাকে কাঁদাইয়া রামের সংসার ত্যাগ মাতৃভক্তির পরিপন্থী নহে। আবহমানকাল সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মুক্ত পুরুষগণ ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সংসার ধর্ম্ম অবস্থানুযায়ী। যাহা একসময়ে এক অবস্থায় বিধেয় তাহা অন্য অবস্থায় অন্য সময়ে বিধেয় নহে।

পিতার মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র আনুমানিক অষ্টম বর্ষীয় বালক। ধনীর পুত্র ঐ বয়সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। দরিদ্রের পুত্র রাম তৎপূর্ব্বে পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত গান গাহিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। পিতার দেহান্তে মাতুলালয় হইতে ফিরিয়া রাম সংসারের চাষবাস দেখিতে বাধ্য হন, কারণ বাম তদ্বিষয়ে অপটু ছিলেন। মাতা রাজকুমারী অতি কর্ম্মিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ধান সিদ্ধ করিতেন, মুড়ি ভাজিতেন, পৈতা তুলিতেন, পাক করিতেন। কিসে সংসার চলে তদ্বিষয়ে জাগরূক ছিলেন। তাঁহার গৃহস্থালীতে সংসার একরূপ ক্লেশে চলিত। রামকেও ঐ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তিনি বিদ্যাভ্যাসের সময় পান নাই। রামের গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই রামচন্দ্র কর্ম্মান্বেষণে রামপুরহাটে আসিলেন। রামপুরহাট বর্দ্ধিষ্ণু নগর। এখানে ই. আই. রেলের অনেক কর্মচারী আছে। তখন ঐখানে ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়র অফিস-এর বড়বাবু দীনবন্ধু। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও ইংরাজী মন্দ জানিতেন না। তিনি বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, উন্নতমনা ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের পক্ষে দীনবন্ধু হইলেন। নিজ বাসায় স্থান দিয়া রামকে ইংরাজী শিখাইলেন। রামপুরহাটে ব্রজনাথ সাহার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ব্রজনাথের সাহা কোম্পানি নামক একটী মনিহারির দোকান ছিল। রেলওয়ের সাহেবরা ঐ দোকানের খরিদদার। সাহেবদের সহিত কথাবার্ত্তা শিখিবার জন্য দীনবাবু রামকে ঐ দোকানে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রাম মনোযোগের সহিত কাজ শিখেন। ব্রজবাবু তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন, খাইতে দিতেন এবং আং ১২৮৪ সালে তাঁহার ৩৲ টাকা বেতন ধার্য্য করেন। ঐ ৩৲ টাকা রাম মাকেই দিতেন।

সহোদর বৃত্তান্ত

রাম নিজগুণে অচিরে ব্রজবাবুর প্রিয়পাত্র হন। শীঘ্রই তিনি দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন এবং তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল। ব্রজনাথ রামকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের পুত্র বটকৃষ্ণ রামকে দাদা বলিতেন। রামও তাঁহাকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিতেন।

সম্পৎ সম্পদমনুরধ্নাতি।

জলেই জল বাঁধে। রাম এই সময় মোকদ্দমা করিয়া মাতুলের বিষয় উদ্ধার করেন এবং মাতুলানীর সহিত মীমাংসাসূত্রে বিষয় পান। তাহাতে তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল। তিনি কয়েক বিঘা জমি খরিদ করেন, বাটী ঘরও বাড়ান, সংসারের অনটনও ঘোচে।

আং ১২৮৭ সালে রাজকুমারীর কঠিন পীড়া হইলে রাম তাঁহাকে রামপুরহাটে ব্রজবাবুর বাটীতে আনেন। ব্রজবাবু তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রাজকুমারীর নিকট বটকৃষ্ণ রামের বাল্যলীলার কাহিনী শুনেন। বটকৃষ্ণের মুখে আমরা অনেক সংবাদ পাইয়াছি। রাজকুমারী আরোগ্যলাভ করিয়া স্বগৃহে ফিরেন।

আং ১২৯০ সালে স্বামীগৃহে রাজকুমারীর দেহবসান হয়। রাম উপস্থিত ছিলেন এবং জননীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা সাধ্যমত করিয়াছিলেন। ঐ দেশে তারাপীঠের পুণ্য শ্মশানে সকলেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রার্থী। মাতার দেহ ঐ পবিত্র ক্ষেত্রে দাহের জন্য রামচন্দ্র আনিতে ব্যস্ত হইলেন। তখন বর্ষাকাল, বিশেষতঃ ঐদিন বড় ঝড়বৃষ্টি। আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে রাম শব লইয়া কবিচন্দ্রপুরে আসিলেন। দ্বারকায় বান ডাকিয়াছে। পারের জন্য জোড়া ডোঙ্গা ঘাটে আছে; কিন্তু নাবিক নাই। তাঁহারা নাবিক অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। এদিকে তখন বাম তারামন্দির বাটির বিরামখানায় বসিয়া আছেন। তাহা পথ হইতে একতলা ও শ্মশানতল হইতে দোতলার সমান উচ্চ। তথা হইতে শ্মশান, নদী ও তৎপরপারে কবিচন্দ্রপুর প্রভৃতি বহুদূর দেশ দেখা যায়। স্বগ্রামবাসিদিগকে শবসহ দ্বারকার পশ্চিমপারে দেখিতে পাইয়া বাম ঐ নদীর পূর্ব্বপারে আসিলেন। নদীতে বন্যা, শব লইয়া এপারে আসার সুবিধা নাই। বাম অচিরে সমস্ত ঘটনা বুঝিলেন এবং বালকের ন্যায় "মা মা" রবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মাতৃমৃত্যু

কেহ কেহ বলেন বাম সন্তরণে দ্বারকা পার হইয়া মাতার শব পৃষ্ঠে বাঁধিয়া "জয়তারা" ধ্বনিতে নদীর খরস্রোতে পুনরায় ঝাঁপ দিলেন এবং এপারে উঠিলেন। কিন্তু আমরা ঐ শ্মশানকৃত্যের বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরেই কবিচন্দ্রপুরের ঘাটে জোড়া ডোঙ্গা পান এবং তাহাতেই শবসহ নদী পার হইয়া তারাপীঠের শ্মশানে উঠেন। বাম চিতার কাষ্ঠাদি সংগ্রহে সহায়তা করেন। চিতা সজ্জিত হইল। রাম বামকে মুখাগ্নি করিতে বলিলে বাম উত্তর দিলেন "ভাই, আমি মার কুপুৎ। কিছুই করিবার অধিকার নাই। তুমি যথার্থ বেটা।" বাম সন্ন্যাসী সুতরাং রামই মুখাগ্নি করিলেন। বাম অন্ত্যেষ্টিকালে উপস্থিত ছিলেন এবং মাতার কল্যাণে "জয় জয় তারা" শব্দে শ্মশান প্রতিধ্বনিত করতঃ করপুটে উর্দ্ধমুখে জগদম্বাকে জানাইলেন, "তারামা! আমার গর্ভধারিণীকে কোল দে।" তাঁহার ভাব দর্শনে বান্ধবগণের হৃদয় গলিয়া গেল এবং বোধ হইল "তারা মা যেন তাঁহার জননীকে ক্রোড় দিলেন।"

অন্ত্যেষ্টি

রামের পুত্র সন্তান হয় নাই। একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী বিবাহের পর পিতার ভিটায় বাস করিতেন। তিনি ও তাঁহার স্বামী রাখালদাস রায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন।

৯। পূর্ণ প্রকাশ।

নভো ঘনঘটামসীচ্ছবি বিলোক্য বর্ষোন্মুখং
নিমন্ত্রিত সমাগমাকুলগৃহং চ কৃত্যে গুরোঃ।
সহোদরং সমাগতসমার্চ্চনহুতাশচিন্তাজড়ং
রুরোধ কৃপয়াচিরং বিবৃতভূতি বর্ষং বিভুঃ॥

গগন ঘন মেঘাচ্ছন্ন মসীবর্ণ ও বর্ষোন্মুখ। নিজগৃহে নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইয়াছে। সমাগতগণের আদরার্চ্চনে সহোদরকে হতাশ ও ব্যাকুল দেখিয়া শক্তিমান বাম কৃপাপূর্ব্বক বৃষ্টিপাত বহুক্ষণ বন্ধ করিলেন। তাহাতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ পাইল।

শাস্ত্রের বিধান—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥

ব্রাহ্মণের দশদিনে, ক্ষত্রিয়ের বারদিনে, বৈশ্যের পনরদিনে এবং শূদ্রের একমাসে অশৌচ যায়। জাতিভেদে অশৌচ তারতম্যের বিশিষ্ট কারণ আছে। আত্মীয়জননে সুখ এবং আত্মীয় বিয়োগে দুঃখ স্বাভাবিক। ঐরূপ পার্থিব সুখদুঃখ উভয়ই পারত্রিক সাধনার বিরোধী। ঐ সুখ দুঃখে মনঃ তদাকারিত হইয়া পারত্রিক চিন্তায় অসমর্থ হয়। প্রাজ্ঞ মুনিগণ জানিয়াছিলেন যে সকল বর্ণের চিত্তবল সমান নয়। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ যতদূর অন্তর্মুখী, রজপ্রধান ক্ষত্রিয় ততদূর নহে এবং ক্ষত্রিয় যতদূর অন্তর্মুখী, রজস্তমোময় বৈশ্য ততদূর নহে; তমপ্রধান শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা বহির্মুখীন। সুখ দুঃখ রূপ চিত্তের মল কাটিতে গুণ-তারতম্যানুসারে সময় তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। তাহা না বুঝিয়া কেহ কেহ ঐরূপ ব্যবস্থা ঋষিদের স্ববর্ণের প্রতি পক্ষপাত মনে করেন। যদি ঋষিরা স্ববর্ণের প্রতি পক্ষপাতী হইতেন তবে ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অত কঠোর করিতেন না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের আশ্রমভেদে কত বিধিনিষেধ। তাহা প্রতিপালন না করিলে কি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত!

অশৌচ ব্যবস্থা

কলির ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীতমাত্র চিহ্নধারী ও কেবল ষষ্ঠকর্ম্মে অর্থাৎ দানগ্রহণে লোলুপ। ক্ষত্রিয়গণও নামে ক্ষত্রিয়, আর্ত্তের ত্রাণ ও প্রজা-পালনাদিতে সমর্থ নয়। বৈশ্যগণ বৌদ্ধের ন্যায় বৈদিক কর্ম্মবিহীন। শূদ্র পতিত ও অভিমানী, আপনাকে জগতের গুরু মনে করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দানে উৎসুক। হায় কলি, চতুর্ব্বর্ণের এরূপ গতি করিয়াছ!

বর্ত্তমানে সর্ব্ববর্ণের মুখ্যকর্ম্ম পরসেবা! কিন্তু এ দোষের জন্য মনু যাজ্ঞবল্ক্য দোষী নন। কালের কুটিল গতি, আমরাই দোষী। যদি তাঁহাদের উপদেশ মত নিজ নিজ চরিত্র শোধন করি, আবার আর্য্যসমাজ জগতে মান্যগণ্য হইতে পারি।

যেই ধর্ম্ম যেই জ্ঞান যেই ত্যাগ যেই প্রাণ
এনেছিল এ ভারতে গৌরবের ভার।
সেই ধর্ম্ম সেই জ্ঞান সেই ত্যাগ সেই প্রাণ
সাধিলে পাইবে সেই গৌরব আবার॥

এক্ষণে দশাহান্তে শ্রাদ্ধ স্থূলদৃষ্টিতেও সূত্রধারী বিপ্রগণের সুবিধাজনক নয়। শ্রাদ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি "অদনীয়স্য তৎস্থানীয় দ্রব্যস্য প্রেতোদ্দেশ্যেন শ্রদ্ধয়া ত্যাগঃ"। অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত কর্মের ন্যায় শ্রাদ্ধও এক্ষনে শ্রদ্ধাশূন্য, কেবল আত্মাভিমানে লুচিমণ্ডার আয়োজনে পরিণত। সে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ নাই। তাই অনুকল্প দর্ভময়ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা! প্রেতের পারলৌকিক কৃত্য হউক না হউক নিমন্ত্রিতগণ উদরপূর্ত্তির জন্য ব্যস্ত। কর্মকর্ত্তা এবং পুরোহিত মহাশয় প্রেতের মাঙ্গলিক কর্ম্ম শীঘ্র সারিতে ব্যাকুল। পুরোহিত মহাশয় তালিকা যত বাড়াইতে চাহেন, কর্ম্মকর্ত্তা উহা ততই কমাইতে প্রয়াসী। লুচিমণ্ডার বাজার বড় গরম। ব্রাহ্মণের পক্ষে দশদিন সংগ্রহ কঠিন। মনুর নিয়ম ব্রাহ্মণের বর্ত্তমানে ভারভূত। রামচন্দ্রকে সে ভার সহিতে হইল। আবার

শ্রাদ্ধ

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকোজাতঃ,

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া জন্মিল!

রামের পিতৃদেব সর্ব্বানন্দ এক কন্যার দুইবার বিবাহ দেওয়ায় গ্রামে কতক তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহেন। দলাদলি বাধে। ঐ ঘোঁট রাজকুমারীর শ্রাদ্ধে জাগিয়া উঠিল। একদলের কর্ত্তা দুর্গাদাস সরকার; তিনি রামের পৃষ্ঠপোষক। বিরুদ্ধদলের কর্ত্তা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। কুলীনের সন্তান, বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত, রামপুরহাটের মোক্তার; তাঁহার নিবাস রামপুরহাটের নিকট বড়শালগ্রাম, তিনি ঐ অঞ্চলের সমাজপতি। তাঁহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি। দীনবন্ধু ও ব্রজনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। রাম তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি রামকে অভয় দিলেন। তাঁহার ও দুর্গাদাসাদির চেষ্টায় দলাদলি মিটিয়া গেল। রামকে স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজকে অহ্বান করিতে হইল। রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও সন্ন্যাসী বলিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন না! কিন্তু সহোদরাদির অনুরোধে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে স্বগ্রামে আসিলেন। সন্ন্যাস লইলেও দ্বাদশ বৎসর পরে জন্মভূমি দর্শন বিধেয়। রাম বাটীতে প্রবেশ করিলেন না, বাহিরে আসন পাতিলেন। ঐ দিবস প্রাতে উহাদের আত্মীয় কাটোয়ার অধীন কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত নারেঙ্গা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ আসিয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে আদর করিলেন। তিনি উন্নত সাধক। তাঁহার ও অন্যান্য

দলাদলি মীমাংসা

স্বগৃহে

উপস্থিত আত্মীয়গণের মুখে রামের বিভূতির ব্যাপার যেরূপ শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গৃহে আসিয়া রামের প্রাচীন স্মৃতি জাগিল। 'মা মা' বলিয়া কাঁদিলেন। দেহাধ্যাস তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইলে আবার গভীর ভাব ধারণ করিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল 'জয় তারা' ধ্বনি করিতেছেন। মহাপুরুষের লীলা বিচিত্র।

ঘনঘটা

তখন বর্ষাকাল, আকাশে ঘনঘটা। শ্রাদ্ধ বাড়ী তাদৃশ প্রশস্ত নয়। ভোজের জন্য বাটীর সম্মুখে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার উপর সামিয়ানা টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৃষ্টি আটক হইবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছেন। প্রায় ৫০০ শত ব্রাহ্মণ হইবে। বৃষ্টি পড়ে পড়ে। যদি বেগে বৃষ্টি হয়, নিমন্ত্রিতদের জন্য বসিবার স্থান দেওয়া রামের পক্ষে কঠিন। বহুদিনের দলাদলি এই ভোজে মিটিবে! সে ভোজে যদি বাধা পড়ে বিপক্ষেরা টিটকারি দিবে। সকলই পণ্ড হয়। মান যায়। রামের হিতৈষিগণ ভাবিয়া আকুল। রামও বড় কাতর।

উপায়ান্তর না পাইয়া রাম ভগবানকে ডাকিতেছেন। কেহ কেহ বলিল, "তোমার দাদা এতদিন তারামার সাধনা করিলেন। তাঁহার কি এমন দৈবী শক্তি নাই যে বৃষ্টি বন্ধ করেন?" তাই রাম দাদাকে ধরিলেন—"দাদা! মান যায়, বৃষ্টি বন্ধ কর।" কোন কোন লোক ইহাতে রামকে উপহাসও করিলেন।

বিভূতিতে মন দিলে তাহাতেই মজিয়া থাকিতে হয়, আর উন্নতি হয় না। সেইজন্য যোগশাস্ত্রের বাণী—

তে সমাধেরুপসর্গাঃ ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।

বিভূতি অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি সমাধির বিঘ্নকারক। জাগ্রদবস্থায় তাহা সিদ্ধি বটে (পরমার্থতঃ তাহা সিদ্ধি নহে)। রামের পূর্ণ

বিভূতি

বিভূতি স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মহাপুরুষেরা আত্মগোপন করিয়া থাকেন; বিভূতি প্রকাশকে তাঁহারা বুজরুকি বলেন। রাম বুজরুকি দেখাইয়া লোককে ভুলাইবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই। লুপ্তপ্রায় তারাবিদ্যা দানে জীবকে উজ্জীবিত করিবার জন্যই,

আসিয়াছেন। কিন্তু ফুল ফুটিলে যেমন তাহার সৌরভ ছড়ায়, মৃগমদ জন্মিলে যেমন মৃগের সুগন্ধ ছুটে, সিদ্ধি আসিলে সেইরূপ মহাপুরুষের বিভূতি কতকটা স্বতঃই প্রকাশ পায়। শ্রীধরস্বামী ভগবান্‌কে অগ্নিস্বরূপ বলিয়াছেন। অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইলে তাপাদি পাওয়া যায়; সেইরূপ মহাপুরুষের আশ্রয় লইলে তাঁহার প্রভাব জীব অনুভব করে।

বামের কাতরভাবে বামের প্রাণে দয়া উপস্থিত হইল। তিনি মণ্ডলের ঈশানকোণে বসিয়া 'জয়তারা' রবে আকাশের দিকে চাহিলেন। হস্তের ত্রিশূল কর্ম্মস্থলে পুতিলেন। তৎক্ষণাৎ ঘূর্ণি বাতাস উঠিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের স্থানটি মার্জ্জনা করিয়া দিল। অল্প বৃষ্টিও আরম্ভ হইল, কিন্তু মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তির কি মহিমা! বামের বাটীতে ও তৎসন্নিহিত স্থলে বৃষ্টি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। কেবল ভোজনস্থানে জলসিঞ্চনমাত্র ঘটিল। লোক দেখিয়া অবাক যে অদূরে চতুর্দ্দিকে মুষলধারায় বর্ষণ, গুরুগম্ভীর মেঘ গর্জ্জন, ঘন ঘন বিদ্যুদুল্লাস এবং ভীষণ ধ্বনিতে বজ্রপাত হইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে একবিন্দু জল নাই। দলে দলে ভোজ সুচারু-রূপে হইল। ২।৩ ঘণ্টা পরে কর্ম্মশেষে বাম বলিলেন, "ভাই! বরুণদেব আর সময় দিবেন না।" তিনি ত্রিশূল উঠাইলে ঐ স্থানও বৃষ্টিতে ভাসিয়া গেল! উচ্ছিষ্ট পত্রাদি অপসারিত হইল।

বৃষ্টি স্তম্ভন

অবিশ্বাসী জড়বাদী বলিতে পারেন ইহা কাকতালীয় ন্যায়। কিন্তু যাঁহারা মহাপুরুষের শক্তির প্রভাবে পড়িয়াছেন তাঁহারা কতক বুঝিয়াছেন সে শক্তির কি মহিমা। বৃষ্টি স্তম্ভন মহাপুরুষের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। বাম এই লীলা আর একবার চম্পানগরের মহাশয় তারকনাথ ঘোষের ভোজে পরে দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসাদে তাঁহার চরণাশ্রিত কেহ কেহ এ বিভূতি দেখাইতে পারেন।

শ্রাদ্ধের পরেই বাম তারাপীঠে চলিয়া আসিলেন। বৃষ্টিরোধ বার্ত্তা শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই বলিল "বাম সিদ্ধ হইয়াছে।" বাম যে সিদ্ধ সেই সিদ্ধ। জীবত্রাণ জন্যই প্রভু কিঞ্চিৎ প্রকট হইলেন।

১০। প্রেত প্রদর্শন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঞ্চদশবর্ষ যুধিষ্ঠিরাদির সেবায় বশীভূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর প্রাসাদে কালযাপন করেন। মধ্যে মধ্যে ভীমের বাক্যবাণে ও জরাক্রমণে পরিশেষে তাঁহার বৈরাগ্য উদিত হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট বাণপ্রস্থ অবলম্বনের প্রস্তাব করিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা ধর্মরাজ সম্মতি দিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষুঃ বৃদ্ধরাজা পুত্রাদির শ্রাদ্ধাদি করতঃ পৌরজনপদগণের নিকট বিদায় লইয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বিদুর ও সঞ্জয় সহ গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিলেন। সতী গান্ধারী পতির অনুগামী হইলেন। কুন্তীও পুত্রগণের মায়া কাটাইয়া ভ্রাতৃশ্বশুরের সেবার জন্য গান্ধারীর সঙ্গ লইলেন। তাঁহারা প্রথমে কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং আরণ্যক দীক্ষা লইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দ ও কুরুনারীসহ গুরুগণকে শীঘ্রই দেখিতে গেলেন। মাসাবধি কাল আনন্দে কাটিল। হঠাৎ ব্যাসদেব তথায় আসিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বর দিতে প্রস্তুত। মনীষী কুরুরাজ ও গান্ধারী তখনও পুত্রশোকে জর্জর-হৃদয়। পুত্রদর্শনই তাঁহাদের অভীষ্ট। কুন্তীও কর্ণকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্যাসদেব সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "অদ্য আমার তপোবল সকলে দেখ। তোমাদিগের সহিত মৃত কুরুবীরগণের সম্মিলন এই রাত্রেই ঘটাইব।" তাপস-মণ্ডলী ও পাণ্ডবাদি সহ রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র সায়াহ্নে গঙ্গাতীরে সান্ধ্যোপাসনান্তে স্বজন দর্শন প্রতীক্ষায় বসিলেন। মহর্ষিও সায়ংকৃত্য সারিয়া গঙ্গাজলে অবগাহন করতঃ কুরুক্ষেত্রে পতিত বীরবর্গকে আবাহন করিলেন। জলমধ্যে তুমুল নাদ উত্থিত হইল। ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতি কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ যোদ্ধবেশে দেখা দিলেন। তাঁহাদের গলে দিব্যমাল্য ও কর্ণে ভাস্বর কুণ্ডল। তাঁহাদের পূর্ব্ববৈর ও মাৎসর্য্যভাব নাই। ব্যাসপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের দিব্য চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইল। মৃত পিতামহ, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনকে দেখিতে পাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রাদির বাণপ্রস্থ

ব্যাসদেব

মৃতবীর আবাহন

তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ সুমহল্লোমহর্ষণম্ ।
বিস্মিতঃ সজনঃ সর্ব্বোদদর্শানিমিষেক্ষণঃ ॥
তদুৎসবমহোদগ্রং হৃষ্টনারীনরাকুল ।
আশ্চর্য্যভূতংদদৃশে চিত্রং পটতং যথা ॥

—মহাভারতে আশ্রমবাসিকপর্ব্বাণি
৩২ অ. ১৯-২০ শ্লোক ।

সেই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় এবং অতীব লোমহর্ষণকর দৃশ্য নির্ণিমেষনয়নে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। সেই মহোৎসবে নরনারীগণ হৃষ্ট হইলেন। উহা পটাঙ্কিত আশ্চর্য্য চিত্রের ন্যায় দেখা গেল।

সম্মেলন

সমস্ত রাত্রি স্বজন সম্মেলনে মহানন্দে অতিবাহিত হইল। নিশান্তে মহর্ষি আগন্তুকগণকে স্ব স্ব লোকে বিসর্জ্জন দিলেন। যে যে নারী পতিসঙ্গ কামনা করিলেন তাঁহারা গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পতিসহ স্বর্গে মিলিতা হইলেন। বৈশম্পায়নের মুখে জনমেজয় এই ব্যাপার শুনিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—যে কুরুবীরগণের দেহপাতের পরও কি প্রকারে পূর্ব্বরূপ ধরিয়া তাঁহারা আসিলেন। বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন :—

অবিপ্রণাশঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামিতি নিশ্চয়ঃ ।
কর্ম্মজানি শরীরাণি তথৈবাকৃতয়ো নৃপ ॥
মহাভূতানি নিত্যানি ভূতাধিপতি সংশ্রয়াৎ ।
তেষাঞ্চ নিত্যসম্বন্ধো ন বিনাশঃ বিযুজ্যতাম্ ॥
অনায়াসকৃতং কর্ম্ম সত্যশ্রেষ্ঠঃ ফলাগমঃ ।
আত্মাচৈভিঃ সমাযুক্তঃ সুখদুঃখমুপাশ্নুতে ॥
অবিনাশ্যস্তথা যুক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি নিশ্চয়ঃ ।
ভূতানামাত্মকো ভাবো যথাসৌ ন বিযুজ্যতে ॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম তাবদস্য স্বরূপতা ।
ক্ষীণকর্ম্মা নরোলোকে রূপান্তত্বং নিযচ্ছতি ॥
নানাভাবাস্তথৈকত্বং শরীরং প্রাপ্য সংহতাঃ ।
ভবন্তি তে তথা নিত্যা পৃথকভাবং বিজানতাম্ ॥

অশ্বমেধশ্রুতিশ্চেয়মশ্ব সংজ্ঞাপনং প্রতি।
লোকান্তরগতা নিত্যং প্রাণা নিত্যং শরীরিণাম্॥
—মহাভারতে আশ্রমবাসিকে ৩৪।৪।১০

এই শ্লোকসমূহে জন্মমৃত্যু রহস্য উট্টঙ্কিত। সুতরাং ভাষা সরল হইলেও ভাব অতি দুরূহ। কালীসিংহের অনূদিত মহাভারতে অনুবাদ, যথা—

বঙ্গানুবাদ

"ভোগ ব্যতীত কখনই কর্ম্মসমুদয়ের বিনাশ হয় না। কর্ম্মভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ শরীর যে সমুদয় মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদয়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহ নাশ হইলেও, তাহাদের নাশ হয় না। লোকে পূর্ব্বতন অদৃষ্টপ্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয়। আত্মা সেই কর্ম্ম ও মহাভূত সমুদয়ে লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করেন। আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূত সমুদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্ম্মক্ষয় হইলে তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্ব্বতন শরীরের মহাভূত সমুদয় দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ শরীর যে পূর্ব্বতন শরীর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্বচ্ছেদন সময়ে শ্রুত্যনুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যে জন্তুগণ লোকান্তরে গমন করিলেও, উহাদের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না।"

নীলকণ্ঠের টীকা মূল অপেক্ষা জটিল। তিনি জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বাধারে এইরূপ দিয়াছেন:—

নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা

ব্রাহ্মলৌকিকাএব সত্যাভীষ্মাদয়োঽনূতৈর্জন্মাদিভির্ভাববিকারৈরাবির্ভূয় তিরোভূতাঃ সন্তোমহর্ষি-বিশ্বয়াবির্ভূয় স্থ্যাদিভিশ্চ যাথাত্ম্যেন গৃহীতাঃ সন্তস্তাভিঃরেমিরে ইতিযুক্তমুৎপশ্যামঃ।

ব্রহ্মলোকে যে সত্য ভীষ্মাদি আছেন তাঁহারাই অবিদ্যাবশতঃ মিথ্যা-

জন্মাভিনিবেশযুক্ত হইয়া ইহলোকে আবির্ভূত এবং পরে তিরোভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই মহর্ষির তপোবনে পুনরায় আবির্ভূত হইলেন এবং যথার্থ ভীষ্মাদিরূপে স্ত্রীগণ কর্তৃক পরিগণিত হইয়া সেই নিশি বিহার করিলেন।

এই মতে যত জীব যে যে রূপে মর্ত্যধামে আসিতেছে সকলেরই মূল দেহ ব্রহ্মলোকে আছে; ঐ রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। এই বাদ নীলকণ্ঠ স্বীয় বেদান্ত-কতক নামক গ্রন্থে দেহরণিকরণে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ বাদ সমীচীন বোধ হয় না। কারণ জীব শরীর চর্ম্মচক্ষুগোচর বিশিষ্টাকৃতি, তাহা লিঙ্গ শরীরের ন্যায় নিরাকার নহে। ঐ বিশিষ্টাকৃতি মোক্ষ পর্য্যন্ত থাকিলে জীবাত্মার পক্ষে কর্ম্মবশতঃ অন্যবিধ আকার ধারণ সম্ভব নয়, অথচ দেহীর দেহের ও আকারের পরিবর্ত্তন পুনঃপুনঃ হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। বৈশম্পায়নের উক্তি গুরু কৃপায় আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি। ভোগ বিনা কর্ম্মের ক্ষয় নাই। কর্ম্ম কর্ম্মের প্রভব। সুতরাং কর্ম্মের সম্যক বিনাশ সাধারণতঃ নাই। দেহীর দেহ কর্ম্মজ, মহাভূতের সংঘাতেই দেহ। মহাভূত স্রষ্টার ইচ্ছা সম্ভূত হইলেও সেই ইচ্ছা কত পূর্ব্বে হইয়াছে জানা না থাকায় তাহা একরূপ অনাদি এবং ঐ মহাভূত মহাপ্রলয়ে নাশপ্রাপ্ত হইলেও সেই মহাপ্রলয় অতি সুদূর বলিয়া মহাভূতগণকে একরূপ নিত্য বলা যাইতে পারে। মহাভূত সকল অনাদিকাল হইতে সম্মিলিতভাবে আছে। ইহাই তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, যখনই তাহারা বিযুক্ত হয় তাহাদের বিয়োগ মাত্র ঘটে, কিন্তু নাশ হয় না। ঐ মহাভূতাদির সহিত যুক্ত হইয়া আত্মা সুখ-দুঃখ অনুভব করেন অর্থাৎ আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইলেও পরমাত্মাসৃষ্ট মহাভূতাদির সহিত আত্মীয়তারূপ মিথ্যা জ্ঞানবশতঃ সুখী দুঃখী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করেন। উক্তরূপ মহাভূত-সম্বন্ধ আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ অবিনাশী। আত্মার সহিত মহাভূতের সংযোগ অর্থাৎ আত্মভাব প্রকৃতির ধর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—আয়াসকৃত বা সঙ্কল্পমূলক এবং অনায়াসকৃত বা সহজ। প্রথমোক্ত কর্ম্মই শরীরারম্ভক, আত্মার বন্ধনস্বরূপ। দ্বিতীয়বিধ কর্ম্ম নিবৃত্তিমূলক বলিয়া শ্রেষ্ঠ ফলদায়ক অর্থাৎ মোক্ষদ। যে কর্ম্মপুঞ্জবশতঃ যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে সেই কর্ম্মপুঞ্জ ক্ষয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই দেহের আকার থাকিবে। অর্থাৎ যে

শ্রীগুরু কৃপায় সমাধান

কর্ম্মবশতঃ আমি মর্ত্ত্যলোকে যে বিশিষ্ট দেহ লইয়া আসিয়াছি, এই দেহের স্থূল-ভূতসজ্ঘাত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলেও ভূতের সূক্ষ্মাংশ বিনষ্ট হয় না, সুতরাং দেহান্তেও জীবের সেই আতিবাহকদেহ থাকে। নরক ভোগ জন্য নারকীয় শরীর ও স্বর্গভোগ জন্য দিব্যদেহ ধারণ করিলেও পূর্ব্ব দেহানুরূপ আকৃতি থাকিয়া যায়। স্বর্গ নরক ভোগাদিতে ভূত-সূক্ষ্মাংশক্ষয়ে আত্মা জনলোকে লিঙ্গ শরীর মাত্র লইয়া উপস্থিত হন। তাহাই পিতৃলোক। লিঙ্গ শরীর সাঙ্খ্যে পঞ্চ তন্মাত্রা দশেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার সমাহার সুতরাং তাহাতে বিশিষ্টা মূর্ত্তি নাই। পিতৃলোক হইতে বাসনানুসারে নূতন দেহ ধরিয়া জীব মর্ত্ত্যে আসেন। তখন পূর্ব্বদেহের সমস্ত ভূতজাত ক্ষয় হওয়ায় পূর্ব্বাকার থাকে না। ভীষ্মাদির স্বর্গবাস কালে ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে তপোবলে আবাহন করেন। তখন তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় ভীষ্মদেহাকার বর্ত্তমান থাকায় এবং মহর্ষির প্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রাদির দিব্যচক্ষুঃ হওয়ায় ঐ জ্যোতির্ম্ময়াকার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। বামদেবেরও তপোবল ব্যাসদেবের ন্যায় ছিল। শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গদিবসে অপরাহ্ণে বাম পিতৃগৃহ হইতে আসন তুলিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে ভাল-বাসেন। তাঁহার আধার উত্তম। তাঁহার পরলোকাস্তিত্ববুদ্ধি দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বলিলেন, "কর্ত্তামার শ্রাদ্ধ দেখিলে, কর্ত্তামার আকৃতি দেখিবে।" ব্রহ্মানন্দের লোভ উপজিল; তিনি বামের সঙ্গে চলিলেন। সন্ধ্যার পর উভয়ে তারাপীঠের শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। যে ঝিলে রাজকুমারীর শবদাহ হইয়াছিল সেই ঝিলের পার্শ্বে বাম বসিলেন, ব্রহ্মানন্দকেও বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মানন্দ বিস্মিতনয়নে দেখিলেন যেন ঐ ঝিলে চিতা প্রজ্বলিত হইল এবং চিতার মধ্যে রাজকুমারী শয়ানা। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্যলোক তথায় আসিলে ঐ দৃশ্য অপসৃত হইল। অবিশ্বাসী জড়বাদী বলিতে পারেন ইহা ইন্দ্রজাল মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ইহাকে সেভাবে লন নাই। রাজকুমারী যে কর্ম্মসূত্রে রাজকুমারী-দেহ ধরিয়াছিলেন এই দেহপাতও ঐ কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় ঐ দেহের জ্যোতির্ম্ময়াকার তখনও ছিল। সেই আকার লইয়া তিনি বামের আহ্বানে ঐ চিতামধ্যে উপস্থিত হইলেন। বাম ব্রহ্মানন্দকে ক্ষণিক জ্ঞানচক্ষু দেওয়ায় তিনি ক্ষণিক দেখিলেন।

মাতৃমূর্ত্তি প্রদর্শন

১১। ত্যাগাবতার

কৌমারসন্ন্যাসনিরস্তভোগং ঘোরশ্মশানালয়মাপ্ততোষম্ ।

ত্যাগাবতারং কুলনাথনাথং বামাভিধানং পুরুষং নমামঃ ॥

যিনি কৌমারেই সন্ন্যাস লইয়া জীবের পক্ষে দুষ্পরিহার্য্য ভোগ অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ভীষণ শ্মশানকে গৃহ করিয়াছেন, যিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, যিনি ত্যাগের অবতার, যিনি কুলনাথগণেরও নাথ সেই বাম নামক পুরুষকে প্রণাম করি। জীব সুখভোগের জন্য লালায়িত। ভোগের জন্যই জীবের জন্মগ্রহণ। ভোগসুখ ক্ষণিক, ভোগ নানা ক্লেশের নিদান, ত্যাগেই শান্তি।

—ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ —গীতা

মনুজস্স পমত্তচারিণো তন্‌হা বড্‌ঢতিমালুবা বিঅ ।

সো পলবতী হুরাহুরং ফলমিচ্ছন্‌ব বনস্মিন্ বানরো ॥

—ধম্মপদে তন্‌হাবগ্গে ।

প্রমত্ত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরহিত মনুষ্যের তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগকামনা মালুবা লতার ন্যায় বর্দ্ধিত হয়। ফলাভিলাষী বানর যেমন বনে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া গতিবিধি করে, অজ্ঞানী মনুষ্যও তেমনি ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করে। ত্যাগের জন্য চিত্ত সংযম আবশ্যক। কেবল বাহ্যতঃ ত্যাগ ত্যাগই নহে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ !

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে ॥ —গীতা ৩।৬

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়াও ভোগ্য বিষয় সতত স্মরণ করিতে থাকেন তিনি মূঢ় ও কপট। ভোগ শক্তি বিদ্যমান, ভোগ কামনাও প্রবল। কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি ভোগ করিতেছি না, কিন্তু সততই ভোগ্যবস্তু ভাবিতেছি। ইহা যথার্থ ত্যাগ নহে, প্রত্যুত মানস ভোগ। বাহিরে লোককে দেখাইতেছি ত্যাগী, সুতরাং ইহা কপটাচার। তদপেক্ষা বরং চিত্ত হইতে ভোগ বাসনা অপসৃত করিয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ ভাল। কারণ তাহাতে ভোগের মূল ছিন্ন ও শাখাপ্রশাখা শীঘ্রই শুষ্ক হয়।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ —গীতা ২ ৬৪

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত এবং বিষয়ে অনুরাগ নাই, তিনি যদি সংস্কার-বশতঃ বাহ্যতঃ ভোগ করেন, ঐরূপ জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বাহ্য ভোগও শীঘ্র বিদূরিত হইয়া শান্তির উদয় হয়।

পূর্ণত্যাগের চিত্র যথা :—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থমনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যেতে ॥ —গীতা ২।৫৪

হে পার্থ! যখন জীব বিষয় ভোগ কামনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতঃ আত্মতুষ্টি লাভ করেন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। পূর্ণত্যাগের উপায়ও গীতা বলিতেছেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ —গীতা ২।৫৯

অপটু শরীরের শক্তির অভাবে বিষয়ভোগ অপসৃত হয়, কিন্তু ভোগ রস বা আসক্তি যায় না। সেই পরম রসের নিদানকে দেখিলে ভোগ রসও নষ্ট হয়। পুরাণ-মতে দেবগণেরও ভোগরস যায় নাই। কেবল হরি ও হর ভোগরসেরও অতীত. শিব যোগীরাট্, ত্যাগের বিগ্রহ। তিনি পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী হইলেও নিষ্কাম অতএব শ্মশান তাঁহার আবাস, চিতাভস্মই অঙ্গরাগ, ভুজঙ্গ ভূষণ এবং বৃদ্ধ বৃষমাত্র তাঁহার বাহন। বাহ্যতঃ তাঁহার আচরণ অমঙ্গলময়, পরমার্থত: তাঁহার চরিত্র মঙ্গলময়। কবিবর প্রকাশ করিয়াছেন :—

মদনভস্মের পর মহাদেব স্বগণসহ হিমালয় হইতে অন্তর্হিত হইলে তাঁহাকে রূপ দ্বারা বশীভূত করা অসম্ভব বুঝিয়া তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় গৌরী পিতামাতার অনুমতি লইয়া গৌরীশৃঙ্গে তপস্যানিরতা হইলেন। গৌরীর উৎকট তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য জটিল ব্রহ্মচারিবেশে দেখা দিলেন। গৌরীর আতিথ্যে যেন প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয়তা দেখাইয়া তাঁহার তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার সখীমুখে শঙ্করকে পতিরূপে লাভের বাসনা জানিয়া স্তুতিচ্ছলে হরের নিন্দা করিলেন। গৌরী তদুত্তরে বলিলেন—

অনর্থ নিবারণার্থ কিংবা মঙ্গললাভহেতু লোক মঙ্গলাচরণ করে, জগতের শরণ্য নিষ্কাম হরের পক্ষে ঐরূপ আশাপ্রণোদিত চিত্তবৃত্তির আবশ্যকতা নাই। তিনি অকিঞ্চন হইলেও সর্বসম্পদের আধার; তিনি শ্মশানচারী হইলেও ত্রিলোকের নাথ। তিনি ভীষণ হইলেও শিব বলিয়া কথিত! সেই পিনাকপাণির তত্ত্ব কে জানে! তিনি অলঙ্কারেই ভূষিত হউন, কিংবা সর্পকে ভূষণ করুন, তিনি গজচর্ম্ম কিংবা উত্তমবস্ত্র পরিধান করুন; তিনি নরকপাল কিংবা চন্দ্রকে শিরোমণ্ডন করুন, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তাঁহার রূপ কেহ চিনিতে পারে না। চিতাভস্ম অমঙ্গল্য হইলেও তাঁহার অঙ্গস্পর্শে মঙ্গলময় হয়, সুতরাং নৃত্যকালে তদঙ্গচ্যুত সেই ভস্ম দেবগণও নিজ নিজ মস্তকে ধরিয়া ধন্য হন। তিনি দরিদ্র হইলেও যখন বৃষে আরোহণ করিয়া যান তখন ঐরাবত-বাহন ইন্দ্রও তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া সেই শ্রীচরণের অঙ্গুলিসমূহকে প্রস্ফুটিত মন্দারকুসুমরাগে রঞ্জিত করেন।

কবি শিবপুরাণাদি হইতে উক্ত সংবাদ লইয়াছেন। পুরাণে প্রচ্ছন্ন হরের প্রশ্নে দেবাদিদেবের শ্মশানচর, চিতাভস্ম-ভুজঙ্গভূষণ দিগম্বর করালী কপালী বাতুল মূর্ত্তির রহস্য তপস্বিনী গৌরীর মুখে উদ্ঘাটিত।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভস্মীভূতং চরাচরম্।
মহাপ্রলয়কালেচ শ্মশানে চরতে হরঃ॥
অশেষজগতাং শেষঃ শেষোঽহিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শেষকালেধৃতঃ কট্যাং কালাভরণভূষিতঃ॥

* * * *

মহাপ্রলয়সম্ভূতং চিতাভস্মচ দৃশ্যতেঃ।
তৎকথং বরমিচ্ছামি সত্যমুক্তং ন সংশয়ঃ॥
বকারং পীযূষং বিদ্যাৎ অতুলোঽসৌ সনাতনঃ।
তস্মাদসৌ বাতুলস্তু মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
যঃ সর্বপাপসম্ভাতং স্মরণাৎ হরতিপ্রভুঃ।
তং হরং পাপমোক্তারং বরমিচ্ছামি ভোদ্বিজ॥

* * * *

কংস্বর্গং পালিতং যস্মাৎপুরা ত্রিপুরদাহনাৎ।
তস্মাৎ শিবঃ কপালীতি মুনিভিঃ স্তূয়তে সদা॥

কবৈরলং ভূষিতশ্চ বিবস্বান্ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অষ্টমূর্ত্তিধরত্বেন করালী পরিকল্প্যতে॥
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাং বেতালকোগণঃ।
ততোহসৌ প্রোচ্যতে সদ্ভির্ভূতবেতালসম্বৃতঃ॥
পাদৌ যস্য তু পাতালং কটির্ভূর্খৌ শিরস্তথা।
দিশোবাসাংসি যস্যাসন্ দিগ্বাসাস্তেন সম্মতঃ!
—শিবপুরাণে।

উক্ত শ্লোকসমূহের আশয় যথা:—

মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ হইতে লতাগুল্মাদি স্থাবরজঙ্গম পদার্থ যেন ভস্মীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড মহাশ্মশানে পরিণত হয়। মহাপ্রলয়ে কেবল শিব বা শান্ত-শক্তিচৈতন্য মাত্র থাকেন। ইহা শিবের শ্মশানচারিত্ব। নিখিল কার্য্যকূট যে পরম কারণে লীন হয় সেই কারণেই শেষ; তাহা মহাপ্রকৃতি বা অনন্ত-শক্তি। সহস্রফণা অনন্তনাগ তাহার রূপকমাত্র। শিব ঐ শেষকে কটিদেশে ধারণ করেন, অর্থাৎ সেই অনন্ত শক্তিময়ী প্রকৃতি শিবচৈতন্যে তখন নিহিতা। সুতরাং তিনি নাগভূষণ। প্রলয়ের চিতাভস্মই তাঁহার অঙ্গরাগতুল্য। "ব" শব্দে অমৃত বুঝায়। তিনি অমৃত অর্থাৎ নিত্য এবং অতুল অর্থাৎ নিরতিশয়; অতএব তিনি বাতুল। বাতুল শব্দের অর্থ উন্মত্ত ধরিলেও তিনি তারা প্রেমে উন্মত্ত অর্থাৎ সদানন্দ। সর্ব্বজীবের পাপরাশি হরণ করেন বলিয়া তিনি হর। ত্রিপুর বা অসুরগণের স্বর্ণরৌপ্যলৌহময়পুরত্রয় সত্ত্বরজস্তমোগুণের উদ্দামলীলা। "ক" শব্দে প্রতিপাদ্য স্বর্গ বা দেবগণের পুরী, উক্ত গুণত্রয়ের শৃঙ্খলাময়ী লীলা। পরমেশ্বরই সেই উদ্দামভাব সংযত করিয়া বিশ্বে নিয়ম স্থাপন করেন। তজ্জন্য তাঁহার নাম কপালী। কপাল শব্দের সাধারণ অর্থ 'মাথার খুলি'। নরদেহের পরিণাম কপাল শ্মশানে গড়াগড়ি যায়। মহাদেব কপালী অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে অবশিষ্ট কারণের ধারক। ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম—পঞ্চভূত এবং যজমান অর্থাৎ উপাসক জীব এবং সোম অর্থাৎ ঐশ শান্তভাব এবং সূর্য্য অর্থাৎ ঐশ ভীমভাব, সমস্তই তাঁহার মূর্ত্তি। অতএব তিনি অষ্টমূর্ত্তি। তন্মধ্যে সূর্য্য যেমন কিরণমালী তিনি সেইরূপ প্রচণ্ড শক্তির আধার। অতএব তিনি করালী। তাঁহারই চৈতন্যে জগদুদ্ভাসিত এবং তাঁহারই শক্তিতে সকলে শক্তিমৎ। মহাভূতগণের সমষ্টি বেতালবৎ নাচিয়া

নাচিয়া বেড়ায়। মহাভূতই শিবের ভূত বেতাল, তাই তিনি ভূত বেতাল পরিবৃত। পাতাল তাঁহার পদস্থানীয়, পৃথিবী তাঁহার কটি এবং স্বর্গ তাঁহার মস্তক। তিনি দিগম্বর বা নিরাবরণ। তাঁহাকে আবৃত করে এমন পদার্থ নাই। হরগৌরী লীলা তাঁহার নিষ্কাম ভোগ, সুতরাং তাহাও ত্যাগ।

মায়ামনুজ বামও শ্মশানবাসী, উন্মত্ত, দিগম্বর, চিতাভস্মলেপী ও সর্ব্বত্যাগী। তিনি বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গও করেন নাই। তিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতকাম, পূর্ণ ত্যাগের লীলা এই অবতারে দেখাইয়াছেন। তিনি কুলনাথ-নাথ। ইতঃপূর্ব্বে কৌলের পরিচয়ে বলা হইয়াছে ক্ষিতি হইতে প্রকৃতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ চরাচর ও এতৎ-কারণকে যিনি শিবশক্তি হইতে অভিন্ন দেখেন তিনিই কৌল। কৌলগণেরও স্তর আছে। নাথ সম্প্রদায়ই কৌলশিরোমণি। কুলনাথগণই গুরু-পঙ্‌ক্তি। তন্মধ্যে মানবৌঘ, সিদ্ধৌঘ এবং দিব্যৌঘ নামক শ্রেণীত্রয়। মানবৌঘ অর্থাৎ যে সকল মানব তপোবলে কুলনাথ পদ পান; তাঁহাদের নাম:—সুখানন্দ নাথ, পরানন্দ নাথ, পারিজাতানন্দ নাথ, কুলেশ্বরানন্দ নাথ এবং বিরূপাক্ষানন্দ নাথ। শেষোক্ত মহাপুরুষ বঙ্গে সুপরিচিত। সিদ্ধর্ষি কুলনাথগণই সিদ্ধৌঘ। যথা—বশিষ্ঠানন্দ নাথ, কূর্ম্মনাথানন্দ নাথ, মীননাথানন্দ নাথ, মহেশ্বরানন্দ নাথ, হরিনাথানন্দ নাথ। যে সব পরম কৌল মহাসিদ্ধি বা শিবত্ব প্রাপ্ত তাঁহারা দিব্যৌঘ; যথা—ব্যোমকেশানন্দ নাথ, নীলকণ্ঠানন্দ নাথ ও বৃষধ্বজানন্দ নাথ। নাথ সম্প্রদায়ের মানবৌঘ শৈবতন্ত্রে মন্ত্রেশ্বর পদবাচ্য। সিদ্ধৌঘ ও দিব্যৌঘ অষ্টবিদ্যেশ্বর। ইঁহারা শিবভাবাপন্ন কিন্তু শিব নহেন। দেবাদিদেব বামই কেবল কুলনাথনাথ।

প্লাবন-তরঙ্গ

১। করুণ দণ্ড

বামং তারানিবিষ্টং শিশুমিব সরলং বঞ্চয়ন্ বিত্তমাদা-
দিত্যাক্ষিপ্তোনগেন্দ্রো বিধৃতনিগড়িতো দণ্ডধারে প্রেষিতঃ
মুক্তো বামপ্রসাদার্জ্জনহিতকরণে সোঽর্পয়ংস্তদ্ধনার্দ্ধং
দুঃস্থঃ শাস্তিং চ লেভে করুণমৃদুরহো দেবদেবস্যদণ্ডঃ ॥

তারানিবিষ্ট শিশুবৎ সরল বামকে প্রবঞ্চনা করিয়া তদীয় ধন গ্রহণ করিয়াছে এই অভিযোগে নগেন্দ্র ধৃত হইয়া দণ্ডধারের নিকট প্রেরিত হইলে বামের কৃপায় জনহিতকর কার্য্যে গৃহীত বিত্তের অর্দ্ধমাত্র প্রত্যর্পণ করতঃ মুক্ত হন। পরে দুরবস্থায় পড়িয়া শাস্তি পান। দেবাদিদেবের কি করুণা-মসৃণ দণ্ডবিধান!

দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তদীয় পত্নীর সহিত কনিষ্ঠ সহোদর রামেশ্বরের বিবাদ ঘটে। রামেশ্বরের অধিকার ইংরাজ সরকার স্বীকার করিলেও তদীয় ভ্রাতৃপত্নী ক্ষান্ত হন নাই। আদালতে স্বত্বসাব্যস্তের জন্য মোকর্দ্দমা করিতে প্রস্তুত হন। রামেশ্বর তান্ত্রিক সাধনা-সিদ্ধিতে আস্থাবান্। বিপৎ হইতে উদ্ধার জন্য স্বয়ং তারাপীঠে সন ১৩১৩ সালে আসিয়া শ্রীবামের শরণাপন্ন হন এবং বশিষ্ঠাসনে বসিয়া নিজে জপও করেন। তজ্জন্য শিমূলতলা পটমণ্ডপে বেষ্টিত হওয়ায় বামের প্রিয়পুত্র ন্যায়পরায়ণ উগ্রস্বভাব তারা ক্ষ্যাপা তাহাতে প্রতিবাদ করেন। মহারাজা শীঘ্র জপ সমাপন পূর্ব্বক শ্রীবামের সেবায় মাসিক ৪০৲ প্রণামী দিবার অঙ্গীকার করতঃ চলিয়া যান। কিন্তু দুই বৎসর যাবৎ কোন টাকা পাঠান নাই।

দ্বারবঙ্গাধিপতির প্রণামী

বীরভূমের দণ্ডধার (Magistrate) রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তারাপীঠ প্রদর্শন করিতে যান। তারামার পথের অবস্থা দেখিয়া তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য গোপালপুর হইতে চিলে নদী পর্য্যন্ত একটি নূতন সরল পথ নির্ম্মাণে তিনি কৃতসঙ্কল্প হন। তখন জেলা বোর্ডের কর্ত্তা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট।

সুতরাং তিনি জেলাবোর্ড হইতে টাকা লইলেন এবং স্থানীয় জমিদার ও ধনী লোকের নিকট চাঁদা তুলিলেন। তিনি শুনলেন যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার নিকট বামের প্রণামী প্রায় ১০০০৲ টাকা পাওনা হইয়াছে। বাম সন্ন্যাসী। তাঁহার টাকার প্রয়োজন নাই, বিবেচনায় ঐ টাকা তারাপীঠ পথের জন্য লইতে অভিলাষী হইলেন। এদিকে বামের সেবায় রত নগেন্দ্র পাণ্ডা দ্বারভাঙ্গায় চলিয়া গিয়া মহারাজের কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ টাকার তাগাদা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের পত্রও মহারাজের নিকট যায়। মহারাজা উভয় পক্ষকে টাকা না দিয়া বামের নামে তাহা ডাক যোগে পাঠান। বামের জ্ঞাতসারে কিন্তু বিনানুমতিতে নগেন্দ্র বামের নাম স্বাক্ষর করিয়া ঐ টাকা লন ও নিজ ঋণ পরিশোধ করেন। তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ক্রুদ্ধ হইয়া নগেন্দ্রকে বিচারার্থ ধৃত করতঃ বীরভূম নগরে আনাইয়া হাজতে রাখেন।

তারাপীঠ

নগেন্দ্র পাণ্ডা

নগেন্দ্রের আত্মীয়গণ তাঁহার উদ্ধারের জন্য বামকে ধরিলেন। বাম নগেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। তিনি বীরভূমে আসিলেন। যদি বীরভূমে কার্য্য সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে বামকে কলিকাতায় আমার বাসায় আনিয়া হাইকোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্তাদি দাখিলের পরামর্শও হইয়াছিল। কিন্তু বাম শিউড়ি সহরে রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেই এই মীমাংসা হয় যে নগেন্দ্র অর্দ্ধেক টাকা লউক ও অর্দ্ধেক জনহিতকর পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে দিলে মুক্তি পাইবে। নিস্পৃহ বাম নিজ প্রাপ্য ত্যাগ করিলেন। নগেন্দ্র অর্দ্ধেক টাকা প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্ত হইলেন। সেই টাকা তাঁহাকে ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। সেই ঋণের জন্য পরে তিনি দুঃস্থ হন। তাহাতে তাঁহার অহঙ্কৃতিভাব বিদূরিত হয়। বামের সেবায় ও বামের দেহান্তে পূজাপীঠাদিতেই জীবন অতিবাহিত করেন। এবং শান্তিও পান।

নগেন্দ্র বামের ভক্ত। তথাপি তিনি অপরাধ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি দণ্ড দিলেন। কিন্তু এই দণ্ডের মধ্যেও করুণা বিরাজমানা। কবি গাহিয়াছেন—

ব্যথা দিবে বলে দিয়েছিলে ব্যথা, প্রিয় ব্যথা দিলে কই ?
জানাইলে কত প্রেম ব্যাকুলতা, সুখ বই তাতে দুখ কই ?
শাসনের তলে ছলছল করে করুণা মাখান আঁখিজল।
সে যে মোর প্রাণে স্বরগের সুধা অবিরল ॥
দুঃখ নিয়া তাই করিনু বরণ সুন্দর তব ও দুটী চরণ।
বক্ষের মাঝে করিয়া ধারণ প্রেম আজি হল জয়ী ॥

২। চিত্রেঙ্গিত

রামং নন্দো মুমূর্ষোর্জরঠপিতুরসূন্ যাচিতুং সঙ্গতশ্চ
যুঞ্জন্ দীর্ঘায়ুষা তৎপিতরমপগদং প্রেষয়ৎতঞ্চরামঃ।
পৃষ্ঠস্তন্তর্হিতোঽসৌ পিতুরপি বিষয়ং শশ্বদাশ্বাসয়ংস্তং।
পূর্ণে কালে প্রয়াণং পিতুরবদদহো শীর্ষকম্পেন চিত্রে ॥

কঠিন রোগে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পিতার প্রাণভিক্ষার্থ নন্দ রামের নিকট আসিলেন, রামও তাঁহার পিতাকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ করতঃ তাঁহাকে গৃহে প্রেরণ করিলেন। রাম অন্তর্হিত হইলেও তাঁহাকে নন্দ পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বার বার আশ্বাস দিতেন এবং পিতার কালপূর্ণ হইলে নিজ চিত্রে শীর্ষকম্পন দ্বারা পিতার দেহান্তের সংবাদ দেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামমহোৎসবোপলক্ষে কলিকাতার বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ে আহূত স্মৃতিসভায় রামের করুণা ও অলৌকিক বিভূতির সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলেন। তাঁহার মাতুল অধরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে ওকালতি করিতেন। আমি তাঁহার সহিত তথায় ওকালতি করিয়াছি। তিনি ধীর, স্থির ও সজ্জন। অর্থোপার্জ্জন

আর্ত

করিয়া বৃদ্ধ বয়সে অবসর লন। প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে তদীয় পুত্র নন্দগোপাল অত্যন্ত চিন্তিত হন। লৌকিক চিকিৎসার দুঃসাধ্য ব্যাধি জানিয়া অলৌকিক চিকিৎসার আকাঙ্ক্ষা আসে। তখন তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলীর নর্ম্যাল স্কুলে

শিক্ষকতা করেন। রামের নাম ও গুণ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি ১৩১৭ সালের বৈশাখ মাসে বন্ধু রজনীকান্ত সেনগুপ্তের পরামর্শে তারাপীঠ যাত্রা করিলেন। হৃষীকেশ মজুমদার নামক অন্য বন্ধুও সঙ্গে ছিলেন। পরদিন প্রাতে ১০টায় তাঁহারা শ্রীপীঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকে প্রাচীন শ্মশানে বসিষ্ঠের সিদ্ধাসনের ভূমিতে শয়ান দেখিলেন। তথায় ভক্ত অবিনাশ রায়, নগেন্দ্র পাণ্ডা ও নগেন্দ্র বাগ্‌চি ছিলেন। যুবক যাত্রীদিগকে পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কেন আসিয়াছেন?"

দর্শন

তাঁহারা উত্তর করিলেন "মহাপুরুষ দর্শনে।" "কি আনিয়াছেন?" আগন্তুকগণ যে চার আনার মাত্র গঞ্জিকা লইয়া গিয়াছিলেন তাহা বাহির করিলেন। শ্রীরাম তাহা লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত গঞ্জিকা সেবনে যাত্রীরা বিস্মিত! বিশেষ কোন কথা হইল না। তাঁহারা পাণ্ডার বাটীতে গেলেন। স্নানান্তে দেবীদর্শনাদি ঘটিল। মধ্যে মধ্যে রামকে দেখিতে আসিলেন কিন্তু কথোপকথনের কোন সুবিধা পাইলেন না। দুই দিন এইভাবে গত। তৃতীয় দিবস তারা ক্ষ্যাপা তারাপীঠে আসিলেন। নন্দ পিতাকে সঙ্কটাপন্নাবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। বাটী ফিরিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত। রামের কৃপালাভাশায় আগমন। তাহা না ঘটায় ফিরিতেও পারিতেছেন না। রাম অন্তর্য্যামী। তাঁহার পিতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পিতার

ফল

প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নন্দ কাতর হইয়া তৃতীয় দিন আশ্রমে যাইলে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি বাসনা? তিন দিন আছেন?" নন্দ ভাবিতেছেন পিতার জীবন থাকিবে কি না। হঠাৎ শ্রীরাম নন্দকে বলিলেন—"যা! তোর বাবা ভাল হয়েছে।" নন্দ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। করুণাময় পুনরায় বলিলেন—"তোর বাপের এখনও পনর বৎসর আয়ু আছে!" যাত্রিগণ চতুর্থ দিবসে ফিরিলেন। বাটীতে আসিয়া নন্দ দেখিলেন যে তাঁহার পিতৃদেব আরোগ্যলাভ করিয়া সদর ঘরে বসিয়া আছেন।

লৌকিকানাংহি সাধুনাং বাগর্থমনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥
—উত্তররামচরিত ১ম অঙ্ক।

লৌকিক সাধুগণ অর্থানুসন্ধান করিয়া তদনুসারে বাক্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু আদিভূত ঋষিগণের বাক্যকেই অর্থ অনুগমন করে। সাধারণ সাধুগণ প্রকৃতির বশবর্ত্তী। তাঁহারা প্রকৃত ঘটনার বিসম্বাদী কোন কথা বলিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বাক্‌সিদ্ধ-পুরুষগণের বাক্যানুসারে প্রকৃতি নিয়মিত হয়।

বাক্‌সিদ্ধ

তাহার পর রাম সন ১৩১৮ সালে শ্রাবণ মাসে দেহ রাখিলেন। নন্দলালও হাইকোর্টের উকিল হইলেন। তাঁহার পিতৃষস্রেয় মন্মথনাথ তখন হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় থাকে। আমি রামের কথা উকিলখানায়, বলিতাম। মন্মথনাথ তাহা সাদরে শুনিতেন। তাঁহাকে একখানি রামের চিত্রও দিয়াছিলাম। তাহা তিনি বাঁধাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক কলিকাতার নিজ বাটীতে রাখেন। নন্দ ঐ বাটীতেই থাকেন। যখনই তাঁহার পিতার পীড়া হয় তখনই তিনি রামকে স্মরণ করেন এবং তাঁহার মানস নয়নে রামও আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভয় দেন।

বিদেহে অভয়দান

এইরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইল। পঞ্চদশ বর্ষে অধর সাংঘাতিক পীড়ায় হুগলিতে শয্যাশায়ী। নন্দ পিতার শুশ্রূষা করিতেছেন। আর রামও স্বদেহে নাই যে তাঁহার কাছে যাইবেন এবং পিতার কালও পূর্ণ বুঝিয়াছেন। হঠাৎ নন্দকে বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিতে হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিবেন সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু কর্ম্ম শেষ হইতে বিলম্ব হইল। হুগলি ফিরিবার রেলগাড়ি নাই। সুতরাং মন্মথবাবুর বাটীতে যৎসামান্য আহার করিয়া রাত্রি-যাপন করিতেই হইবে। আহারান্তে মন্মথ বাবুর শয়নগৃহের বহির্দ্দিকে রক্ষিত রামের চিত্রখানিকে প্রণাম করিয়া মনে মনে জানাইতেছেন, 'পিতাকে এ যাত্রাও রক্ষা করুন।' বিস্ময়ের কথা!—চিত্রখানি উজ্জ্বল হইল এবং চিত্রের গ্রীবাদেশ কম্পিত হইয়া জানাইল—"না!" নন্দ ভাবিলেন উহা তাঁহার চিত্তভ্রম। দ্বিতীয় বার জানাইলেন। চিত্র-মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। তখন তিনি মন্মথ বাবুকে ডাকিলেন এবং তাঁহাকে এই ব্যাপার বলিলেন। মন্মথ বাবুরও কৌতূহল উদ্দীপিত হওয়ায় তৃতীয়বার চিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তৃতীয়বারও চিত্র শীর্ষকম্পনে অধরের মৃত্যু ঘোষণা

চিত্রেঙ্গিত

করিলেন। উভয়ে শয়ন করিতে গেলেন। বামের নিকট নন্দ এই শেষ প্রার্থনা করিলেন যেন পিতার মুখাগ্নি করিবার অবসর পান। চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই তিনি হুগলি ফিরিলেন। তাঁহার পিতৃদেব অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শেষ পুত্রকৃত্যের অবসর পাইলেন।

এই অদ্ভুত ঘটনা মন্মথনাথ কবির ভাষায় সমর্থিত করেন।

> There are more things in heaven and earth, Horatio !
> Than are dreamt of in your philosophy.
>
> —Hamlet I, IV.

নায়ক হ্যামলেট স্বর্গগত পিতার প্রেতাত্মা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া ও তাঁহার বাণী স্বকর্ণে শুনিয়া সেই ব্যাপার বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিলে বন্ধু তাহা বিশ্বাস করিতেছেন না। হ্যামলেট তাঁহাকে বলিলেন—

> "হোরেশিও ! প্রকৃতির লীলা বিচিত্র,
> তাহা মানুষের জ্ঞানগম্য নহে।"

৩। কালীসুত

> শ্রীবামো ব্যবহারাজীবতিলকৌ বিপ্রৌ বুধৌ সাধকৌ
> সিদ্ধশ্রীগুরুধৌতযৌবনমলৌ স্নেহের কালীসুতৌ।
> ইত্যামন্ত্র্য তয়োঃ প্রণতয়োরিষ্টৌ প্রভুঃ সূচয়ন্
> পাদস্পর্শনদেবীদর্শনঘনানন্দং সমাস্বাদয়ৎ ॥

যাঁহাদের যৌবন দোষ সিদ্ধ সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক ধৌত হইয়াছিল, এমন ব্যবহারাজীবগণের ভূষণ বুদ্ধিমান্ সাধক বিপ্রদ্বয়কে শ্রীবাম সস্নেহে কালীসুত বলিয়া সম্বোধন করতঃ তাঁহাদের গুরু ও ইষ্ট দেবতার বিষয় সূচনা করিয়া প্রণতগণকে শ্রীচরণস্পর্শে অধিকার দিয়া এবং দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া সান্দ্রানন্দের সম্যক্ আস্বাদ দিয়াছিলেন।

কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক দুই প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকিল ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ ছিল। যৌবনে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হন। কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষের কৃপালাভে উভয়েরই ইষ্টে

উকিল

ও গুরুতে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে। ক্রমশঃ তাঁহারা গৃহী সাধক হন। ওকালতি করিতেন বটে কিন্তু তাহাতে আত্মহারা হন নাই। কালীপদই লক্ষ্য ছিল। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গীতশক্তি ছিল। আদালতেও অবসর পাইলে সৎকথায় ও ভক্তিসঙ্গীতে কাল যাপন করিতেন। প্রতি রবিবার উভয়ে সপরিবারে বৈদ্যবাটীতে গুরুভ্রাতা অক্ষয়-

ভক্ত

কুমারের বাটীতে আসিতেন এবং সাধনানন্দ ভোগ করিতেন। রাম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতি তাঁহাদের বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাদের প্রৌঢ়াবস্থায় আমি হুগলিতে ওকালতি আরম্ভ করি। আমার পিতৃদেবের বিদ্যাবত্তাদির বিষয় তাঁহারা বিদিত ছিলেন। আমাকে তাঁহারা আদর করিতেন। আমি শ্রীরামের কৃপা পাইলে তাঁহারা আমাকে গুরুভাই জ্ঞান করিতেন; আমিও শ্রীশকে দাদা বলিতাম এবং তিনি বিষ্ণুকে খুড়া বলিতেন বলিয়া আমিও বিষ্ণুকে খুড়া বলিতাম। শ্রীশদাদার বাটীতে আমার অবাধগতি ছিল। তথায় আমার গুরুভ্রাতা তারাক্ষ্যাপার ও

ঘনিষ্ঠতা

জগৎক্ষ্যাপার সহিত আলাপ হইত। সে ঘটনা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশদাদার সহিত ইষ্টগোষ্ঠীতে কতদিন মহানন্দে কাটিয়াছে। যখন তিনি একতারা লইয়া রামপ্রসাদাদির গীত গাহিতেন তখন তথায় অপূর্ব্ব ভক্তিলহরী উঠিত।

শ্রীশদাদার পত্নীও সাধিকা ছিলেন। শ্রীগুরু সন্নিকর্ষ তিনিও সম্যক উপলব্ধি করিতেন। একদা বর্ষাকালে নূতন বাটীতে কূপের নিকট সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে বজ্রপাত হইল। কঠোর নাদে কর্ণ বধির ও বিদ্যুৎ প্রভায় চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। গুরুভক্তি-পরায়ণা সাধিকা দেখিলেন যেন শ্রীগুরু তথায় আবির্ভূত হইয়া বজ্রকে

পরিবারবর্গ

সরাইয়া দিলেন। শ্রীশের একটি মাত্র কন্যা নামে ও কার্য্যে অন্নপূর্ণা। জামাতা শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও ধীর সুধী। হুগলীতে ওকালতি করেন। শ্রীশদাদা ও তৎপত্নী গত।

বিষ্ণুপদ স্বদেশপ্রাণ ওজস্বী ভক্ত ছিলেন। হুগলী জেলায় কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে প্রধান। তাঁহারও পুত্র নাই। জামাতা উকিল।

বিষ্ণুপদ ও শ্রীশচন্দ্র ১৩১৫ সালে শ্রীরামের পদধূলি লইবার জন্য তারাপীঠে যান। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরাম তাঁহাদের বিশুদ্ধভাবে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পুত্রস্নেহ প্রদর্শন করতঃ "আমার কালীর ছেলে আসিয়াছে" বলেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের শ্রীগুরু কালিদাসের ও ইষ্টদেবী কালীর বিষয় ইঙ্গিত করেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে স্বেচ্ছায় শ্রীপাদপদ্ম তাঁহাদের মস্তকে অর্পণ করেন। তৎফলে ভক্তদের অভূতপূর্ব্ব সাত্ত্বিকভাবোদয়ে শরীর রোমাঞ্চিত এবং মনঃ আনন্দে বিভোর হয়। পরে উভয়কে শ্রীবশিষ্ঠের সিদ্ধাসনে বসাইয়া ধ্যানে দেবীমূর্ত্তিও দেখাইয়া দেন। তৎপূর্ব্বে বিষ্ণুপদ নীল জ্যোতিঃমাত্র দেখিতেন। নীলজ্যোতিরুদয়ে বিষ্ণু শ্রীগুরুর শুভাগমন বুঝিয়া প্রণাম করিতেন। শ্রীশচন্দ্রের দুঃখ ছিল যে তিনি কিছু দেখিতে পান না। করুণাময় উভয়ের দুঃখ দূর করিলেন। তৎপরে প্রতিদিনই শ্রীমূর্ত্তি তাঁহাদের মানস নয়নে উজ্জ্বলভাবে আবির্ভূত হইত।

কালীসুত

ইষ্টদর্শন

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী কুণপকুলশিরোমালিনী দীর্ঘনেত্রা।

তাঁহারা রামকে গুরুবৎ জ্ঞান করিতেন।

৪। নীলকণ্ঠ

পুরা কালকূটাদভূন্নীলকণ্ঠোঽধুনা রামদেবঃ সশিষ্যোঽপি নিত্যম্।
সুরাসম্বিদাদীন্ গরান্ কুণ্ডলিন্যাং জুহ্বতীতি ধন্যো মনুষ্যাবতারঃ॥

পূর্ব্বকালে একবার মাত্র কালকূটাস্বাদে রামদেব নীলকণ্ঠতা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে শিষ্যমণ্ডলীসহ নিত্য তিনি কুণ্ডলিনীতে নির্ব্বিকারভাবে

সুরাসম্বিদা প্রভৃতি নানাবিধ বিষ আহুতিস্বরূপ দিয়াছেন। আহো! মনুষ্যাবতারই ধন্য!

নির্মথ্যমানাদুদধেরভূদ্বিষম্
মহোল্বণং হালাহলাহ্বমগ্রতঃ।
সম্ভ্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ
তিমিদ্বিপিগ্রাহতিমিঙ্গিলাকুলাৎ॥
তদুগ্রবেগং দিশিদিশ্যুপর্য্যধো
বিসর্পদুৎসর্পদসহ্যমপ্যাতি।
ভীতাঃপ্রজা দুদ্রুবুরঙ্গসেশ্বরাঃ
অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্॥

*　　　　*　　　　*

ততঃ করতলীকৃত্যব্যাপি হালাহলংবিষম্।
অভক্ষয়মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ॥
তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্য্যং জলকল্মষঃ।
যচ্চকার গলে নীলং তস্য সাধোবিভূষণম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৮।৮

দৈত্যসংগ্রামে বিধ্বস্ত দেবগণ নারায়ণের উপদেশে দৈত্যগণসহ সন্ধিস্থাপন করিলেন। সুরাসুর ক্ষীরোদসমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্দর মন্থনদণ্ড এবং বাসুকি মন্থনরজ্জু হইল। আদিকূর্ম্ম মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই মন্থনফলে উগ্রবীর্য্য কালকূট বিষ উত্থিত হইল। বিষ জ্বালায় ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধপ্রায়। সুরাসুরগণ দেবাদিদেবের শরণ লইলেন। পরমকারুণিক বাম সেই গরল পান করতঃ বিশ্ব রক্ষা করিলেন। হলাহলের প্রভাবে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইল। অনন্তর নারায়ণ স্বয়ং মন্থন করিলে পারিজাত তরু, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, কৌস্তুভমণি, কমলধারিণী কমলা, চন্দ্র এবং অমৃতভাণ্ডকর ধন্বন্তরী উত্থিত হইলেন। ইন্দ্র, পারিজাতাদি এবং নারায়ণ, কৌস্তুভ ও কমলাকে লইলেন। তদ্দর্শনে অসুরগণ অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করিল। নারায়ণ মোহিনীবেশে অসুরদিগকে রূপে মোহিত করিয়া অমৃতভাণ্ড লইয়া পরিবেশনচ্ছলে দেবগণকেই অমৃত দিলেন, অসুরগণ পাইল না।

সমুদ্রমন্থন তত্ত্ব

সমুদ্রমন্থন-তত্ত্ব গভীর। দেবাসুরভাবাপন্ন জীবনিচয় অমৃতাশায় নিত্যই সংসাররূপ সমুদ্রমন্থন করিতেছে, কিন্তু অমৃত বা নিত্যশুদ্ধানন্দ পাইতেছে না। বরঞ্চ দুঃখবাহুল্যই তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিতেছে। সেই দুঃখের জ্বালায় তাহারা যখন দেবদেবকে কাতরে ডাকিতেছে, তখন করুণাময় সেই বিষজ্বালা শমিত করিয়া জীবের জন্য অমৃত মন্থন করেন ; সেই অমৃত দেবভাবাপন্ন জীবেরই প্রাপ্য।

তত্ত্ব

সমদুঃখসুখত্বই অমৃত। তল্লাভের জন্য সাধনা ; পশু, বীর ও দিব্যভাবে সাধনা ত্রিবিধ। পশুভাবে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পরিপালনে চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানকর্ম্মে সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-রূপ দ্বৈত মুক্তি। বিকারহেতু বর্ত্তমানে চিত্তের অবিকৃতিই যথার্থ চিত্তসংশুদ্ধি। সুতরাং বীরভাবে বিকারহেতু পঞ্চ'ম'কার সাধনা। তদ্বারা সম্পূর্ণ চিত্ত সংযমে বীরের ক্রমশঃ সমস্ত দেবময়জ্ঞানই দিব্যভাব। তৎফলে সাযুজ্যাদ্বৈত মুক্তি।

'ম'কার সাধনা

মনুজ বাম সংযতচিত্ত। সমস্তই তারা ব্রহ্মময়ী জ্ঞান তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং তিনি পশুভাবের সাধনা লন নাই। তিনি দিব্যবীর। দিব্য বীরাচারই লইয়াছিলেন। ভোগের জন্য মদ্যাদি সেবন করিতেন না, কুলকুণ্ডলিনীতে মদ্যাদির আহুতি দিতেন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে!

যথার্থ বীর সাধকের উপর সুরাদির কোন প্রভাব দেখা যায় না। বাম কখনও সুরাপানে ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। একদা জনৈক ভক্ত দুই টিন দেশী মদ তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ভারবাহী টিন দুটি আশ্রমে নামাইয়া মদ ঢালিয়া লইতে বলিল। বামের ঘরে পাত্রের অভাব বিচিত্র নহে। সেবক পাণ্ডা বলিল, 'টিন রাখিয়া যাও, পরে উহা পাঠান হইবে।' ভৃত্য তাহা করিতে অনিচ্ছুক। বাম সমস্যা সমাধান জন্য বলিলেন, "তারামার মুখে ঐ টিন ঢালিয়া দে।" বাম মুখ ব্যাদান করিলেন। ভারবাহী পাত্র হইতে মদ্য তাঁহার গলে ঢালিতে লাগিলেন। মুহূর্ত মধ্যে টিন দুটি খালি হইল। সকলে অবাক্। ক্ষণেক পরে বাম কর্ম্মনাশা নদী প্রবাহিত করিলেন। চতুর্দ্দশীর মেলায় বামের বহু ভক্ত তাঁহার জন্য সুরাসম্বিদাদি

লইয়া যাইতেন; কল্পতরু প্রভু সকলেরই ভক্ত্যুপহার লইতেন, কখনও বিচলিত হন নাই।

৫। রাজধানীতে শ্মশানচারী

ভাগীরথীসজ্জিতসিন্ধুপোতাং প্রাসাদমালোপবনাভিরামাম্।
অতৈলপূরপ্রদীপালিরথ্যাং দুর্গাভিগুপ্তাংচ গুল্মাধিকারাম্॥ ১
সৌদামিনীবাহিতদৌত্যভারাং বাষ্পাদিযানং জলযন্ত্রজালাম্।
অন্তঃপ্রণালীমলহারিযোগাৎ স্বাস্থ্যাদি কৃত্যে গণতন্ত্রপাল্যাম্॥ ২
বাণিজ্যলক্ষ্মী সুষমাবিলোলৈরশেষদেশাগ্নিলিতৈর্জনৌঘৈঃ।
বিভিন্নবাগ্বেশচরিত্রধর্মৈঃ স্বল্পাবসারামিবভূতধাত্রীম্॥ ৩
নিত্যোৎসবাং নাট্যপ্রদর্শনীভিঃ বাণীবিলাসাং বুধছাত্রবৃন্দৈঃ।
দীনার্ত্তসেবাসদনৈঃ শরণ্যাং ধর্মস্য পীঠৈরপি পুণ্যগন্ধাম্॥ ৪
শ্বেতাঙ্গসাম্রাজ্যললামভূতাং স্ফীতাতুলাং ভারতরাজধানীম্।
যতীন্দ্রনির্ব্বন্ধভরেন নীত্বা শ্মশানচারী বিচচার রামঃ॥ ৫

যাহার অর্ণবপোতনিচয় ভাগীরথীবক্ষে সুসজ্জিত, যাহা প্রাসাদমালায় ও উপবনে অতি রমণীয়, যাহার পথসকল তৈলবিহীন দীপাবলিতে আলোকিত, যাহা দুর্গদ্বারা সংরক্ষিত এবং গুল্মস্থ প্রহরীগণ দ্বারা অধিকৃত। ১।

যেখানে সৌদামিনী দূতীস্বরূপা হইয়া সংবাদ দেয়, যেখানে বাষ্পাদি চালিত যন্ত্রযান ও অশ্বাদি যানবাহন, যাহা জলধারাযন্ত্রে ব্যাপ্ত, যেখানে মলাদি অন্তঃপ্রণালী দ্বারা অপসারিত হয়, স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে যাহা গণতন্ত্রাধীন। ২।

বাণিজ্যশ্রীর সুষমা দর্শনে চঞ্চল হইয়া অশেষ দেশ হইতে মিলিত বিভিন্ন-ভাষী, বিভিন্নবেশ, বিভিন্নচরিত্র, বিভিন্নধর্মী, অসংখ্য জনসমূহে যাহা নিখিল ধরণীর ক্ষুদ্রানুকৃতি স্বরূপ। ৩।

যেখানে নিত্যই নাট্যপ্রদর্শনী প্রভৃতি হেতু উৎসব বর্ত্তমান, যাহা পণ্ডিত-ছাত্রমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে সরস্বতীর বিলাসভূমি, যাহা দীন ও আর্ত্তগণের সেবাশ্রমহেতু শরণদায়িনী, যাহা বিভিন্ন ধর্মপীঠদ্বারা পুণ্যগন্ধা। ৪।

সেই শ্বেতাঙ্গগণের সাম্রাজ্যের শিরোমণিরূপা, সমৃদ্ধিশালিনী, অতুলনীয়া ভারতবর্ষের রাজধানীতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে আনীত হইয়া শ্মশানচারী বাম বিচরণ করিয়াছিলেন। ৫।

কেহ কেহ বলেন, 'সংসারত্যাগী সাধুগণ সংসারের কোন উপকারেই আসেন না। তাঁহারা একরূপ ঘোর স্বার্থপর। কিসে নিজের উন্নতি হইবে তজ্জন্যই ব্যস্ত। নিজে সংসারের জ্বালা হইতে জুড়াইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধি।' ইহা ঘোর ভ্রম। জগতের যাবতীয় মহাপুরুষের লীলাই জগতের উপকারার্থ। যীশুখৃষ্ট জগতের অধিক উপকারী, কি মহাপ্রাণ Howard উপকারী, এ প্রশ্নের পাশ্চাত্যপ্রিয়গণ উত্তর করুন। শ্রীচৈতন্যের, নিত্যানন্দের জীবপ্রেম অগাধ, শ্রীবামও তদপেক্ষা ন্যূন নহেন। তিনি স্বার্থপর জগতে নিঃস্বার্থ ত্যাগের আদর্শ দেখাইতে আসিয়া প্রধানতঃ শ্মশানলীলা অবলম্বন করিয়াছিলেন, শ্মশানেও ত্রিতাপতাপিত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া তাদের হৃদয়ে ভক্তি-শান্তিধারা ঢালিতেন। আবার অভিমানী অক্ষম সংসারীর গৃহেও মধ্যে মধ্যে যাইয়া সাংসারিক আকিঞ্চনাশের ছলে পারমার্থিক নিধিও দিতেন।

১৩০৫ সালে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে তাঁহার পদধূলিদান কলিকাতার সংসারকীটগণের প্রাণে যথোচিত ভক্তিভাব উদ্রেকেরই জন্য। মহারাজা সুশিক্ষিত, শিষ্টাচারে অদ্বিতীয়। তাঁহার অবারিত দ্বার। কি ইংরাজী, কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা—সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার। দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত ইত্যাদি এমন কোন জ্ঞানের বিভাগ নাই যাহাতে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় প্রিয়ংবদও বিরল। তাঁহার পৌত্রের বয়স্ককে তিনি "আপনি" ভিন্ন সম্বোধন করিতেন না। তাঁহার নিকট যিনি গিয়াছেন তাঁহার সদালাপে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপাপাত্র। কিন্তু শরীরে অসাধ্য অম্লশূল। পুত্রাভাববশতঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, বর্ত্তমান মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারকে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। প্রদ্যোৎকুমারেরও পুত্র না হওয়ায় যতীন্দ্রমোহনের মনে ব্যথা ছিল। সেইজন্যই তিনি ক্ষ্যাপাবাবাকে লইয়া আসেন।

তাঁহার ভাগিনেয় সত্যনিরঞ্জন তারাপীঠে গিয়া বামকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মহারাজা ভাগিনেয়ের মুখে একালে এরূপ ত্যাগের আদর্শ

আছে শুনিয়া আকৃষ্ট হন। তবে পদমর্য্যাদার বশে স্বয়ং তারাপীঠে যাইতে অনিচ্ছুক। তাই ভাগিনেয়কে প্রেরণ করেন, যেরূপে হয় ক্ষ্যাপাকে আনা চাই। সত্যনিরঞ্জন দুই একবার বিফল মনোরথে ফিরিয়া আসেন। পরে পাণ্ডাদের পরামর্শে বাবার কনিষ্ঠ সহোদর রামের সাহায্যে বাবাকে আনিতে পারেন। মূলকথা বাম প্রাণের ডাক না হইলে আসেন না। যখন যতীন্দ্র-মোহনের প্রাণের ডাক পড়িল তিনি আসিতে সম্মত হইলেন। সঙ্গে ৮।১০ জন পাণ্ডা—বিপিন, নবীন প্রভৃতি। রামপুরহাট পর্য্যন্ত পাল্কীতে, তথা হইতে বাষ্পযানে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। হাওড়া হইতে মহারাজার গাড়ীতে প্রাসাদে আসিলেন। বামের জন্য মহারাজার দ্বিতলে বড়বৈঠকখানায় আসন হইয়াছে। উহার ভিতর দুইটি বন্দুকধারী সাহেবের মূর্ত্তি খাড়া আছে। বাম বালক, তিনি উহা দেখিয়াই বাহানা ধরিলেন "না, ভিতরে যাইব না। ঐ সাহেবেরা বন্দুক লইয়া মারিবেন।" মহারাজার লোকেরা বলিলেন, 'বাবা, উহা মৃন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি।' বাবা বলেন 'কি জানি বাবা।' তিনি বৈঠকখানার দরজার বাহিরে চত্বরে বসিয়া পড়িলেন।

অমৃতস্যেব সন্তৃপ্যেদবমানস্য তত্ত্ববিৎ।
বিষস্যেবোদ্বিজেন্নিত্যং সম্মানস্য বিচক্ষণঃ॥

—মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব ১২৯ অধ্যায়।

মহামুনি জৈগীষব্য বলিতেছেন যে তত্ত্ববিৎ মানকে বিষবৎ এবং অপমানকে অমৃতবৎ দেখিবেন। বাম তত্ত্ববিৎ, তাহারই পরিচয় দিলেন। মহারাজা তথায় করযোড়ে উপস্থিত। পরিধানে কোঁচান দিশি ধুতি, গলায় একখানি তোয়ালে। তিনি বাবার নিরভিমান ভাব দেখিয়া বিস্মিত। বৈঠকখানায় যাইতে আগ্রহ দেখাইলেন না। ভিতরের বারান্দায় বাবাকে আনিবার জন্য পাণ্ডাগণকে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডারা বাবাকে বুঝাইয়া হাত ধরিয়া বারান্দায় লইয়া গেলেন। তথায় বিলাতি গদিওয়ালা কেদারা রহিয়াছে। বাম তাহাতেও বসিলেন না। মহারাজা দাঁড়াইয়া আছেন। পাণ্ডারা মহারাজাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বড়ই সম্ভ্রমে পড়িয়াছেন। মহারাজার নিকট তাঁহাদের নানারূপ প্রত্যাশা আছে। বাবা না বসিলে মহারাজা বসিবেন না বুঝিয়া তাঁহারা বাবাকে বারবার বলিতে লাগিলেন

"বাবা বস্থন বস্থন, মহারাজা আপনার জন্ম বসিতে পারিতেছেন না।" রামের নিকট সামাজিকতা নাই, তিনি সরলহৃদয়। মহারাজা বলিয়া তাঁহার সম্ভ্রমবোধও নাই। সম্রাট Alexandarকে দণ্ডী ঔদাসীন্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন। রাম যতীন্দ্রকে সরল-বৎসলচক্ষে দেখিয়াছেন। রাম তাই বলিলেন "তোমাদের মহারাজা বস্থন না কেন, কে তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিতেছে।" রাম বসিতে অনুমতি দিলেন বটে তথাপি রামের এরূপ অনুভাব যে মহারাজা বসিতে পারিলেন না। বাবা ক্ষণেক পরে একখানি আসনে বসিলেন। মহারাজা বসিলেন। পাণ্ডারাও দণ্ডায়মান। মহারাজা তাঁহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলে পাণ্ডারা কেহ বসিলেন, কেহ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অতিথিদের জন্ম নানারূপ ফল মেওয়া মিষ্টান্ন আনীত হইল। পাণ্ডারা ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রদর্শন জন্ম সন্ধ্যাবন্দনা হয় নাই বলিয়া তখন আতিথ্য লইলেন না। রামের দিবারাত্র ধ্যান সন্ধ্যা, স্থতরাং তিনি তারামার দ্রব্য তারামাকেই নিবেদন করিলেন এবং কিঞ্চিৎমাত্র প্রসাদ লইয়া তারামাকেই আহুতি দিলেন। ইহাকেই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামামারে।"

৬। মরকত কুঞ্জে

তস্যাঃশাখানগরতিলকে সিঁতীতি নাম্না শ্রুতে
পৌরেশানাং বিলসিত-পদে ভোগীন্দ্রলীলাবনে।
রম্যে কুঞ্জে মরকতপদাখ্যাতে তমোহারিণীং
দিব্যাং পশ্য প্রকৃতিমধুরাঃ যোগীন্দ্রলীলাবলিম্॥

সেই রাজধানীর শাখানগর সমূহের ভূষণস্বরূপ সিঁতিনামক মুখ্যপুরবাসিগণের বিলাসক্ষেত্রে ভোগীশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রের প্রমোদ উদ্যানে মরকত-নাম রমণীয় কুঞ্জে যোগীন্দ্র শ্রীরামের স্বভাবস্থন্দর মুগ্ধ সমভাবোদ্দীপিকা লীলা দেখুন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে সিঁতিনামক স্থানে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিলাসোদ্যান, নাম Emerald Bower (মরকত কুঞ্জ)। তাঁহার ধনের

অভাব নাই, হৃদয়ে কবিত্বও আছে, বাগানবাটী তাহার পরিচায়ক, জাঁকজমক নাই অথচ সুন্দর। মহারাজা জানেন যে রাম শ্মশানচারী, কলিকাতার ন্যায় জনসমাকীর্ণ গৃহসঙ্কুল মহানগরী তাঁহার ভাল লাগিবে না। সেইজন্য স্বীয় উদ্যানে তিনি রামের বাসা স্থির করিয়াছিলেন। স্বীয় ভদ্রাসনে পদধূলি দিবার কারণ আরও মহারাণী প্রভৃতিও যাহাতে তাঁহার দর্শন পান। সেই উদ্দেশ্যেই প্রথমে প্রাসাদে আনয়ন করেন। তাহা পূর্ণ হইলে বাগানবাটীতে তাঁহাকে পরিচারকবর্গ সহ পাঠাইলেন। তথায় আতিথ্যের আয়োজন রাজোচিত। নানাবিধ ফল, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্নব্যঞ্জনাদির যথেষ্ট পারিপাট্য। কালীঘাট হইতে মহাপ্রসাদ আসিয়াছে। কারণ ও শুদ্ধি। সুব্যবস্থা হইয়াছে। পরিচর্য্যার জন্য বহু ভৃত্য মহারাজের প্রিয় দৌহিত্র জলধি আতিথ্যের ভার পাইয়াছেন। পাণ্ডামহাশয়েরা শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি সারিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করতঃ সুরসাল ফলে ও মনোরম মিষ্টান্নে রসনা পরিতৃপ্ত করিলেন; পরে দেবভোগ্য অন্নব্যঞ্জনে উদরপূর্ত্তি হইল। রামও কুলকুণ্ডলিনীতে কারণ ও শুদ্ধি আহুতি দিয়া আপন আনন্দে আপনি মত্ত আছেন। স্বরূপানন্দ প্রভৃতি চলিতেছে। অপরাহ্নে মহারাজা সপুত্র আসিলেন। তাহার উপবন রামের আগমনে তপোবন হইয়াছে। তিনি বিবেচক সংস্কৃতজ্ঞ; কালিদাসের দুষ্মন্তের ন্যায় মহাপুরুষ দর্শনে বিনীত ভাবেই ছিলেন। রাজোচিত কোন আভরণ নাই, সঙ্গে প্রধান কর্ম্মচারী আছেন। প্রণামাদির পর মহারাজার ইঙ্গিতে রায়বাহাদুর রামবাবুকে বলিলেন, 'মহারাজা বাবার সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে চান।' পাণ্ডারা সভ্য, ধনিগণের মন যোগাইতে পটু। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সকলেই উঠিলেন। বাবা সরল বালক। তিনি ডাকিতেছেন 'নগেনকাকা, নগেনকাকা'। নগেন্দ্র বলিল, 'বাবা! মহারাজা আপনার সহিত গোপনে আলাপ করিতে চান। তাই আমরা যাইতেছি।' বাবার বাহির ও ভিতর একরূপ। তাঁহার কোন সঙ্কোচ নাই। বৈদিক ঋষি চাহিয়াছেন, 'ভগবন্! আমাকে এই বর দাও যেন কাহারও নিকট হৃদয় গোপন করিতে না হয়।' রামই সেই বরদাতা; সেই বরভোক্তাও বটেন। সেই বরের ফল তাঁহার মানসে ফলিত। মহারাজা কিছু সম্ভ্রমান্বিত হইলেন। তিনি রামের আচরণে শিক্ষা পাইলেন। নীরবে আছেন। রাম দেখিলেন মহারাজা

বুঝিয়াও লজ্জাবরণ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তখন সহোদর প্রভৃতিকে বলিলেন 'তবে যাও।' তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

মহারাজা বাবাকে ঐহিক কল্যাণের জন্য আনিয়াছেন। আরোগ্য ও বংশরক্ষা এই দুই-ই তাঁহার অভীষ্ট। তিনি গম্ভীর প্রকৃতি, কাহাকেও উহা প্রকাশ করেন নাই। অন্তর্য্যামি রামের উহা অবিদিত নাই। রামকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় হউক আর সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের নিকট ঐহিক বাসনার কথা বলিতে লজ্জাবশতঃই হউক, তিনি হৃদয় গোপন করিয়া রামকে প্রথম প্রশ্ন করিলেন 'বাবা, মোক্ষ কিরূপে পাওয়া যায়?' বাবা বুঝিলেন মহারাজ সংসারী, প্রবৃত্তিপন্থী; নিবৃত্তিপন্থী নহেন। মোক্ষের অধিকারী নন। অধিকারীভেদেই শাস্ত্রে সাধনাদির ব্যবস্থা। সুতরাং উঁহাকে উত্তর দিলেন, 'তারামার কৃপায়।' সদুত্তর বটে। মুক্তিদাত্রীর কৃপা ব্যতীত কিরূপে মুক্তি আসে? দাসের মুক্তি প্রভুর ইচ্ছাধীন। কিন্তু এ উত্তরে সাধনপথ নির্দিষ্ট নাই। মহারাজা অনেক পড়িয়াছেন। তাঁহার তর্কের ইচ্ছা আসিল—বলিলেন 'সে কৃপা কিরূপে আসে?' তারাময় রাম বলিলেন 'তারামার চরণে মন প্রাণ ঢাল।' মহারাজা তাহাতেও জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে যে কঠিন কথা। কিরূপে তা ঘটে?' তখন রাম তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজাইবার জন্য বলিলেন 'বাবা! মা তোমাকে গঙ্গাবাঁধা টাকা দিয়াছেন। তুমি মাকে কি দিয়াছ? তাঁহার জীবের প্রতি কি প্রেম দেখাইতেছ? তাহাদের দুঃখে কতদূর দুঃখী হইতেছ? এইগুলা অভ্যাস কর। মোক্ষ অনেক দূরের কথা!' মহারাজা এখন নিরস্ত। করুণা, মুদিতা, মৈত্রী প্রভৃতি অগ্রে সাধন চাই। তাহাতেই হৃদয়ের বিস্তার। সর্ব্বজীবই মার সন্তান—এই জ্ঞান হইলে মার প্রতি ভক্তি আপনিই উদিত হইবে। ক্রমশঃ তারাময় জগৎ জ্ঞানোদয়ে মুক্তি ঘটে।

মহারাজা বলিলেন 'বাবা! আমরা মোক্ষের চিন্তাও করি না, মোক্ষ আমাদের দূর বটে। তবে যাহাতে ভক্তি হয়—আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাও মহারাজার হৃদয়ের কথা নহে। রাম বলিলেন 'ভক্তি বড় দুর্লভ। সংসারের কামনা হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে তাহা আসে না। তোমার প্রাণ সতত যেভাবে ভোগ চাহিতেছে, শরীরের সুস্থতা ও বংশরক্ষা চাহিতেছে, ভক্তি কি সেভাবে চাহিতেছে? মহারাজা দেখিলেন রাম তাঁহার হৃদয় জানিয়াছেন।

তখন তিনি নীরব। রাম বংশরক্ষা সম্বন্ধে কি বাধা তাহা বলিয়া দিলেন। তথাপি আশীর্ব্বাদ করিলেন বংশরক্ষা হইবে। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। রামের কৃপায় বংশরক্ষা হইয়াছিল।

৭। শৌচ

কক্ষং তত্র মনোরমং সুমুকুরং যন্ত্রাম্বুনা ঝঙ্কৃতং
বাষ্পালোকবিভাসিতং বনচরঃ শৌচায় নীতোঽবদৎ।
"নৈদৃক্ হা শয়নায় কোটিশতশো স্থানং লভতে নরাঃ!"
যতশ্চোপবনং বহিঃ স বিদধে শৌচং সলীলং যতী॥

সেই মরকত কুঞ্জে শৌচের নিমিত্ত মনোরম দর্পণাদিসজ্জিত যন্ত্রমুখনির্গত জলের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, বাষ্পপ্রদীপালোকে উদ্ভাসিত, কক্ষে নীত হইলেই ধনিগণের বিলাসতার নিন্দা করিয়াই বলিলেন 'হায়! শতকোটি লোক এরূপ স্থান শয়নের জন্য পায় না!' পরে উপবনে গিয়া লীলাসহকারে শৌচ করিলেন।

রাম শ্মশানচারী; প্রাসাদে বা বিলাসোদ্যানে অভ্যস্ত নন। তিনি মহাপ্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করেন। বিলাসিতার ধার ধারেন না। বিলাসিতা ভালও বাসেন না। প্রথমদিনই তাঁহার পরিচয় দিলেন। অপরাহ্নে তাঁহার কোষ্ঠ পরিষ্কারের বেগ লাগিয়াছে। পাণ্ডাদের নিকট সেকথা শুনিয়া রাজভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে মর্ম্মরখচিত আলোকমালারঞ্জিত এক ঘরে লইয়া গেল। প্রভু ঘর দেখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভৃত্যরাও দাঁড়াইয়া আছে। বাবা রামভাইকে ডাকিতেছেন। রাম আসিল। রাম সংসারী ধনিঘেঁষা, তিনি বুঝিয়াছেন বাবের গোল বাধিয়াছে কিরূপে ঘরে মলত্যাগ করি। তিনি বাবাকে শিখাইবার জন্য বলিলেন 'রাজারাজড়ার এইরূপ বন্দোবস্ত।' প্রভুর হৃদয়ে অন্য ভাব। তিনি বলিলেন 'এমন ঘরে যে লাখ লাখ লোক শুইতে পায় না।' প্রভুর কোমল প্রাণে লাগিয়াছে। পৃথিবীর একদিকে এত নির্ধনতা যে লক্ষ লক্ষ লোকে বর্ষার অবিরল ধারা হইতে নিজ মস্তক বাঁচাইতে পর্ণশালাও পায় না। অন্যদিকে ধনিগণের

এমন বিলাসিতা যে কোষ্ঠপরিষ্কারের জন্য মর্ম্মরখচিত দীপোদ্ভাসিত চিত্রিত গৃহ। চিকাগোর ধর্ম্মমণ্ডলীতে শ্রীগুরুর কৃপায় প্রতিষ্ঠালাভের পর যখন বিবেকানন্দ আমেরিকার একজন ধনকুবেরের অতিথি হন তখন তিনি রাত্রে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ঘুমাইতে পারেন নাই। মাদুরে ঢাকা মেজের উপর পড়িয়া তিনি নীরবে সমস্ত রাত্রি এই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন 'হায় মা! তুই এদেশের লোককে এত ধন দিয়াছিস আর আমার ভারতকে এত নির্ধন করিয়াছিস।' বামের বসুধৈব কুটুম্বকম্। সুতরাং এদেশ ওদেশ তাঁহার মনে আসিল না। তিনি কেবল বিলাসিতাই দূষনীয় মনে করিলেন। তাই তিনি যতীন্দ্রমোহনকে বলিয়াছিলেন 'মা তোমায় গঙ্গাবাঁধা টাকা দিয়াছেন, তুমি মাকে কি দিয়াছ?'

প্রভু গৃহে মলত্যাগ করিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে সম্মুখের বাগানে আনা হইল। গোলাপ ঝাড়ের মধ্যে বসিলেন, আবার উঠিলেন। আবার উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন! পাণ্ডারা বলিতেছেন 'বাবা, ওকি হচ্ছে?' প্রভু বালকবৎ খেলা করিতে করিতে বহির্দেশের কার্য্য করিলেন। নগ্ন—লজ্জা নাই!

৮। আরতি

সিদ্ধংক্ষিপ্তং শ্মশানালয়মপি পুরায়াতমাকর্ণ বামং
কুঞ্জেতত্রোদয়াস্তং প্রচলিত কুতুকাৎ পৌরবৃন্দোঽবিরামম্।
নিঃসঙ্গ সোঽবধুতঃ পরিজনসহিতঃ স্তোকমুদ্বেজিতোঽভূৎ
তঞ্চাবাধং জনৌঘং গৃহপতিরবরুধৎ পত্রিকাসেতুবন্ধৈঃ॥

শ্মশানবাসী সিদ্ধ বামাক্ষ্যাপা পুরীতে আসিয়াছেন শুনিয়া মরকত কুঞ্জে উদয়াস্ত অবিরাম পুরবাসিগণ কৌতুকবশতঃ যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সেই বীতসঙ্গ অবধূত ও পরিজনবর্গ ঈষৎ উদ্বেজিত হইলেন এবং গৃহপতিও 'পত্রিকা-বিনা প্রবেশ হইবে না'—এইরূপ সেতু বা মর্য্যাদাদ্বারা ঐ অবাধ জনস্রোত বন্ধ করিলেন।

রাম সর্ব্বত্যাগী। কেবল যতীন্দ্রের কাতরাহ্বানে স্বীয় আসন ছাড়িয়া আসিয়াছেন। ভক্তের কার্য শেষ হইয়াছে। আর তিনি জনাকীর্ণ মহানগরীতে ধনীগৃহে থাকিতে চাহেন না। বনবাসী মুনিগণের চক্ষে প্রাসাদ এবং গৃহিসঙ্গ কিরূপ তাহা কালিদাস কণ্বশিষ্যগণের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদ দর্শনে শার্ঙ্গরব বলিলেন,

শারদ্বত!
মহাভাগ! নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব॥

সত্য বটে এই মহাভাগ রাজা দুষ্মন্ত ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। ইহার সুশাসন ফলে চতুর্ব্বর্ণ প্রজার মধ্যে নীচও অপথে যায় নাই। তথাপি বিজনতা আমাদের চিরপরিচিত বলিয়া জনাকীর্ণ রাজগৃহে যেন অগ্নি লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

শারদ্বতও তদুত্তরে বলিলেন—

জানে ভবান্ পুরপ্রবেশাত্তবেদৃশঃ! সংবেগঃ অহমপি
অভ্যক্তমিবস্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখ সঙ্গিনমবৈমি॥

জানি যে আপনি পুরপ্রবেশ করিয়াই এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছেন। স্নাত যেমন তৈলাক্তকে, শুচি যেমন অশুচিকে, জাগ্রৎ যেমন নিদ্রিতকে, মুক্ত যেমন বদ্ধকে, সেইরূপ আমিও অত্রস্থ ভোগাসক্ত জনকে দেখিতেছি।

রাম পরদিনই আবদার লইয়াছেন যে তারাপীঠে চল। মহারাজা রামকে ছাড়িতে চাহেন না। রামকে ও পাণ্ডাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন যে অন্ততঃ ৩,৪ দিন ক্ষ্যাপাকে এখানে রাখা চাই। রামের ফিরিয়া যাইবার আর এক কারণ হইয়াছে। হুতুম প্যাঁচা ঠিক বলিয়াছেন "কি মজার আজব সহর কলকাতা।" এখানে হুজুগ লাগিয়াই আছে। লোকে হুজুগে মাতিয়া আছে। পথে চলিতে চলিতে যদি একজন বসিয়া পড়ে অমনি শত শত লোক জমিয়া যায়। যদি পথের ধারে ভালুক নাচায়,

সহস্র সহস্র লোক জুটে। নাচ তামাসার তো কথাই নাই। তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা আসিয়াছে রব উঠিয়াছে। সে নাকি কুকুর নিয়া মড়ার মাংসও খায়, শ্মশানে থাকে ইত্যাদি কিম্বদন্তী সহস্রমুখে সহস্রধারায় প্রবাহিত।

সিঁতির বাগানে কলকাতার লোক যেন রথযাত্রাদর্শনে যাইতেছে। ধনী, নির্ধন, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী অনবরত ন্যাংটা ক্ষ্যাপাকে দেখিতে চলিয়াছে। ক্ষ্যাপা আত্মপ্রসাদের জন্য এখানে আসেন নাই, যে ধনীদিগকে আদর-অভ্যর্থনা করিবেন। তিনি সামাজিকতা জানেন না। তাঁহার দয়া অসীম বটে, কিন্তু পরমোপকারী, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় তিনি নীরবেই দয়াধারা ঢালিয়া দিতেছেন। তাঁহার নিকট মৌখিক আবেদন নিবেদনের প্রয়োজন নাই। প্রাণের ক্রন্দনই যথেষ্ট। সুতরাং তিনি তামাসা দর্শনে সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপই করিতেছেন না। পাণ্ডারাও লোককে বাবার পক্ষে উত্তর দিতে বিরক্ত হইয়াছেন। মহারাজার কর্ণে এই কথা গেল। তিনি তৃতীয় দিবসে আদেশ দিলেন যে তাঁহার বা জলধিবাবুর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কাহারও বাগানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। লোকের সমাগম কমিল।

৯। কালীঘাটে

কালীঘট্টে বিকটিতবদনে বিশ্বমাতুঃ প্রতীকে
ছায়াং পশ্যন্ শশধরজয়িনো বক্ত্রবিম্বস্য বামঃ
ভাবাবেশাদনিমিষনয়নপ্রোচ্ছলৎ প্রেমধারো
হৃষ্যদ্রোমা শিশুরিবজননীং বর্ষীয়ানভ্যধাবৎ ॥
মা মা দেবীং স্পৃশ ইতি চকিতৈঃ পূজকৈর্বার্য্যমাণো
ভক্ত প্রাহোৎকট বিপুলমুখীং কঃ স্পৃশেন্মাতরং তে।
নেয়ং মাতা শিশুশশীবদনা তারিণীমে মনোজ্ঞা
তাং মূর্ত্তিং নাস্পৃশদপি নিতরাং সেবকৈর্যাচ্যমানঃ ॥

কালীঘাটে বিশ্বমাতার বিকটবদন মূর্ত্তিতে তাঁহার চন্দ্রাতিশায়িনী বদনচ্ছায়া দর্শনে বামের ভাবাবেশ বশতঃ নির্নিমেষ নয়ন হইতে প্রেমধারা উচ্ছলিত হইল

এবং তিনি বয়োবৃদ্ধ হইলেও শিশুর ন্যায় জননীর দিকে রোমাঞ্চিত কলেবরে ধাবিত হইলেন। "না না দেবীকে স্পর্শ করিও না" বলিয়া চকিত পূজকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিলে, ভক্ত কহিলেন, "কে তোমাদের এই বিকট বিস্ফারিতমুখী মাকে স্পর্শ করিবে! ইনি আমার সেই বালচন্দ্রমুখী মনোহারিণী তারামা নন।" পরে সেবকগণ "স্পর্শ করুন" বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি মূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন না।

বাম মুক্ত বিহঙ্গম। তিনি কলিকাতায় যেন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছেন। মহারাজের সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি নাই। কিন্তু তিনি মানুষের আদর যত্ন চান না। তারামার সমাদরই তাঁহার প্রার্থনীয়। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তারামার ক্রোড় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্মবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাব। কলিকাতায় বিলাসিতা ও ধর্ম্মহীন ভাব শ্রীবামের ভাল লাগিতেছে না। একথা তিনি এই অধম সন্তানকে পরে ১৩১১ সালে তাঁহার বিচিত্র ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

কালীঘাট যাত্রা

"বাবা! তোমাদের কলকত্তা সাহেব বাবাদের বুজরুকি ; আগুনে জাহাজ, আগুনে গাড়ী, কত লোক, কত টাকা, কত বাড়ী কিন্তু তারামা তথায় নাই।" তারাপীঠের শ্মশানে যাইতে তিনি ব্যস্ত। মহারাজার অনুরোধে পাণ্ডারা কালীঘাট যাইবার প্রস্তাব করিয়া বামকে চতুর্থ দিন ধরিয়া রাখিলেন। কালীমা তাঁহার চক্ষে বড় মা, তারামা ছোট মা। বালকের ন্যায় বাম যেন বড় মা দর্শনের লোভেই ভুলিলেন। মহারাজা পূর্ব্ব হইতে কালীঘাট দর্শনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সেবক হালদার মহাশয়দিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপাকে কালী দর্শনে আনিতেছেন। একঘণ্টা মন্দিরে অন্য যাত্রী প্রবেশ না পায় তজ্জন্য পালাদারকে অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

বামকে কালীঘাটে গাড়ি করিয়া প্রাতে আনা হইল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য হালদার মহাশয়রা সপরিবারে উপস্থিত। সকলে প্রণামাদি করিলেন। উপস্থিত যাত্রীগণও বামের দর্শন জন্য উদ্গ্রীব। মন্দিরে অন্য লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং তথায় জনতা নাই। তীর্থে সকলের সমান অধিকার আছে ইহা বুঝাইবার জন্য বাম বলিলেন যে সকল ছেলের সঙ্গে তিনি মার দর্শন করিবেন। সুতরাং সকলেরই অবারিত দ্বার হইল। বামকে মার সম্মুখে দাঁড় করান হইল। বড়মাকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে

বাম আত্মহারা হইলেন। হৃদয়-সমুদ্রে ভক্তিলহরী উঠিয়াছে। তাহা উছলিয়া দুনয়ন দিয়া দর দর ধারে পড়িতেছে। ভাবগাম্ভীর্য্যে রসনায় প্রিয় 'জয়তারা' রবও নাই। ভক্ত যাত্রীরা মাকে ছাড়িয়া মার প্রিয় সন্তানকে অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন ও প্রাণে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে প্রভুর ভাবতরঙ্গ উত্তাল হইল। "মা মা" বলিয়া তিনি পাষাণময়ী মূর্ত্তিকে ধরিতে গেলেন। পুরোহিতেরা হাঁ হাঁ করিয়া বাধা দিলেন। তাঁহারা বামের ভাব বুঝেন নাই। সেবায়েৎ ভিন্ন কাহাকেও মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না, এই নিয়ম। নিয়ম রক্ষার জন্য তাঁহারা নিষেধ করিলেন।

ভাবতরঙ্গ

এইরূপ ব্যাপার গৌরাঙ্গাবতারেও ঘটিয়াছিল। নীলাচল প্রবেশপথে প্রাণের আবেগে সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রভু শ্রীমন্দিরে আসিয়া গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তম দেখিতে দেখিতে নিস্পন্দ নির্ব্বাক! পরে প্রেমোল্লাসে নিজ প্রাণধনকে ধরিতে যান। প্রহরিরা বাধা দিলে নিঃসংজ্ঞ হইয়া মন্দিরদ্বারে পতিত হন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রহরী দ্বারা উঠাইয়া লইয়া যান। নিত্যানন্দও শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে প্রেমে অধীর হইয়া তদভিমুখে ছুটেন। প্রহরীরা তাঁহাকে বাধা দিলে তিনি সবলে তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলরামের গলে লম্বিত মালা কাড়িয়া লইলেন। দাস ঠাকুরের ঐ দৃশ্য বর্ণনা কি হৃদয়গ্রাহী!—

মত্ত সিংহ গতি যিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥
প্রবেশ হইল গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমজলে॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেন কালে গৌরচন্দ্র জগৎ-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ-সুভদ্রা-সঙ্কর্ষণ॥
দেখিমাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবার॥

পুরুষোত্তমে মহাপ্রভু

লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেক পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কি বুঝিবে ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
দৈব চক্রে সার্ব্বভৌম পড়িলা দৃষ্টিতে॥
হৃদয়ে চিন্তিলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
এই শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার॥
এই জন হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এই মত চিন্তে সার্ব্বভৌম মহাধন্য॥
সার্ব্বভৌম নিবারণে যত পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সবে মহাভয় করি॥
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতন প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ নিজপ্রিয় কায়॥

শ্রীচৈতন্য ধীরললিত ও নিত্যানন্দ ধীরোদ্ধত নায়ক। তাই উভয়ের আচরণ-ভেদ। বাম অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রেমাভিমান লীলা দেখাইলেন। মান কেবল কান্তভাবের নিজস্ব নহে। বাৎসল্যে ও মাতৃভাবে মান আছে, বর্ত্তমান মহাপ্রভু তাই মানভরে বলিলেন—"না তোদের মাকে ছুঁবনা। তোদের মার একপেছে মুখ, আমার তারামার মুখখানি টুনকুচির মত।" কালীঘাটে মার পাষাণময়ী মূর্ত্তি তন্ত্রোক্ত কালী-মূর্ত্তির অনুরূপ নহে। পুরুষোত্তমের মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তি গঠনে বিশ্বকর্ম্মার শিল্প-নৈপুণ্য বিশেষ ব্যক্ত। এই মূর্ত্তির মুখমণ্ডল একপেছে অর্থাৎ একঝুড়িই বটে। শ্রীচৈতন্য যেমন শ্রীজগন্নাথের তাদৃশ বিকট প্রতিমূর্ত্তিতে মদনমোহন বংশীধারীরূপ দেখিয়াছিলেন, বাম সেইরূপ ভাবভরে কালীঘাটের বিকট পাষাণময় মুখমণ্ডলে তারামার দিব্য শ্রীবদন দেখিতেছিলেন। সে শ্রীবদনের শোভা মার্কণ্ডেয় মুনি দেবগণের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন,—

বামের মান

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণ চন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ —শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।১২

তোমার সেই মৃদু-মৃদু হাসিভরা নির্মল পূর্ণচাঁদপারা ঢল ঢল কাঁচা সোণার মত মধুর মুখখানি দেখিয়াও ক্রোধান্ধ মহিষাসুর যে তোমাকে অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিল, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার বটে।

ভাব ভঙ্গে শ্রীরামের বহির্নয়নে আমার সেই ইন্দুবদন সরিয়া গিয়া পাষাণময় বিকট মুখ ভাসিল। তিনি তাহাই নিজ ভাষায় প্রকাশ করিলেন।

হালদার মহাশয়রা তথায় উপস্থিত। তাঁহারা পুরোহিতদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং অপরাধ ক্ষালনের জন্য বলিলেন "না বাবা, আপনি স্পর্শ করিতে পারেন", এবং স্পর্শের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বাবা পুরোহিতের উপর ক্রোধ করেন নাই। পুরোহিত দ্বারা মা-ই বাধা দিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে সকলই মার খেলা। সুতরাং মারই উপর অভিমান হইল। আর তিনি মার পাষাণ-মূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন না।

অভিমানে ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

মা আমায় আর, আদর ক'রো না,
ক'রোনা নিওনা নিওনা কোলে।
ব্যথা পেওনা ফেলনা অশ্রু
ব'য়ে যাওয়া ছেলে ম'লে ॥
আগুনে পুড়িয়া হ'য়ে গেছি ছাই
ধুলা ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই,
একেবারে গেছে শুকাইয়া প্রাণ
দুঃখে পাপে তাপে জ্ব'লে ॥
কত যে সয়েছ কত যে মেরেছ
কত যে কহেছ কত যে বকেছ
যত কেশে ধরে টেনেছ উপরে
তত যে ডুবেছি অতল জলে ॥

ফেলে দাও আর ক'রনা যতন,
ফিরাও বদন সরাও চরণ
ছাড় মোর আশা মোছ ভাল বাসা
বুকে লাথি মেরে যাও চলে ॥

প্রভুর হৃদয়ের ভাব আমরা কি জানিব। তবে তিনি মার ব'য়ে যাওয়া ছেলে নহেন। তিনি মার আঁচলের ছেলে; মা ভিন্ন জানেন না। মাকে দেখিয়া মার কোলে উঠিতে গেলেন। তাহাতে মা বাধা দেওয়ায় বোধ হয় শিশুর ন্যায় অভিমানভরেই তিনি মার কোলে আর গেলেন না।

১০। মূলাজোড়ে

মূলাজোড়গ্রামে সুরসরিদমলে কালীকাধাম পুণ্যং
চতুষ্পাঠীশোভাচ্ছুরিতমিবযশঃ খুল্লতাতস্য মূর্ত্তম্।
যতীন্দ্রঃ সানন্দং পরিজনসহিতো বাষ্পপোতেন নিন্যে
পথা গাঙ্গেয়াম্ভঃকণ-মৃদুমরুতাসেবিতং বামদেবম্ ॥
পুরো দেব্যাস্তস্মিন পুলকিততনৌ নির্নিমেষাক্ষিধারে
মুদা মাতর্মাতধ্বনিমুখরিত প্রাঙ্গণে ভক্তবীরে।
জনাঃ প্রেম্না হৃষ্টা বিগলিতমদাচার্যবর্য্যৈঃ সবাষ্প-
স্বরো মাতর্মাতধ্বনিমুচ্চরন্ মেঘবিস্ফূর্জ্জিতাভম্ ॥

গঙ্গাতটস্থ মূলাজোড গ্রামে নিজ খুল্লতাত প্রসন্ন কুমারের মূর্ত্ত যশঃস্বরূপ চতুষ্পাঠী শোভিত পবিত্র কালীবাড়ীতে গঙ্গাম্বু শীকর শীতল ও মৃদুল মরুতে বীজ্যমান বামদেবকে গঙ্গার বক্ষ দিয়া বাষ্পপোতে সানন্দে সপরিবার যতীন্দ্রমোহন লইয়া গেলেন। তথায় দেবীর সম্মুখে সেই ভক্তবীর রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। তাঁহার নির্নিমেষ নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আনন্দে তিনি 'মা মা' রবে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করিলে তত্রস্থিত দর্শকবৃন্দ তাঁহার প্রেমে যেন আবিষ্ট হইয়া সাশ্রুনয়নে আপনাআপনি মেঘগম্ভীর স্বরে 'মা মা' রব করিয়া উঠিল। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণও বিদ্যা গর্ব্ব ত্যাগকরতঃ "মা মা" বলিলেন।

কলিকাতা হইতে কিয়দ্ দূরে উত্তরদিকে শ্যামনগরের নিকট মূলাজোড় নামক গ্রাম। এখানে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কীর্ত্তি দেদীপ্যমান। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ। ধনী জ্ঞাতির দেওয়ানি ছাড়িয়া প্রৌঢ়াবস্থায় ইংরাজী ও ফার্সি শিখিয়া সদর দেওয়ানি আদালতে উকিল হন। ঐ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা মহারাজা উপাধি না পাইলেও তিনি কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। শাসনকর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য পদ পান। তাঁহারই সম্পত্তি পাইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন মহারাজা হইতে পারেন। প্রসন্নকুমার বিদ্যোৎসাহী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন চর্চ্চার জন্য তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়াছেন। তাহার ব্যাজ হইতে বৎসর বৎসর একজন অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রের ও মহম্মদি সরা প্রভৃতির বর্ত্তমান কালোপযোগী ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যান গ্রন্থাকারে পরিণত হয়। এই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এখন নানা কথা শুনা যায় বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা তাহার জন্য দায়ী নহেন।

প্রসন্নকুমার

প্রসন্নকুমার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মূলাজোড় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তৎসঙ্গে কালীমাতার মূর্ত্তিও স্থাপিতা। মন্দির ও চতুষ্পাঠী দর্শনীয়। বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ তথায় কাব্য, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি অধ্যাপনা করেন। দেবীসেবারও সুব্যবস্থা আছে। একাধারে বিদ্যা ও ধর্ম্ম চর্চ্চার কারণ প্রসন্নকুমার যথেষ্ট সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন।

মূলাজোড়ে কীর্ত্তি

যতীন্দ্র মোহন মূলাজোড়ের কালী দর্শনোপলক্ষে রামকে আর দুই এক দিন ধরিয়া রাখিতে প্রয়াসী। কলিকাতা হইতে মূলাজোড় পর্য্যন্ত গঙ্গাবক্ষে যাতায়াত মনোরম। তজ্জন্য একখানি ছোট জাহাজ ভাড়া লওয়া হইল। পথে জলযোগের ও মূলাজোড়ে প্রসাদের বিশিষ্ট আয়োজন হইয়াছে। রামের জন্য কারণ ও সম্বিদাদির অভাব নাই। সপরিবার যতীন্দ্র মোহন সানুচর রামকে লইয়া ভাগীরথী বক্ষে বাষ্পপোতে মরালের ন্যায় চলিয়াছেন। দুইপার্শ্বে নগরে ও উপনগরে কতশত হর্ম্ম্য ও দেবায়তন শোভা পাইতেছে। পাওয়া বড়ই হৃষ্ট। এরূপ সুযোগ কখনও তাঁহাদের অনেকের অদৃষ্টে ঘটে নাই। মহারাজও রামকে

জলপথে যাত্রা

পাইয়া আনন্দিত। বাম সদানন্দ। কারণানন্দও করিতেছেন। ক্রমে সকলে মূলাজোড়ে পৌছিলেন।

কালীবাড়ী

কালীবাড়ীতে ধূমধাম। আজ দেবীর রাজভোগ। চতুষ্পাঠীতেও আনন্দ। ছাত্রগণের অনধ্যায়। অধ্যাপকগণেরও বামদর্শন কৌতূহল। তাঁহারা শুনিয়াছেন যে বামাক্ষ্যাপা একপ্রকার নিরক্ষর, কিন্তু সিদ্ধপুরুষ। শ্রীচৈতন্যকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রথম যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বামকে সেই চক্ষেই দেখিতেছেন। কেহ কেহ বা শ্রদ্ধান্বিত।

বামের অপেক্ষায় পূজা হয় নাই। মন্দিরে আসন, পুষ্প, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপাদি ষোড়শোপচার আছে। বাম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বারে বসিয়া পড়িলেন। পুরোহিত ঠাকুর জানাইলেন যে তাঁহার জন্যই এই পূজার আয়োজন। সম্মুখে বৃহৎ কোশা, গঙ্গাজলে ভরা। বাম তাহা দুই হাতে উঠাইয়া গঙ্গাজল প্রায় শেষ করিলেন। কোন কোন অধ্যাপক এই নূতন আচমনে হাসিতেছেন। মনে করিতেছেন বাম তন্ত্রানভিজ্ঞ, আচমনাদির বিধি বিদিত নহেন। জলপান করিয়াই বাম নির্নিমেষ নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিলেন। চক্ষু স্বভাবতঃ প্রেমরাগে রঞ্জিত, তাহার উপর কারণ করিয়াছেন। পাষাণ প্রতিমা তাঁহার নয়নে সজীব জননী।

প্রতিমা দর্শনে

মার মূর্ত্তি-দর্শনে প্রভুর ভক্তিগঙ্গা উদ্বেলিত, নয়ন ধারায় তাহা বক্ষ ভাসাইয়া ঝরিতেছে। ক্ষণেক পরে শ্রীমুখ হইতে "মা" "মা" নাদ বহির্গত হইল। সমস্ত মন্দির কাঁপিয়া গেল। "মা" "মা" রবের গভীর প্রতিধ্বনি উঠিল। নাদসিদ্ধের হৃদয়ের নাদে সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয়তন্ত্রী বাজিল। স্বতঃ সমস্বরে সকলেই 'মা' 'মা' বলিয়া উঠিলেন। সমস্ত মন্দিরবাটী মুখরিত। দর্শকবৃন্দ ভক্তিরসে আপ্লুত। তাঁহাদের শরীর পুলকে পূরিত। অধ্যাপকগণের পাণ্ডিত্যাভিমান তিরোহিত। বামের বাহ্য পূজা নাই। সুতরাং নৈবেদ্যাদি কোন বহিরুপচার লাগিল না।

মা মা রব

তাঁহার পূজা তন্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে :—

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনশ্চার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ॥

তেনোদকেনাচমনং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রংস্যাৎগন্ধতত্ত্বেন গন্ধকম্ ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপংপ্রাণং প্রকল্পয়েৎ।
দীপার্থং তৈজসং তত্ত্বং নৈবেদ্যার্থং সুধাম্বুধিম্ ॥
যোগময়ী পূজা — অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা শব্দতত্ত্বেন গীতকম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি কামাদিং বলিমাহরেৎ।
এবং যোগময়ী পূজা বায়ুতত্ত্বেন চামরম্ ॥

সাধক স্বীয় হৃৎপদ্মকেই ইষ্টদেবতার আসনরূপে এবং সহস্রার হইতে চ্যুত অমৃতধারাই শ্রীচরণ যুগলে পাদ্যরূপে অর্পণ করিবেন। তিনি মনস্তত্ত্বকে অর্ঘ্যরূপে কল্পনা করিবেন। সহস্রারামৃতোদক দ্বারা আচমনীয় ও স্নানীয় দিবেন। আকাশতত্ত্বই বস্ত্ররূপে, গন্ধতত্ত্ব গন্ধদ্রব্যরূপে, চিত্তই পুষ্পরূপে ; প্রাণ ধূপরূপে কল্পনীয়। তেজস্তত্ত্বই দীপ, সুধাম্বুধিই নৈবেদ্য, অনাহত ধ্বনিই ঘণ্টা, শব্দতত্ত্বই গীত, ইন্দ্রিয়চেষ্টাই নৃত্য, কামাদিই বলিরূপে আহরণীয়। ইহাই যোগময়ী পূজা। ইহাতে বায়ুতত্ত্বই চামর। ঐরূপ পূজা সমাপনান্তে শ্রীরাম মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে জনতা। কত লোক পদধূলি লইবার প্রয়াসী। কিন্তু পাণ্ডারা রামের পদস্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছেন, সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু কিছু বলিতেছেন না। ত্বরিতানন্দাদি চলিতেছে। কথোপকথন না করিলেও রাম সকলের হৃদয়ে স্বীয় আনন্দভাব আধারভেদে অল্পবিস্তর মাত্রায় দিয়াছেন। সকলেই বিশুদ্ধানন্দ ভোগ করিতেছেন। পুরোহিত মহাশয় বাহ্য পূজা সারিলেন। নিত্যই তিনি মাকে ষোড়শোপচারে পূজা করেন। কিন্তু সে পূজায় তাঁহার প্রাণ-মনঃ পড়ে না। আজ রাম কি গুণ করিয়াছেন। পুরোহিতের হৃদয় ভক্তি গদগদ। প্রাণের আবেগে তিনি পূজা করিলেন। পূজা যে প্রাণহীন ব্যাপার নহে বুঝিলেন। ভোগ সরিল।

আনন্দময়ী

বাহ্যপূজা

প্রসাদ প্রার্থী বহু। সকলের পাতা হইল। রামকে পৃথক্ স্থানে বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাম তাহা বুঝিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে সকলের সঙ্গেই বসিলেন। রাজভোগ রামের সম্মুখে উপস্থাপিত হইল। তারাপীঠে তারামার ভোগ নহে। রাম দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজার মা বড় মা, বড় লোক।" পাণ্ডারা বলিলেন

"হাঁ বাবা।" রাম আপামর সাধারণের সহিত প্রসাদ পাইলেন। পাওয়া তাঁহার জন্ম তথায় বসিতে বাধ্য হইলেন। অধ্যাপকগণ শাস্ত্রেই পড়িয়াছিলেন নির্ব্বিকার পুরুষ, এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিলেন নির্ব্বিকার মহাপুরুষ কিরূপ। নিখিল সমবেত জনতাই তাঁহার ক্ষণিক সঙ্গে ভক্তি-মাধুর্য্য অনুভব করিল। মূলাজোড় হইতে অপরাহ্নে রামকে লইয়া কলিকাতার দল ফিরিল। মহারাজার ইচ্ছা রামকে আরও দুই একদিন রাখেন। কিন্তু রামকে রাখিবার আর উপায় নাই। তাঁহাকে চিড়িয়াখানা ও মিউজিয়ম দেখাইব বলা চলে না। রামও আর থাকিতে চান না। তাঁহার কলিকাতার লীলা শেষ হইয়াছে। সুতরাং তৎপরদিনই রামের প্রস্থান ঘটিল। মহারাজা পাণ্ডাদের বিদায় করিলেন। রামকেও সম্মান দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা বড়। তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই। রামের কোন আশা নাই। তিনি মহানন্দে নিজাধিকারে ফিরিলেন।

১১। ভক্তজীবন

ক্ষণমপি সেবিতো বিভুরদাৎ কুলস্থিতৌ নন্দনম্।
তমমরনাথ নামামিষতোঽমরশ্রিয়া রঞ্জয়ন্॥
অভয়পদাশ্রয়েণ চ শিশুং তত্তার মারীভয়াৎ।
ত্রিজগতি ভক্তজীবনধনো নকোঽপি রামং বিনা॥

ক্ষণমাত্র সেবিত হইয়াও সেই বিভু ভক্তের বংশরক্ষা কারণ আনন্দবর্দ্ধক পুত্র দিয়া সেই শিশুর অমরনাথ নাম রাখিয়া অমরগণের ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করতঃ অভয়পদাশ্রয় দানে তাঁহাকে মহামারী ভয় হইতেও উদ্ধার করেন। ত্রিজগতে রাম ব্যতীত আর কে ভক্ত-জীবন-ধন আছে?

শ্রীরামের দয়া অপার। সংসারীর জন্ম কত ক্লেশই স্বীকার করিতেন। তাহাদের প্রারব্ধ কর্মস্রোতঃ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেন। সেইরূপ বরের ফলে চম্পা নগরের তারক নাথ মহাশয়ের বংশধর পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের কল্যাণ কামনায় রাম একরূপ জাগরূক ছিলেন। তিনি তাহার নাম রাখেন অমরনাথ।

তারাপীঠ-বাসিনী ক্ষীরোদা দেবী বামা বলিয়া পাঠান যেন পুত্রের কল্যাণে নিত্য তারামাকে মানৎ দেওয়া হয়। তদবধি তারক নিত্য মানৎ দিবার জন্য স্বীয় পাণ্ডা নবীনকে বার্ষিক বৃত্তি পাঠাইতেন। ক্ষীরোদা দেবী আরও বামের আদেশ বলিয়া আসেন, যেন পুত্রটীকে পঞ্চম বর্ষ হইলে তারাপীঠে আনা হয়।

বামের কৃপা

তারক সুখী ধনী সন্তান। তারাপীঠে তিনি আসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই জন্যই বোধ হয় ১৩০৮ সালে ভাগলপুরে প্লেগের ভয় দিয়া সপুত্র তারককে তথা হইতে সিউড়িতে লইয়া আসেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ভক্তি-পরায়ণা। তিনি চম্পা নগর হইতে বরাবর তারাপীঠে আসিয়া বামের চরণ দর্শন করতঃ সিউড়িতে ফিরিলেন। তারকনাথ মাকে ও পুত্রকে লইয়া তারাপীঠে আষাঢ় মাসের প্রারম্ভেই আসিলেন। তারাপীঠের ইতিহাস বহুদিন হইতে শুনিয়াছিলেন। কল্পনা নেত্রে তারাপীঠের একটা ছবি দেখিতেন। অদ্য চর্ম্মচক্ষে তারামার মন্দির, ভীষণ শ্মশান এবং শ্মশানেশ্বর শ্রীবামকে স্বীয় রাজ্যে দেখিয়া তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিল। শ্রীবামের চরণে পিতা, পুত্র ও পিতামহী ভক্তিভরে লুটাইয়া আনন্দ পাইলেন। ক্ষীরোদা দেবীর যাত্রী বলিয়া নবীন তাঁহার পাণ্ডা হইলেন। তারামার পূজা প্রভৃতি ঘটার সহিতই হইল। পাণ্ডা ঠাকুরের প্রণামী মন্দ হইল না। ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হইল।

তারাপীঠে তারক

অপরাহ্নে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন। পাকা ভোজ, লুচি তরকারী মিষ্টান্নাদি। অভিমান বশতঃ ব্রাহ্মণগণ তারামার আঙ্গিনায় ভোজনে বসেন না। মন্দিরের পীঁড়ি প্রভৃতি উচ্চ স্থানে বসিয়াছেন। বামকে আশ্রম হইতে আনিবার জন্য বারবার লোক যাইতেছে। বাম পাঁচ ছয়টী কুক্কুর সঙ্গে শেষে মন্দির বাটীতে আসিলেন। রাজপথ হইতে বার পাইটী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মন্দির বাটীর দ্বার পার হইয়াই দক্ষিণধারে আঙ্গিনায় বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার জন্য উচ্চস্থানে বরাসন হইয়াছে। যেখানে ইতর জাতি আছে, বাম সেইখানে বসিলেন। তিনিই তো শঙ্করাচার্য্যকে জ্ঞান দিবার জন্য কাশীতে চণ্ডাল রূপে দেখা দেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণবর্গের জ্ঞানোদয় হইল না। তারকনাথ বামের ভাবে বিমুগ্ধ। শিষ্টাচার দেখাইয়া তাঁহাকে বরাসনে আনিবার বাণী সরিল না। বামকে

ভোজ

সেইখানেই পাতা করিয়া আহার দেওয়া হইল। তুষ্টা, শ্বেত, ফুল, কালু, ভুলু প্রভৃতি কুকুর সহ রাম আনন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে আপন মনে ভোজন করিতে লাগিলেন। তারকনাথ পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

অর্দ্ধ ভোজন হইতে না হইতে আকাশে ঘনমসী ছড়াইয়া পড়িল। মেঘে সূর্য্যদেব আবৃত হইল, বৃষ্টি পড় পড়ে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হৈ চৈ উঠিল—"শীঘ্র আন শীঘ্র আন।" ঝড় উঠিল। পরিবেশকগণ

বৃষ্টি স্তম্ভন

ত্বরান্বিত হইলেন। রামের ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি তাঁহার সাথীদের লইয়া কতই খেলা করিতেছেন। ইহার মুখে লুচির টুকরা, উহার মুখে মাংস ইত্যাদি প্রসাদ দিতেছেন ও তাহাদের প্রসাদ পাইতেছেন; তারকনাথের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। বৃষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড না হয়। তিনি কাতরে রামকে মনে মনে জানাইলেন,—"লজ্জা নিবারণ! নিজ মাতৃশ্রাদ্ধে যেমন মহোদধের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে আমারও সেইরূপ লজ্জা নিবারণ কর।" তারক রামের মাথার উপর ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইলেন। বাবা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। বৃষ্টি পাড়ল না। এক ঘণ্টার উপর আকাশ ভ্রুকুটী মাত্র করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির ভোজন সমাধা হইলে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারকনাথ ক্ষীরোদার মুখে রামের মাতৃশ্রাদ্ধের উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন, আজ চক্ষে তাহা দেখিলেন।

পরদিন মহাশয়জীর মাতাঠাকুরাণী রামকে পারমার্থিক কথা জিজ্ঞাসা করেন। রামদেব তাঁহাকে সাধ্য ও সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তারকের মাতা কাশী মৃত্যু বর চান। রাম তাহাই দিলেন। ভক্তিমতী বৃদ্ধা কয়েক বৎসর পরে কাশীতে উত্তরায়ণে দেহ রক্ষা করেন।

১২। আশুতোষ

ব্যাধেরসাধ্যাদপি মৃত্যুবক্ত্রাৎ ত্রাতা শরণ্যশ্চ সুখপ্রসাদ্যঃ।
মনুষ্যভাবেঽপি জহৌনরাম স্বামাশুতোষত্বং প্রকৃতিং স্বকীয়াম্॥

অসাধ্য ব্যাধি হইতে এমন কি মৃত্যুর করাল কবল হইতে ত্রাণকারী শরণাগতবৎসল সুখে প্রসাদনীয় রাম মনুষ্যজন্মেও স্বীয় আশুতোষ স্বভাব ত্যাগ করেন নাই।

আশুতোষ

দেবগণের মধ্যে শ্রীরাম জীব কল্যাণে সতত জাগরূক। সমুদ্রমন্থনে ঘোর হলাহল বিষ জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে তিনি সেই কালকূটও জগতের হিতার্থ পান করেন। তিনি মহা কারুণিক ও আশুতোষ। তিনি সকলের শরণ্য, তাঁহার শরণ্য কেহ নাই। উৎকট তপস্যা ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রভৃতি পাইলে তবে প্রসন্ন হইবেন, এরূপ নহে। এক বিল্বদলেই 'বরং বৃণু' বলেন। শ্রীমদ্ভাগবদাদি পুরাণে বর্ণিত আছে যে বকাসুরকে বর দিয়া তিনি স্বয়ং বিপন্ন হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আশুতোষ স্বভাব যায় নাই। শাস্ত্রের এই আদর্শ ছবি নররূপী রামেও ছিল। তিনি স্বয়ং 'যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্ট' শ্মশানবাসী। জীবগণের মঙ্গলই তাঁহার অনুধ্যেয়। তাহাদের ইহামুত্র কল্যাণ বিধান করিতে তাহাদের নিকট কিছুই চাহিতেন না। অনেক সময় অযাচিত ভাবেও কৃপা করিতেন। তিনি আশুতোষ কিনা একটী কাহিনী হইতে প্রকাশ পাইবে। সন ১৩৩৮ সালে আষাঢ় মাসে রামের তিরোভাব মহোৎসবে আমরা কলিকাতা হইতে তারাপীঠে যাইতেছি। তদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য রামপুরহাট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া দ্বারকা নদী পার হইয়াছি। দ্বারকার পূর্ব্বতীরে সরলপুর গ্রামের পাড়া। সেখানে কয়েক ঘর লেট প্রভৃতি জাতীয় লোকগণের বাস। মোট বহিবার জন্য তাহাদের আবাহন হইয়াছে। ১০।১২ জনের মাথায় মোট দিয়া আমরা কয়েকজন চলিতেছি। আমার সঙ্গে একটী পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক মোট লইয়া যাইতেছে। পুরুষকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওরে বাবা! জানিস কেন তারাপীঠে এ সব মোট যাচ্ছে?" সে বলিল, হাঁ গো, রামের মোচ্ছব।" "রামের মোচ্ছব কেন? জিজ্ঞাসায় বলিল, "রামের কাছে অনেক লোক

আসতো; তাঁর মরবার পর তারা মোচ্ছব করে।” “রামের কাছে কেন অনেক লোক আসতো রে?” প্রশ্নে উত্তর পাইলাম, “সে যে সাধু ছিল বাবু।” কথোপকথন জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ঐ স্ত্রীলোক কে?” সে বলিল, “আমার স্ত্রী।” আমার চক্ষে উভয়ের বয়সের পার্থক্য বেশী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, “ও কি তোর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী?” সে বলিল, “না গো, আমার বয়সও কম, রোগে রোগে আমি বুড়িয়ে গে’ছি। আমার মহাব্যাধি হয়েছিল।” তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিসে গেল?” সে কহিল, “ক্যাপার দয়ায়।” কি ব্যাপার খুলিয়া বলিতে বলায় শুনিলাম ঐ ব্যক্তির মহাব্যাধি অর্থাৎ গলিত কুষ্ঠ হয়। অবস্থানুসারে চিকিৎসা করিয়া যখন অসাধ্য ব্যাধি গেল না তখন জীবনে হতাশ হইয়া “বলং বলং দৈববলং” ভাবিয়া রোগী রামের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। রাম বুঝিতে পারিলেন। একদিন সে যখন বাটী ফিরিয়া আসিতেছে রাম তাহাকে বলেন “ওরে! পথের ধারে শ্মশানে একখানা হাড় আছে, তাহা সরিয়ে দিয়ে যাস।” ভক্তিভরে আর্ত্ত তাই করিতে গিয়া কাঁচা হাড়ের ভয়ানক দুর্গন্ধ পায়। অন্নপ্রাশনের অন্নও সে গন্ধে উঠিয়া আসিবার উদ্যোগ করে। তথাপি প্রাণের দায়ে সে নাকে কাপড় দিয়া সে হাড়খানি সরাইয়া দিল। সেই দিন হইতেই ব্যাধি কমিতে আরম্ভ হইল। মাস খানেকের মধ্যে সে নির্ব্যাধি হইল। প্রাণ পাইল।

উপহাসচ্ছলে তাহাকে বলিলাম, “তুই বাবা! রামের কৃপায় প্রাণ পেয়েছিস্ তবে এ রামের মোচ্ছবের মোট বহিতে তুই কিছু নিবি না তো? সে সরল প্রকৃতি, তাহার মনে হইল বোধ হয় বাবুরা দাম দেবে না। ভয়ে ভয়ে বলিল—“বাবু! তা কি হয়, আমি যে রামকে খুসি করেছি।” “কি করে কল্লে?” বলায় সে উত্তর দিল, “কেন এক পয়সার গাঁজা একদিন দিয়েছি। তিনি খুব আহ্লাদ করে তা নিয়েছেন।” তখন ভাবিলাম, “রাম! তুমি যথার্থই আশুতোষ।” চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

১৩। কর্ণধার

যস্যাঙ্ঘ্রিপোতেন ভবাম্বুধিং তরন্
শ্রেয়ো মুমুক্ষুস্ত বিপত্তরঙ্গিণম্।
তীর্ণোমহেন্দ্রঃ শ্রিয়মাপ্নুতে শুভাং
তং কর্ণধারং নরবামমাশ্রয়ে॥

যাঁহার শ্রীচরণতরী সংযোগে মুমুক্ষু জীব ভবসাগর পার হইয়া শ্রেয়ঃ বা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হন, পক্ষান্তরে মহেন্দ্র বিপদ্রূপ নদীমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া শুভা শ্রী প্রাপ্ত হন, সেই নৃমূর্ত্তি শিব কর্ণধারকে শরণ লইতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের প্রিয় মেধাবী শিষ্য। গুরু তাঁহাকে যজুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করান। যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যাভিমানে অহঙ্কৃত হইয়া সতীর্থগণকে

যাজ্ঞবল্ক্য

অবহেলা করিলে গুরু তাঁহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। গুরুশাপে শিষ্য গুরুদত্ত বিদ্যা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীতে লাঞ্ছিত হন। 'সূর্য্যদেব ত্রয়ীময়' বোধে তিনি তখন সূর্য্যের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাত্মা জ্যোতির্ম্ময় দেব তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া নূতন যজুর্মন্ত্র প্রদানে যাজ্ঞবল্ক্যকে কৃতার্থ করেন। সেই মন্ত্ররাশি শুক্লযজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়ী নামে প্রচারিত হইল। তাহার শেষাংশ ঈশোপনিষৎ। তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।

এ যুগেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্বে বঙ্গদেশে নেহালচাঁদ বৈরাগী নামক জনৈক সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার যশঃ সৌরভে নানা ভক্ত ও শিষ্য জুটে। তন্মধ্যে রাইমোহন বৈরাগী মোক্ষ-

রাইমোহন

পথের পথিক। সাধনপথ অতি সঙ্কট ও কণ্টকাকীর্ণ। গুরুভক্ত হইলেও গুরু তাঁহাকে কঠিন পরীক্ষা করেন। সামান্ত অপরাধে তাঁহার সাধনপথে কণ্টক দিয়া গুরু দেহরক্ষা করিলেন। শ্রীগুরুর অন্তর্ধানে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার উপায় রহিল না। তখন রাইমোহন উন্মত্তবৎ নানাস্থানে মহাপুরুষ অনুসন্ধানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। শেষে তারাপীঠে শ্রীবামের শরণাপন্ন হন। আশুতোষ বাম তাঁহাকে সহজে কৃপা করিলেন। কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া তাঁহাকে গুরুশাপ

হইতে মুক্ত করতঃ সাধনের উচ্চস্তরে লইয়া যান। রাইমোহনের প্রাণে শান্তি আসে। তাঁহার চক্ষুরুন্মীলিত হইলে তাঁহার ত্রিকালদর্শিতাদি বিভূতি বিকশিত হয়। ক্রমে তিনি শ্রীরামের চরণতরী ধরিয়া ভবসাগরোত্তরণের অধিকারী হইলেন।

শ্রীরামের কৃপা লাভের পর রাইমোহন কেঁদুলিতে দিন কতক থাকেন। শিউড়ির মহেন্দ্রনারায়ণ রুজ নামক মোদক তাঁহার দর্শন পাইয়া আকৃষ্ট হন। মহেন্দ্রের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া রাইমোহন মহেন্দ্রের বাটীতে আসেন ও কিছুকাল অবস্থিতি করেন। মহেন্দ্র সামান্য বাংলা জানিতেন ও শিউড়িতে জাতিব্যবসা করিতেন। তাহাতে উন্নতিলাভ করিয়া তিনি বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। অর্থ অনর্থের মূল। কুলোকের চক্রান্তে মহেন্দ্র দলিল জালকরণ অভিযোগে দায়রা সোর্পদ্দ হইলেন। রাইমোহন বাবাজী তাঁহাকে তারাপীঠ-ভৈরবের শরণ লইতে উপদেশ দেন। কাতর প্রাণে মহেন্দ্র রামের শরণ লইলেন। অন্তর্য্যামী রাম তাঁহাকে নিরপরাধ জানিয়া অভয় দিলেন। মহেন্দ্র ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। রাইমোহন অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এখন রাম মহেন্দ্রের একমাত্র আশ্রয় হইলেন। শত্রুভয়ে মহেন্দ্র সিউড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাসের অভিলাষী হন। রামই তাঁহার সহায় সম্বল জানিয়া তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তকে সামীপ্যাধিকার দিবার জন্য বলিলেন, "রামপুরহাটে 'জয়তারা' নামে দোকান খুল।" মহেন্দ্র সত্বর দেওয়ানি কাছারির সম্মুখে ময়রার দোকান খুলিলেন। দিন দিন ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে লাগিল। অচিরে মহেন্দ্র ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিলেন। মহেন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নহেন। তাঁহার ধারণা রামের কৃপায় তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শ্রীরামের প্রতি ভক্তিভাবও বর্দ্ধিত হয়। তিনি রামকে প্রথম প্রথম 'প্রভু' বলিয়া ডাকিতেন। পরে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে তাঁহাকে 'বাবা' বলিতেন। বীতরাগী রামও তাঁহাকে পুত্রবৎ দেখিতেন। ক্বচিৎ রামপুরহাটে শ্রীরামের শুভাগমন হইলে তিনি মহেন্দ্রের বাসায় স্বতঃই আসিতেন। মহেন্দ্রে নিজ বাটীতেও শ্রীরামকে সেবা করিয়াছেন। এবং তিনবার তিনি তাঁহার তিনখানি ফটো তুলিয়া লন। রামের ভক্তরাও মহেন্দ্রের কাছে সুপরিচিত ও আদরের

মহেন্দ্র বিপন্ন

পাত্র। এমন কি রামের কুকুর নিত্যসঙ্গী কালু ভুলু প্রভৃতিও মহেন্দ্রের বাটী চিনিত এবং মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের আদর পাইবার জন্য রামপুরহাটে ছুটিয়া আসিত। যতদিন শ্রীরাম স্থূলদেহে ছিলেন মহেন্দ্রের পুত্রপরিবার ও শ্রী অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীরামের দেহরক্ষার পর মহেন্দ্রের একমাত্র পুত্র চলিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের ধারণা শত্রুপক্ষ তাহাকে বাণ মারিয়া নষ্ট করিয়াছে। তাঁহার দৌহিত্রাদি বর্ত্তমান। তিনি দীর্ঘজীবী। ঐহিক স্বার্থের জন্য তিনি রামকে ভজনা করেন। কল্পতরু রাম তাঁহার ঐ বাসনা পূর্ণ করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহেন্দ্রের প্রাণে ভক্তিভাবও জাগ্রত করেন। শ্রীরামের দেহ রক্ষার পর তাঁহার সারমেয় ছলছল নেত্রে আসিয়া রামপুরহাটে মহেন্দ্রের নিকট থামে। তাহাতে মহেন্দ্র উদ্বিগ্ন হন। অচিরে তিনি দুঃসংবাদ শুনিয়া তারাপীঠে ছুটিলেন। পিতার বিরহে পুত্রের ন্যায় তিনি কাঁদিয়া আকুল হন। রামের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণে তিনি কায়িক পরিশ্রম করেন। শ্রীরামের বার্ষিক মহোৎসবে তিনি যথাসাধ্য মিষ্টান্নাদি দিয়া সাহায্য করিতেন। শ্রীরামের চিত্র বাটীতে স্থাপন করিয়া নিজ প্রভুর পূজায় তিনি শ্রদ্ধাভক্তির আস্বাদন লন। তৎফলে পুত্রশোকাদিতে তিনি কাতর হন নাই বা পুত্রপৌত্রাদিতে তাদৃশ আসক্ত হন নাই।

১৪। কল্পবৃক্ষ

আর্ত্তাণামশ্রুধারাং সদয়াপমৃজন্নর্থিনামর্থদাতা।
ভাবার্দ্রেজ্ঞানবীজং ক্বচিদপি বিকিরন্ বর্দ্ধয়ন্ তত্ত্বভাসাং॥
জিজ্ঞাসূনাং তদস্তস্তদমৃতফলমাস্বাদয়ন্ জ্ঞানিনশ্চ।
শ্রীরামো ভুক্তিমুক্তিপ্রসবনিরুপমো জঙ্গমঃ কল্পবৃক্ষঃ॥

আর্ত্তগণের অশ্রুধারা সদয় ভাবে মুছাইয়া, অর্থিগণের সদর্থ পূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে কোন ভক্তিভাবসিক্ত হৃদয়ে জ্ঞানবীজ বপন করতঃ জিজ্ঞাসুগণের হৃদয়ে সেই বীজ বর্দ্ধিত করিয়া এবং জ্ঞানীগণকে সেই বীজের অমৃতময় ফল আস্বাদন করাইয়া ভোগমোক্ষস্বরূপ ফলদাতা অতুলনীয় রাম সচল কল্পবৃক্ষ।

গীতামতে ভক্ত চতুর্ব্বিধ,—(১) আর্ত্ত অর্থাৎ রোগশোকাদি পীড়িত,

(২) অর্থী অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রয়োজনাপেক্ষী, (৩) জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জ্ঞানপিপাসু এবং (৪) যোগী। তাঁহারা সকলেই ভগবানের অনুগৃহীত। ভগবন্মূর্ত্তি শ্রীবামও আর্ত্তের আর্ত্তিহর, অর্থীর অর্থদাতা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানবিকাশক ও জ্ঞানীর মোক্ষদাতা। ভাবুক, আর্ত্ত ও অর্থীর হৃদয়েও তিনি জ্ঞানবীজ বপন করেন। কল্পশ্রুত কল্পবৃক্ষ কেবল ভোগই দেয়। বামরূপ কল্পবৃক্ষ, ভোগ ও মোক্ষ উভয়বিধ ফল দিয়া থাকেন।

বামের নিকট সহস্র সহস্র ব্যক্তি সহস্র সহস্র বাসনা লইয়া গিয়াছেন। অধিকাংশই আর্ত্ত ও অর্থার্থী। সকলেই অল্প বিস্তর সফলকাম হইয়াছেন। নিরভিমান নরদেব নিজে তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন—একথা বলিতেন না। "শিমূলতলার মাটী লইয়া যাও", "তারামাকে জানাও" ইত্যাদি বলিতেন। তারামার কৃপায় বা ক্ষেত্র-গুণে ভাবসিদ্ধি, আর্ত্তের আর্ত্তি-হরণ ও অর্থার্থীর অর্থ ঘটিল, ইহা জানাইতেন। তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের প্রাণে ভক্তি-ভাবও জাগাইয়া পরম কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিতেন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁহার আদরের পাত্র ছিল। জ্ঞানী ছিল তাঁহার প্রিয়তম। মধ্য ও অন্ত্য লহরীর সমস্ত উপাখ্যানই এ বিষয়ে প্রমাণ। তদতিরিক্ত আরও কয়েকটী উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে।

হাওড়া ব্যাঁটরায় শ্রীপ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাওড়ায় Burn Coর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হিসাব নিকাশের তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া বিপন্ন হন। হাওড়া আদালতে কলিকাতা হইতে বড় Counsel লইয়া যান। দৈবশক্তি আশ্রয় জন্যও স্বীয়পুত্র মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে বামের কৃপা প্রার্থনায় পাঠান। মন্মথনাথ তারাপীঠে ছুটিলেন। প্রসন্নের প্রতি বাম প্রসন্ন ভাব দেখাইলেন। মোকর্দ্দমা মিটিয়া গেল। প্রসন্নের সম্মান রক্ষা হইল। মন্মথ বামের ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ভক্তি ভাবের উদ্রেক হইল। শ্রীবামকে হৃদয়াসনে বসাইয়া আজীবন ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন।

কলিকাতা বি. কে. পাল এভিনিউ নিবাসী প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোকর্দ্দমার বিপাকে পড়িয়া বৃষ্টি বর্ষা উপেক্ষা করিয়া তারাপীঠ গিয়া শ্রীবামের শরণাপন্ন হন। প্রথম দুই এক দিন বাম তাঁহার প্রতি উদাসীন

ভাব দেখান। তিনি মনে মনে প্রভুকে কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে বর্ষা কাটিলে আকাশ পরিষ্কার হইল। শ্রীবাম তাঁহাকে বলিলেন "এখন কি দেখিতেছ? যাও, মেঘ কাটিয়াছে।" তিনি ফিরিয়া আসিলেন। অল্প দিনেই বহুদিনের জটিল মোকর্দ্দমায় তাঁহার জয়লাভ হইল। তদবধি তিনি দেবতাজ্ঞানে অনন্যমনে শ্রীবামকে পূজা করেন। এই ঘটনাটী তিনি কলিকাতায় শ্রীবামের এক জন্মোৎসবে বর্ণনা করেন।

রামপুরহাটের প্রধান উকিল শ্রীঅনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সজ্জন ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি। মোকর্দ্দমায় তিনি কখনও অন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতেন না। অনন্তবাবু রামপুরহাটে হিন্দুদিগের মধ্যে সততাদি গুণের কথঞ্চিৎ অভাব বোধে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতেন। তাহাতে তাঁহার স্বধর্ম্মিগণ তাঁহাকে গুপ্ত ব্রাহ্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার কন্যার বিবাহ কালে ঐ ব্যাপার লইয়া একটা গণ্ডগোল হইবার উপক্রম হয়। স্থানীয় শ্রীশ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় সহযোগে ভ্রম সংশোধন ঘটাইলে সহজেই সে গোল মিটিয়া যায়। শেষ বয়সে সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিবার ঔৎসুক্য অনন্তবাবুর আসে। বামকে তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। তিনি যশঃ ও অর্থ সাধনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বামকে আনিতে তাঁহার মহুরী শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারাপীঠে পাঠাইলেন। অনন্তের জ্ঞান-পিপাসা যথার্থ জানিয়া বাম অনন্তবাবুর বাটীতে আসেন এবং একদিন অহোরাত্র তাঁহার সেবা লন। অনন্তবাবুর অবস্থা ভালই, তাঁহার বসত বাটীর অন্দর মহল পাকা দ্বিতল ও সদর মহল কতক কাঁচা, কতক পাকা; সদরে একটি সুন্দর কূপ আছে। বাম ঐ কূপের নাম 'চন্দ্র কুণ্ড' দেন। সনাতন ধর্ম্মের রহস্য অতি সরল কথায় তাঁহাকে গোপনে বুঝাইয়া দেন এবং নিজ প্রিয় শিষ্য রসিকচন্দ্রকে প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার বাটীতে রাখিয়া দেন। অনন্তবাবু ও তৎপত্নী এবং পুত্রগণ রসিক দাদাকে সাদরে তাঁহাদের গৃহে রাখেন। স্বনামধন্য বাগ্মী ও স্বদেশহিতৈষী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্তবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি তারা খ্যাপার প্রিয় ভক্ত। তাঁহাদের বাটীতে পরে তারা দাদার অবাধ গতায়াত হয়।

শীতলচন্দ্র নামক জনৈক দারোগার সহসা নির্ব্বেদ উদয় হয়। তিনি

বামের নিকট দীক্ষার জন্য ছুটিয়া আসেন। বাম তাঁহাকে দীক্ষা দিতে নারাজ। তিনিও বামের শ্রীপদ ছাড়িবেন না। বাম তাঁহাকে কঠোর পরীক্ষা করিলেন। যে কারণ-যন্ত্র তিনি বামকে উপহার দিয়াছেন, বাম সবলে উহা দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলেন। ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। শীতল সহাস্য মুখে বলিতেছেন—"এ চরণ আমি ছাড়িব না।" সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। শেষে বাম তাঁহাকে দীক্ষা দেন।

মল্লারপুরের সারদা শুঁড়ি মধ্যে মধ্যে বামের নিকট যান। তাঁহার বৈরাগ্য উদিত। বাম তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। শুঁড়ি সারদাকে বাম কেন এত আদর করেন এই প্রশ্ন ব্রাহ্মণ ভক্ত সুবোধের মনে উঠিলে বাম শিক্ষা দিবার ছলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলকে—"বাবা! শুঁড়ি দেখবে?" বলিয়া সুবোধকে ও "বাবা! ব্রাহ্মণ দেখবে?" বলিয়া সারদা শুঁড়িকে দেখান। সারদা দাদাতে আমরা ব্রাহ্মণোচিত ভাব দেখিয়াছি। সারদাকে বাম কারণ প্রসাদ দিয়াছেন, সারদা তাহা লইয়াছে,—এই দৃশ্যে তারা ক্ষ্যাপা উগ্র হইয়া "তুই বেটা শুঁড়ি পাত্র ধরিতে জান না, বামের সহিত চক্রে বসিবার সাধ! এই বলিয়া ছুরি খুলিয়া সারদার ডান হাতে সবলে আঘাত করিলেন। রক্ত পড়িতে লাগিল। সারদা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। তারা ক্ষ্যাপার প্রতি বিরূপ জনৈক পাণ্ডা রামপুরহাটে সদরে এই রক্তপাতের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া জানাইলে দারোগা তদন্তে আসেন। সারদা এজাহারে তারা দাদার কোন দোষ দিলেন না। সারদা বামের কৃপায় মৌনাবলম্বন পাইয়াছিলেন।

নন্দ পাটনি গঙ্গাপুত্র—জাতিতে চণ্ডাল। তাহার গলিত কুষ্ঠ হয়। দুই হাতের ও পায়ের কতক কতক অঙ্গুলির অগ্রভাগ খসিয়া পড়ে। আর্তিতে বামের শরণাপন্ন হয়। বাম তাহার গলিত কুষ্ঠ নিরাকরণ করিলেন ও 'দেবদুর্লভ চরণ' দিলেন। তারা ক্ষ্যাপা বলেন নন্দকে বাম স্বীয় উত্তর-সাধকতার উচ্চ অধিকারও দেন।

হালিসহরের অতুলচন্দ্র শিব ভক্ত। তিনি সদ্গুরু লাভের জন্য কাতর হইলে দেবাদিদেব স্বপ্নে তাঁহাকে তারাপীঠে বামের নিকট যাইবার আদেশ দেন; অতুল দাদা ছুটিলেন। বাম সবই জানিয়াছেন। তিনি সহজেই

অতুল দাদাকে কোল দিলেন। তিনি দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এ জীবনে তিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সালিখা নিবাসী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হালদার, কপিল চন্দ্র গাঙ্গুলী, ননীলাল ঘোষ, ফণিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ও তিনকড়ি ঢোল একবার গুড ফ্রাইডের ছুটিতে শ্রীবাবার নিকট যান। তাঁহার শ্রীমুখে ভাব-প্রবণ ও সুর-তাল-লয়-যুক্ত অপার্থিব গান শুনিয়া এবং তাঁহার ভাব দেখিয়া বিমোহিত হন। তাঁহার গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাশ্রু দর দর ধারে বহিয়া পরিধেয় আলখেল্লা ভিজাইয়া প্রেম যমুনা বহাইয়া দিল। কি অপার আনন্দ তাঁহারা এই মহাপুরুষ সংস্পর্শে লাভ করেলেন তাহার বর্ণনা ভাষায় কুলায় না। যখন তাঁহারা বশিষ্ঠাসন শিমুলতলায় বসিয়া বাবার শ্রীমুখের গান শুনিয়া বিহ্বল হইয়া আছেন এমন সময় কোথা হইতে এক বিকট দুর্গন্ধ দম বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। "আর এখানে তিষ্টিতে পারিতেছি না।" এই কথা বাবাকে বলামাত্র সহসা তথায় এক স্বর্গীয় সৌরভ আসিয়া তাঁদের মনপ্রাণ বিমোহিত করিল। অতি উৎকৃষ্ট আতর এসেন্স প্রভৃতি সেই গন্ধের কাছে তুচ্ছ।

বারান্তরে দেখা গেল রামপুরহাট হইতে একজন ধনী ময়রা আসিয়াছে স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া। তিনি মায়ের নিকট বলিদান দেন। অবিনাশও দেন। অবিনাশের ইচ্ছা ছিল ঐ বলিদানের প্রসাদ বাবার ভোগ দিয়া সকলের মধ্যে বণ্টন হইবে। বাবাকে বলায় বাবারও ইচ্ছা তাই দেখা গেল। ময়রা তাতে রাজী নয়। রসুই হইল। পরে দেখা গেল ময়রার সমস্ত খাদ্য কোথায় উধাও। অবিনাশের খাদ্যাদিতে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইল। বাবা কিছু বলিলেন না, একটু হাসলেন।

শিমুলতলায় বাবার পূজা অদ্ভুত ব্যাপার। একদিন অবিনাশ বাবাকে ধরিয়া শিমুলতলায় লইয়া গেলেন। "বাবা পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে।" বাবা উত্তরে বলিলেন "আমি কি পূজা জানি রে।" অনেক করিয়া বলায়, বাবা "তারামার শিলা পাদপদ্মের সম্মুখে বসিলেন। হাতে ফুল চক্ষু আরক্তিম দর দর ধারায় বক্ষ প্লাবিত মন্ত্র "ওঁ তারা ওঁ তারা ওঁ তারায়ৈ বৌষট স্বাহা।" অপার্থিব ভাবের বন্যা ছুটিল। "জয় তারা রবে" মনে প্রাণে ভক্তির উৎস ছুটাইয়া দর্শক সকলে কাঁদিয়া আকুল হইল।

অবিনাশ বলিল, "বাবা নাস্তি বিনাশ, রক্ষ অবিনাশ।" বাবা সে ডাক বুঝিলেন। তাঁহাকে পায়ের কড়ি দিলেন।

সন্তান তরঙ্গ

১। যোগেশ্বর

যোগেশ্বরং ভিন্নত্রিসপ্তচক্রং কূটস্থিতং তন্ময়মিদ্ধবোধম্।
ছায়াবপুর্ব্যাপ্ত ত্রিসপ্তলোকং রামাভিধানং পুরুষং নমামি॥

যিনি যোগেশ্বর এবং স্থূলসূক্ষ্মপরভেদে ত্রিবিধ শরীরে ত্রিসপ্তগ্রন্থিভেদ করিয়াছেন যাঁহার পরিণামাদি ভাবান্তর নাই, যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মময়, যাঁহার চৈতন্য দেদীপ্যমান, যিনি নিজ প্রতিবিম্বে ত্রিসপ্তভুবন ব্যাপিয়া আছেন, সেই রাম নামক পুরুষকে প্রণাম করি।

সন্তানগণের সহিত লীলায় শ্রীরামের যোগৈশ্বর্য্য প্রকট। যোগ দ্বিবিধ—হঠযোগ ও রাজযোগ। হঠযোগই রাজযোগের সোপান স্বরূপ। হঠযোগের

হঠযোগ

উদ্দেশ্য শরীর সুস্থতা ও চিত্ত স্থৈর্য্য। চতুরশীতি প্রকার আসন বন্ধ ও নেতি ধৌতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীরকে নীরোগ, লঘু, দৃঢ় বাতাতপ ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বন্দ্ব-সহ করিয়া প্রাণায়ামে বায়ু স্তম্ভনে চিত্তচাঞ্চল্যাপহরণপূর্ব্বক মহামুদ্রাদি সাধনে কুণ্ডলীশক্তি জাগরণ হঠযোগের ফল। কুণ্ডলীশক্তি জাগ্রত হইলে অনিমাদি বিভূতি আসে। কিন্তু মুক্তি রাজযোগ সাধ্য। তাহার নামান্তর সমাধি, উন্মনীলয়, নিরালম্ব, নিরঞ্জন সহজা তুর্য্যা জীবন্মুক্তি।

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ।
তথাত্মমনসো চৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে॥
যদা সংক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে।
তদা সমরসত্বং চ সমাধিরভিধীয়তে॥
তৎ সমং চ দ্বয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
প্রণষ্টসর্ব্বসঙ্কল্পঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥

বিবিধৈরাসনৈঃ কুম্ভৈঃ বিচিত্রৈঃ করণৈঃ পরং।
প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণঃ শূন্যে প্রলীয়তে॥
উৎপন্নশক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে॥
সুষুম্নাবাহিনি প্রাণে শূন্যে বিশতি মানসে।
তদা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নির্ম্মূলয়তি যোগবিৎ॥

জলে সৈন্ধব লবণ মিলিত হইলে যেমন উভয়ে সমতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মন ও আত্মা মিলিত হইলে উভয়ের যে একরূপতা ঘটে তাহাকে সমাধি বলে। যখন প্রাণবায়ু ক্ষীণ এবং মনের লয় হয় তখন তাহাদের যে আত্মার সহিত সমরসত্ব অর্থাৎ একরূপতা হয় তাহাই সমাধি নামে অভিহিত। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব ও সমাধিপদবাচ্য। তখন সমস্ত সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হয়।

স্বস্তিকাদি নানা আসনবন্ধ, নানাবিধ কুম্ভক ও মহামুদ্রাদি বিচিত্র হঠসিদ্ধি করণ দ্বারা কুণ্ডলীশক্তি প্রবুদ্ধা হইলে শূন্যে প্রাণের লয় হয়। যে যোগীর কুণ্ডলীশক্তি জাগিয়াছে, যিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করিতে পারিয়াছেন তাঁহারই সহজাবস্থা জন্মে। যখন প্রাণবায়ু কেবল সুষুম্না নাড়ীতে বহিতে থাকে এবং মন শূন্যে লীন হয় তখন যোগী সমস্ত কর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত প্রাণ সর্ব্বনাড়ীতে সঞ্চারিত এবং যে পর্য্যন্ত মনের লয় না ঘটে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে। যে মনুষ্য প্রাণ ও মনঃ উভয়কে লয় করিতে পারেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। মোক্ষের অন্য উপায় নাই।

রাজযোগ

পাতঞ্জলদর্শনে রাজযোগের ব্যবস্থা—পতঞ্জলি মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। চিত্তের বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে লয় হইলে জীবাত্মাতে স্বরূপ প্রকাশ পায়। মনের পঞ্চভূমি, বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র ও যোগ। ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্তভূমিতে চিত্তচাঞ্চল্য; মূঢ়ভূমিতে চিত্তের তমোভাব। একাগ্রভূমিতে চিত্তের এক বিষয়ে প্রণিধান বশতঃ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নিরোধভূমিতে চিত্তের লয়ে আরও চৈতন্য জাগরণ। দৃঢ় অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত নিরোধ হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধে বিশিষ্ট প্রযত্নের নাম অভ্যাস। ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম

সমাধি

বৈরাগ। প্রকৃতিপুরুষান্যথাখ্যাতি অর্থাৎ চৈতন্যময় পুরুষ প্রিয়োপলীলা প্রকৃতি হইতে পৃথক, এই জ্ঞান জন্মিলে চরম বৈরাগ্য। সবিতর্ক সবিচার সানন্দ ও সাস্মিতভেদে একাগ্রসমাধিও চতুর্বিধ। তাহাতে ব্যুত্থান আছে। নিরোধ সমাধি অর্থাৎ যে সমাধিতে সর্ব্ববিধ বৃত্তি জ্ঞানের লয় হয় সেই সমাধিই যথার্থ সমাধি। এইরূপ সমাধি দ্বারা বাসনাবীজ ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া কৈবল্যলাভে পুরুষ মুক্ত হন। বাম রাজযোগীশ্বর। হঠযোগ সাধন করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। কিন্তু তিনি হঠযোগেও সিদ্ধ। হঠযোগাভ্যাসী তারা ক্ষ্যাপা বামের হঠযোগ সিদ্ধিদর্শনে বিস্মিত। প্রভু কখনও বিনা মুদ্রায় থাকিতেন না। শ্রীবাম লীলার আদিলহরীতে যে প্রতিকৃতি আছে সেই তাঁহার শেষ চিত্র। এই চিত্রে শ্রীতারার লেলিহানাদি মুদ্রা বর্ত্তমান। অন্য চিত্রে পাতলী প্রভৃতি মহা মুদ্রা দেখা যায়। ষঠচক্রভেদই হঠযোগের সীমা। কুণ্ডলীশক্তিকে সুষুম্নায় ষঠচক্রভেদ করতঃ সহস্রারে স্থাপনই হঠযোগের পরাকাষ্ঠা। আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে সোমচক্র গুপ্ত। সহস্রারে মূলাধারাদির অনুরূপ সূক্ষ্ম সপ্তচক্র গুহ্যাতিগুহ্য। স্থূল শরীরে এই চতুর্দ্দশ চক্র। সূক্ষ্ম শরীরেও তদনুরূপ সূক্ষ্ম সপ্তচক্র। বাম উক্ত ত্রিসপ্তচক্রই ভেদ করেন। এই অবস্থায় যোগী ইচ্ছানুরূপ শরীর ধারণ করিতে পারেন। যোগশাস্ত্রে নির্ম্মাণকায়ার কৌশলের যে ইঙ্গিত আছে তাহা বামে পূর্ণমাত্রায় ছিল দেখা যায়। সন্তান তারণ পদ্ধতি তাহার দিগ্‌দর্শন স্বরূপ।

ত্রিসপ্তচক্রভেদ

মহাপুরুষগণ সংসারে নির্লিপ্ত থাকিলেও জীব কল্যাণে সতত জাগরূক। কল্যাণ দ্বিবিধ—শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ। অবিদ্যাত্মক অনিত্য ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখই প্রেয়ঃ। মূঢ় জীব প্রেয়ঃ প্রার্থী। বিজ্ঞজীব শ্রেয়স্কামী। উভয়ের প্রভেদ শ্রুতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।

প্রেয়ঃ

অন্যৎ শ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং বিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেহর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।

শ্রেয়ঃ

—কঠোপনিষদ।

নচিকেতা পিতৃবচনে যমালয়ে গমন করিয়া তিন দিন অপেক্ষা করিলে প্রোষিত যমরাজ আসিয়া ব্রহ্মবর্চ্চস অতিথিকে বরত্রয় দিতে চাহিলেন। জ্ঞান পিপাসু নচিকেতা প্রথমে অগ্নিবিদ্যা চাহিলেন। গুরু শিষ্যকে নানা ঐহিক পারত্রিক ভোগ সুখকর বরদানের প্রলোভন দেখাইলেও যখন শিষ্য ভুলিলেন না, তখন যম বলিতেছেন—প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ বিভিন্ন। তাহাদের প্রয়োজনও ভিন্ন। উভয়ই পুরুষকে বদ্ধ করে। তদুভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ চান তিনি সাধু, আর যিনি প্রেয়ঃ চান তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হন।

ভগবান কল্পতরু। জীব যাহা চায় তিনি তাহার কর্ম্মানুসারে তাহাই দেন। শ্রেয়স্কামী ও প্রেয়স্কামী উভয়েই তাঁহার ভক্ত, প্রথমটী অন্তরঙ্গ

অন্তরঙ্গ দ্বিতীয়টী বহিরঙ্গ। শ্রীবামের বহিরঙ্গ ভক্তগণের সহিত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা অন্তরঙ্গগণের সহিত গুরু গম্ভীর লীলা বর্ণনীয়া।

২। নন্দীকল্প

শ্রীমদ্বিপ্রং সগোত্রং সুরসিকং ভিষজং প্রাপ্তমাসন্নবাসং।
জীবন্মুক্তং চ কৌলং নিজকুলশিরসি স্থাপয়ন্ নন্দিকল্পং
শ্রীবামো দিব্যলীলাং ভুবি নবমধুরামাততানন্তরঙ্গৈঃ॥

ধনসম্পদশালী সগোত্র সুরসিক চিকিৎসক রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক ব্রাহ্মণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তারাপীঠের সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেছিলেন। বামের শ্রীতারানাদ শ্রবণে অধীর হইলেন; যেন জাগ্রত হইয়া মোহপারাবারে শ্রীবামতরণী ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে ঐ পারাবার হইতে ত্রাণ করিলেন, জীবন্মুক্তিকর কৌলত্বদানে নিজগণের নায়ক নন্দিকেশের পদে অভিষিক্ত করিলেন, শ্রীবামঅন্তরঙ্গের সহিত মর্ত্ত্যধামে নিত্য নূতন মধুর দিব্যলীলার অবতারণা করিলেন।

বৈষ্ণবগণ বলেন, ভগবান অবতীর্ণ হইলে তাঁহার মধুর অন্তরঙ্গগণও

লীলার্থ অবতীর্ণ হন। শ্রীবাম অবতীর্ণ হইলে তাঁহার পার্ষদগণও অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে প্রভুর নন্দিকেশের সহিত লীলাই অগ্রে বর্ণনীয়া।

তারাপীঠের সন্নিকট খরুণগ্রাম। তথাকার চট্টোপাধ্যায় বংশ বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ। তাঁহাদের অন্যতম রসিকচন্দ্র ১২৬৮ সালে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ও সামান্য ইংরাজী শিখিয়া ডাক্তারী ব্যবসা করেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার না হইলেও শীঘ্রই হাতযশঃ লাভ করেন, ক্রমে প্রসার বাড়ে। যৌবনেই ঘোড়া ও পাল্কী রাখিবার সঙ্গতি আসে। বিবাহ ঘটে, সন্তানও হয়।

গৃহী

শ্রীবামের নাম শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হন। পরে শারদজ্যোৎস্না-ধৌত নিশীথে বামের "জয়তারা" নাদ অর্দ্ধক্রোশদূরস্থিত নিজ বাটীতে শুনিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি ঘন ঘন বামের নিকট আসিতে থাকেন। সংসার চিন্তা ত্যাগ করিয়া বামের নিকট বসিয়া থাকেন। তাঁহার হাবভাব দেখেন, কথা শুনেন, তাঁহার সেবাও করেন। যিশু বলিয়াছেন, "অর্থের সেবা ও ভগবানের সেবা সমকালে সম্ভব নহে।" রসিকের ব্যবসার প্রতি শৈথিল্য আসিল। রোগীরা তাঁহাকে বাটীতে পায় না। সুতরাং প্রসার কমিল। আর্থিক অসচ্ছলতা ঘটিল। গৃহে রসিকের উপর অনুরোধ উপরোধ, অনুযোগ অভিযোগ হইতে লাগিল, "তিনি যেন বামের নিকট এরূপ ঘন ঘন যাইয়া আখের নষ্ট না করেন"। কিন্তু কিছুতেই রসিকের চৈতন্য হইল না। তিনি অর্থ সেবা ছাড়িয়া বামের সেবাই একান্ত মনে লইলেন। বামও তাঁহাকে কোল দিলেন। অচিরে করুণাময় গুরু তারাপীঠ মহাশ্মশানে শ্মশানবাসিনীর বীর সাধন পদ্ধতি দিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন, "বীরপুত্র"। পরে বাম তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন।

আশ্রয় লাভ

বাতাতপ হইতে বামের শরীর রক্ষার জন্য রসিকেরই আগ্রহ হয়। তিনি বামকে বলেন, "বাবা একটু আশ্রয় না হইলে কি করিয়া চলে? আপনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আমরা ত ঝড় বৃষ্টি সহিতে পারি না।" বাবা ভক্তের ইচ্ছায় বিঘাত দিলেন না। রসিকের চেষ্টায় জ্যোৎকুণ্ডের পশ্চিমে শ্মশানের পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান স্থানে সন ১৩০০ সালে একখানি চালাঘর উঠে।

রসিক মজুরদের সহিত দেওয়াল দিয়াছিলেন। বাবাও তাঁহার দেখাদেখি ঐ ঘরে যোগাড় দিয়াছিলেন। ঘরখানি পূর্ব্বমুখী। তাহার উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বে বেষ্টিত দাওয়া ছিল। দক্ষিণ দাওয়ায় ভক্তগণ চুল্লী করিত। উত্তর দিকের খোপে বাবার কুকুর থাকিত। রসিক দাদা প্রায়ই আশ্রমে থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে বাটী যাইতেন। ধান জমি যাহা কিছু ছিল তাহার আয়ে সংসার কায়ক্লেশে চলিত। যখন তিনি উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন একান্ন ছিলেন। তিনি উপার্জ্জন ছাড়িলে আত্মীয়েরা পৃথগন্ন হন। রসিকের তাহাতে দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি রামকে লইয়া উন্মত্ত। রামের অন্য কোন সন্তান পিতার সঙ্গ তাঁহার মত পান নাই। তিনি ধন্য। রসিক শ্রীগুরুর জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি বীরভাবাপন্ন, বীরাচারী আনন্দময় জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। কখনও রামপুরহাটের উকিল অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইতেন॥ অনন্তবাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে প্রবণতা ছিল। রসিকদাদার প্রভাবে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। রসিক দাদার কথাতেই রাম অনন্তবাবুর বাটীতে আসেন। ইঁহার চেষ্টায় রামপুরহাটে আরও অনেক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ধর্ম্মভাব উদ্রিক্ত হয়।

গুরুসঙ্গ

বীরাচারী

বাবা রসিককে নিজ স্বর্গারোহিনী বিদ্যার পরিচয় ভঙ্গিতে দেন। রসিক দাদা রামের স্থূলশরীরে কখন রামরূপ, কখনও ত্রিশূলধারী রুদ্ররূপ দর্শন করিয়াছেন। তিনি রামের সহিত বহুবার চক্রানুষ্ঠানে বসিয়াছেন। "তারামাই" বাবার 'আশ্চর্য্য' "ভৈরবী" রসিক দাদা জানিয়াছিলেন। রামই যে সদাশিব তাহা তাঁহার স্থির ধারণা আসিয়াছিল। তিনি রামের সহিত কত গান গাহিয়াছেন। রামের প্রিয় সঙ্গীত তাঁহার অনেক জানা ছিল। তন্মধ্যে একখানি—

মনপবনের নৌকা বটে বেয়েছে মন কালী ব'লে।
মহামন্ত্র মন্ত্র যার সে সুবাতাসেতে বাদাম তুলে।
কালীনামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল।
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে।

কমলাকান্তের নেয়ে নোঙর তোল মন দুর্গা ক'রে।
পড়িবে তুফানে যবে নাম গাহিবে সবাই মিলে ॥

তিনি নিজে বামের জীবনী লিখিবেন ইচ্ছা করেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। বামের সমাধিও তিনি দেন।

বাম স্বদেহে যখন ছিলেন তখন আমার সহিত রসিক দাদার সাক্ষাৎ হয় নাই। উভয়ে উভয়ের নামমাত্র শুনিয়াছিলাম। বামের দেহরক্ষার পরে রামপুরহাটে অনন্তবাবুর বাটীতে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। তখন তিনি প্রৌঢ়। তাঁহার উন্নত নাতিস্থূল নাতিকৃশ দেহ দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুসমন্বিত; সৌম্য বীরভাবব্যঞ্জক বদনমণ্ডল, রুদ্রাক্ষভূষিত দীর্ঘবক্ষ গৈরিক-অধোবাস শোভিত নিম্নাঙ্গ দেখিয়া আমার শ্রদ্ধাভক্তি আসে। তিনি কতই প্রেমের সহিত আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া আদর করেন। তখন অনন্তবাবু গত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কলিকাতায়। মধ্যমপুত্র ভূপেন্দ্রের উপর সংসারের ভার। স্বদেশহিতৈষী জিতেন্দ্র তখন বিখ্যাত হ'ন নাই। রসিক দাদার সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অনন্তবাবুর পত্নী ও পুত্রগণ অত্যন্ত আতিথেয়, বহুবার তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

রসিক দাদা বামের স্মৃতিসংরক্ষণী সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। সমাধি মন্দির নির্ম্মাণে তিনি যথাসাধ্য পরিদর্শনাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীগুরুর তিরোধান তিথি মহোৎসবে তিনি যোগদান করিতেন। শেষ বয়সে রামপুরহাটের বিশ্রুত উকিল শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই বেশীর ভাগ থাকিতেন ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। বাবার দেহরক্ষার অল্প কয়েক বৎসর পরেই রসিক দাদা নিজ জন্মভূমিতে দেহরক্ষা করেন। তারাপীঠে শ্রীগুরুর সমাধির নিকট তাঁহার দেহের সমাধি হইয়াছে।

দেহরক্ষা

নন্দী শিবের নিত্যানুচর। কূর্ম্মপুরাণ মতে শিলাদমুনি যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিলে তিনি উত্থিত হন। পুরাণান্তরে তিনি শালঙ্কায়ন মুনির পুত্ররূপে কথিত। কল্পভেদে মতদ্বৈধের সমাধান কর্ত্তব্য। তাঁহার জন্ম যে শিবাংশে তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই।

মায়াযোগবলোপেতস্ত্র্যক্ষা বৈ শূলপাণিধৃক্ ।
রূপবান্ গুণবাংশ্চৈব বপুষাদিত্য-সন্নিভঃ ॥

তিনি যোগবলে বলীয়ান, মায়াশক্তিসম্পন্ন, ত্রিলোচন, শূলধর, রূপবান, গুণবান এবং সূর্যাতুল্য তেজস্বী। তাঁহার নামান্তর নন্দিকেশ, নন্দিষেণ, শিলাদি ইত্যাদি। রসিকচন্দ্র নবরূপী বামদেবের নন্দিকেশ। তিনি দীর্ঘকায় তেজস্বী রূপবান, গুণবান বামের নিত্যানুচর।

নন্দীকল্প

৩। নববীরভদ্র

বৃদ্ধাং মাতরমাকুলাং চ তরুণীংজায়াংত্যজন্ যৌবনে
শ্রীবামং প্রভুমাসসাদ কুলদানন্দঃ শ্মশানে দ্বিজঃ।
তং বামো নববীরভদ্রমনুগং কর্মিষ্ঠমাসাদয়ৎ ।
শ্রীকৈলাসপতিং স্বরাজসতনুং শান্তো বিভুঃ কর্ম্মণে ।

বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী ভার্য্যাকে শোকে ভাসাইয়া যৌবনে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুলদানন্দ নামক দ্বিজ শ্মশানে পূর্ব্বপ্রভু বামকে পাইলেন। তিনি বীরভদ্রের অবতার। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য বীরভদ্রের সৃষ্টি। বীরভদ্র উর্জ্জিতরজোগুণ ও কর্ম্মনিষ্ঠ। তাঁহার সেই রজোভাব যায় নাই। কিন্তু স্রষ্টার রুদ্রভাব এ শ্মশানলীলায় নাই। এ অবতারে তিনি শান্ত শিব সুন্দর। কর্ম্মাতীত বাম প্রাচীন সংস্কারবশে ভক্তের তান্ত্রিকানুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইলেন। শ্রীকৈলাসপতি রজোভাবাপন্ন, ভাবুকের অনাদিলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা এবং তান্ত্রিকানুষ্ঠানে তৎপর। তিনি শ্রীবামের রজোমূর্ত্তি। অতএব তাঁহারই নিকট প্রভু বাম কুলদানন্দকে পাঠাইলেন।

১২৯৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর থানার অন্তর্গত চাঁদাইপুরের কুলদানন্দ নামক জনৈক গৃহস্থ যুবাকে বাম আকর্ষণ করেন। কুলদানন্দের জন্ম সন ১২৬২ সালে ২২শে আষাঢ়। বাল্যকালে তিনি বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত কিছু শিক্ষা করেন। পিতৃবিয়োগে যৌবনেই সংসারের ভার পড়িলে বহরমপুরে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলা শিক্ষকতা করেন। তাঁহার

সুপারিশে শেষ বর্ম্মাযুদ্ধে অস্থায়ী চাকুরী পান। যুদ্ধাবসানে বাটী ফিরেন। পৈতৃক জমি হইতে মোটা ভাতের সংস্থান ছিল। বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাব প্রবল। আর স্ববৃত্তিতে গেলেন না। বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী পত্নীর বন্ধন কাটাইয়া ১২৯৪ সালে গৃহ ছাড়িলেন। বৎসর খানেক এদিক ওদিক ঘুরিলেন।

সংসার ত্যাগ

কুলদানন্দ বামের নাম পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। ১২৯৫ সালে শারদীয়া পূজার পর চতুর্দ্দশী মেলায় তারাপীঠে আসিলেন। বামের ভাব দর্শনে বামকে জীবন্ত ভৈরব জ্ঞান করিলেন। পাঁচ ছয় দিন বামের পিছু পিছু ফিরিলেন। অবসর পাইলেই বামের পা চাপিয়া ধরিতেন। বাম বলিতেন, "ছাড়্ ছাড়্ আমায় কি কুঠে করিবি?" ভক্তকে পরীক্ষাও করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলিতেন, "ব্রাহ্মণকুমার, বৃদ্ধা মাকে ও নববধূকে কাঁদাইয়া আসিয়াছ, ঘরে ফিরিয়া যাও, ভাল ছেলে হও"। ভক্ত প্রথমে মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। পরে তিনি কাতরে জানাইলেন "বাবা, আমি আপনার ছেলে হইব, সেবা করিব।" সন্তানের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শেষে বাম বলিলেন, "তবে থাকেন বাবা তারামার ভাল ছেলে হন।"

তখন বামের আশ্রম হয় নাই। শ্মশানে বা শিমূলতলায় বা জোৎকুণ্ডের ঘাটে থাকিতেন। রাত্রে তারামন্দিরের বিরামখানায় বা অলিন্দে শয়ন করিতেন। ঐ মন্দিরের উত্তরভিতে বাহির দিকে পূর্ব্বাংশে সীতাহরণাদি লীলা ও পশ্চিমাংশে কৃষ্ণলীলা অঙ্কিত ছিল। বাম পূর্ব্বাংশে শুইতেন। ভক্তকে বলিলেন, "বাবা, আমি রাবণরাজার পদতলে থাকি, আর আপনি কৃষ্ণঠাকুরের পদতলে থাকুন।"

কুলদানন্দ সাতমাস বামের সেবার অবসর পান। উভয়ে মন্দিরের দরদালানে শুইতেন। তখন জনমানব মন্দির বাটীতে থাকিত না। সম্মুখে শ্মশানে শৃগাল কুকুরের উৎসব কোলাহল। শ্মশানের বড় বড় মশা, তাহার উপর শয্যা নাই; বামের ভূমিই খট্টা ভূমিই শয্যা। কচিৎ কোন কোন পাণ্ডা শীতকালে দুই এক আটি খড় ছড়াইয়া দিত। রাতে কম্বল জুটিত না। মশারীর ত কথাই নাই। বড় মশা লাগিত। বাম কখনও বলিতেন,

"তারাবেটী কুবিদে। দিনে কুচে বড়ি খাওয়াবে। রেতে মশা দিয়ে রক্তটুকু খাবে"। কোন কোন রাতে কুলদাকে লইয়া জ্যোৎকুণ্ডুর ঘাটে বা শ্মশানে কাটাইতেন। শেষরাতে মন্দিরে শুইতে আসিতেন। কুলদা ঘুমাইয়া পড়িতেন। বাবা জিতেন্দ্রিয়। অতি প্রত্যুষেই কুলদাকে ডাকিতেন। কুলদার ভোরে উঠা অভ্যাস হইল। তিনি উঠিয়া বামকে তামাক সাজিয়া দিতেন। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পূজার ফুল তুলিতেন।

কোন কোন দিন বাম কুলদার সঙ্গে ফুল তুলিতে যাইতেন। খেয়াল চাপিলে কোন কোন দিন কতক ফুল মার মন্দিরদ্বারে কতক মন্দির প্রাঙ্গনে শুষ্ক হরীতকীতলায় "জয়তারা" নামে ছড়াইয়া দিতেন। কোন কোন দিন বা জ্যোৎকুণ্ডুর ঘাটে, কোন দিন বা শিমূলতলায় বেদীর উপর তারামার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া ফুল রাখিতেন।

একদিন বাম কুলদার সহিত কবিচন্দ্রপুরে মাঠের পুষ্করিণীতে ফুল তুলিতে যান। পুকুরটী পাঁকে ও দামে ভরা। কিন্তু অনেক পদ্ম ফুটিয়াছে। বাম পদ্মের শোভায় জগজ্জননীর অতুলনীয় শোভাদর্শনে বিহ্বল হইয়া মধ্যস্থানের একটী বড় পদ্ম তুলিতে গেলেন। ফলে দামে জড়াইয়া বাম ডুবিয়া যাইতেছিলেন। কুলদানন্দ ডুব গালিয়া দাম ছিঁড়িয়া দেন। বাবা বলিতেন, "বাবা আপনি ছিলেন তাই বাঁচিলাম। নইলেত কুবিদে বেটী মেরেছিল।" কি সরলতা কি কৃতজ্ঞতা, কুলদার ভক্তি পরীক্ষার জন্যই কি এই খেলা খেলিলেন!

বাবার চক্ষে ভালমন্দ সবই তারার কার্য্য। তারা কেবল ভাল আর মন্দ অসুজন, ইহা নহে। একই তারার দুই দিক। তিনি ভালকে সু-তারা, মন্দকে কু-তারা বলিতেন। সবই এক মহাপ্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। একেই সব প্রতিষ্ঠিত। একেই সব লয় হয়। ইহাই সত্যদর্শন। আভেস্তার অনুকরণে ইহুদীতন্ত্রে ঈশ্বর ভালর কর্ত্তা, শয়তান মন্দর কর্ত্তা। শয়তান ঈশ্বর বিরোধী, ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি হয়। যদি বলা যায় 'মন্দের' প্রভাব ঈশ্বরকে বলিলে ঈশ্বরে দোষারোপ হয় তাহার উত্তর—বিবাদিমতেও শয়তান ঈশ্বরের ললাটসম্ভূত। তাহার মনও ঈশ্বরের নির্ম্মাণ। সেই মনঃ-প্রবৃত্তি ভাল বা মন্দর দিকে পরিচালন কাহার শক্তিতে? ঈশ্বরের নিকট ধার করা শক্তি শয়তানের শক্তিতে নয় কি? ভগবান

সর্ব্বশক্তিমান, সমস্তই তাঁহার লীলা। অথচ তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। যেমন পদ্মপত্রে জল।

কুলদানন্দের বাহ্যসেবায় মন উঠিতেছে না। তিনি বাবার নিকট দীক্ষা চাহিলেন। বাবার অনুষ্ঠান কি সাত মাস যাবৎ ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়াও ধরিতে পারিলেন না। বাম তাঁহাকে ধরা দিয়াও ধরা দেন নাই। বাম জানিতেন কুলদানন্দের ভাবী গুরু তাবুকের কৈলাসপতি। তথাপি কুলদানন্দকে কৃপার উদ্দেশ্যে তাঁহার চিত্তশুদ্ধির জন্য দেবদুর্লভ সঙ্গসুখ দিয়াছেন। তাঁহার মনকে তারামার দিকে ছুটাইয়াছেন। কুলদা মন্ত্রের জন্য আগ্রহ দেখাইলে বাম তাঁহাকে 'তারা' নাম দিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা এই তারা নামই মন্ত্র। আর মন্ত্র তন্ত্র কি জানি। তারা তারা জপ করবেন।" সত্যই নামই মহামন্ত্র। বীজ কেবল নামের সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত। কুলদার ইহাতে মন উঠিল না। তিনি অনুষ্ঠানাদির জন্য বামকে ধরিলেন। বাম সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞভাব দেখাইতেন, তাহা কাপট্যপ্রণোদিত নহে বরঞ্চ বিনয়সম্ভূত। তিনি বলিলেন, "আমি কি অনুষ্ঠান জানি বাবা? কৈলাসপতি গোঁসাই রাজা গোঁসাই। মদনদাদার গুরু। তিনি সব জানেন। তাঁর কাছে যাও"। কুলদা প্রতিবাদ করিলেন—"বাবা আপনিই আমার গুরু, কেন অন্যের নিকট পাঠান?" বাবা শুনিলেন না। কুলদা শেষে বাবার কথায় কৈলাসপতির নিকট গেলেন ও দীক্ষিত হইলেন। কৈলাসপতিই তাঁহার কুলদানন্দ নাম দেন। তিনি উন্নত সাধক। গুরুর মঠের ভার তাঁহার উপর।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ঋষি দেখাইয়াছেন—পিতামাতার পুত্রস্নেহও অহেতুক নয়।

মানুষাঃ মনুজাব্যাঘ্রঃ সাভিলাষাঃ সুতান্‌প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কি ন পশ্যসি॥

মেধস মুনি বলিতেছেন, "হে নরপুঙ্গব সুরথ, তুমি কি দেখিতেছ না, মনুষ্যগণ পুত্রকে স্নেহ করে তাহাও প্রত্যুপকার প্রাপ্তির লোভ বশতঃ।" বামের জীব প্রতি স্নেহে স্বার্থগন্ধ ছিল না। বাম শুশ্রূষাদি কোন প্রত্যুপকারের আশায় জীবকে কৃপা করেন নাই। কুলদানন্দ অন্যের সেবক হইবে জানিয়াও তিনি অহেতুক কৃপা বশতঃ তাঁহার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সাহায্য করিলেন।

সস্ত্রীকোঽধিগতোঽচিরান্নবগুরোঃ কৌলাবধূতং পদং
প্রেয়াঃ স্বংপিতুরং যযৌ সুত ইব শ্রীরামমানন্দনম্।
সিদ্ধাম্বামিব ভৈরবীমবিতথাং তস্যাভ্যনন্দন্মুদা
গোপালস্তব মাতরস্মি মধুরান্ দেহীতি বাচা বিভুঃ ॥

সস্ত্রীক সেই রুদ্রপরিচায়ক অচিরে নূতন গুরু কৈলাসপতির কৃপায় কৌলাবধূত সংস্কার পাইয়া পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় মনোমোহন শ্রীরামের নিকট গিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার ভৈরবীকে সত্যই স্নেহময়ী জননীতুল্য দেখিয়া "মা আমি তোমার গোপাল যে সব ক্ষীরাদি মধুর দ্রব্য আমার জন্য আনিয়াছ, মাগো, আমায় দাও" বলিয়া সানন্দে অভিনন্দন করিলেন।

শাস্ত্রমতে পতি পত্নী কামজ নহে। পত্নী পতির কামচরিতার্থতার ক্রীড়া-পুত্তলিকা নহে। পতিও পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদন-ভূষণাদির ঐহিক সুখ সম্পত্তির হেতু নহে। উভয়ের জীবনমরণের সঙ্গী, ঐহিক ও পারত্রিক সাধনায় পরস্পর উত্তর সাধক। মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবিষয়ে বিশদভাবে বলিয়াছেন—

ভর্ত্তব্যা রক্ষিতব্যা চ ভার্য্যা হি পতিনা সদা।
ধর্ম্মার্থকামসংসিদ্ধৌ ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী ॥
যদা ভার্য্যা চ ভর্ত্তা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়ণামপি সঙ্গতম্ ॥ ইত্যাদি

কুবলাশ্বের সহিত মদালসার পরিণয়ে কুণ্ডলা দাম্পত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন—ভর্ত্তা সর্ব্বদা ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধন বিষয়ে ভার্য্যা ভর্ত্তার সহায় হইয়া থাকেন। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার পরস্পর মিল থাকিলে তদুভয়ের ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মিলন ঘটে। ভার্য্যা ব্যতীত পুরুষ কিরূপে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সাধন করিবে? তাঁহার ত্রিবর্গ ভার্য্যাতে প্রতিষ্ঠিত। তদ্রূপ ভর্ত্তৃ বিনা ভার্য্যাও ধর্ম্মাদি সাধনে অসমর্থা। উক্ত ত্রিবর্গ পতি পত্নী উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে। স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষ দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যগণ ও অতিথিগণের সেবা করিতে পারেন না। মনুষ্যগণ ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহা গৃহে আনিলেও যদি ভার্য্যা না থাকেন

বা কুভার্য্যা হন তাহা হইলে সেই ধন অচিরেই বিনষ্ট হয়। স্ত্রী বিনা যে পুরুষের কাম চরিতার্থ হয় না তাহা প্রত্যক্ষ। পতি পত্নী সাহচর্য্যেই বৈদিক ধর্ম্মপালন সম্ভব। ভর্ত্তৃ বিনা স্ত্রীর ধর্ম্ম অর্থ ও সন্ততি হইতে পারে না। সেইজন্য ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ দাম্পত্যধর্ম্ম সাপেক্ষ।

এই সমস্ত কারণেই প্রাজ্ঞ ঋষিগণ বিবাহমর্য্যাদা সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া পৈশাচ প্রভৃতি কামজ মিলন নিন্দনীয় করতঃ তৎপ্রচলন সমাজ হইতে বিদূরিত করেন—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং" একত্রে তোমরা ধর্ম্মাচরণ কর—এই মন্ত্র দম্পতি হৃদয়ে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রজাপত্যরূপ পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। তাহারই ফলে অরুন্ধতী, অনসূয়া, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি আদর্শ পত্নী ও বসিষ্ট, অগস্ত্য, রাম, সত্যবান প্রভৃতি আদর্শ পতি পাপময় ধরাকে স্বর্গাপেক্ষাও পুণ্যময় স্থানে পরিণত করিয়াছেন। তাহারই ফলে ভারত রমণী আদর্শ সতী।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত কুমারানন্দের পত্নী ত্রিপুরানন্দময়ী পতির সন্ধান পাইতেই সংসার ছাড়িয়া পতিপদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন কুমার দাদা ডাবুকের কৈলাসপতি বাবার নিকট দীক্ষিত হইয়া তারাপীঠের নিকট দক্ষিণগ্রামে শ্রীগুরুর চরণ সেবায় নিরত। ত্রিপুরা মা দক্ষিণগ্রামে আসিয়া পতির ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী হইলেন। কৈলাসপতি তাঁহাকেও দীক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি আজীবন স্বামীর উত্তরসাধিকা ছিলেন। এই দম্পতিই যথার্থ ভৈরবভৈরবী।

সন ১২৯৯ সালে কুমারানন্দ স্বীয় ভৈরবীসহ তারাপীঠে শ্রীবামকে দেখিতে আসেন। তারামন্দিরের সোপানে বামকে দেখিতে পাইলেন—স্নান হইয়াছে, তিনি উলঙ্গ, বিকার নাই। যদিও প্রকাশ্যে বাম কুমারদাদার গুরু নন তথাপি তিনিই হৃদয়াধিকারী। কুমারদাদার ভক্তি উচ্ছলিত হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে বামকে প্রণাম করিলেন। বামেরও স্নেহ উথলিয়া উঠিল। ত্রিপুরা মা বামের কথা শুনিয়াছিলেন। সাক্ষাতে বুঝিলেন বাম বামই বটে। বামও তাঁহাতে ভৈরবী-শক্তি দেখিতে পাইলেন, তথাপি পরীক্ষার জন্য কুমারদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাধুবাবা! আশ্চর্য্য বুজরুকি করিয়াছেন। ভৈরবী মা আসিয়াছেন দেখছি। তা ঘরের মা, না পরের মা?" কুমার উত্তর করিলেন, 'আপনি তো সব জানেন, তা দেখুন,

ঘরের না পরের।" রাম তখন সস্নেহ দৃষ্টিতে মার পানে চাহিয়া বলিলেন, "না ঘরের মা বটে, তো মা বটে, তারা মা বটে।" রামের চক্ষে—স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। সব শক্তিই তাহার মা। রামের দৃষ্টিতে কি বাৎসল্য! ভৈরবী মা গলিয়া গেলেন। রামের 'মা' রবে তাঁহার 'যশোদা-ভাব' জাগিল। তিনি রামের জন্য ক্ষীরের নাড়ু প্রভৃতি আনিয়াছিলেন স্নেহভরে রামের করে নাড়ু দিলেন। রাম সেই স্নেহের উপহার সাদরে লইলেন। ত্রিপুরা মার পুত্র সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার মা হওয়ার সাধ মিটাইবার জন্য কি প্রভু তাঁহাতে যশোমতীর ভাব দিয়াছেন। উলঙ্গ রাম নাড়ু খাইতেছেন। ত্রিপুরা মার মুখ হইতে বাণী নিঃসৃত হইল, "আমার নাড়ুখেকো গোপাল।" তদবধি তিনি রামকে গোপাল বলিয়া ডাকিতেন। রামের জন্য কতই মিষ্টান্ন নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে পতিসহ তারাপীঠে আসিতেন। রামকে খাওয়াইয়া যশোদা সাজিতেন। ধন্য মা তোর সৌভাগ্য! ধন্য তোর সাধনা! রামই গোপাল অর্থাৎ জগতের পালক ও ইন্দ্রিয়ের চালক। তিনি শান্ত দাস্যাদি সর্ব্ব ভাবময় অথচ ভাবাতীত। তিনি মূর্ত্তিমান রসকদম্ব। যে তাঁহাকে যেভাবে দেখিতে চায় তিনি তাহাকে সেভাবে দেখা দেন। তুমি মা কোমলপ্রাণা স্নেহময়ী, তাই তোমাকে স্পৃহনীয়া বাৎসল্যময়ী যশোদা করিলেন। রাজকুমারী মাকে দেবকীমার ন্যায় কাঁদাইয়াছিলেন।

কুমারানন্দ রামের ও কৈলাসপতির সমাদরের পাত্র। কৈলাসপতি ডাবুকের অনাদিলিঙ্গ আবিষ্কারপূর্ব্বক শ্রীরামের সাহায্যে দেবতার সংস্কার করান। তিনি আর্দ্রপন্থী শক্তিসেবক ছিলেন। তিনি ক্রমশঃ ভৈরবী গ্রহণ করেন। তাঁহার বহু শিষ্যসেবক হয়। কাশ্মীর রাজার শিক্ষাবিদগণের প্রধান মানকর নিবাসী মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার শিষ্য হন। উঁহার দ্বারা কাশ্মীরে কৈলাসপতির প্রভাব বিস্তারিত হইয়া শেষে তিনি কাশ্মীরাধিপতির গুরুপদে বৃত হন। এবং কাশ্মীররাজের সাহায্যে ডাবুকে বৃহৎ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করতঃ পূজা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার দেহান্তে কুমারানন্দ ডাবুকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই চেষ্টায় কাশ্মীররাজ হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি দ্বারা ডাবুকের অনাদিলিঙ্গের সেবার ব্যবস্থা হয়। কুমারানন্দের শেষবয়সে আমার সহিত আলাপ হয়। তিনি কলিকাতায় আমার বাসায় আসিয়া ধারাবাহিকক্রমে রামের বাল্য ও মধ্যজীবনী বর্ণনা করেন। তাঁহার ভৈরবী ত্রিপুরাসুন্দরী পতির

ক্রোড়ে ভারতনারীর স্পৃহনীয় মরণ প্রাপ্ত হন। কুমারানন্দদাদাও ভাবুকের অনাদিলিঙ্গের সেবার সুব্যবস্থা করিয়া দেহ রাখিয়াছেন।

৫। ছায়াত্ম।

সদাচারং স্বপ্নপ্রকটিতমন্ত্রং কৈশোর সন্ন্যাসিনং
হঠাভ্যাসোদ্ভাসিদ্রঢ়িমতরুণং স্ফারোরসং শ্যামলম্।
ভ্রমন্তং ভূস্বর্গে নিজগণপতিং ছায়াত্মনা কর্ষয়ন্
অদৃশ্যঃ শ্রীরাম স্ফুটনরগিরা স্বংনামধামাব্রবীৎ ॥

যিনি বাল্য হইতে সদাচারী ও কৈশোরে স্বপ্নে দীক্ষালাভে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, যিনি হঠযোগী ও তজ্জনিত দৃঢ়কায়, তেজস্বী ও চিরতরুণ, যাঁহার বক্ষঃ বিশাল, যিনি কাশ্মীরে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ নিজগণ-পতিকে ছায়াপুরুষ দ্বারা আকর্ষণ করাইয়া শ্রীরাম অদৃশ্য থাকিয়াও স্পষ্ট মনুষ্যভাষায় নিজনাম ও ধাম জানাইলেন।

তারাক্ষ্যাপা বালব্রহ্মচারী। তিনি তাঁহার সাংসারিক নাম ধামাদির পরিচয় দেন না। তাঁহার যজ্ঞসূত্র আছে। তাহাতে রুদ্রগ্রন্থি। ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন। কলির ব্রাহ্মণকে নিন্দাও করেন। যতদূর ইঙ্গিতে বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় রংপুরের কোন ধনী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। বাল্যে মাতৃহারা হন। কৈশোরে শিবচতুর্দ্দশীতে পিত্রালয়ে শিবমন্দিরে স্বপ্নবৎ ঘোরাবস্থায় মন্ত্র পাইয়া তাঁহার উৎকট বৈরাগ্য উদিত হয়। অচিরে গৃহবাস ত্যাগ করতঃ নানাদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক হরিদ্বারে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট হঠযোগ শিক্ষা করেন। আসন মুদ্রাবন্ধাদিতে

গণপতি

তিনি সিদ্ধ। তৎফলে তিনি স্থির যৌবন। তিনি কৃষ্ণকায়, নাতিহ্রস্ব, তেজঃপুঞ্জ। বাহ্যতঃ অত্যন্ত কঠোর ও বিবিক্তসেবী। ছাত্রসদৃশ জনকতক ভিন্ন কাহারও সহিত মিশিতে চান না। সর্ব্বদা তাহাদের



বহরমপুরের মহাত্মা তারা ক্ষ্যাপা

—ডাঃ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, তারানাথ আশ্রম সমিতির সৌজন্যে।

এতটুকু ত্রুটী দেখিলে রুক্ষভাবে ভর্ৎসনা করেন। বাহিরের লোক তাঁহার উষ্মা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু অন্তর অতি কোমল।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহনুবিজ্ঞাতুমর্হসি॥

মহাপুরুষদের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর। কুসুম অপেক্ষাও কোমল। তাহা কে সহজে বুঝিতে পারে?

সন ১২৯৪ সালে আদিষ্ট হইয়া তিনি অমরনাথ দর্শনে যান। অমরনাথ হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত। কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ। শ্রীনগর হইতে অনন্তনাগ পদব্রজে দুই দিনের পথ। তথা হইতে পীরপঞ্চাল প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। পীরপঞ্চাল হইতে অমরনাথের পথ চিরতুষারাবৃত। ইহার ছয় ক্রোশ দূরে পঞ্চতরণী নামক পঞ্চখরস্রোতা পার্ব্বত্য তটিনীর সঙ্গম। ঐ স্থান হইতে অমরনাথের ব্যবধান দুই ক্রোশ। ঐ স্থানে কোন মন্দিরাদি নাই। হিমালয়ে এক প্রকাণ্ড গুহার ছাদ হইতে যুগযুগান্তর হইতে উপরিস্থিত তুষার স্তূপ প্রতিক্ষণেই গলিয়া কিছু কিছু কোন ছিদ্রপথে ক্ষরিত হইতেছে। হিমানী সংঘাতে গুহা মধ্যে নির্ম্মল স্ফটিকবৎ শিলাবেদী নির্ম্মিত। ঐ শিলাই গৌরীপট্ট। তদুপরি শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমাদি পর্য্যন্ত স্যন্দিত তুষার বিন্দুতে তিনটী শিবলিঙ্গাকৃতি গঠিত হয়। মধ্য লিঙ্গটী প্রায় এক হস্ত উচ্চ ও বেষ্টনী প্রায় একহাত। অপর দুইটি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। মধ্যটিকে শিবলিঙ্গ ও বামপার্শ্বেরটিকে গৌরী ও দক্ষিণেরটিকে গণেশ বলা হয়। পূর্ণিমার পর হইতে অমাবস্যার মধ্যে ঐ তিনটি মূর্ত্তিই বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অমরনাথ দর্শনকাল ঋষি পূর্ণিমা অর্থাৎ শ্রাবণী পূর্ণিমা। এই দুর্গম তীর্থে গমন কাশ্মীররাজ্যের সহায়তা ব্যতীত অতীব কঠিন হইত। দর্শনকালের মাসাবধি পূর্ব্বে কাশ্মীররাজের আদেশে সরাই চটী খোলা হয়। তথায় আটা, চাউল, ঘৃত প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য ও ডাণ্ডি, ঝাম্পান নরযান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রক্ষা করা হয়। সাধু সন্ন্যাসীকে সদাব্রত দেওয়া হয়। গৃহীরা যথোচিত মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পান। ঐ সমস্ত বিষয়ের ভার তখন বর্দ্ধমান জেলার

অমরনাথ

তীর্থযাত্রা

মানকর নিবাসী কাশ্মীর রাজকর্ম্মচারী মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, ভাবুকের কৈলাসপতি বাবার শিষ্য। উদার প্রকৃতি ও সাধক। সাধু ও সন্ন্যাসীর সেবায় তাঁহার মহা আনন্দ। তারা ক্ষ্যাপার (বামকুমারের) সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। মহেশচন্দ্র তাঁহার ও অন্যান্য সন্ন্যাসীর জন্য প্রচুর আহার্য্য ও প্রহরী পরিচালক ও পার্ব্বত্য ঘোটকাদি ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাত্রীরা ত্রয়োদশীতে পীরপঞ্জাল ও পরদিন পঞ্চতরণী পার হইয়া চতুর্দ্দশীতে পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন। ঐ রাত্রেই কুমারের হঠাৎ জ্বর আসিল। তিনি অমরনাথের উপর অভিমান করিয়া কত কি বলিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষ্যাপার প্রাণ ব্যাকুল হইল। তখন মহামায়া মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া মধুর বচনে আশ্বাস দিলেন। ক্ষণেক পরে তিনিও উঠিলেন। জ্বরে পা টলিতেছে। পৃষ্ঠে শুষ্ক বিল্বপত্র বাঁধিয়া প্রহরীকে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস, যতক্ষণ না ভূমিতে পড়িয়া যাই আমায় স্পর্শ করিও না।" তথা হইতে অমরনাথের প্রশস্ত পথে যাইতে দুই ক্রোশ পথ কেবল বন্ধুর নহে, খুবই খাড়াই। পূর্ণিমাতিথির অবসানেই তথায় এক-প্রকার প্রাণসংশয়কারী বায়ু বহে। সুতরাং যাত্রীদিগকে পূর্ণিমার মধ্যে যাইতে ও ফিরিতে হয়। সুস্থলোকের পক্ষেও পার্ব্বত্যপ্রদেশে দুই ক্রোশ পথ উঠা ও দুই ক্রোশ নামা দুষ্কর। জ্বরগ্রস্তের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। এইস্থানে তরতোয়া নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদীর তীর দিয়া একটি বনপথ আছে। তাহা আরও দুর্গম। ক্ষ্যাপা পঞ্চতোয়াতীরে আসিলে তাঁহার বাহ্যের বেগ আসিল। কোষ্ঠও পরিষ্কার হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। তিনি দেখিলেন যে, সাধারণ পথে গেলে অমরনাথ পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে। সুতরাং দুর্গম বনপথ ধরিয়া চলিলেন। ভক্তির বলে শরীরে অদ্ভুত বল পাইলেন। দ্রুতপদে চলিলেন ও সঙ্গীদের পূর্ব্বেই অমরনাথ পৌঁছিলেন। তথায় পাপহরা নামক নির্ঝরিণী। সেই ঝরণায় যাত্রীরা স্ত্রী

দর্শনাদি

পুরুষে বিনা সঙ্কোচে উলঙ্গ স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করতঃ অমরনাথের গুহায় পূজার জন্য প্রবেশ করেন। তীর্থ মাহাত্ম্যে কাহারও চিত্তবিকার হয় না। ক্ষ্যাপাও স্নানান্তে গুহায় গিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত তুষারসৃষ্ট দেবাদিদেবের প্রতীককে সানন্দচিত্তে বিল্বদলে পূজা করিলেন। ছাদ হইতে যে তুষারবিন্দু গুহার সর্ব্বস্থলেই পড়িতেছে, তাহা

পান করা সাধুগণের প্রথা। যিনি এক নিঃশ্বাসে এইরূপ ৩২টী বিন্দু পান করিতে পারেন, তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিদিত হন। ক্ষ্যাপাও সে প্রথার অমর্য্যাদা করেন নাই।

পূর্ণিমা তিথি মধ্যে যাত্রীদল ফিরিল। ক্ষ্যাপা অনন্তনাগ হইয়া জম্মুতে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ত্রিকুটস্থিত সত্যলীলাদেবী দর্শনে গেলেন। মূর্ত্তি শীলাময়ী, গুহাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা। দর্শনান্তে হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন অধিত্যকা শোভায় আকৃষ্ট হইলেন। যোগবলে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি উন্মীলিত। সহসা মাতামহীর ছায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া অন্তর্হিত হইল। তিনি তাঁহাকে চিন্তা করেন নাই। তবে কেন তিনি দর্শন দিলেন ভাবিতেছেন। এমন সময় অকস্মাৎ সমস্ত পর্ব্বত যেন কম্পিত হইল। চকিতনয়নে তিনি চারিদিকে চাহিলেন। জনমানব নাই। শূন্যে এক অলৌকিক ছায়াপুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার বিশালবক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, কুঞ্চিত কেশ, শ্যামল বর্ণ, আরক্তিম নয়ন, প্রসন্ন বদন। পুরুষ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে বামকরের তর্জ্জনী বাড়াইয়া জলদগম্ভীরনাদে "বামা বীরভূম" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। ইহা বামের অচিন্ত্য মহিমা।

৬। মত্তাক্রীড়া

মত্তাক্রীড়ো ভক্তো ধাবন্নভিদয়িতমথ পথি শকটপতিতঃ
শয্যাশায়ীভূয়ঃ স্বস্থোঽধ্বনি কুতুকহৃত ইব বিতনু বচসা।
বুদ্ধোঽবাধং যাতো বামে প্রভুদয়িতসখিপিতৃগুরুগতিশিবং
তারামম্বাঞ্চৈকাধারে নিখিলনিজজনমগভক্ত পরমুদা॥

ভক্ত মত্তবৎ প্রিয়তমাভিমুখে ধাবিত হইয়া পথে শকট হইতে পতিত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। পরে সুস্থ হইয়া পুনরায় যাইতে যাইতে কৌতুক-দর্শনে আকৃষ্ট হইলে অশরীরী বাণী দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া পুনরায় যাত্রা করতঃ বিনা বাধায় বামকে পাইয়া একাধারে প্রভু প্রিয়সখা পিতা গুরুপতিশিব ও জননী তারা এমন কি নিখিল আত্মীয়কে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

অপরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ না হইলে তাঁহার নিকট অবনত হওয়া যায় না। চণ্ডীমাহাত্ম্যে তাহা পরিস্ফুট। যথা—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

শুম্ভাসুরের দূত শুম্ভের জগদাধিপত্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া শুম্ভকে ভজনা করিবার জন্য জগদম্বাকে বলিলে তিনি মনে মনে হাসিলেন। উত্তরে বলিলেন.

আকৃষ্ট

—"শুম্ভাসুর ত্রিজগতের অধিপতি বটে, তাহার ভ্রাতা নিশুম্ভও তাদৃশ পরাক্রান্ত। কিন্তু কি করি, অল্পবুদ্ধি বশতঃ আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি— যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেন, কিম্বা যিনি আমার দর্পচূর্ণ করিবেন, কিম্বা যি‍নি আমার তুল্যবল হইবেন তাঁহাকেই আমি ভর্ত্তারূপে বরণ করিব।"

"বামা বীরভূম" শব্দে আকৃষ্ট সাধক আকর্ষক বামের নাম ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার শক্তির পরিচয় পান নাই। এক্ষণে তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাবের পরিচয় তাঁহার নিকট প্রকট হইল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। উন্মত্তের ন্যায় সদ্য কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিলেন।

দুর্ঘটনা

একা গাড়ীতে কাশ্মীর পার হইয়া পাঞ্জাবে পড়িলেন। পথে দুর্ঘটনা ঘটিল। অশ্ব হঠাৎ ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। গাড়ী উল্টাইয়া গেল। চালক লাফাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। আরোহী পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া শকট চলিয়া গেল। তিনি তীব্র আঘাতে অচৈতন্য হইলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সাময়িক শুশ্রূষা করতঃ তাঁহাকে কাশ্মীরে মহেশ বিশ্বাসের নিকট পাঠাইলেন। তথায় দুইমাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। কার্ত্তিক মাসে সুস্থ হইয়া পুনরায় বামের দিকে ধাবিত হইলেন। হরিদ্বারে আসিয়া বাষ্পযানে শীঘ্র দিল্লীতে পৌছিলেন।

দিল্লী পাণ্ডবগণের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের স্থলে প্রতিষ্ঠিত। বহুকাল যাবৎ ঐ স্থল ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। উহাই পৃথ্বীরাজের লীলাভূমি।

দিল্লী

উহাই মহম্মদীগণের রাজধানী। সাজাহান নূতন দিল্লী স্থাপন করেন। মোগলসম্রাটগণের ঐশ্বর্য্যে দিল্লী তৎকালে অতুলনীয় নগরী। দিল্লীশ্বরের সহিত জগদীশ্বরের উপমা উদ্ভট পরিচয়ে রক্ষিত।

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যৈর্ন দত্তং, নৃপেণ কিঞ্চিৎ শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥

দিল্লীর সম্রাট কিম্বা জগদীশ্বর আমার বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ। অন্য রাজা যাহা দিবেন তাহাতে আমার শাকের বা লবণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে মাত্র।

কলিকাতা ইংরাজের রাজধানী থাকা কালেও ইংরাজ রাজ দিল্লীতেই দরবার করিতেন। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশদ্বর্ষীয় রাজ্যোৎসব দিল্লীতেই পালিত হয়। তদুপলক্ষে ভারতের যাবতীয় সামন্ত নৃপতি দিল্লীতে সমবেত হন। ভূমিশূন্য 'রাজা মহারাজা' উপাধি ধারিগণের গণনা কে করে। তোষামোদাদি দ্বারা ধনী মানী অনেকে দরবারে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। ঐ তামাসায় যোগ দিতে কত রাজা, কত জমিদার ঋণী হইয়াছেন।

দরবার

উৎসবমুখর পুরীতে প্রবেশ করিয়া আগন্তুক হেমচন্দ্র সেনের অতিথি হইলেন। হেমচন্দ্র সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক। তিনি উদার প্রকৃতি ও বদান্য। পর্য্যটকের জন্য তাঁহার অতিথিশালার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। হেমচন্দ্রের আত্মীয়া আগন্তুকের ভক্ত। আগন্তুক ভক্তকে দর্শন ও যান পরিবর্ত্তনের জন্য দিল্লীতে নামিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দরবার দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া তিনি ভাবিতেছেন—"ধন্য ইংরাজ, ধন্য তোমার কর্ম্মশক্তি! ধন্য তোমার পুণ্যফল! ভারত তোমার ক্রীড়া পুত্তলিকা। এত গৌরব আর কোন বিদেশী জাতি পান নাই। তাই সকলে তোমার প্রতি ঈর্ষাকুল।" দরবার দেখিতে দেখিতে তাঁহার মন দোলায়িত। "একি দরবার দেখিবে, বড় দরবারে চল"—এই অশরীরিণী বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি কালক্ষেপ না করিয়াই পরবর্ত্তী বাষ্পযানেই গুরু দরবারে ছুটিলেন! কানপুর পার হইলে পুনরায় গুরুর বিভূতি দেখিলেন। তৃতীয় দিবসে বীরভূমের মল্লারপুরে উপস্থিত হইলেন।

বিভূতি

তখন তাঁহার পূর্ণযৌবন। হিমাচলের জলবায়ুতে শরীর সবল ও পরিপুষ্ট। বক্ষঃ বিস্ফারিত। শিরোভাগে নাতিলম্বিত কুন্তলরাশি। চক্ষে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। হস্তে পার্ব্বত্য যষ্টি। পদে পার্ব্বত্য পদত্রাণ। স্কন্ধে

নিজদ্রব্যসম্ভার। তাঁহার আবেগ বর্ণনাতীত। পথে দিবসত্রয় অনাহারী। মল্লারপুর হইতে দ্রুতপদে ছুটিয়াছেন। চিলে পার হইয়া দ্বারকার পথে পড়িয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ বাম ভক্তের আগমন জানিতে পারিয়া পাণ্ডাগণকে বলিতেছেন—"আজ দাদা আসিতেছেন।" পাণ্ডারা তাঁহার কথা ধরিতে পারিলেন না। অচিরে ভক্ত তারা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তারামাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বামদেব কোথায়" ? কালী পাণ্ডা তাঁহাকে বামের নিকট লইয়া গেলেন। আশ্রয়গৃহের সম্মুখে বাম ভক্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভক্ত তাঁহাকে পাইয়া যেন একাধারে প্রভু দয়িত সখা জনক, গুরু পতি শিব ও তারামাকে পাইলেন।

মিলন

৭। প্রজাগর

শিষ্যঃ স্নিগ্ধদৃশা বরন্ সুতপদে তস্মৈ শ্মশানে গুরুঃ
পীঠৈশ্বর্য্যমদর্শয়ন্ নিশি পুনস্তারারহস্যং জগৌ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনঞ্চ গুরবে শিষ্যোঽদদাদ্ দক্ষিণাং
ভূমানন্দমদঃ প্রজাগরমহো জাগর্ত্তু নো মানসে॥

শিষ্যকে স্নেহনিষ্যন্দিনী দৃষ্টি দ্বারা পুত্রপদে বরণ করতঃ গুরু তাঁহাকে রাত্রে শ্মশানে নিজপীঠের ঐশ্বর্য দেখাইয়া তারা তত্ত্বোপদেশ করিলেন। শিষ্যও গুরুকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনরূপ দক্ষিণা দিলেন। ঐ মহানন্দময় গুরু ও শিষ্যের জাগরণোৎসব আমাদের মানসে সর্ব্বদা জাগরূক থাকুক।

বাম কেবল করুণাসিন্ধু নন। তিনি স্নেহেরও পূর্ণসিন্ধু। প্রিয় শিষ্যকে তাঁহার পরিচয় দিলেন। স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া তাঁহাকে যেন পুত্ররূপে বরণ করিলেন। শিষ্য কৃতার্থম্মন্য হইয়া সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিলেন। পরক্ষণেই বামে সদানন্দময়ী তারামূর্ত্তিদর্শনে শিষ্যের মুখ হইতে তারাস্তোত্র-পংক্তি নির্গত হইল,—'কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিযুগান্বিতাম্'—

যাঁহার বামদিকের উর্দ্ধ ও অধঃ করে যথাক্রমে নরকপাল ও পদ্ম বিরাজিত।

তেজস্বী শিষ্য বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ডাকিলেন"? গুরু অনুভব মুদ্রায় মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে ধীরে বলিলেন—"কি জানেন, আপনার জন্ম ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়, কাল নয়, পরশু নয়, তার পরদিন আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে" অনুভব মুদ্রায় স্মৃতি জাগে। শিষ্যকে তাই ঐ মুদ্রা ধরিয়া উপদেশ দিলেন। শিষ্য কার্ত্তিকমাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় শুক্রবারে শেষরাত্রে ভূমিষ্ঠ হন। পরম আদরে শিষ্যকে আরও কহিলেন—

সর্ব্বজ্ঞ

"আপনি কয়দিন উপবাসী আছেন। কিছু ছোলা সিদ্ধ ও মুড়ি খান।" উপবাসের পর এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। শিষ্য অবিচারিতভাবে এ আদেশ পালন করিলেন। দেহকৃত্যে ও গুরু শুশ্রূষায় দিবস কাটিয়া গেল।

ঐ দিবস পীঠে ৫।৬ জন ভৈরব ভৈরবী উপস্থিত। তাঁহাদের নির্ব্বন্ধে রাত্রে শিমূলতলায় বাম চক্রানুষ্ঠানে চক্রেশ্বরপদ স্বীকার করেন। প্রিয়

চক্রানুষ্ঠান

শিষ্যও চক্রানুষ্ঠানে যোগ দিলেন। তারা প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। নিশীথান্তে ভৈরব ভৈরবীগণ নিদ্রাভিভূত হইলেন। বাম তখন সুতকল্প শিষ্যকে মহাশ্মশানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর গাঢ় তমস্বিনী মহানিশা। শিষ্য তেজস্বী সাধক। হিমাচলে নির্জ্জন ভীষণস্থানে একাকী বহু বর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি অকুতোভয়।

পীঠৈশ্বর্য্য

তারাপীঠ জনাবাস। এখানকার শ্মশানে তাঁহার কি ভয়? এইরূপ তাঁহার মনে ধারণা। শব ভূমিতে পদার্পণ করিতেই হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে একটা চিতা জ্বলিল। ক্ষণপরে শত শত হস্তীর তুমুল বৃংহতি ধ্বনি শুনিয়া দরবিস্ময়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ? এসব কি তোমার খেলা?" নিরভিমান ভক্তাবতার উত্তর দিলেন, "এযে তারামার রাজ্য, মার কত ঐশ্বর্য্য!" তারপর শিষ্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দাদা কাঁপছেন, ভয় পেয়েছেন?" বলিয়া শিষ্যের বিশালদেহকে বগলদাবা করিয়া একছুটে আশ্রম ঘরে গেলেন। একটু পরে বলিলেন, "আমি পাত্র ফেলে এসেছি"—বলে শিষ্যকে ঘরে শিকল দিয়া পুনঃ শ্মশানে ছুটিলেন।

৮। বিনায়ক

পশুবিধিপালনোৎসুকমমাদিবসে কুলধর্ম্মদীক্ষিতম্
নিশি শবসাধনেহন্তিকগতং গময়ন্নবশক্তিমূর্জ্জিতাম্ ॥
প্রতিপদি মজ্জয়ন্নিব সুধাম্বুধি স্বপ্নথ মন্ত্রশোধনাৎ
স্বগণবিনায়কং শিবগুরুর্বিদধে পরসিদ্ধিভাজনম্ ॥

অমাবস্যাদিবসে পঞ্চাচার পালনোৎসুক নবাগত শিষ্যকে কৌলধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মহানিশায় শবসাধনে বিশিষ্ট নবশক্তি সঞ্চার করতঃ প্রতিপদ তিথিতে তৎফলে তাঁহাকে যেন সুধাসিন্ধুতে মগ্ন রাখিয়া তৎপরদিনে তাঁহার স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রশোধন করতঃ সেই নিজগণপতিকে শিবস্বরূপ গুরু পরম সিদ্ধি-ভাজন করিলেন।

পরদিন অমাবস্যা, সূর্য্যগ্রহণ। ছোটক্ষ্যাপার ইচ্ছা উপবাসাদি নিয়ম পালন করতঃ জপ করেন। তিনি হঠযোগী, সাধক, বিধিনিষেধের অধীন। এ সুযোগ কেন ছাড়িবেন! বাম রাজযোগী সিদ্ধপুরুষ, বিধিনিষেধের অতীত। তাঁহার বাহ্যানুষ্ঠান নাই, তাঁহার শরীর মনপ্রাণ তারামর। ছোটক্ষ্যাপাকে ঐরূপ সাধনের অধিকারী করিবেন বলিয়া হিমাচল হইতে ডাকিয়া আনিয়াছেন। তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "দাদা, পায়স ও মাংস খাইব।" ছোটখ্যাপাকে প্রসাদ লইতে হইবে। বিধিনিষেধ গণ্ডী থাকিবে না। গুরুর আদেশমত শিষ্য মাংসাদি পাক করিলেন। গ্রহণের কাল উপস্থিত। বাম আহারীয় আনিতে বলিলেন। ছোটক্ষ্যাপা বলিলেন, "আপনার সবই বিপরীত।" বাবা নিরভিমান, নিজে বিধিকিঙ্কর নহেন ইহা বলিতে চান না। গুরুপরম্পরাগত কৌলাচারই এই কৌলতীর্থের উপযোগী বুঝাইবার জন্য উত্তর দিলেন, "এযে শিমুলতলা!" আগন্তুক বুঝিলেন—বাম অবধূত, দ্বিতীয় মহেশ। তথাপি তিনি অবধূতাচারকে নিন্দাবাদ করিলেন, "পিশাচে পাইলে সত্যবর্জ্জিত হয়।" বাবা উত্তরে খড়্গ দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই গুরু, দেবদানবযক্ষগন্ধর্ব্ব, সকলেই ইহার উপাসক। ইহাতেই ব্রহ্মদণ্ড। এঁর দ্বারাই পিশাচমোচন।" ভক্ত ভাব বুঝিতে না পারায় বাম তাহাকে আবর্ত্তনীয় মুদ্রায় উহা বুঝাইয়া বলিলেন—"খড়্গ মহেশ্বরের প্রাণ, রোহিনী তাহার উৎপত্তিস্থান, রুদ্রদেব তাঁহার গুরু।" অমাবস্যার গ্রহণ বাহ্যতঃ নিয়ম-

ভঙ্গে পালিত হইল। রাত্রিতে শ্মশান সাধনা। ছোটক্ষ্যাপা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার ভিতর শক্তি সঞ্চার হইয়াছে। তৎফলে প্রতিপদে দিবারাত্র তিনি যোগনিদ্রাভিভূত। দ্বিতীয়া প্রাতে উঠিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সংস্কারের আয়োজনের জন্য ভাবিতেছেন। বামের দীক্ষা লৌকিকী নহে যে ষোড়শোপচারে পূজা হোম গুরুবরণের জোড় ইত্যাদি নানাদ্রব্য সম্ভার আবশ্যক। শিষ্য ফুল তুলিয়া আনিলে বাবা বলিলেন, "ঝিল বেড়িয়ে এলাম। দক্ষিণ মশানে অনেক কাঠ পড়িয়া আছে। নিয়ে আসুন আগুন জ্বালতে হবে। আজ যে আপনার সংস্কার।" ছোটখ্যাপা দ্বারকাতীরে শ্মশানে শবকাষ্ঠ আনিতে গেলেন। হস্তে একখানা, স্কন্ধে একখানা, কুক্ষিদেশে একখানি কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া শ্মশান হইতে ফিরিতেছেন। শ্মশানেই দেখিলেন একটি সর্প বাম দিক হইতে আসিয়া তাঁহার দক্ষিণে স্থিরভাবে দাঁড়াইল: উভয়ে উভয়কে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। ছোটক্ষ্যাপার বোধ হইল তারামা তাঁহার নাগভূষণ পাঠাইয়াছেন। শিমূলতলায় আসিয়া ঐ ঘটনা প্রকাশ করিলে বাবা বলিলেন, "ঐ নাগের সহিত তোমার যুদ্ধ হ'বে।"

শিমূলতলায় শবকাষ্ঠে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। উভয়ে অগ্নির সম্মুখে বসিলেন। গুরুর মুখ অগ্নিকোণে, শিষ্যের বায়ুকোণে। চক্রানুষ্ঠান হইল। ক্ষ্যাপা কিশোর বয়সে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করতঃ তাহা হইতে পঞ্চাক্ষর বাদ দিয়া একাদশাক্ষর রাখিলেন। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শিষ্যের যষ্টি লইলেন। ঐ দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আদিত্যবার। বাবা পুনঃ পুনঃ বলিলেন, "স্নান সমাপনান্তে পূর্ণকুম্ভে আদিত্যের উপাসনা কর।" শিষ্য মন্ত্র পরীক্ষা করিলেন। গুরু শিষ্যে অপূর্ব্ব কথোপকথন হইল। গুরু বলিলেন—"কেমন রে কেমন?" শিষ্য বলিলেন—"হ্যাঁরে হাঁ।" এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, সমস্যা সমান।

শিষ্যও কেও কেটা নন। তিনিও মহাপুরুষত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম তারানাথ ব্রহ্মচারী। সাধারণে তারাক্ষ্যাপা বলে। তিনি গুরুভক্তির আদর্শ। দশরথ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"ন ত্র্যম্বকাদন্যমুপাসিতাসৌ।" ত্র্যম্বক ভিন্ন রাজা দশরথ কাহাকেও উপাসনা করেন না। ছোটক্ষ্যাপা সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে—"বাম ভিন্ন তিনি

চতুর্দ্দশভুবনে কাহাকেও মানেন না। তিনি বিনামায় "তারা" নাম লিখিতে কুণ্ঠিত নহেন। 'বাম' নামও লিখিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "ঐখানেই সঙ্কোচ, কারণ বামকে যে মাথা বেচিয়াছি।" বাবাও তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। ঐ স্নেহ তাঁহার সম্ভ্রমজড়িত জানাইবার জন্য বাবা তাঁহাকে 'দাদা" সম্বোধন করিতেন। তিনিও বীরসন্তানবৎ কখনও কখনও বাবাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহার গুরুস্থানের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাভক্তি যে কখনও তিনি রামপুরহাট হইতে তারাপীঠ গোশকট সুলভ হইলেও না হাঁটিয়া যান নাই। একবার তিনি সন্ধ্যার সময় রামপুরহাটে পৌছিয়া গুরুর প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ তারাপীঠমুখে যাত্রা করেন। দ্বারকা পার হইলে অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। সরলপুরের মাঠে তিনি দিশাহারা হইয়া পথ হারাইলেন। এদিকে বাবা আশ্রমে তাহা জানিতে পারিয়া সোৎকণ্ঠভাবে সেবায়েৎ পাণ্ডাকে বলিতেছেন—"দাদা আসিতেছেন তাঁহাকে পাছে গিলিবার চেষ্টা করিতেছে।" পাণ্ডা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বাবার কৃপায় কিছুক্ষণ পরে বীরতনয়ের দিগ্‌জ্ঞান হইল। অবশেষে তিনি আশ্রমে পৌছিলে সাদরে বাবা বলিলেন—"দাদা তোমাকে পাছে গিলিতে ছিল।" শিষ্য বলিলেন—"হাঁ বুড় মহারাজ! সব তোমারই খেলা।" বাবা তাঁহার গুহ্য বিদ্যার অনেকতত্ব উঁহাকেই উপযুক্ত বুঝিয়া দিয়াছেন। ছোটক্ষ্যাপা বা তারাক্ষ্যাপা বিপুল শক্তির অধিকারী। তিনি বিভূতি দেখাইয়া ধনমানের প্রার্থী নহেন। তিনি মহা সিদ্ধিকামী। গুরু তাহা এখনও তাঁহাকে দেন নাই বলিয়া গুরুর নিকট জোর করেন।

তিনি যখন পলাশীর নিকট জুরণপুরের শ্মশানে শবসাধনা করেন সেই সময় একদিন এক পুত্রহারা মাতার করুণ ক্রন্দনে কাতর হইয়া দুই বোতল কারণ শুদ্ধ করিয়া মৃত পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন। পরে সেই দুই বোতল সঙ্গে লইয়া তারাপীঠে উপস্থিত করেন। বাবা বোতল খুলিয়াই বলেন—"মদ বদ, দাদা, মড়ার গন্ধ কইচে। খায়েন না। খাবেন, একমুষ্টি চালের অন্ন, ঘনাবর্ত্ত দুধ, ফলমূল।" গুরুভক্ত বীর সন্তান এক মুহূর্ত্তে বাহ্য পঞ্চমকার ত্যাগ করেন ও শুদ্ধসাত্বিক আহার গ্রহণ করেন।

তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় অনেক আছে। অন্যায় তিনি কাহারও সহিতে পারেন না। ভয়ও কাহাকে করেন না। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা

রামেশ্বর সিং গদি পাইবার পরেই ভ্রাতৃজায়ার সহিত মোকর্দ্দমার সময় সদলবলে তারাপীঠে আসেন। শ্মশানভৈরব বামকে ও তারামাকে প্রসন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শিমূলতলার বেদীতে জপ করিবার জন্য কানাৎ দিয়া তাহা ঘেরেন। তখন ছোটক্ষ্যাপা তথায় উপস্থিত। তাঁহার পরশুরাম মূর্ত্তি, হস্তে কুঠার। মহারাজার আচরণে উদ্বেলিত হইয়া মহারাজকে বলেন, "শিমূলতলা তোমার দ্বারভাঙ্গার গদি নয়। এস্থান সকল সাধকের সমান অধিকার। কানাৎ উঠাও।" মহারাজা কানাৎ তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

ঐ সময় কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় তারাপীঠে বামের কৃপাপ্রার্থী হইয়া সস্ত্রীক গিয়াছেন। রাজার কুমারী বামকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। তিনি আশ্রমে বামের পদধৌত করিয়া নিজ আঁচলে উহা মুছাইতেছেন। ছোটক্ষ্যাপা তাহা দেখিয়া তাঁহার হাত হইতে বামের চরণ ধরিলেন এবং নিজ দীর্ঘ-কেশপাশে তাহা মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন—"এইরূপে ত গুরুসেবা করিতে হয়।" তাঁর প্রাণের ভাব—

সোহাগসঞ্চিত উষ্ণ আঁখিজলে
ধুয়াব চরণ, মুছাব কুন্তলে।

বাবা তাঁহার সেই ভাব দর্শনে বলিলেন—"দাদা যান্। আপনি কামরূপ জয় করিয়া আসুন।"

সন ১৩১৮ সালে শ্রাবণ মাসে যখন বাম দেহ রাখেন তখন ছোটক্ষ্যাপা কামরূপে। তাঁহাকে কে যেন স্পর্শ করিয়া বলিল—"তুমি কি করিছো, আমি চলিলাম।" মুখ ফিরাইয়া দেখেন—বামের মূর্ত্তি। তিনি তৎক্ষণাৎ কামাখ্যাধাম হইতে তারাপীঠ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনদিন পরে শ্রীধামে আসিয়া শুনিলেন—বাম দেহ রাখিয়াছেন। × × ×

বামের ইঙ্গিতে তিনি এ দাসের সাধনপথে সহায়। সে লীলা তরঙ্গান্তরে বর্ণিত। তিনি বামভক্তগণের শিরোমণি। প্রতিভা জ্ঞান তপঃসিদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার গণপতিত্বের লক্ষণ।

৯। দৈবাদেশ

কান্তাশোকে পরিহৃতগৃহো বিপ্রো হবা কাশ্যপঃ।
স্বর্গতাং তাং নয়নপথগামীপ্সন্ মনোহারিণীম্॥
নানাতীর্থে গুরুমভিসরম্ সিদ্ধং নিরাশঃ পুন।
দৈবাদেশাদ্ দ্রুতমুপগতো বামং গুরুং সিদ্ধিদম্॥

কান্তাবিরহে শোকাকুল হইয়া কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণযুবক গৃহত্যাগ করতঃ স্বর্গতা মনোরমা প্রিয়ার দর্শনাভিলাষে নানাতীর্থে সিদ্ধগুরু অন্বেষণ করতঃ ব্যর্থমনোরথ হইলেন, পরিশেষে দৈবাদেশে সিদ্ধিদাতা গুরু বামের নিকটে শীঘ্রই উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিগমানন্দ স্বামী শক্তিমান পুরুষ। তাঁহার রচিত জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু, তান্ত্রিক গুরু, প্রেমিক গুরু প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার জ্ঞানভক্তির নিদর্শন। তিনি আসামে সারস্বত মঠ বঙ্গদেশে নানাস্থানে আশ্রম স্থাপন করতঃ শাস্ত্রালোচনা ও সাধনার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার বহু শিষ্যসেবক। চিদানন্দ প্রভৃতি চিরকুমার শিষ্যগণ গুরুর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

নিগমানন্দের সাংসারিক নাম নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস নদীয়া জেলার কুতুবপুর গ্রামে। যৌবনোদ্‌গমে বিবাহ ঘটে। অনুরূপ দম্পতীর মধ্যে অল্প দিনে প্রগাঢ় প্রেম হয়। অনিত্য সুখেই নলিনীনাথ বিভোর ছিলেন। হঠাৎ করাল কাল তাহাতে কুঠারাঘাত করিল। যৌবনেই তিনি পত্নী হারাইলেন।

পত্নীশোক

বিরহব্যথায় আকুল হইলেন। শোকই চিত্তসংশোধনের দ্বার। শোকেই তাঁহার পারত্রিক পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন— তাদৃশ প্রণয়পাঠ ছিন্ন করিয়া কান্তা কোথায় গেলেন? জীব কোথা হইতে আসে, কেন আসে, কোথায় যায়, মৃত্যুর পর অস্তিত্ব কিরূপ থাকে? ইহজীবনে মৃত্যুর পরে জীবের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে কিনা ইত্যাদি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা তাঁহার হৃদয়ে জাগিল। সন্তানাদি বন্ধন ছিল না। সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া মহাপুরুষের অন্বেষণে বাহির হইলেন। তৎকালীন বিখ্যাত মহাত্মাগণের আশ্রয়ও লইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্যার

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

সমাধান হইল না। সাম্পরায় বিদ্যা চাহিতেছিলেন, স্বর্গতা পত্নীর সাক্ষাৎ করাই তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য। পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল শাস্ত্রীয় মত শ্রবণে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি পারলৌকিক অস্তিত্বের অনুভূতি চাহিতেছিলেন। সম্পরীতা কান্তাকে কেহই দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে সংশয় আসিল। ভাবিলেন—মরণের পর জীবন কাকাণ্ডিবৎ। উহা দার্শনিকের কল্পনামাত্র। নানাস্থানে কয়েক বৎসর ঘুরিবার পর কলিকাতায় জনৈক ব্যক্তির অতিথি হইলেন। রাত্রে ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা আসিল। নিশীথে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন—শয়নকক্ষ আলোকিত। সন্দেহ হইল দীপ কি নিবাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। প্রণিধানের পর গৃহমধ্যে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারই দেহকান্তিতে গৃহ উদ্ভাসিত। ইহা কি স্বপ্ন না চিন্তা জর্জর মস্তিষ্কের বিকার। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিলেন; সেই মূর্তি দণ্ডায়মান। তাঁহার সহিত কথা বলিতে গেলেন। তখন মূর্তি অন্তর্হিত। গৃহের দ্বার রুদ্ধ। এ মূর্তি কিরূপে প্রবেশ করিল? কিরূপেই বা বিলীন হইল! আরও বিস্ময়ের কথা তাঁহার শয্যায় একখানি বিল্বপত্র এবং তাহাতে একটী অপরিচিত দুর্বোধ্য মন্ত্র লিখিত। এই ঘটনায় ধারণা জন্মিল যে, স্থূল জগৎ ভিন্ন সূক্ষ্ম জগৎ আছে। অনুসন্ধিৎসা জন্মিল। পুনরায় ভ্রমণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ মন্ত্রের কোন ব্যাখ্যাতা পাইলেন না। পুনরায় পরলোকে সংশয়ান্বিত হইলেন। একদা এক ভগ্নবাটীতে প্রায়োবেশনে ত্রি দিবস কাটাইতে মনস্থ করেন। ক্লান্তিবশতঃ প্রথম প্রহরেই নিদ্রাদেবীর অঙ্কে শায়িত। স্বপ্ন দেখিলেন যেন কলিকাতায় প্রত্যক্ষীভূত মহাপুরুষ গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিতেছেন—"বাবা, হতাশ হইও না।" সেই মহাপুরুষের অনুসন্ধানে আবার বেড়াইলেন। ঋষিকুলের আকর দেবতাত্মা নগাধিরাজের দক্ষিণ ও উত্তরদিকে বহুকাল কাটাইলেন। নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করিলেন। সকলেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু যুবক সন্ন্যাসীকে আদর করিলেন। কেহ কেহ শিষ্য করিতে চাহিলেন। কেহ কেহ কথঞ্চিৎ বিভূতি দেখাইলেন। কিন্তু কেহই অলৌকিকভাবে লব্ধ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে

অলৌকিক মূর্তি ও মন্ত্র

অনুসন্ধিৎসা

পারিলেন না। নবীন সন্ন্যাসী যে রহস্য জানিতে চান তাহার মীমাংসা কোথাও না পাইয়া তিনি শিষ্যত্ব লইলেন না।

এ জীবনে জন্মমৃত্যু রহস্যভেদ হইল না এই নিরাশান্ধকারে সহসা তারাপীঠ ভৈরবের নিকট যাইবার জন্য দৈবাদেশ পাইলেন। আনন্দে তারাপীঠ যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন। শিরে জটাভার, করে কমণ্ডলু, কটিতে কৌপীন। বীরভূমে পৌছিয়া কবিচন্দ্রপুর দিয়া দ্বারকা পার হইয়া তারাপীঠের মনাশ্মশানে উঠিলেন। শ্মশান ঘাটের পথ ধরিয়া তারামার মন্দির বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

১০। নিগমানন্দ দেবীদর্শন

পৃষ্ট্বার্ত্তং গুহমিব গুরুস্তং সাম্পরায়ার্থিনং
তারা বিশ্বাকৃতিরিতিবদন্ যাগে শ্মশানে চ তাম্।
বিষগ্‌জ্যোতিঃ স্থিতপরিচিত স্ত্রীরূপিনীং দর্শয়ন্
তারাকণ্ঠকুলিত নিগমানন্দং ব্যধত্তাশ্রিতম্॥

সেই আর্ত্ত পরলোকতত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে শ্রীগুরু নিজকুমারবৎ সাদরে গ্রহণ করিয়া 'তারা বিশ্বরূপা' ইহা মুখে প্রথমে বলিয়া শ্মশানে শবযজনে মহানিশায় দেবীকে অনন্তজ্যোতিঃ মধ্যবর্ত্তিনী পরিচিত নিজপত্নীরূপে দেখাইয়া কান্তার কমনীয় কণ্ঠস্বরে নিগমতত্ত্ব আলাপে আশ্রিতকে আনন্দিত করিলেন।

বাম তখন জীবৎকুণ্ডের পশ্চিমদিকের ঘাটে বসিয়া আছেন। সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে অস্তোমুখ। রক্তিম কিরণে দ্যাবাপৃথিবী রক্তিমরাগ ধরিয়াছে। নবাগত সন্ন্যাসী পশ্চিমদিক হইতে শ্রীবামের অভিমুখে আসিতেছেন। অগ্রেই তাহার ছায়া গুরুর পাদস্পর্শ করিল। বাবা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত শিষ্য চরণে পতিত। বাবা বলিয়া উঠিলেন, "কে রে ভাগ্যবান্ এলি?" ভক্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন। যে আশা বক্ষে ধরিয়া সংসার ছাড়িয়াছেন, যাহার অন্বেষণে কয়েক বৎসর কতস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিফল হইয়াছেন। তাঁহার সেই আশা এক্ষণে ফলবতী হইবে। অপার

সাগরে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত মগ্নপ্রায় নাবিক আশ্রয়স্থল বন্দর পাইলে যেরূপ ভাবান্বিত হন নলিনীনাথের সেইভাব। ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে ধরে না, প্রেমাশ্রুরূপে বহির্গত। গদগদস্বরে বলিলেন—"আমি আজ ভাগ্যবান বটে।" শ্রীবাম এরূপ সিদ্ধভক্তের সমাগমে উৎফুল্ল। সকলই জানিয়াছেন। নটের গুরু তিনিই। তথাপি বলিলেন—"কি চাও বাবা?" ভক্ত নিজের অন্তরের কথা লুকাইয়া বলিলেন—"তারামাকে।" বাবা উত্তর দিলেন—"সে ত সহজ বাবা!" তারা মা সর্ব্বত্র বিরাজমান। ঐ দেখ, বাবা, অস্তাচলগামী তপনে তারামা; ঐ জলে তারামা, ঐ স্থলে তারামা, এই অনন্ত আকাশেও তারামা।" ভক্ত বলিলেন—"বাবা, ওসব তারামা বটে, কিন্তু ও নিত্য দেখি, তারামা বলিয়া বোধ হয় না। আমি ও নকল চাই না, আসল চাই।" বাবা বলিলেন—"বেশ বাবা, থাক, সময়ে পাইবে।" শিষ্যকে উপযুক্ত বিধায় আশ্রমেই স্থান দিলেন। শিষ্যও শ্রীগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। বাম অন্তর্দ্রষ্টা ও অন্তর্জগৎ দেখাইতে পারিবেন এ বিশ্বাস তাঁহার আসিয়াছে। তিনি গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া গুরুসেবায় রত রহিলেন। গুরু তাঁহার স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রের যাহা ব্যাখ্যা করিলেন তা গুহ্যাতিগুহ্য। শিষ্য শমদমাদিসাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ও মুমুক্ষু। তাঁহাকে অধিকদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।

কুলবারে কুলনক্ষত্রে অমাবস্যা যোগ ঘটিল। বাম বলিলেন, "আজ তোমার লগ্ন উপস্থিত। শিষ্যের মহানন্দ। আর কেহ জানিল না। দিবসে বিশিষ্ট বাহ্যকর্ম্মদ্বারা পরিচয় দেওয়া হইল না। মহানিশায় গুরু ও শিষ্য ব্যতীত আশ্রমে কেহ ছিলেন না। তখন শ্রীগুরু শিষ্যকে মহা শ্মশানে লইয়া গেলেন। রজনী গাঢ়তমোগুণ্ঠকাবৃতা। আকাশে তারাকুল মিটিমিটি জ্বলিতেছে মাত্র। জন মানব নাই। দ্বারকা কুলুকুলু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও সারমেয় শব লইয়া দ্বন্দ্ব করতঃ শ্মশানের নীরবতাভঙ্গ করিতেছে। বাম নির্ভীক। এ শ্মশান তাঁহার রাজ্য। নবাগত শিষ্যও সাহসী। শ্রীগুরুর বলে বলীয়ান। বাম শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সমন্বিত এক শব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহা যথাবিধি সংস্কার করতঃ তদুপরি শিষ্যকে বসিতে আদেশ দিলেন এবং জপমন্ত্রও দিলেন। শিষ্য গুরুপদেশমত যথাবিধি শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। জপ করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান

মধ্যে মধ্যে লুপ্ত হইতেছে। জাগ্রতাবস্থায় ভীতির সঞ্চারও কচিৎ কচিৎ হইতেছে। তখনি শ্রীগুরুর "জয়তারা" নাদ শুনিতেছেন। সেই ভব-ভয়হারী ধ্বনিতে সকল ভয় বিদূরিত হইতেছে। এইরূপ ব্যুত্থানমিশ্রিত সমাধি কতক্ষণ চলিল। পরে অন্তর্জগতে মন প্রবেশ করিল। বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত ও অখণ্ড তেজোময় জগৎ উদ্ভাসিত। সেই অনন্ত জ্যোতিমধ্যে উজ্জ্বলতর জ্যোতির্ম্ময়ী এক রমণীয়া নারীমূর্ত্তি আবির্ভূতা। মূর্ত্তি তাঁহার চিরপরিচিতা, চিরাকাঙ্ক্ষিতা প্রণয়িনীর মূর্ত্তি। কিন্তু তাহার কি দিব্যছটা, কি দিব্য আভরণ, কি দিব্য ভাব, কি দিব্য হাসি! তাঁহার সহিত কথোপকথন নিগমানন্দের শিষ্য চিদানন্দ "মায়ের কৃপা" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথোপকথন শেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইল। 'অস্তি নাস্তি ভাতি ন ভাতি' অবস্থা আসিল।

প্রাতে যখন সমাধি ভাঙ্গিল শিষ্য দেখিলেন—তাঁহার মস্তক শ্রীগুরুর ক্রোড়ে ও দেহ শ্মশানে বালুকা শয্যায় লুণ্ঠিত। দিনমণি অরুণরাগে পূর্ব্বাকাশ ভাসাইতেছেন। শ্মশানের তরুনিচয়ের শিরোদেশ কনক কিরণে রঞ্জিত। শিষ্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া গুরুচরণে পতিত হইলেন। প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। গদ্গদকণ্ঠে নিগমের ভাষায় শ্রীগুরুবন্দনা করিলেন—

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে।
বিদ্যাবতারসংসিদ্ধৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ ॥
নারায়ণ স্বরূপায় পরমাত্মৈকমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বাজ্ঞান তমোভেদভানবে চিদ্ঘনায় তে ॥
স্বতন্ত্রায় দয়াকৢপ্ত বিগ্রহায় শিবাত্মনে।
পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে ॥
বিবেকিনাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিনে।
প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে ॥
ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়ামৃত্যু মহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ ॥

হে নাথ! হে ভগবন্! তুমি গুরুরূপী শিব। তোমাকে নমস্কার। বিদ্যাবতারসংসিদ্ধির জন্য তুমি নানারূপ ধরিয়া থাক। তুমি নারায়ণস্বরূপ।

তুমি পরমাত্মস্বরূপ। তুমি অজ্ঞান তমোবিনাশক সূর্য্য। তুমি চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি। তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বাধীন জীবের উদ্ধারের জন্য তুমি কৃপাবশতঃ দেহধারণ কর। নচেৎ তুমি সাক্ষাৎ শিব। তুমি ভক্তগণের পরমতত্ত্ব। তুমি মঙ্গলভাজনগণের সুমঙ্গল। তুমি বিবেকীর বিবেক। তুমি বিমর্শকারীর বিমর্শ। তুমি প্রকাশের প্রকাশক। তুমি জ্ঞানীর জ্ঞান, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তোমার কৃপায় অদ্য মায়ামৃত্যুরূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার সকল কর্ম্মের অবসান হইয়াছে। এক্ষণে আমি শিব।

যুবক বহুকাল যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন, এতদিনে বামের কৃপায় তাহা পাইলেন। যুগপৎ পত্নীরূপদর্শন, মহামায়া সাক্ষাৎকার ও জন্মমৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। যখনই বামদত্ত মন্ত্রে আহ্বান করেন তখনই মহামায়া পত্নী-রূপে দেখা দেন। তৎকারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরু ভঙ্গী করিয়া প্রকাশ করিলেন, "বাবা, মহামায়ার মানবীমূর্ত্তি তিনি; তাহার মধ্যে তুমি যাহা চহিতেছিলে, তাহাই পাইতেছ।"

জননী জন্মকালে চ স্নেহকালে চ কন্যকা।
ভার্য্যা ভোগায় সম্পৃক্তা অন্তকালে চ কালিকা।
একৈব কালিকা দেবী বিহরন্তি জগৎত্রয়ে॥

একই কালিকাদেবী জন্মকালে জননীরূপে, ভোগবিলাসে ভার্য্যারূপে, স্নেহদর্শনে কন্যারূপে এবং অন্তকালে কালীরূপে ত্রিজগতে বিহার করিতেছেন।

ভক্ত কৃতার্থ হইয়া শ্রীগুরুচরণে বিদায় হইলেন। তিনি পরে জ্ঞানসাধনা, অজপা সাধনাদি প্রেমসাধনার জন্য অন্য গুরু গ্রহণ করেন। গুরু চতুষ্টয়ের নিকট লব্ধবিদ্যা, তান্ত্রিকগুরু প্রভৃতি পুস্তক চতুষ্টয়ে দিয়াছেন। তিনি পরে নিগমানন্দ সরস্বতী নামে অভিহিত হন। আসাম ও বঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন জন্য বহু মঠ স্থাপন করতঃ জীবের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন—"বাম মাতৃভাব সাধনায় সিদ্ধ। মার আদুরে ছেলে।" আমরা বলি—'তিনি ভাবাতীত সর্ব্বভাবময়।'

১১। মহাকাল

বিদ্বাংসং বন্দ্যবংশং হরিহরপরং ছিন্নসংসারপাশং।
স্বক্ষেত্রে পূর্ণচন্দ্রং নিজমহাকালমুদ্বুধ্য বামঃ॥
নেপালে যোগভূতিং পশুপতিপদে লম্ভয়ন লোকভূত্যৈ।
লীলান্তপুণ্যপীঠেহ্ প্রকটমপিতং পাদমূলে স্থধত্ত॥

বন্দ্যবংশীয় অধ্যাপক হরিভক্ত পূর্ণচন্দ্র সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া তারাপীঠে শ্রীবামের আকর্ষণে উপস্থিত হইলে বাম সেই নিজমহাকালকে প্রবুদ্ধ করিয়া নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে তাঁহাকে সিদ্ধি দিয়া জীবকল্যাণে তাঁহাকে রাঢ়দেশে বিচিত্রলীলা করাইয়া অন্তর্হিত সেই ভক্তকে অন্তেও স্বীয়চরণমূলে স্থান দিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার মানকর প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। প্রায় সার্দ্ধচতুঃশতবর্ষ পূর্ব্বে মানকরের জীবননামক জনৈক ব্রাহ্মণ নশ্বরধনের কামনায় বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতন গোস্বামীর পদাশ্রয়ে অবিনশ্বর কৃষ্ণধনের সন্ধান পান। একালে মানকরের সন্নিহিত গ্রামবাসী বন্দ্যবংশীয় শ্রীপূর্ণচন্দ্র বামের নিকট তারা ধনপ্রাপ্ত হন। পূর্ণচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। বাঁকুড়া জেলায় কুঁচেকোল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মানকরের বৈষ্ণব সাধক হরেকৃষ্ণ বাবাজী তাঁহাকে প্রথমে আকর্ষণ করেন। পূর্ণচন্দ্রের ধর্ম্মভাব আজন্ম প্রবল। বাবাজীর সঙ্গ মণিকাঞ্চন সংযোগতুল্য হইল। তিনি হরিনামে মাতিলেন।

গৃহত্যাগ

তাঁহার বৈরাগ্য উদিত। গৃহে থাকিতে পারিলেন না। পূর্ণচন্দ্র হরেকৃষ্ণ বাবাজীর সহিত কিছুদিন ঘুরিলেন। বাবাজী উন্নত সাধক। তথাপি পূর্ণচন্দ্র বাবাজীকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বামের নাম ও মহিমার বিষয় শুনিয়াছিলেন। বামের কৃপাও প্রকটিত। সাং ১৩০৩

দীক্ষা

সালে পূর্ণ তারপীঠে ছুটিলেন। বামকে দেখিয়াই আত্মসমর্পণ করিলেন। অলৌকিক দৃগ্‌দীক্ষায় বাম নবাগত শিষ্যের হৃদয়ে তারাতত্ত্বের বীজরোপণ করিলেন।

নিমীল্য নয়নে ধ্যাত্বা পরতত্ত্বে প্রসন্নধীঃ।
সম্যক্ পশ্যেৎ গুরুঃ শিষ্যং দৃগ্‌দীক্ষা ভবেৎ প্রিয়ে॥

—কুলার্ণবতন্ত্র।

সদাশিব পার্ব্বতীকে উক্ত দীক্ষার লক্ষণ বলিতেছেন—"হে প্রিয়ে! যখন গুরু প্রসন্নবুদ্ধিতে মুদিত লোচনে পরতত্ত্ব সম্যক্ ধ্যান করতঃ শিষ্যের প্রতি করুণদৃষ্টি করেন তাহাই দৃগ্‌দীক্ষা।" সদ্‌গুরুর করুণ কটাক্ষপাতে শিষ্যের কৃতকৃত্যতা লাভ হয়। গুরু শুশ্রূষার জন্য পূর্ণ তারাপীঠে রহিলেন। তারামার প্রসাদ সাধকদের জন্যই রাজা রামকৃষ্ণ বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনা কঠোর পরীক্ষায় তাহা পাওয়া যায় না। পূর্ণও গুরুতীর্থে পরপিণ্ডোপ-জীবী হইতে অনিচ্ছুক। তিনি গুরুর ন্যায় অভিমানশূন্য নহেন। গুরুর কৃপায় এ সমস্যার সমাধান হইল। ঐ সময়ে তরামার পাচকের পদখালি হয়। পূর্ণ তাহা স্বীকার করিলেন। শ্রীগুরু আজন্মসিদ্ধ, তারাময়। সুতরাং তিনি তারামার বাহ্য পরিচর্য্যা করিতে পারেন নাই। শিষ্য সাধক তারাময়ত্ব পিপাসু। তিনি তারামার বাহ্যপরিচর্য্যায় সমর্থ হইলেন। তারসেবা ও গুরুসেবা উভয়সেবাই তাঁহার অদৃষ্টে একত্র ঘটিল।

কিছুদিন পরে করুণাময় গুরু তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিলেন। সে অভিষেকও বাহ্যসলিল সেবন নহে। তাহা অন্তরাভিসেচন। বিহঙ্গম যেমন স্বীয় শাবককে সঙ্গে লইয়া উড়াইতে শিখায়, বামও সেরূপ স্বীয় সন্তানকে কিছুকাল সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দিলেন। পরে পূর্ণাঙ্গতার জন্য তাঁহাকে নেপালে পশুপতিনাথে পাঠাইলেন। সেখানে শ্রীগুরুর কৃপায় আচরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। পরে পুনরায় গুরুর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গুরুর ইঙ্গিতে তিনি বাঁকুড়া জেলার মেলেড়া গ্রামের শ্মশানে বসিলেন। শ্রীগুরুর বাহ্যাচরণ গ্রহণ করিলেন। শ্মশানেই তাঁহার আলয়, শ্মশানচর শৃগালাদি তাঁহার সহচর, শবকন্থাই তাঁহার পরিচ্ছদ হইল। তিনি বামাচার লইলেন। গুরুর ন্যায় পঞ্চম মকার বর্জ্জন করিলেন। মহাসিদ্ধির জন্য অন্তঃ এবং প্রাকৃত পঞ্চতত্ত্ব তারা সাধনায় ব্যাপৃত হইলে তারাপ্রেমে তিনিও ক্ষিপ্ত হন। তাঁহার পূর্ণক্ষ্যাপা নাম বাহির হয়।

সিদ্ধিলাভ

মেলেড়া বাঁকুড়া জেলার এক গণ্ডগ্রাম। তথাকার চট্টোপাধ্যায়েরা বিখ্যাত। তাঁহাদেরই অন্যতম দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকপদ প্রাপ্ত হন। তৎপার্শ্ববর্ত্তী পাড়িয়া গ্রামের দুর্গাদাস তেওয়ারী অবস্থাপন্ন। তাঁহার পুত্র কঠিন রোগগ্রস্ত হন। সব চিকিৎসাই বিফল হইল।

অন্তিমাবস্থায় রোগীকে তুলসীতলায় বাহির করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এমন সময় পূর্ণক্ষ্যাপা তথায় উপস্থিত হন। দুর্গাদাস

প্রচার

ক্ষ্যাপার ভক্ত। ক্ষ্যাপার নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিলেন। পুত্রের আয়ুঃ ছিল। ক্ষ্যাপারও দয়া হইল। তিনি জল পড়িয়া রোগীর উপর সিঞ্চন করিতে মৃতপ্রায় দেহে জীবনীশক্তি জাগিয়া উঠিল। অচিরে রোগী সুস্থ হইল। মুহূর্ত্তে এই বার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঐ অঞ্চলের বহুলোক তাঁহার ভক্ত হইল। পূর্ণ ইচ্ছা করিলে আশ্রমাদি করিতে পারিতেন। তিনিও গুরুর ন্যায় ত্যাগী। সুতরাং একখানি চালাঘর মাত্র শ্মশানে উঠাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি নিত্য ভিক্ষায় বাহির হইতেন। দুই এক ঘরের নিকট যাহা পাইতেন তাহা নিজেই পাক করিয়া অতিথি সেবান্তে নিজ দেহধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিতেন। এ বিষয়ে শালিখার প্রসিদ্ধ চটগাঁই বাবার সহিত পূর্ণচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখা যায়।

বামের দেহরক্ষার পর সন ১৩২১ সালে দামোদর বন্যায় বর্দ্ধমান বিভাগের অর্দ্ধাংশ ভাসিয়া গেলে শ্রীবাম এ দাসকে আর্ত্তসেবায় ব্রতী করেন। তাঁহার কৃপায় যথাসময়ে সেবকদল গঠিত হয়। ক্রমশঃ তাহা বামা মিশন বা বামসেবক সম্প্রদায় নামে মেদিনীপুর প্লাবনে, পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষে, বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গ প্লাবনাদিতে কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হয়। ১৩২২ সালে বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে যখন বামা মিশন খাতড়া থানায় সদাব্রত খুলিয়া নিত্য সহস্রলোকের অন্ন বৎসরাবধি যোগাইতেছিল, তখন পূর্ণচন্দ্র একক মেলেড়ায় সদাব্রত খোলেন। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে প্রথমে তিনি ২৫।৩০ জনের জীবন রক্ষা করেন। ঐ সময় একদিন স্থানীয় জনৈক ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলেন—'যদি একভরি শঙ্খবিষ খাইতে পারেন তবে তাঁহার সেবাব্রতের জন্য ১০০৲ দিবেন।' ক্ষ্যাপা অম্লান বদনে একভরি শঙ্খবিষ খাইলেন ও ১০০৲ লইয়া দুর্ভিক্ষ সেবায় ব্যয় করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী এরূপ সেবাব্রত চালাইতেছেন, ইহাতে প্রথমে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে। পরে তাঁহারা যথার্থ বিষয় জানিলে তাঁহার উপর সন্দেহ কাটিয়া যায়।

পূর্ণ দাদাও বাবার মত সহজে লোককে ধরা দিতেন না। তাঁহার সিদ্ধির

সংবাদে বহুলোক তাঁহাকে উত্যক্ত করিত। তিনি কথনও তাহাতে কৃতক কোপ দেখাইতেন। আবার উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে তাঁহার স্নেহের উৎস ছুটিত। অণ্ডালের নিকটবর্ত্তী রামকিঙ্কর হালদার প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। সন ১৩২৮ সালে ভাদ্র মাসে তিনি গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া তারাপীঠে আসেন। শিমূলতলায় বাবার সমাধি মন্দিরের পাশেই তাঁহার সমাধি দেওয়া হয় ও তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়।

দেহত্যাগ

কালিকাপুরাণে বর্ণিত মহাকাল শিববীর্য্যোৎপন্ন। শিবই তাঁহাকে লালন করিয়া স্বগণের জনৈক অধিপতি করেন। পূর্ণচন্দ্র বামের মহাকাল।

১২। ভৃঙ্গী

বাল্যে দুর্ললিতং ততো বিপথগং নিঃস্বঞ্চ রোগাকুলং।
ত্যক্তং বন্ধুজনৈর্নিরাশ্রয়জগচ্চন্দ্রং সগোত্রং দ্বিজম্॥
শস্ত্রমর্পয়িতং গলে ব্যবসিতং ছায়াবপুর্বারয়।
স্বং পাদাম্বুজপাংশুলী বিরজসং বামেঽকরোৎ ভৃঙ্গিনম্॥

কলিকাতায় যোড়াসাঁকোর মুখোপাধ্যায় বংশ প্রথিতযশা। তাঁহাদের দশাবিপর্য্যয় ঘটিলেও এখনও ঠাকুরবাটী প্রভৃতি তাঁহাদের ভক্তিবিভবের সাক্ষ্য দিতেছে। জগচ্চন্দ্র তাঁহাদের দৌহিত্র। তাঁহার মাতুল না থাকায় তিনি মাতামহীর বড় আদরের ধন ছিলেন। পিতা বল্লালী কৌলিন্য করিয়াছিলেন, সুতরাং জগৎ মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হন। কৈশোরে মাতামহ পরলোকগত হইলে তিনি অসৎসঙ্গে অসৎপথের পথিক হন। ক্রমশঃ তাঁহার বিশেষরূপ অধঃপতন ঘটে। মাতামহীর মৃত্যুর পর মাতামহের সম্পত্তি নষ্ট করেন। নিজের শরীরও ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় জীবন্মৃত হন। সন ১৩০০ সালে তিনি দারিদ্র্যক্লেশ ও রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার আশায় গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজের গলদেশে ক্ষুর দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। তখন আচম্বিতে দেখিলেন সম্মুখে এক শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁহার ক্ষুরসমন্বিত দক্ষিণহস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান। রঘুবংশে কবিবর কল্পনাবলে

অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কুশাবতীর প্রাসাদে রুদ্ধার্গল গৃহে নিশীথে শ্রীরামনন্দনের গৃহে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যথা—

অথার্দ্ধরাত্রৌ স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশামদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতাম পশ্যৎ॥
সা সাধু সাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্ব্বং তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ॥
অথা ন যোঢ়ার্গলমপ্যগারং ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাং।
স বিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধ বিসৃষ্টতল্পঃ॥

অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে যখন পরিজনগণসুপ্ত কিন্তু নিশ্চলপ্রদীপ শয়নগৃহে রাজা কুশ জাগ্রৎ তখন তিনি প্রোষিতভর্তৃকবেশা অদৃষ্টপূর্ব্বা এক রমণীকে দেখিতে পাইলেন। সেই রমণী শত্রুঞ্জয় ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম বন্ধুসহায় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়শব্দপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিলেন। দর্শনে প্রবিষ্ট ছায়ার ন্যায় রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রবিষ্টা রমণীকে শ্রীরামনন্দন সবিস্ময়ে শয্যা হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ উন্নমিত করিয়া বলিলেন ইত্যাদি।

জগচ্চন্দ্রের ঘটনা অনুরূপ। "এ নহে কাহিনী, কবির কল্পনা।" জগচ্চন্দ্র বিস্মিত ও অ-বাক্। "আত্মহত্যা মহাপাপ, তারাপীঠে সাক্ষাৎ হইবে" বলিয়া ছায়াপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। জগৎ কখনও তারাপীঠ বা তারাপীঠের শ্রীবামকে স্মরণ করেন নাই। বাম অহেতুক করুণাসিন্ধু। পতিতোদ্ধার জন্য তাঁহার অবতার। না জানি এই পতিতের কি প্রাক্তন পুণ্যফল ছিল। প্রভু ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া সৎপথে ফিরাইবার জন্য ছায়াশরীরে বদ্ধার্গলগৃহে প্রবেশ করিলেন। জগতের জীবনস্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি তারাপীঠের সন্ধান করিয়া ছুটিলেন। করুণাময় প্রাণদাতা অচিন্ত্যমহিম বামকে স্থূলে দেখিয়া পদতলে লুটাইলেন।

জগৎ যথার্থ বামকে জীবনের ভার দিলেন এবং বামও তাঁহার ভার লইলেন। জগৎকে সংস্কার দিলেন নিজের নিকট কয়েকদিন রাখিয়া; পুনরায় পরীক্ষার জন্য সংসারে পাঠাইলেন। জগৎ এখন ভিন্ন লোক। তাঁহার যৌবনের দোষ এখন গুণে পরিবর্ত্তিত। প্রেম যমুনায় এখন উজান বহিতেছে। অসার বারনারী সঙ্গের পরিবর্ত্তে সারাৎসারা 'তারা' বরনারী

সঙ্গের জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত। সঙ্গীতশক্তি এখন তাঁহার সাধনার সহায়। কুৎসিত সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে এখন রামপ্রসাদী ভক্তিসঙ্গীত তাঁহার মুখে অবিরত উচ্ছসিত। প্রাণপ্রিয় দেবকে ঘন ঘন দেখিতে যান। তদ্দর্শনে তাঁহার ভাব তরঙ্গ উঠে।

অচিরে তাঁহার প্রতি বামের পূর্ণকৃপা হইল। জগৎছাড়া হইলেন। কৌল সন্ন্যাস গ্রহণে তারাবামের নামগানে জীবন ঢালিয়া দিলেন।

শ্রীবামের দেহরক্ষার পর সন ১৩২৬ সালে হাওড়া বালিতে আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠকল্প শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে জগচ্চন্দ্রের সহিত পরিচয় ঘটে। জগৎ দাদা তদবধি আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর স্বরূপ দেখেন। তখন তাঁহার জগৎক্ষ্যাপা নাম হইয়াছে। তিনি তখন সংসার ছাড়িয়া এঁড়েদার দেমগুলদের ঘাটে গঙ্গাবাসী ঘরে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। আমাদের সিংহি বাগানের বাসায় তিনি বহুবার আসিয়াছেন। জনাইয়ের বাটিতেও পদধূলি দিয়াছেন। নিজমুখে শ্রীগুরুর উপরোক্ত লীলা বর্ণনা শুনিয়াছি। "গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্" এই ধ্বনি প্রায়ই তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উঠিত। মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "বাপ কি খাঁড়া।" জিজ্ঞাসা করায় শেষোক্ত বচনের অর্থ বলিয়া দেন যে—"সংসারে যন্ত্রণাই জগদম্বার খড়্গাঘাত। তাহা মাদৃশজীবের পক্ষে প্রথমে ভয়াবহ বটে কিন্তু পরিণামে কল্যাণকর।"

তাঁহার নিকট দশমহাবিদ্যার নিম্নলিখিত সুন্দর স্তোত্র পাইয়াছি—

কালী	জয় জগদীশ্বরি! কালি! কুলেশ্বরি। অসুরভয়ঙ্করি! পাপযুতম্। নাদচলিতগিরিপূরিতকন্দরি! জয় শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥
তারা	নীলসরস্বতি! তারে ভগবতি! হর জড়তাপতমাশ্রগতম্। পৃথু লম্বোদরি ভুবন বিষধরি জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥
ষোড়শী	ঈশ্বরকেশবরুদ্রকমলভব শিরসি সদাশিবমুদবসিতম্। হে ত্রিপুরেশ্বরি! ভবসাগরতরি জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥
ভুবনেশ্বরী	ইন্দ্রমুকুটবতি লোহিতভাস্বতি বেদভুজে নতমার্ত্তণ্ডতম্। হে ভুবনেশ্বরি সুরকুলশঙ্করি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম॥

ভৈরবী — মাতর্ভৈরবি! দুরিততিমিররবিরজ্যি রজস্তব গিরীশমুতম্।
সেবকহিতকরি! শঙ্করসহচরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

ছিন্নমস্তা — ছিত্বা নিজশিররাপিবসি রুধিরমসিহস্তারুণাভা পতিতম্।
রতিকামোপরি পদমর্দ্দনকরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

ধূমাবতী — ধূমাবতি! সতি! ভক্ষিতনিজপতি! রথমারোহসি কবটযুতম্।
তনুরুচিধূসরি! কলহপ্রমদকরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

বগলা — পীতকবসনে! ধৃতরিপুরসনে! জহি গদয়া দ্বিষতামযুতম্!
প্রণতদয়াদরি! কালে জিত্বরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

মাতঙ্গী — পাশাঙ্কুশমসিখেটং প্রবহসি হংসি রিপুং শুচি রোষযুতম্।
মাতঙ্গি! কদরি! বিদলনকুঞ্জরি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

কমলা — দ্বিরদচতুষ্টয়বিধৃতকণকময়কলসৈঃ স্নাপনমাচরিতম্।
কমলে! গহ্বরি! হরিধৃততস্করি! জয়শিবসুন্দরি! পাহিসুতম্॥

জগৎ দাদা সন ১৩২৮ সালে আমার সহিত তারাপীঠে শ্রীগুরুর তিরোভাব মহোৎসবে যান। মার মন্দিরের অলিন্দে আশ্রয় লন। শ্রীবামের জগাই বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিতেন। গুরুর মহিমাকীর্ত্তনে তাঁহার যেন শতাধিক বদন হইত। গুরুর উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস। যাহা কিছু অনুযোগ অভিযোগ সবই তাঁহার গুরুর উপর। দুঃখ পাইলে তাঁহারই দান বলিতেন। সুখ পাইলেও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেন।

যখন তিনি রামপ্রসাদাদির গান গাহিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতিরুদ্ভাসিত নয়নযুগল হইতে প্রেমধারা বিগলিত হইত। তিনি আত্মহারা হইতেন। সে সঙ্গীত লহরীতে পাষণ্ডও দ্রবীভূত হইত। তিনি বলিতেন যে গঙ্গাতীরে নিজাশ্রমে যখন নির্জনে তিনি গাহিতেন তখন শ্রীগুরু অদৃশ্যভাবে তাঁহার সহিত যোগ দিতেন। তাঁহার দুঃখ এই ছিল যে ছায়া শরীরেই গুরু তাঁহার সহিত লীলা করিতেন, সম্মুখে স্থূলে দেখা দিতেন না।

জগৎক্ষ্যাপার দেহরক্ষাও অদ্ভুত। রবিবার অপরাহ্নে এঁড়েদার দেমগুলের

ঘাটে স্থানীয় ভদ্রলোক তাঁহার উপদেশ ও গীত শুনিতে সমবেত হইতেন। সন ১৩৩০ সালে গ্রীষ্মকালে এক রবিবার ঐরূপ সমাবেশে আমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ৺শরচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। জগৎদাদা সৎকথা মধ্যে তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনাইতেছেন। সূর্য্যাস্ত গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার তখনও ধরার মুখখানি সম্পূর্ণ আবৃত করে নাই। পার্শ্বে তরুশাখায় কুলায়ে বসিয়া জগৎপিতার আত্রিক গান করিতেছে। সম্মুখে ভগবতী ভাগরথী মরুহিল্লোলে ঐ গীতির তালে তালে নাচিতেছেন। হঠাৎ একখানি মড়ার খাটিয়া ভাসিতে ভাসিতে ঘাটে লাগিল। জগৎদাদা তাহা দেখিয়া বালকের মত ছুটিলেন ও তাহা তুলিয়া আনিলেন। ভদ্রমণ্ডলী বিস্মিত। তিনি বলিলেন—"ওরে মা আমার জন্য খাটিয়া পাঠাইয়াছেন। কাল প্রাতে আমাকে লইয়া যাইবেন।" তিনি সুস্থ সবল, উপস্থিত সকলে তাঁহার কথা শুনিয়া ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি মনে করিলেন। তাঁহার কিন্তু নির্ব্বন্ধাতিশয়। তিনি খাটিয়া নিজের কুঠরীতে তুলিয়া তাঁহার শয্যা উহার উপর পাতিলেন। আমার ভ্রাতা ও দুই তিনটি লোক শেষপর্য্যন্ত জগৎদাদার নিকট ছিলেন। তাঁহাদিগকে তিনি আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন—"তোমরা তিনজন কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আসিবে। আমি ঐ সময় এই খাটিয়ায় শুইয়া দেহত্যাগ করিব। আমার শয্যার নীচে ৫৲ টাকা সৎকারের জন্য থাকিবে।" তাঁহাদের ঐ কথা প্রতীতি হইল না। জগৎদাদা তাঁহাদের সহিত ঐ ঘাটে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বসিয়া সদালাপ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। যদিও জগৎদাদার কথায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই, তথাপি ঐ কয়জন সূর্য্যোদয়ের একটু পূর্ব্বেই ঐ ঘাটে আসিলেন। আমার ভাই একটু আগেই গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষ্যাপার শয়ন কুঠরীর কবাট ঠেলিলেন। উহা অর্গলবদ্ধ ছিল না। সামান্য লোহার ছিটকানি যা লাগান ছিল একটু অঙ্গুলি দ্বারা আঘাতে খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন সন্ন্যাসী সেই খট্টায় শয়ান, তাঁহার কণ্ঠশ্বাস চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই তিনি অন্তর্জলির জন্য গঙ্গায় লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আরও ২।৩ জন ইতিমধ্যে সমবেত হইয়াছে। মদীয় ভ্রাতা সন্ন্যাসীকে লইয়া মার নাম গাহিতে গাহিতে অন্তর্জলি করিলেন। নব সূর্য্যোদয়ের সহিত তাঁর প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগতি হইল। চক্ষু বিস্ফারিত। ইহলীলা অবসিত।

এই ইচ্ছামৃত্যুর সংবাদ তড়িতবেগে নগরে প্রচারিত হইল। সোমবার হইলেও বহুলোক আসিয়া প'ড়িল। খট্টার নিম্নে সৎকারের জন্য ৫৲ টাকা পাওয়া গেল। তাহাতে অকুলানবিধায় সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা ২০৲, ২৫৲ টাকা উঠিল। চন্দনকাষ্ঠ ও প্রচুর ঘৃতে সাধু দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইল। তৎপরে তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণে গ্রামবাসিগণ ভূরিভোজন করাইলেন।

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হয়। জগাই মাধাই উদ্ধার প্রত্যেক মহাপুরুষই করিয়া থাকেন। জগৎদাদা বলিতেন তিনি বাবার জগাই। আমাদের ধারণা তিনি বামের ভৃঙ্গীরিট।

১৩। নরশঙ্কর

ধর্ম্মরাজকরাৎ কৃতে সমরক্ষয়ৎ শিশুতাপসং
চন্দ্রশেখরবিগ্রহো বিভুরর্জ্জিতঃ কিন রোষতঃ।
কালসর্পমুখাৎ কলৌ গৃহিণং যুবানমযাচিতোহ
মোচয়ন্নরশঙ্করঃ ফণিভূষণং খলু সামতঃ।

সত্যযুগে চন্দ্রশেখররূপে তাপসশিশু মার্কণ্ডেয়কে বিভু সংস্তুত হইয়া যমহস্ত হইতে কোপপ্রকাশপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিযুগে নরাকার শঙ্কর গৃহী যুবককে অযাচিতভাবে কালসর্পমুখ হইতে ফণিভূষণরূপ দেখাইয়া সামপ্রয়োগে মুক্ত করিলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় রাণীগঞ্জের নিকট ইকড়া নামে এক গ্রাম আছে

তথাকার বিজয়গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে তিনি স্থানীয় কোন কয়লার খনিতে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিতেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে তিনি বাঁকুড়া জেলায় কোন ঝরণায় একখানি রক্তাভ গোল পাথর কুড়াইয়া পান। তাহা তিনি অন্নপূর্ণাজ্ঞানে নিজগৃহে পূজা করিতে থাকেন। ঐ প্রস্তরটী মূল্যবান হীরক। লেখক একদিন উহার পূজা করিয়াছেন। উহা করতলে রাখিলে একটি গোল রক্তিম আভা পড়ে। ভবানন্দ মজুমদারের পক্ষে 'অন্নদার ঝাঁপি'র ন্যায় উক্ত প্রস্তরখণ্ড বিজয়-গোবিন্দের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক হয়। উহা পাইবার পর হইতে তাঁহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার জোৎজানকী, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়লার খনি ও বাঁকুড়ার জমিদারী ইত্যাদি সম্পত্তির মূল্য অন্যূন দশলক্ষ টাকা ছিল। ষষ্ঠীভাগ্যও ভাল। জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার জীবদ্দশায় মারা যান। মধ্যম পুত্র প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কয়লার বাজারে খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। বিজয়গোবিন্দ ধনের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। পূজায় ক্রিয়াকলাপে রাজার ন্যায় মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। নিজগ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। শেষবয়সে তিনি পুত্রগণের উপর কর্ম্মভার দিয়া শ্যামাসঙ্গীত রচনায় ও জগদম্বার সেবায় রাজর্ষির ন্যায় জীবন কাটান। তাঁহার চতুর্থপুত্র হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় আজন্ম ধর্ম্মপরায়ণ ও শিবভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে কয়লার কারবারে মধ্যম সহোদরের সহকারী হন। কখনও ইকড়া জোৎজানকী খনির কাজকর্ম্ম দেখিতেন। কখনও বা কলিকাতায় উঁহাদের কয়লার কার্য্যালয়ে থাকিতেন। তিনি

দর্শনাকাঙ্ক্ষা।

বামের নাম শুনিয়া আকৃষ্ট হন। যৌবনে একটি পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে শান্তির জন্য তারাপীঠে বামের চরণ দর্শনের অভিলাষী হইয়া পিতার অনুমতি চাহিলে পিতা বলেন, "বামের ন্যায় সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার তোমার এখনও হয় নাই। পরে তুমি যাইও।" পিতৃবাক্যে তিনি বামদর্শন স্থগিত রাখেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী বাম তাঁহার হৃদয়াধিকার করিয়া তাঁহার পুত্রশোকে শান্তি দেন ও তাঁহার ভক্তি বৃদ্ধি করেন।

সন ১৩১০ সাল ভাদ্রমাসে হৃষীকেশ কলিকাতায় আসেন। এইদিন গঙ্গাস্নানান্তে বাসায় ফিরিতেছেন এমন সময় সহসা এক অপরিচিত গৈরিক

বসনধারী তাঁহাকে উপযাচক হইয়া বলিলেন—"তোমার আগামী বৎসর ভাদ্রমাসে এই তারিখে নিশীথে সর্পদংশনে মৃত্যুযোগে দেখিতেছি।" হৃষীকেষ ধীর। এ কথায় বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে নিজবাসায় আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন না। বলিলেন—"তোমার বাসায় গিয়া তোমার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে তোমার মনে হইবে আমি লাভের আশায় তোমায় ভয় দেখাইয়াছি" হৃষীকেশ মৃত্যুযোগের প্রতিকারের কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঐ নিশীথে শুভাদৃষ্ট বশতঃ যদি তোমার কোন মহাপুরুষের আশ্রয় ঘটে, তাহা হইলে তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। হৃষীকেশও মনে মনে ঐ কথা তোলাপাড়া করিতে করিতে বাসায় আসিলেন। কিন্তু কাহাকেও এ বিষয় জানাইলেন না। এই লেখকের সহিত বহুপরে তাঁহার ধর্ম্ম ভ্রাতৃসম্বন্ধানুরোধে ও বামের মহিমা-কীর্ত্তনচ্ছলে তাঁহার এই গোপনকাহিনী প্রকাশ করেন।

পূর্ব্বাভাস

হৃষীকেশের বাতব্যাধি ছিল। এই মৃত্যুব্যাপারের পূর্ব্বাভাসের কিছু পরে বাতব্যাধি প্রকোপ হইলে তিনি বাটী চলিয়া যান। চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম হইলে জোৎজানকী কয়লার খনি পরিদর্শনে ব্যাপৃত থাকেন। বীরভূম জেলায় আমেদপুর ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে বেলেগ্রামে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মরাজ শিব আছেন। ধর্ম্মরাজের বাতব্যাধির ঔষধ বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় বিখ্যাত। বিজয়গোবিন্দের পরিবার আস্থাবান। সুতরাং ধর্ম্মরাজের ঔষধ ধারণের প্রস্তাব উঠিল। হৃষীকেশ তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন —"এক যাত্রায় বেলের ধর্ম্মরাজ দর্শন ও তারাপীঠের ভৈরবদর্শন ঘটিবে। সঙ্গে পঞ্চানন নামে তাঁহার এক মাসতুত ভাইও চলিলেন। পথে যাত্রা করিয়া বাহির হইলে পর পঞ্চাননের নিকট বেলে হইতে তারাপীঠ যাইবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন। আমেদপুরে নামিয়া ধর্ম্মরাজের ঔষধ যথানিয়মে বাঁধিয়া রামপুরহাটে অপরাহ্নে পৌছিলেন এবং তথা হইতে তারাপীঠে ইষ্টদর্শনে ভাদ্রমাসে পদব্রজে চলিলেন।

যাত্রা

বাম সবই জানিয়াছেন। সমস্ত তাঁহারই লীলা। তিনি সেদিন অপরাহ্নে নিজ আশ্রমে খ্যাপা মুটুপাগ্‌লা প্রভৃতিকে বলিতেছেন—"আজ আমার পরম

ভক্ত সন্তান আসিতেছে। মার পূজাদি দিবে।" কিছুক্ষণ পরেই আশ্রমে সন্তান উপস্থিত। বর্ষাকালে দুর্গম কর্দ্দমাক্ত পথে প্রায় চারিক্রোশ হাঁটিয়া সন্তান ক্লান্ত। তিনি বামকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণের আবেগে প্রণিপাত করিলেন। বাম তখন ধূমপান করিতেছিলেন।

প্রথমদর্শন

শ্রান্তসন্তান ধূমপানে অভ্যস্ত! তাঁহার ধূমপানের অভিলাষ হইয়াছে। অন্তরঙ্গ বাম তাহা বুঝিয়া নিজ হুঁকা তাঁহার হাতে দিলেন। যদিও বামকে হৃষীকেশ গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন তথাপি "আজ্ঞা গুরুণাং অবিচারণীয়া" বোধে দ্বিধা না করিয়া তিনি হুঁকা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। নুটু পাণ্ডার চক্ষে উক্ত আচরণ বিসদৃশ বোধ হওয়ায় তিনি প্রতিবাদ করতঃ বলেন—"বাবু, আপনার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। ইনি মহাপুরুষ। বালাভাব বশতঃ ইনি আপনাকে হুঁকা দিতে পারেন। আপনি কি বলে ঐ হুঁকা টানিতেছেন?" আগন্তুক স্বচরিত্র সমর্থন না করিলেও বাম নুটুকে বলিলেন—"আমার ছেলেকে আমি দিয়াছি। ছেলে টানিতেছে। তোর কথায় কাজ কি?" নুটু নিরস্ত হইলেন। হৃষীকেশ বলিলেন—"পাণ্ডাঠাকুর তোমরা তীর্থগুরু। প্রথমেই তোমার সহিত কলহ হইল। চিরসদ্ভাব স্থাপন জন্য আমরা তোমার যজমানত্ব স্বীকার করিলাম। নুটু আনন্দিত। বিবাদ মিটিল।

পাণ্ডা জানাইলেন যে বাম কিছু পূর্ব্বেই রাত্রে শিমূলতলায় পূজা হইবে বলিয়াছেন। যাত্রী পাণ্ডার হাতে খরচপত্র দিলেন ও পাণ্ডা পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। রাত্রে শিমূলতলায় পূজা ও বলি হইল। কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ দেওয়া গেল। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক হইলে আশ্রমে চক্রানুষ্ঠান হইল। প্রসাদ বিতরণাদি করিয়া কার্য্য শেষ হইতে অর্দ্ধরাত্র কাটিল। পাণ্ডাঠাকুর যজমানগণকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। যজমানদের অভিপ্রায় বাবার আশ্রমে অবস্থিতি করেন। হৃদয়জ্ঞ বাম পাণ্ডাকে বলিলেন—"আমার ছেলে আমার কাছে থাকিবে।" হৃষীকেশ বাবার জন্য একখানি কম্বল লইয়া গিয়াছিলেন। বাবা তাহাই বিছাইতে বলিলেন। নটুপাণ্ডা বাবার শয্যা পাতিয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

পূজাদি

বাবার আশ্রমে সদর পথের পশ্চিমে ও শিমূলতলার পূর্ব্বদক্ষিণকোণে

অবস্থিত। উহা পূর্ব্বদ্বারি। ঘরের দক্ষিণ ও উত্তর অলিন্দ আবৃত। পূর্ব্বদিকের অলিন্দটির উত্তর ও দক্ষিণাংশ আবৃত। কিন্তু মধ্যভাগে অনাবৃত প্রবেশদ্বার। শীতকালে ঐ প্রবেশপথে পর্দ্দা ফেলা থাকিত। ঘরখানি থাকিত চাবিবদ্ধ। বাবা তাহার পূর্ব্ব অলিন্দের উত্তরাংশে দক্ষিণদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতেন। যথাস্থানে বাবার কম্বল পাতা হইয়াছে। ঐ পূর্ব্ব বারান্দার দক্ষিণদিকে আগন্তুকগণ কম্বল পাতিতেছেন, বাবা বলিলেন—"হৃষীকেশ তুমি আমার দিকে শুইবে।" পঞ্চাননের শয্যা দক্ষিণদিকে রহিল। হৃষীকেশ বাবার পদতলে বেষ্টিত কম্বল উত্তরাংশে পাতিলেন। বাবা তখনও শয়ন করেন নাই। তিনি আশ্রমের প্রবেশপথ অবরোধ করতঃ ধূমপান করিতেছেন। হৃষীকেশ তাঁহার বাম পার্শ্বে নিরাপদস্থানে বসিয়া আছেন। পঞ্চানন ঐ প্রবেশপথের দক্ষিণদিকে। আশ্রমের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে একখণ্ড ক্ষুদ্র পতিত ভূমি। তাহার পূর্ব্বে একটী রাজপথ ও তৎপরে জোৎকুণ্ড নামক তারামার সরোবর। পঞ্চানন ঐ সরোবরের পাড় পর্য্যন্ত অন্ধকারে ছায়া ছায়া দেখিতে পাইতেছেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হৃষী, ঐ পুষ্করিণী হইতে একটি মস্তবড় সাপ ছুটিয়া আসিতেছে।" সর্প আশ্রমে উঠিয়া বামদিকে যাইলে পঞ্চাননের প্রাণ সংশয়। তাহার বাহিরে যাইবার উপায় নাই। তাই তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অবিলম্বে কালসর্প আশ্রমের প্রবেশ পথে আসিল এবং পঞ্চানন শয্যার দিকে না গিয়া হৃষীকেশের শয্যার দিকে বাঁকিল। কিন্তু বাম ঐ পথে উপবিষ্টা সুতরাং সর্প বামের ক্রোড়ে উঠিল। নিমেষমধ্যে বামের পূর্ব্বকায় বেষ্টন করতঃ তাঁহার মুখপানে ফণামণ্ডল আনিয়া দুলিতে লাগিল।

আগন্তুকগণ অবাক হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছেন। শুনিয়াছেন দেবাদিদেব বাম ভুজঙ্গভূষণ। মানবদেহে বামলীলায় তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। বাম সর্পকে বলিতেছেন, "হিংসা প্রবৃত্তি ভাল নয়। স্বস্থানে যাও!" দ্বিজিহ্ব নিজ জিহ্বা লিক্ লিক্ করিতেছে। বাম মধ্যে মধ্যে তাহার চোখে তামাকের ধুঁয়াও দিতেছেন।

প্রাণদান

ক্ষনেক পরে সর্প বামের দেহ হইতে বেষ্টন খুলিয়া হৃষীকেশের দিকে না গিয়া পঞ্চাননের দিকে নামিল। পঞ্চানন তখন হতজ্ঞান। অতঃপর ভুজঙ্গ বামের আশ্রমগৃহের দ্বারের রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তখন

হৃষীকেশের স্মৃতিপটে একবৎসর পূর্ব্বেকার গঙ্গাস্নানান্তে সন্ন্যাসী সমাগমের কথা উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন মৃত্যুযোগ সংবাদদাতাও রাম, মৃত্যুহরও রাম। তখন তাঁহার ভক্তিভাব এত প্রগাঢ় যে মুখ দিয়া কৃতজ্ঞতাবাণীও সরিল না। তাঁহার প্রাণে কিন্তু এই প্রকার ভাবতরঙ্গ উঠিল—

"হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারং।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তম্
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে।"

১৪। দেবগুরু

বিনা ত্রাণং প্রাণৈঃ কিমিতি মণিভদ্রঃ মিত্রতনয়ং
হৃষীকেশাকারচ্যুতমিহদিবোঽ রক্ষন্নুপদম্।
পরীক্ষ্যাপি ধান্তে নিশি শবগৃহে দেবাকতিধরো
দদৌ তস্মৈ তারাতুলরসসুধাং রামোঽখিলগুরুঃ॥

ত্রাণ না করিলে প্রাণরক্ষা বৃথা ইহা ভাবিয়া হৃষীকেশ নামক মনুষ্যাকারে ধরাধামে চ্যুত নিজমিত্র কুবেরনন্দন মণিভদ্রকে রক্ষা করিয়া তৎপরেই মহানিশায় অন্ধকারে ঘোর শ্মশানে পরীক্ষা করতঃ দেবাকার ধরিয়া তারকনাথ গুরু তাহাতে অনুপম রসাত্মক তারাসুধা দিলেন।

অযাচিতভাবে আগন্তুকের মৃত্যুযোগ কাটাইয়া করুণাময় শয়ন করিলেন। আগন্তুক তাঁহার পদতলে শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "এস বাবা, তুমি আমার পাশে শুইবে।" ভক্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। ভগবান বলিলেন, "ছোট ছেলের গা বাপের গায়ে লাগিলে দোষ নাই।" তখন ছেলে আর থাকিতে পারিলেন না বাপের কোলে শুইলেন। ক্ষনেকপরে পুত্রের কঠোর পরীক্ষা হইল। পিতা বলিলেন, "বাবা অধিক কারণ করাইয়াছ পিপাসা লাগিয়াছে। নদী হইতে একটু জল আনিতে পার?" ভাদ্রমাস মেঘমেদুর অম্বর। নক্ষত্র তিরোহিত। রজনী গাঢ় তমস্বিনী। আশ্রমের প্রাচীন

পরীক্ষা

শ্মশান বৃক্ষলতাকীর্ণ। তথায় ঘন সূচীভেদ্য অন্ধকার। শবাস্থি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ। প্রেতালয়ে সর্পাদির অভাব নাই। ঐ শ্মশান পার হইয়া তবে দ্বারকা নদী। হৃষীকেশ সদ্য আসিয়াছেন। পথ অনভ্যস্ত। তাঁহার প্রাণে কিন্তু ভগবান অসীম বল দিয়াছেন। ভক্ত অবিচারিতভাবে কমণ্ডলু লইয়া উঠিলেন। কেবল প্রভুর নিকট তাঁহার চিমটা চাহিয়া লইলেন। পঞ্চানন শুইয়া আছেন। "বাবা তাহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—"ছেলে একলা যাইতেছে, তুমিও যাও।" সর্প ব্যাপারে পঞ্চাননের আত্মাপুরুষ প্রায় উড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে অন্ধকারে সেই আশ্রয় হইতে বাহিরে যাইতে পারিতেছে না। বাম তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। "ব্যাটা এমন মোটা যে তিনটা বাঘে খেতে পারে না। ব্যাটার ভয় দেখ। যা আমার ঘর থেকে বেরো।" তিরস্কারের ফলে পঞ্চানন ঘরের বাহির হইল বটে কিন্তু দুই চারিপদ গিয়াই থামিল। সর্ব্বজ্ঞ বাম বুঝিয়াছেন যে সে দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিতেছে ঐখানে ভয় নাই। ওখানে কি ব্যাটাকে সাপে খেতে পারে না?" পঞ্চানন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, আশ্রমেও ফিরিতে পারিতেছে না, শ্মশানেও যাইতে পারিতেছে না।

ওদিকে তাঁহার বীর ভ্রাতা দিব্যদৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া আশ্রমের উত্তর-পশ্চিমাংশ দিয়া প্রাচীন শ্মশানে নামিয়াছেন। মৃদুমধুর স্বরে "জয় জয় তারা" রব তুলিয়া তালে তালে চিমটা বাজাইতে বাজাইতে জঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া চলিতেছেন। তাঁহার প্রাণে ভীতির সঞ্চার নাই। বামের কৃপায় তাঁহার পদে নরকঙ্কালাদি কিছুই লাগিল না। শৃগাল সরীসৃপাদিরও আভাস পাইলেন না। অনভ্যস্ত পথ ধরিয়া অবিলম্বে দ্বারকার তীরে বালুকাময় কৈলাসপতির ঘাটে পৌঁছিলেন। এইখানেই বামের দীক্ষা ঘটিয়াছিল। তীর হইতে নদীগর্ভে নামিয়া কমণ্ডলু মাজিয়া জল ভরিলেন।

দৈবীদীক্ষা

যেমনি ফিরিয়াছেন অমনি দেখেন শঙ্করমূর্ত্তিতে গুরু দণ্ডায়মান। উহা তাঁহার নয়নের ভ্রম কিনা সংশয় হওয়ায় উত্তমরূপে ক্ষণকাল চাহিলেন। মূর্ত্তি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান। তথাপি সংশয় যাইতেছে না। তখন মূর্ত্তি মধুর স্বরে কহিলেন, "স্নান কর।" ভক্ত স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে উঠিলেন। এখনও মূর্ত্তি রহিয়াছে। তিনি নিকটে আসিলে মূর্ত্তি বীজমন্ত্র দিয়া অন্তর্হিত হইল। ভক্তের ভাব বর্ণনাতীত। তিনি কমণ্ডলুতে পুনরায়

জল ভরিয়া ভাবে টলমল করিতে করিতে আশ্রমে আসিলেন। গুরু শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহাকে বলিলেন,—"আসিয়াছ বাবা! আমার আর তৃষ্ণা নাই।" ভক্তের রুদ্ধভাবের কবাট খুলিয়াছে। তিনি গুরুর পদতলে লুটাইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া গদগদস্বরে প্রণাম করিতেছেন—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

বাম ধৃতমুগ্ধভাব। তিনি সন্তানকে সান্ত্বনা দিতেছেন—"বাবা, তারামার আশ্চর্য্য শ্মশান। তুমি নিজ সৌভাগ্য ফলে তারামার কৃপা পাইয়াছ তাতে আমার কি গুণ দেখলে?"

পঞ্চানন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। শুভাদৃষ্টফলে কেবল বামের ফণিভূষণ মূর্ত্তি দেখিল। বীর হৃষীকেশের পুণ্যপরিপাকে প্রাণরক্ষা ও দৈবীদীক্ষা ঘটিল।

১৫। শাপমোক্ষ

তং ব্যক্তানন্দমূর্ত্তিঃ সুতমিব বিলয়ন্ নন্দয়ংশ্চাপি তস্মৈ
রাসং রাকেন্দুরম্যে শবময়পুলিনেঽদর্শয়দ্ দ্বারকায়াঃ।
ভূয়োঽব্যক্তস্ত্রিজন্মাশুভশুভমিহ তং লুতাপয়ন্ ভূরিতাপৈ
লীলানন্দৈশ্চ সূক্ষ্মৈ র্ঘটয়তি বরদঃ শ্রীগুরুঃ শাপমোক্ষম্॥

বরদাতা শ্রীগুরু প্রকটাবস্থায় আনন্দময়মূর্ত্তিতে তাঁহাকে পুত্রবৎ শিক্ষা দিয়া ও আনন্দিত করিয়া দ্বারকার পূর্ণচন্দ্রশোভিত শবাস্তীর্ণপুলিনে তাঁহাকে স্থূলনয়নে শ্রীরাসলীলা দেখাইলেন। পরে অপ্রকট হইয়া ত্রিজন্মের শুভাশুভ ইহজন্মে তাঁহাকে নানাক্লেশ ও সূক্ষ্মলীলানন্দদানে ভোগ করাইয়া শাপমোক্ষ করাইতেছেন।

হৃষীকেশের প্রতি বামের অপার করুণা। দুই তিনবার হৃষীকেশের বাটীতে পদধূলি দিয়াছেন। প্রথমবার সন ১৩১৩ সালে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে। তখন বিজয়গোবিন্দ জীবিত। এই পূজা উপলক্ষে ইকড়ার বাটীতে বিশেষ সমারোহ। বিশপঁচিশমণ ময়দা ভাজা হইত। সহস্র সহস্র লোক আহূত হইত। নাচ তামাসা সপ্তাহাবধি উৎসব চলিত। বামের শুভাগমনে উৎসব মহোৎসবে পরিণত। বিশ ত্রিশ গ্রামের লোক বামকে দেখিতে আসিয়াছে। হৃষীকেশের একটী তিন মাসের কন্যা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যা লইয়াছে। পাছে বাবার ভাবভঙ্গ হয় বা সমাগত লোকের আনন্দে বাধা হয় তজ্জন্য হৃষীকেশ ঐ বিষয় প্রকাশ করেন নাই। হৃষীকেশের ভাব শ্রীবাসাচার্য্যের ন্যায়।শ্রীবাসাচার্য্যের পুত্র মুমূর্ষু পরে পুত্র মৃত হইল, তথাপি নিজ আঙ্গিনায় প্রভু-ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন। তাহাদের ভাব ভঙ্গ না হয় এই ভাবিয়া শ্রীবাস ঐ বিষয় চাপিয়া রাখিয়াছেন এবং মৃত পুত্রকে খিড়কি দ্বার দিয়া পথে বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রভু জানিতে পারিয়া মৃতদেহ আনাইলেন। মৃতকে গুহ্যনামে আহ্বান করিলে মৃত জীব উঠিয়া বসিল। "কেন মা বাবাকে এত অল্প বয়সে ছাড়িয়া যাইতেছ বলিয়া যাও।" প্রভু এই আদেশ করিলে জীব কি অদৃষ্টকর্ম্মবশতঃ এই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহা কিরূপে ফুরাইয়া যায় ইত্যাদি রহস্য উদ্‌ঘাটন করতঃ উজ্জীবিত পুনরায় দেহত্যাগ করেন। বাম অতদূর করিতে দিলেন না। তিনি কারণ প্রসাদ হইতে একটি মুড়ি হৃষীকেশের হস্তে দিলেন। বলিলেন—"যাও, কন্যাটীর মুখে দাও।" কন্যার মুখে মুড়ি দিতেই কন্যাটি আরোগ্য লাভ করিলেন।

কন্যার জীবন দান

হৃষীকেশের পত্নীকেও বাম বিশেষ কৃপা করেন। তিনি তারাপীঠে যাইতে পারিতেন না ভাবিয়া হৃষীকেশের বাটীতে দ্বিতীয়বার যাইয়া তাঁহার পত্নীকে সাধন দেন। পরে পত্নী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলে এবং নানা চিকিৎসায় ব্যাধির উপশম না হইলে বাম অযাচিতভাবে দুইবার তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। তৃতীয়বার বামকে তিনি লইয়া যাইতে চাহিলে বাম বলেন, "এবার বাবা তোমার সঙ্গে বৈদ্যনাথে দেখা হবে।" হৃষীকেশ প্রায়ই তারাপীঠে আসিতেন। শ্রীগুরু স্থূলে তাঁহার সহিত নানা লীলা করিয়াছেন। তিনি একবার রাসপূর্ণিমায় সন্ধ্যায় উপস্থিত হইলে বাম

তাঁহাকে বলেন, "বাবা! এত জাড়ে রাসপূর্ণিমায় যে এলে? ভক্তের মুখ দিয়া সদুত্তর নির্গত হইল, "বাবা রাসেশ্বরকে দেখতে এলাম।" রাম সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে সেই দেবদুর্লভ মাধুর্য্যরসের রাস দেখাইবেন। কিন্তু তিনি নিরহঙ্কার। তাই বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, তারা মা তোমায় রাস দেখাইবেন।" নিশীথে তাঁহাকে লইয়া শিমূলতলায় মার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া শ্রীরাম প্রাচীন শ্মশানে দ্বারকার নিকট কদম্ব-বৃক্ষের তলে বসিলেন, বলিলেন, "রাস দেখিতে কদম্বের মূলে বসিতে হয়।" পুরাকালে ভক্তের বিশ্বরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষা সফল করিবার পূর্ব্বে ভগবান বলিয়াছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বর্যম্॥ গীতা ১১।৮

অর্জ্জুন! আমাকে নিজচর্ম্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পারিবে না। তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দিতেছি। আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ।

নবরূপী রামও ভক্তকে দিব্যদৃষ্টি দিলেন; কিন্তু নিজে দিলেন এ অহঙ্কার দেখাইলেন না। বলিলেন—"বাবা, তারা মাই রাসেশ্বরী, তিনি তোমাকে রাস দেখাইতে আসিতেছেন।" হৃষীকেশ ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পড়েন নাই। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সেই মধুর দৃশ্য গুরুকৃপায় তাঁহার নয়নপথে উদিত হইল।

তদোডুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষনীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥
দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, ২৯।২-৪

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ॥
উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্॥

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
রেমে তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ২৯।৪৩-৪৫

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩।৩

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩.৮

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্শ-স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥
তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাঃ বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ় মলং ব্রজস্ত্রিয়োবিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরুদ্বহ!॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩।১৭-১৮

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-প্রসূনগন্ধানিলজুষ্ট দিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩।২৫-২৬

বহুকাল পরে গৃহাগত পতি কর্ত্তৃক যেরূপ প্রিয়তমার মুখশ্রী পূর্ব্বরাগে কুঙ্কুমবর্ণে রঞ্জিত হয় তদ্রূপ নক্ষত্র গণাধিপতি পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বদিগ্বধূকে অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া তাঁহার মধুর কিরণজালে জীবের সন্তাপ দূর করতঃ উদয় হইলেন।

তখন শ্রীভগবান কুমুদ বিকাশক, রমানন কান্তি, নব কুঙ্কুম অরুণ বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকে ও তদীয় সুখকর কিরণজালে উদ্ভাসিত রমণীয় বাননী দর্শন করিয়া মৃগনয়না ব্রজকামিনীগণের মনমুগ্ধকর সুমধুর বেণু বাদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তা ব্যাকুলা ব্রজকামিনীগণ সেই ভাবোদ্দীপক গীত শ্রবণ করিয়া ঔৎসুক্যভরে পরস্পরের অলক্ষিতে কর্ণের কুণ্ডলসমূহ দোলায়িত করিয়া সেই গীত লক্ষ্য করিয়া বেগে আগমন করিলেন।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ২৯।২-৪

তখন মনোরথপূরক, লীলাময়, উদারহাস্য ও কুন্দকুসুমশুভ্র দন্তকান্তি সুশোভিত যোগেশ্বরেশ্বর প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লমুখী সমবেতা গোপীগণের সহিত তারকারাজি বেষ্টিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইলেন।

গোপীগণপতি ভগবান গোপীগণ কর্তৃক সংকীর্ত্তিত হইয়া নানাপুষ্প শোভিত বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া স্বয়ং উচ্চগ্রামে গান করিতে করিতে বনস্থলী অলঙ্কৃত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

যমুনা তরঙ্গে আন্দোলিত কুমুদসমূহের সৌরভযুক্ত বায়ু প্রবাহে শীতল বালুকাময় যমুনাপুলিনে গোপীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ২৯।৪৩-৪৫

রাসোৎসব আরম্ভ হইল; যোগেশ্বর গোপীমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় যোগপ্রভাবে এককালে বহু হইয়া তাহাদের দুই-দুই জনের কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ অবস্থান করিলেন; —শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩।৮

তৎকালে পদবিন্যাস, কর সঞ্চালন, সহাস্য ভ্রূভঙ্গী, কটি ভঙ্গিমা, কুচ কম্পন, অঞ্চল আন্দোলন প্রভৃতি নৃত্যভঙ্গী পরায়ণা ও গণ্ডস্থলে দোলায়মান কুণ্ডলসমূহ শোভিতা, ঘর্ম্মাপ্লুত-বদনা, শিথিল-কবরী কাঞ্চি-গ্রন্থি, কৃষ্ণবিধুরা গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতঃ মেঘচক্রে বিদ্যুৎ যেমন শোভা পায় তদ্রূপ শ্যাম সমীপে শোভা পাইলেন।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩।৮

শিশু যেমন স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে রমাপতিও সেইরূপ স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশ স্বরূপ নিজাত্মিকা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত আলিঙ্গন, পাণি-পীড়ন, প্রণয় কটাক্ষ, উদ্দাম বিলাস ও হাস্যসহকারে নানাবিধ-ভাবে বিহার করেন।

হে কুরুবংশধর, তৎকালে শ্রীভগবানের অঙ্গস্পর্শজনিত আনন্দে অধীরা, বিকল হৃদয়া, বিবশ শরীরা ব্রজবধূগণের মালা আভরণ, কেশ, বসন, কুচ পট্টিকাদি বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। —শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩।১৭-১৮

অনন্তর শ্রীভগবান জলজ ও বনজ কুসুমের গন্ধবাহী বায়ুপ্লাবিত উপবনে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভ্রমর ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! জিত সুরত, সত্যসংকল্প শ্রীভগবান অনুরাগী ভক্তগণের সহিত এইরূপ শশাঙ্ক-কিরণোজ্জ্বলা-নিশাসমূহে কাব্যকথা বর্ণিত শরতকালীন রস উপভোগ করেন। —শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৩৷২৫-২৬

হৃষীকেশের নেত্রে রাসবিহারী গুরু প্রেমাঞ্জন দিয়াছেন। পূর্ব্বে রাস-পূর্ণিমা কত দেখিয়াছেন। অদ্য কিন্তু তাঁহার চক্ষে—

"স্ফুটতর ঐ নভো নীলিমায়।
উজ্জ্বলতর শশধর ভায়॥"

অসীম গগন ছাপাইয়া কৌমুদী ঝরিতেছে। ফুটফুটে জোছনায় ধরাখানি যেন ভাসিয়া যাইতেছে। ছিন্নভিন্না পার্ব্বত্য নদী দ্বারকা কল্লোলিনী যমুনার রূপ ধরিয়াছে। দ্বারকাতীরে শ্মশানস্থ বনানী সুন্দর যমুনাকুঞ্জে পরিণত হইয়াছে। অচিরে তথায় সুন্দর বংশীরব উঠিল এবং দ্বারকাপুলিনে শতশত মনোরমা পরিবেষ্টিত নবঘনশ্যামমূর্ত্তি তাঁহার স্থূল নয়নে আবির্ভূত হইল। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ণিত রাসবিহার দেখিতে দেখিতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান হইলে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। কিন্তু সেই মধুর স্মৃতিটুকু শ্রীগুরু তাঁহার হৃদয়পটে এমন অঙ্কিত করিয়াছেন যে তদবধি যুথেশ্বরী ও যুথেশ্বরের মূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে নিত্য ভাসে এবং তিনি তাঁহাদিগকে পূজান্তে প্রণাম করেন—

অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্
স্তনযুগগজমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকানাশ্রয়েঽহম্।
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলৈরর্চ্চিততনু গো গোপসঙ্ঘাবৃতম্
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

যাঁহার বর্ণ রক্তোৎপলতুল্য যিনি নীলবসনা ও শোভনকেশা, যাঁহার মুখমণ্ডল শশধরসদৃশ, যাঁহার নয়ন খঞ্জনাঞ্জন, বক্ষস্তনচুম্বি-মুক্তাহারে যিনি উজ্জ্বল, সেই মনোরমা কিশোরী কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার আশ্রয় লইলাম।

যাঁহারা দেহকান্তি প্রস্ফুটিত নীলোৎপলসদৃশ, যাঁহার বদন চন্দ্রতুল্য, শিখিপুচ্ছের কর্ণভূষণ যাঁহার প্রিয়, যাঁহার শ্রীবৎসচিহ্নিত বক্ষঃস্থলে মহনীয় কৌস্তভমণি বিরাজিত, যিনি গোপীগণের নয়ন প্রীতিকর, সেই পীতাম্বর সুন্দর মধুরমুরলী বাদনরত দিব্যভূষণে ভূষিত, গো ও গোপগণে পরিবৃত গোবিন্দকে ভজনা করি।

হৃষীকেশ অতি সৌভাগ্যবান। বাম তাঁহার হৃদ্‌বৃন্দাবনে নিশিদিন আসীন। একবার তিনি ভাবের আবেগে শ্রীবামের চরণ ধরিয়া তারাপীঠে প্রার্থনা করেন, "বাবা এই জন্মেই আমাকে মুক্তি দিন।" বাম বলিলেন, "তা কি করে হয় বাবা? এখনও তোমার দুই জন্ম বাকী।" গুরুভক্ত শিষ্য কহিলেন, "বাবা আপনি যে সাক্ষাৎ শঙ্কর, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া দেখাইয়াছেন। আমি শঙ্করের পদছায়া পাইয়াছি, তথাপি দুই জন্ম বিলম্বে?" ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, "তবে বাবা, এই জন্মে দুইবার মরিতে পারিবে?" ভক্তের মুখে উত্তর সরিল. "বাবা, আপনি সঙ্গে থাকিলে এই জন্মেই দুইবার মরিতে পারিব।" গুরু সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমার ছেলে দেবতা আমি দেবগুরু।"

প্রভুর তিরোভাবের পর হৃষীকেশই শিমুলতলায় বেদী ও বামের সমাধির উপর সুন্দর মন্দির প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয়ে করিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য ভক্তগণের সহযোগে তারাপীঠে বাবার তিরোভাব মহোৎসব প্রবর্তন করেন। তাঁহার এ জীবনে একবার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সন ১৩২৬ সালে তিনি হঠাৎ ঘোর উন্মাদগ্রস্ত হন। তাঁহার সমস্ত বাহ্যজ্ঞান বিকৃত হয়। কিন্তু শ্রীগুরুর সঙ্গবোধ লোপ পায় নাই। স্বপ্নে, জাগরণে সর্ব্বদাই গুরুর ভীষণ-ভাব দেখিতেন। কখনও তাঁহার মনে হইত হইত গুরু যেন তাঁহার বক্ষে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। কখনও বা চীৎকার করিয়া

জীবন্মৃত

বলিতেন, "ঐ গুরু আমাকে আকাশে তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।" পুরাণের আখ্যায়িকায় যেমন ভোজরাজ কংস নিরন্তর কৃষ্ণময় ভাবনায় যমযন্ত্রণা পাইয়াছেন, হৃষীকেশও তদ্রূপ গুরুভাবনায় প্রায় দুই বৎসর

যমযন্ত্রণা ভোগ করেন। ঐ ব্যাধির আরোগ্যও অদ্ভুত। রাম হৃষীকেশকে পূর্ব্বে বলেন যে তাঁহার স্থূলে আর একবার বৈদ্যনাথধামে দেখা হইবে। হৃষীকেশের আত্মীয়েরা তাঁহাকে শেষে উন্মাদ অবস্থায় বৈদ্যনাথধামে লইয়া যান। তত্রস্থ এক শ্মশানে বেড়াইতে গিয়া রামের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সহসা প্রকৃতিস্থ হন। হঠাৎ যেন অজ্ঞান মেঘ তাঁহার কাটিয়া যায়। তাঁহার ধারণা ইহজীবনে ইহাই তাঁহার প্রথম মৃত্যু। গুরু সত্যই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার দ্বিতীয় মৃত্যুও ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার একটি উপযুক্ত পুত্রকেও লইয়াছেন। কিন্তু গুরু সর্ব্বদা সন্তানের হৃদয়ে জাগরুক আছেন। হৃষীকেশের অগাধ ধৈর্য্য। গুরুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি হ্রাস পায় নাই। ধন্য গুরু ধন্য শিষ্য।

১৬। ধুরন্ধর

শান্তং শুদ্ধং তনয়বিরহানলে হরিভূষণং
ভারদ্বাজতনুধরং ধুরন্ধরমাত্মনঃ।
শ্রেয়স্কামং সহপরিজনং বিভুবিদধে গুরুঃ
শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ফলদনিগমব্রতং গৃহমেধিনম্॥

পুত্রবিরহাগ্নিজ্বালায় আর্ত্ত, এবং শুদ্ধ হরিভূষণনামক ভরদ্বাজ গোত্রজ ব্রাহ্মণবেশী নিজগণাধিপ প্রভাময় শ্রেয়স্কামনায় আশ্রয় লইলে স্বপত্নীক তাঁহাকে শ্রীগুরু শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ফলপ্রদ তন্ত্রনিষ্ঠ গৃহমেধী করিলেন।

নদীয়া জেলায় উলোরা বীরনগর বিখ্যাত গ্রাম। তথাকার জমিদার রামনদাস মুখোপাধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কৃতবিদ্য। ইহাদেরই অন্যতম হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁহার পুত্রও উদীয়মান উকিল। ইহাদেরই অন্যতম ভুবনমোহন, পরে ভাবুকের কৈলাসপতি হন। রামের সহিত ঐ কৈলাসপতির সম্বন্ধ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ঐ বংশেরই হরিভূষণ রামের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র হন। হরিভূষণ উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জরাজের রাজধানী বারিপদায় উকিল। সন

১৩১১ সালে ৩০শে ফাল্গুন তারিখে উঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে শোকে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে। এবং দীক্ষা লইবার প্রবল ইচ্ছা হয়। অল্পবিস্তর তন্ত্র পড়া ছিল। শিবই জগদ্গুরুবোধে গুরুকৃপার জন্য তিনি শিবপূজা আরম্ভ করেন। তখন বারিপদায় হরিপদ মৈত্র নামক জনৈক কর্ম্মচারী থাকেন। তিনি সাধক মহাপুরুষ কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের শিষ্য। হুগলীর উকিল ৺বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও ৺শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হরিপদর গুরুভ্রাতা। হরিপদ বামেরও ভক্ত ছিলেন। হরিভূষণ হরিপদর নিকট বামের গুণাবলী শুনিয়া আকৃষ্ট হন।

সন ১৩১২ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর পর রম্ভাতৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে হরিভূষণ হরিপদদাদার সহিত তারাপীঠে পৌছেন। নীরবে বাবার আশ্রমের সম্মুখে বসিয়া হরিভূষণ কাঁদিতেছেন। বাবা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহার দয়া হইয়াছে। তথাপি ভক্তিপরীক্ষার জন্য হরিভূষণের দিকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন। হরিভূষণেব প্রাণমন বামগত; তিনি তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠীবন তুলিয়া লইয়া উদরসাৎ করিলেন। নিষ্ঠীবনের অমৃতময় আস্বাদ পাইলেন। বাম রক্তিমনয়নে তাহা দেখিলেন। হরিভূষণ উঠিয়া বাবাকে কারণাদি উপহারের সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। আর কি দয়াময় থাকিতে পারেন? তিনি বুঝিয়াছেন হরিভূষণ বাহ্য পার্থিব কামনা লইয়া আসেন নাই। তিনি পরমধন তারাধন পাইবার আশায় সুদূর ময়ুরভঞ্জ হইতে আগত। তাই কাঁদিতেছেন। বাবা তাঁহাকে শিমূলতলায় লইয়া গেলেন। তথায় হরিভূষণ প্রিয়তমকে ফলাদি খাওয়াইতেছেন ও কাঁদিতেছেন। বাবা তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া কিছু বলেন নাই। হরি আর থাকিতে পারিলেন না। বাবার পা জড়াইয়া ধরিয়া দীক্ষার জন্য আবেদন করিলেন। এইরূপ তদ্গত ভক্ত বামের আদরের পাত্র। বাম তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে বলিলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম হইতেছে বাম শিষ্যের কুল-দেবতা নির্ব্বাচন করিতেছেন। ক্ষৌরকর্ম্মের পর তাঁহার মুখখানি ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বাবার মুখখানি পদ্মফুলের মত।" হরিভূষণ হৃষ্টপুষ্ট ও গৌরবর্ণ সুপুরুষ। তাঁহার হৃদয় সরল। সুন্দর মুখে সুন্দর ভাব তখন খেলিতেছিল। বাবা তাঁহাকে তাঁহার কুলদেবতার ইঙ্গিত দিয়া বলিলেন, "না ব্যাটাকে অন্য মন্ত্র দিব।" হরিভূষণ কুলদেবতাব দিকে তত আকৃষ্ট

নন। জীবের কূলগত প্রবণতা অপেক্ষা স্বগত প্রবণতা বলীয়সী। তত্ত্বদর্শী গুরু তাহা দেখিতে পান। সুতরাং কোন কোন স্থলে কুলদেবতাকে বাদ দিয়া মন যে দেবতাকে চায় সদ্‌গুরু তাই দিয়া থাকেন। ইহাতে সাধনা আশু ফলপ্রসূ হয়। ‘হরিভূষণ শাস্ত্র পড়িয়াছেন। শাস্ত্রমতে হোমাদি ক্রিয়াত্মক দীক্ষা লওয়াই তাঁহার অভিপ্রায়। দীক্ষার পূর্ব্বদিন সংযমাদি বিধেয় বুঝিয়া তিনি ঐ দিবস উপবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৌলের পক্ষে উপবাসাদি নাই। বাম পরম কৌল। তারাপীঠ কৌলগণের ক্ষেত্র। সুতরাং বাম ভঙ্গী করিয়া কৌলপ্রথা বলিলেন, “বাবা, তারামার প্রসাদ না পাইলে মন্ত্র হয় না।” ঐ দিন যে তিথি তৃতীয়া ও রাত্রে উমাচতুর্থী পড়িবে বাবা তাহাও নিজ ভাষায় বলিলেন, “আজ দিবসে মা ত্রিনয়না।”

দীক্ষা

রাত্রিই কৌল ক্রিয়ার মুখ্য কাল। সুতরাং রাত্রে উমা-চতুর্থী পড়িলে দীক্ষা দিবেন বুঝাইলেন। দিবসে হরিদাদা আয়োজন করিলেন। রাত্রে তিথি উপস্থিত হইলে বাম স্বয়ং জগদম্বার পূজা করিলেন ও স্বহস্তে বলিদান দিলেন। ভোগাদি রন্ধন হইতেছে। শিষ্যকে রাত ১০টার সময় শিমুলতলায় লইয়া গিয়া দুইকানেই মন্ত্র দিলেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রশক্তি অনুভব করিলেন। সর্ব্বশরীর

মন্ত্রশক্তি

শিহরিয়া উঠিল। মন্ত্র জপ করিতে না করিতে অভূত-পূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন ঘটিল। হরিভূষণ জীবন জনম সফল জ্ঞান করিলেন। গুরু পরে হোমাদি ও চক্রানুষ্ঠান করতঃ অভিষেক করাইয়া কারণ প্রসাদ দিলেন। হরিভূষণ অকপটে তাহা লইলেন। তাহার হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া গেল। পুত্র বিরহের কথা তিনি মুখে না বলিলেও অন্তর্য্যামী বাম তাহা জানিয়া ও তাঁহার পত্নীর গর্ভাবস্থা জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে অচিরে তাঁহার পুত্র জন্মিবে। হরি উত্তর দিলেন, “তবে বাবা তার নাম তারাদাস রাখিব।” ঐ পুত্রকে প্রসূতিসহ আসিতেও বলিলেন। গুরুর কৃপা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই মিলে। কয়েকমাস পরেই দেবীপক্ষের তৃতীয়ায় হরির একটী সুকুমার হইল। হরি পর বৎসর ফাল্গুন মাসে পুত্র ও পত্নীকে লইয়া শ্রীগুরুর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। গুরু পুত্রটীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও পত্নীকে দীক্ষা দিলেন।

হরিদাদা গুরুগত প্রাণ। তিনি শ্রীগুরুকে স্থূলে বহু সেবা করেন। যখনই অবসর পাইতেন, বারিপদা হইতে তারাপীঠ আসিতেন। বাবা তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতেন। প্রতি চতুর্দ্দশীর মেলায় হরিদাদা বাবার সহিত লীলানন্দ অনুভব করিয়াছেন। একবার তাঁহার মনে হইল—"বাবা কি শ্যামরূপে আমার হৃদয়ে দাঁড়াইবেন না?" বাম সে বাসনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করেন। হরিদাদা একবার বাবাকে একখানি গামছা উপহার দেন। ভক্তের উপহার এতই মিষ্ট যে বাবা দুইতিন দিন উহা গলায় জড়াইয়া রাখেন। তাহাতে জনৈক ব্যক্তির কটাক্ষপাতে বাবা বলেন, "এ যে আমার হরির গামছা।"

হরিভূষণ বাবাকে তন্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেন। বাবা তাঁহাকে তন্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রমাণসহ বলিতেন। হরি যখন ঐসব প্রমাণ বাহু অনুসন্ধানে তন্ত্রে পাইতেন তখন বিস্মিত হইতেন যে নিরক্ষরকল্প পুস্তকাদি চর্চাবিহীন শ্মশানচারী ক্ষ্যাপা ঐসব তথ্য কিরূপে পাইলেন। বাম তাঁহাকে বীরাচার দেন। তিনি তাহা পূর্ণমাত্রায় লইবার প্রয়াস পান। যতদিন গুরু নরদেহে ছিলেন ততদিন তাঁহার কোন বিঘ্ন হয় নাই। গুরুর তিরোভাবের পর বোধ হয় বীরাচারের পদ্ধতি ভ্রম হওয়ায় তাঁহার পক্ষাঘাত আসে। তিনি কাতরে গুরুকে জানাইলে গুরু তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্ত করেন।

হরিদাদার হৃদয়ে গুরু শান্তশীতলরাগে সদাই জাগিতেছেন, মোহতিমির নাশ করিতেছেন, প্রেমমলয় মরুতহিল্লোল তুলিতেছেন। তিনি শ্রীবামের রক্তিমনয়নকোণে কত প্রেম, কত আশা, কত ভালবাসা দেখিয়াছেন। শ্রীগুরুর অনুপম মাধুরী হেরিয়া আপনাআপনি কতবার তাঁহার চরণে পতিত হইয়াছেন। সে রেণ পরশকালে তাঁহার রিপুচয় স্তম্ভিত প্রায়। তিনি শ্রীগুরুর জয়গানে উন্মত্ত। গুরু গৃহমেধী রাখিয়াছেন। তাই সংসারে নামমাত্র আছেন। সংসারের অভাবে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি সদানন্দময়। গুরুর ধুরন্ধর।

১৭। ভৃগুপতি

বিদ্যাচারত্রবংশরতিশমদমৈর্মোক্ষভাজং সুবোধং
রামঃ স্বং লুপ্তস'জ্ঞং ভৃগুকুলপতিং সঙ্গতং শান্তবোধম্।
তারানামাঙ্‌ঘ্রিপদার্পণং— সমুদিতানন্তভাসা প্রবুদ্ধং
তাবোন্মত্তং চ চক্রে গৃহাগতমপি স্বানুরূপং বিমুক্তম্॥

বিদ্যা, চরিত্র, বংশ, বৈরাগ্য, শম, দম গুণহেতু মোক্ষপদের অধিকারী সুবোধ নামক নষ্টস্মৃতি নিজ শিষ্য শান্তক্রোধ ভৃগুপতি মিলিত হইলে শ্রীরাম তাঁহাকে তারা নাম দিয়া এবং তাঁহার মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপনে বিশ্ব-জ্যোতিঃ দর্শনে প্রকৃষ্টরূপে জাগরিত করতঃ গৃহে রাখিয়াও নিজতুল্য তারা প্রেমে প্রমত্ত করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করিলেন।

জেলা হুগলি, মহকুমা শ্রীরামপুরের অন্তর্গত জনাই নামক সুপ্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম ব্রাহ্মণপ্রধান। ফুলে খড়দহ নিকষ কুলীনের বাস। তথাকার খড়দহ মুখোপাধ্যায়েরা কামদেব পণ্ডিতের সন্তান। তাঁহাদের অন্যতম জগন্মোহন পলাশীর যুদ্ধের পরই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় সারণ জেলায় সরকারী কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। সারণ

বংশ

চম্পারণ প্রভৃতি কয়েকখানি জেলার বিলি বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি প্রভূত সম্পত্তি নিজ আত্মীয় স্বজনের নামে বিলি লন। লাট সংগ্রামপুর প্রভৃতি জমিদারী হইতে তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল। ছাপরায় ও জনাইগ্রামে ক্রিয়াকলাপ জন্য তাঁহার নাম এখনও উজ্জ্বল। বঙ্গদেশের মুখ্য কুলীন বাঁইসার (বেগের) গাঙ্গুলী গোকুলচন্দ্রের সহিত সহোদরার বিবাহ দেন। গোকুলচন্দ্রের পুত্র শিবপ্রসাদ ইংরাজি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় আধিপত্য লাভ করিয়া মাতুলের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন। মাতুলের দেহান্তে তদীয় পুত্রদ্বয় অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় সম্পত্তির পরিদর্শন শিবপ্রসাদ করিতে থাকেন। মাতুলের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া অবসর লন। গোবিন্দচন্দ্রের বিলাসিতায় সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়। মধ্যম ঈশ্বরচন্দ্র ১২০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি পান। সে সম্পত্তি আমলার বেনামে ছিল। আমলা ঈশ্বরচন্দ্রকে বেদখল করিলে তিনি সদর দেওয়ানি

আদালত পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমায় পরাজিত হইয়া দেশে আসিয়া শিবপ্রসাদের শরণাপন্ন হন। শিবপ্রসাদ নানা কৌশলে সুপ্রীমকোর্টে মামলা করাইয়া মাতুলের উক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের অদৃষ্টে সম্পত্তিভোগ হইল না। তিনি শিশুপুত্র শোকে অকালে পরলোকগত হন। মাতুলবংশ লোপ পাইলে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে শিবপ্রসাদ কাশীবাসী হন। তথায় রামেশ্বর তীর্থস্বামী নামে মহাপুরুষের সঙ্গলাভ ও বেদান্তাদি চর্চ্চায় শিবপ্রসাদ শিবত্ব লাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রনাথ শাব্দিক ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সঙ্কলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে দুষ্প্রাপ্য দীর্ঘঋকারাদি ও দীর্ঘঌকারাদি শব্দ তিনি উদ্ধার করিয়া দেন। চন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র কিশোরীমোহন মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করতঃ বর্ত্তমান যুগের ব্যাসনামে খ্যাত হন। পাণ্ডিত্যে, সারল্যে, উদারতায় তিনি ঋষিতুল্য ছিলেন। লেখক তাঁহারই পুত্র।

কিশোরীমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজমোহনের পুত্রত্রয় কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠ নিরাপদ হুগলী আদালতে ব্যবহারজীবী। মধ্যম শশধর রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের আশ্রিত। তিনি অকালে মারা যান। কনিষ্ঠ সুবোধ বাল্যকাল হইতে সুবোধ, সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া হাজারিবাগ Saint Columbus College-এর গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তথায় এক মহাপুরুষের সঙ্গ পান। শতাধিক বৎসর বয়ক্রম হওয়ায় লোকে তাঁহাকে 'বুড়া বাবা' বলিত। সুবোধ গণিতে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষার পাঠের জন্য অধ্যাপকতা ছাড়িয়া দেশে আসেন। পরবৎসর পরীক্ষা দেন। তাহাতে সাফল্যলাভ করিতে না পারায় বিষাদমগ্ন হন। তৎপূর্ব্বে মাতৃশোকে কিরূপে বামের আশ্রয়লাভে আমি শোকমুক্ত হই আমার মুখে শুনিয়া সেই শ্মশানবাসী নিরভিমান মহাপুরুষ দর্শন-বাসনা বীজ সুবোধের মনে রোপিত হয়। এক্ষণে বিফলতাজনিত অশ্রুজলে তাহা অঙ্কুরিত হইল। সন ১৩১৩ সালে ২৪ বৎসর বয়সে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি ৺শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া সুবোধ তারাপীঠে ছুটিলেন। প্রেয়স্কামনা তাঁহার হৃদয়ে জাগে নাই। আমার ন্যায় বিশিষ্ট আকর্ষণেও পড়েন নাই। শৃগাল কুক্কুর সহচর দিগম্বর সন্ন্যাসী কিরূপ

বিদ্যা

দর্শনলালসাবীজ

এই কৌতূহলমাত্র উদ্রিক্ত। তাঁহার মন বিশুদ্ধ। প্রথম দর্শনমাত্রেই তাঁহার বোধ হইল যেন রাম তাঁহাকে টানিতেছেন। তখন পূর্ব্বপরিচিত হাজারিবাগের বুড়া বাবা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইলেন। তিনি উভয় মহাপুরুষকে মনে মনে তুলনা করিতেছেন। অন্তর্যামী রাম বলিলেন, "বাবা! তাবড় তাবড় কত আছেন। কিন্তু যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।" সুবোধ বলিলেন, "রাম কি জানাইতেছেন, যে তিনি তাঁহার জন্মান্তরীণ গুরু? যদি তিনি এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার শ্রীচরণ মস্তকে তুলিয়া দেন, তবেই বুঝিব ইনি অন্তর্যামী ও গুরু।" শ্রীরামও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "জয়তারা" রবে ভক্তের শিরোদেশে আপন দক্ষিণচরণ স্থাপন করিলেন। তৎফলে বিশ্বব্যাপী জ্যোতিরুদ্ভাসিত হইয়া সুবোধের বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইল। সেই ভাব অধিকক্ষণ থাকিলে সংসারীর মনোবিকৃতি ঘটিতে পারে। সুতরাং ক্ষণেক পরেই বৈদ্যনাথ রাম সেই ভাব ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহাতে সুবোধের বাহ্যজ্ঞান আসিল বটে, কিন্তু সেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ভাবে পার্থিব ভাব যেন ক্ষণে ডুবিতেছে ও ক্ষণে উঠিতেছে। 'জয় তারা' রবও মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছে। কৌতুকচ্ছলে রামকে দেখিতে গিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। উদাসীন আগন্তুক জন্ম জন্মের দাস হইয়া সর্ব্বস্ব প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন।

কৃপালাভ

"নিমেষের দেখা চোখে চোখে, আপনা হারায়ে ফেলেছি।
কইতে গিয়ে কথার কথা মরম খুলিয়া দিয়াছি॥"

রাম সদ্বৈদ্য। একমাত্র ঔষধেই ভবব্যাধির মূলোচ্ছেদ ঘটাইলেন। উৎকট বৈরাগ্য লইয়া শিষ্য ফিরিলেন। সে ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাঠে বা কর্ম্মে তাঁহার মন নাই। পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের ফলে একটি পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। কিন্তু জনকজননীর স্নেহভাজন, পত্নীর প্রেমপাশ ও পুত্র কন্যার মায়া শ্রীরামভক্তকে বাঁধিতে পারিল না। তিনি গৃহে থাকিয়া সংসারী হইলেন না। ছুটিয়া ছুটিয়া গুরুর নিকট যান। বাটীতে ফিরিয়া গুরুপ্রসঙ্গেই থাকেন। ধনৈষণা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। আত্মীয়স্বজনের প্রবোধ বা তিরস্কার তাঁহার বৈরাগ্যঘন হৃদয়ে প্রতিহত

হইল। আমার পত্নীও তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পান, যে বৃদ্ধবয়সে সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর বৃত্তি লইয়াও তাঁহার পিতৃদেব সংসারের অনটনে পুনরায় সুদূর চট্টগ্রামে চাকরী করিতে গেলেন। আর তাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়াও পিতৃভার লাঘব করিবেন না?" এ ব্রহ্মাস্ত্রও সুবোধে ব্যর্থ হইল। হাসিয়া সুবোধ বলিলেন, "যে যাহার কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে। অধ্যাপকতা করিলে তিনি অনায়াসে মাসিক বেতন ৫০০৲, ৬০০৲ টাকা ও অধ্যক্ষপদও পাইতে পারেন, এই প্রলোভনে তিনি উত্তর দেন, "বুদ্ধদেব রাজ্য ছাড়িতে পারিলেন, আর আমি বেতনের মায়া ছাড়িতে পারিব না।" কর্ম্মের জন্য মাতৃদেবী পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "মা, এতদিন কিছু আমি শিখি নাই। এইবার শিখিয়াই কর্ম্ম করিব।" সন ১৩১৪ সালে তিনি আমাকে লইয়া শ্রীগুরু দর্শনে যান। তাহার বিবরণ অন্ত্যলহরীতে বিবৃত। কয়েক বৎসর শারদীয় পূজাবকাশে তাঁহার সহিত মহানন্দে যাপন করিয়াছি।

নৈষ্কর্ম্মযোগ

প্রথম প্রথম লোকে তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিত। পরে তাঁহার প্রেমোন্মাদভাব প্রকট হইলে সকলে তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিল। তাঁহার শেষাঙ্কও বিচিত্র। তাঁহার পিতৃদেব চট্টগ্রামে দেহ রাখিয়াছেন। মাতৃদেবীও তৎপরে পতির অনুগমন করিলেন। তাঁহারা দুই পুত্রশোক পাইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহাদের পুত্রশোক দেওয়া উচিত নয় বিবেচনায় বোধ হয় তিনি গৃহে ছিলেন। তাঁহার কন্যাও সৎপাত্রে পড়িল। পত্নী ও পুত্রের ভার জ্যেষ্ঠ সহোদর লইয়াছেন। তাঁহার আর ইহধামে থাকিবার ইচ্ছা নাই। তদ্বিষয় মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত করেন। শরীরে কোন ব্যাধি নাই। হঠাৎ উরুদ্বয়ে উরুস্তম্ভ দেখা দিল। তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সহোদর ও সহোদরা স্থানীয় সুচিকিৎসক ডাকাইলেন। ভিষক্ ভয় পাইয়া কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে বলিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গেলেন। রোগ যে কঠিন তাহা উভয় চিকিৎসকই বুঝিলেন। রোগী নির্বিকার। পূর্ব্ববৎ প্রেমোন্মত্তাবস্থা। কয়েকদিন পরে উরুস্তম্ভ ফাটিয়া গেল। সেই সময় আমিও দেশে যাই। আমার সঙ্গে গুরুভক্ত প্রফুল্লকুমার বসু ছিল। উভয়ে

এই কৌতূহলমাত্র উদ্রিক্ত। তাঁহার মন বিশুদ্ধ। প্রথম দর্শনমাত্রেই তাঁহার বোধ হইল যেন রাম তাঁহাকে টানিতেছেন। তখন পূর্ব্বপরিচিত হাজারিবাগের বুড়া বাবা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইলেন। তিনি উভয় মহাপুরুষকে মনে মনে তুলনা করিতেছেন। অন্তর্যামী রাম বলিলেন, "বাবা! তাবড় তাবড় কত আছেন। কিন্তু যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।" সুবোধ বলিলেন, "রাম কি জানাইতেছেন, যে তিনি তাঁহার জন্মান্তরীণ গুরু? যদি তিনি এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার শ্রীচরণ মস্তকে তুলিয়া দেন, তবেই বুঝিব ইনি অন্তর্যামী ও গুরু।" শ্রীরামও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "জয়তারা" রবে ভক্তের শিরোদেশে আপন দক্ষিণচরণ স্থাপন করিলেন। তৎফলে বিশ্বব্যাপী জ্যোতিরুদ্ভাসিত হইয়া সুবোধের বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইল। সেই ভাব অধিকক্ষণ থাকিলে সংসারীর মনোবিকৃতি ঘটিতে পারে। সুতরাং ক্ষণেক পরেই বৈদ্যনাথ রাম সেই ভাব ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহাতে সুবোধের বাহ্যজ্ঞান আসিল বটে, কিন্তু সেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ভাবে পার্থিব ভাব যেন ক্ষণে ডুবিতেছে ও ক্ষণে উঠিতেছে। 'জয় তারা' রবও মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছে। কৌতুকচ্ছলে রামকে দেখিতে গিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। উদাসীন আগন্তুক জন্ম জন্মের দাস হইয়া সর্ব্বস্ব প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন।

কৃপালাভ

"নিমেষের দেখা চোখে চোখে, আপনা হারায়ে ফেলেছি।
কইতে গিয়ে কথার কথা মরম খুলিয়া দিয়াছি॥"

রাম সদ্বৈদ্য। একমাত্রা ঔষধেই ভবব্যাধির মূলোচ্ছেদ ঘটাইলেন। উৎকট বৈরাগ্য লইয়া শিষ্য ফিরিলেন। সে ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাঠে বা কর্ম্মে তাঁহার মন নাই। পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাহের ফলে একটি পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। কিন্তু জনকজননীর স্নেহভাজন, পত্নীর প্রেমপাশ ও পুত্র কন্যার মায়া শ্রীরামভক্তকে বাঁধিতে পারিল না। তিনি গৃহে থাকিয়া সংসারী হইলেন না। ছুটিয়া ছুটিয়া গুরুর নিকট যান। বাটীতে ফিরিয়া গুরুপ্রসঙ্গেই থাকেন। ধনৈষণা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। আত্মীয়স্বজনের প্রবোধ বা তিরস্কার তাঁহার বৈরাগ্যঘন হৃদয়ে প্রতিহত

হইল। আমার পত্নীও তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পান, যে বৃদ্ধবয়সে সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর বৃত্তি লইয়াও তাঁহার পিতৃদেব সংসারের অনটনে পুনরায় সুদূর চট্টগ্রামে চাকরী করিতে গেলেন। আর তাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়াও পিতৃভার লাঘব করিবেন না?" এ ব্রহ্মাস্ত্রও সুবোধে ব্যর্থ হইল। হাসিয়া সুবোধ বলিলেন, "যে যাহার কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে। অধ্যাপকতা করিলে তিনি অনায়াসে মাসিক বেতন ৫০০৲, ৬০০৲ টাকা ও অধ্যক্ষপদও পাইতে পারেন, এই প্রলোভনে তিনি উত্তর দেন. "বুদ্ধদেব রাজ্য ছাড়িতে পারিলেন, আর আমি বেতনের মায়া ছাড়িতে পারিব না।" কর্ম্মের জন্য মাতৃদেবী পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "মা, এতদিন কিছু আমি শিখি নাই। এইবার শিখিয়াই কর্ম্ম করিব।" সন ১৩১৪ সালে তিনি আমাকে লইয়া শ্রীগুরু দর্শনে যান। তাহার বিবরণ অস্ত্যলহরীতে বিবৃত। কয়েক বৎসর শারদীয় পূজাবকাশে তাঁহার সহিত মহানন্দে যাপন করিয়াছি।

নৈষ্কর্ম্ম্যযোগ

প্রথম প্রথম লোকে তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিত। পরে তাঁহার প্রেমোন্মাদভাব প্রকট হইলে সকলে তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিল। তাঁহার শেষাঙ্কও বিচিত্র। তাঁহার পিতৃদেব চট্টগ্রামে দেহ রাখিয়াছেন। মাতৃদেবীও তৎপরে পতির অনুগমন করিলেন। তাঁহারা দুই পুত্রশোক পাইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহাদের পুত্রশোক দেওয়া উচিত নয় বিবেচনায় বোধ হয় তিনি গৃহে ছিলেন। তাঁহার কন্যাও সৎপাত্রে পড়িল। পত্নী ও পুত্রের ভার জ্যেষ্ঠ সহোদর লইয়াছেন। তাঁহার আর ইহধামে থাকিবার ইচ্ছা নাই। তদ্বিষয় মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত করেন। শরীরে কোন ব্যাধি নাই। হঠাৎ উরুদ্বয়ে উরুস্তম্ভ দেখা দিল। তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সহোদর ও সহোদরা স্থানীয় সুচিকিৎসক ডাকাইলেন। ভিষক্ ভয় পাইয়া কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে বলিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গেলেন। রোগ যে কঠিন তাহা উভয় চিকিৎসকই বুঝিলেন। রোগী নির্ব্বিকার। পূর্ব্ববৎ প্রেমোন্মত্তাবস্থা। কয়েকদিন পরে উরুস্তম্ভ ফাটিয়া গেল। সেই সময় আমিও দেশে যাই। আমার সঙ্গে গুরুভক্ত প্রফুল্লকুমার বসু ছিল। উভয়ে

প্রাতে রোগীকে দেখিতে গেলাম। রোগী বাহিরের ঘরে শয়নে তন্ময়। দুই চারিবার ডাকিবার পর শ্বাসের বিশিষ্ট ক্রিয়াদ্বারা যোগভাব ভাঙ্গিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "হরিদা"। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুবোধদা, তোমার উরুস্তম্ভ!" তিনি উঠিয়া বসিলেন। উরুদ্বয় দিয়া রক্ত ও পুঁজ পড়িতেছে। আহা নাই, উহু নাই। মুখ বিকারাদি নাই ও দেহ যেন তাঁহার নয়। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও শরীরের ধর্ম্ম।" আমি বলিলাম, "এবার কি যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।" নিকটে শুশ্রূষা পরায়ণা সহোদরা ছিলেন। এ কথায় "আম খাইব" উত্তর দিয়া ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। "আম" ফলের মধ্যে সুরসাল। এই দুঃখময় ধাম মাকালফল তুল্য। আনন্দময়ধামকে প্রহেলিকায় আম্রফল বলিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া রোগ গুরুতর বোধ হইত না। সুতরাং লোকে তত উদ্বিগ্ন হয় নাই। সহোদরা আমায় বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদা! ছোটদাদা কি বলিলেন?" আমি বলিলাম, "তুমি ত দিদি শুনিলে।" তিনি তাঁহার উত্তরের আপাতত: অর্থ গ্রহণ করিলেন। "তবে উহার জন্য ভাল আম কলিকাতা থেকে আনিতে দেই?" আমার প্রাণে জাগিল, "সুবোধ দাদা পলাইবেন।" কয়েকদিন পরেই চিকিৎসক একরূপ হতাশ হইলেন। সেই রাতেই দেহপাত হইবে এরূপ জানাইলেন। পরিবারবর্গ সশঙ্কিত। রোগীর কোন উদ্বেগ নাই, শঙ্কা নাই। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "রাত্রে অন্ধকারে কোথায় যাব। কাল সকালে দিবালোকেই যাব।" কোন যন্ত্রণানুভব নাই, রাত্রে তন্ময় দশা। সূর্য্যোদয় হইলে ধ্যানভঙ্গে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, ভগ্নী, জামাতা প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

যেমন গুরু তেমন শিষ্য

শ্রীগুরুর কৃপায় তাঁহাতে অচিরে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গলাভে আমারও কিছু কিছু তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। শ্রীরাম যে সন্তানগণের সহিত ছায়ারূপে সতত বিচরণ করেন তাহা সুবোধচন্দ্রের নিকট শিখি। একবার ৺শারদীয়া চতুর্দ্দশীতে তারামার মেলায় সুবোধদা যান। শ্রীরাম বর্ত্তমানে ঐ মেলায় আনন্দের লহরী ছুটিত। কত ভক্ত, কত গৃহী, কত সাধুসন্ন্যাসী আসিতেন। ঐবার হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়ও

গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে সুবোধ বাবার চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছেন, এবং গুরুভাইগণকে বলিতেছেন যেন তাঁহার

ভিক্ষা

বাসনা পূর্ণ হয়। তাঁহার কাতরতায় হৃষীকেশও বাবাকে তাঁহার মনোরথপূরণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রাম বলিলেন "তোমরা জান, সুবোধদার কি মনোভাব। ও পূর্ণ সন্ন্যাস চাহিতেছে। উহার পিতা, মাতা, পত্নী আছে। সন্ন্যাস দিব কিনা ভাবিতেছি। সুবোধের আবেগ জয়ী হইল। শ্রীগুরু অদ্ভুত গৃহসন্ন্যাস দিলেন। মাতার ও পত্নীর নয়নে রাখিলেন। কিন্তু পূর্ণ সন্ন্যাসী করিলেন।

সন ১৩১৮ সালে রামের তিরোধানের পর সুবোধ কয়েক বৎসর বহুদক ছিলেন। বদরিকাদি তীর্থ পর্য্যটন করেন। পরে কুটীচক হইয়া গৃহসন্ন্যাসী হইলেন। সংসারে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় রহিলেন।

গৃহসন্ন্যাস

দেহরক্ষার জন্য যৎসামান্য আহারে স্পৃহামাত্র ছিল। পার্থিব সর্ব্বকামনাই জয় করেন। একাকী আসীন বা শয্যায় শয়নে ধ্যানমগ্ন থাকেন। এতদবস্থায় আমার সহিত মন্মথনাথ সেন নামক জনৈক গুরুভাই তাঁহাকে দেখিতে যায়। মন্মথভায়ার ডাকাডাকিতে সুবোধের বাহ্যভাব আসিল। মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল—"সুবোধ দাদা, এখন কী সাধনে আছেন?" সুবোধ বলিলেন—"চিন্তনে।" আর বিশেষ কথা হইল না। কারণ তিনি পুনরায় ধ্যানমগ্ন। মধ্যে মধ্যে আমি দেখিতে যাইতাম। আমাকেও তিনি পরিহার করিতে চাহিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার লজ্জাঘৃণাদি অষ্টপাশ বিদূরিত হয়। কটিতে বসন থাকে না। শেষ কয়বৎসর উলঙ্গ থাকিতেন। শীতকালে শয্যায় একখানি চাদর থাকিত। কখনও তাহার দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিতেন মাত্র। রাজযোগের

কীটভৃঙ্গন্যায়

ফলে বজ্রোলি প্রভোলী প্রভৃতি মুদ্রা স্বতঃস্ফূরিত হইয়া তদীয় লিঙ্গ দেহান্তর্গত হয়। কীটভৃঙ্গন্যায়ে গুরুধ্যানে তাঁহার আকৃতিও শ্রীগুরুর আকৃতির ন্যায় হইয়া যায়। যখন তিনি উলঙ্গাবস্থায় বহির্দ্দেশে যাইতেন তখন তাঁহার বিস্ফারিত বক্ষঃ, লম্বোদর, দীর্ঘবাহু ও উর্দ্ধগত লিঙ্গাদি দর্শনে শ্রীরাম বলিয়া ভক্তগণের ভ্রম হইত। শেষাবস্থায় রামের ন্যায় বাল্যভাব আসিয়াছিল। শয্যায় নিজ প্রস্রাবের জলে ভাসিতেছেন, শরীর নিজের মলদিগ্ধ, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নাই। মহামায়া নাম্নী নিজ ভগ্নী তাঁহার সেবা

করিতেন। তিনি আসিয়া শয্যা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া মলাদি ধৌত করিয়া দিতেন। ভাবাও বামের স্থায় হইয়াছিল। জন্মান্তর স্মৃতিও জাগিয়াছিল। বিভূতি আসিয়াছিল। কিন্তু বিভূতিতে মজেন নাই। লক্ষ্য ছিল শ্রীগুরু পরমতত্ত্ব।

১৮। গৃহমেধী

একটি ১৩।১৪ বছরের বালক হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে আসছে তারাপীঠ অভিমুখে। দ্বারকা পার হ'য়ে শ্মশানে অদৃশ্য হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আবার দ্বারকার অপর পারে কবিচন্দ্রপুরের মাঠে হতভম্ভ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দেখছে ভোরের ঝাপসা আলোয়। ঐযে ছুটে চলল, হঠাৎ যেন আছাড় খেয়ে ঝুঁকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল—

"ওরে ওঠ, পা ছাড়, এখানে মাঠে এসে জুটেছিস ওঠ, পা ছাড়, বলছি। ওরে ব্যাটা তোর গায়ে-মাথায় পেসাব হ'য়ে গেল রে। আরে তবু পা পাড়ে না।"

"তা হোক্ বাবা, এই ভোর হচ্চে, সুরধনী ধারা বয়ে গেল, আমি শুদ্ধ হ'লুম। আমায় মন্ত্র দিন বাবা।"

"কইরে বেটা, দেখি তোকে, যা তোর হ'বে এখন বাড়ী যা গা।"

এক বছর পরে

"ওরে বেটা, এই আবার এসেছিস্; দাঁড়া তোকে পিটিয়ে ঠিক করচি।"

দমাদম শব্দ।

"ওরে তোর মুখে রা নেই, বটে।"

"আরে ক্ষ্যাপা করে কি? শ্মশানের পোড়া কাঠ পিটে দুধের ছেলেটাকে খুন করবে নাকি?" শচীপাণ্ডা ছুটে এসে ছাড়াতে চেষ্টা করে, পারেনা. "আঃ কি আপদ, বুড়োর কি ভীমরতী হ'ল।"

শচী পরে ছিনিয়ে নিয়ে আগলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। ক্ষ্যাপা বাবা দস্নেহে ছেলেটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে "কি বাবা লেগেছে, যাও বাবা পাণ্ডা বাবা যত্ন করে বাবা, ওর সাথে যাও বাবা।" বালক গভীর রাতে শ্মশানে ঘুমিয়ে পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে অতি কষ্টে

উঠে দেখল সামনে দীর্ঘকায় ক্ষ্যাপা বাবা দাঁড়িয়ে। "কি বাবা, মা যে তোকে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র দিলেন বাবা। ঐ মন্ত্র জপ করগা, যা বাড়ী যা, বাবা, জপাৎ সিদ্ধিঃ।" বালক বাবার কাছে যাতায়াত করে। দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে যায়। সন্ন্যাস চায়, বাবা দেন না। বলেন তুই সংসারী হবি, যা বিয়া কর গা যা।" শিষ্যও নাছোড়বান্দা, বাবারও এক কথা। মণি গোঁসাই মন্ত্র পেয়ে শ্মশানে শ্মশানে ফেরে, ১০০৮ বাংলার শ্মশান, চক্ষে দর দর ধারা। মন কিন্তু মানে না। আবার শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে ছোটে, আবার হতাশ হয়ে ফেরে। উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। মা বাপ ছেলের ভাবভঙ্গি দেখে ক্ষ্যাপা বাবার শরণাপন্ন হ'ন। "যা, কনে ঠিক করগা, যা ছেলে বিয়া করবে।"

স্বপ্নেদীক্ষা

বিয়ের ঘনঘটা দেখে গোঁসাই আবার ছোট শ্মশানে তারাপুরে গুরুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। "আমায় সন্ন্যাস দিন, বাবা, আমি সংসার কর্ব্ব না।" "নারে তোর সংসার কে দেখবে।"

"কেন দাদা ত আছেন।"

"সে যে অল্পায়ু রে শালা, তোকেই ভার নিতে হ'বে। তোর কর্ম্ম কিছু বাকী আছে, সংসারে ভোগ ও যোগ একসাথে হলেই সিদ্ধি। পা ছাড়, যা ঘর যা। যাবি না তবে রে শালা" তাড়া করেন। অগত্যা মণি বিবাহ করেন, পুত্র কন্যা হয়। গৃহসন্ন্যাস কিন্তু অন্তরে জপ অহরহ। শ্মশানে ঘোরেন আপন ঘোরে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বসিরহাটে লোকে বলে "তারা ক্ষ্যাপা।" সাতক্ষীরা শ্মশানে শব সাধনা করেন। মার দর্শন পান তাঁর বর্ত্তমান আসন সন্নিধানে। তাঁর সর্ব্বজ্ঞ গুরুর আদেশ স্বীকার করে গৃহমেধী আছেন কিন্তু নিরাসক্ত। তাঁর বীরাচার। বসিরহাটে মন্দিরে যে মূর্ত্তি এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ২৫০০ বৎসরের প্রাচীন। গোঁসাইজি যোগবিভূতি লাভ করেছেন। ঘটনাচক্রে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে কয়েক ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন "মা চিন্ময়ী"। বহু ভক্ত শিষ্য তাঁর আশ্রমে যোগপথে অগ্রসর হচ্চে। ক্ষ্যাপাবাবার ভবিষ্যৎ বাণী ফলেছে। তিনি "ভোগ ও যোগ নিয়ে সিদ্ধিলাভ" করে সংসারেই আছেন। এই বীর সন্তান মণিমোহন গোস্বামীর জন্ম ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী, স্বরূপনগরের বাংলানিগ্রামে (২৪ পরগণা), পিতা ৺প্রভাসচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মাতা ৺হেমাঙ্গিনী

দেবী নাটোর রাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্টা। উপনয়নের পর পিতার নিকট বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেন ও যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে যোশিমঠের এক সাধুর নিকট সন্ন্যাস নেন। নামকরণ হয় মোহনানন্দ পুরী তথাপি বামাক্ষ্যাপা বাবা এঁর হৃদয়াধিকারী। তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করেই ইনি সিদ্ধিপথের অধিকারী।

অন্ত্য লহরী

১। মাতৃবিরহ

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥

অন্তরে কৃপা
বাহিরে নিষ্ঠুরতা

দুর্দ্দান্ত শত্রু মহিষাসুর বধে আনন্দিত দেবগণ মার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, "মা! তোমার এই পরাক্রমের তুলনা নাই। এইরূপ ভয়ঙ্কর রূপই বা কোথায়? আবার তোমার কৃপার ধারাও বিচিত্র। তোমার অন্তরে কৃপা, বাহিরে সমর-নিষ্ঠুরতা। ত্রিভুবনে এইরূপ তোমা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। জগতের শান্তির জন্য তুমি অসুরগণকে সবংশে নাশ করিতে উদ্যতা। আবার ভীমসাজে অসিকরে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা। তোমার অস্ত্রপ্রহারে লক্ষ লক্ষ মুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহাদের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত। ইহা অপেক্ষা আর নিষ্ঠুরতা কি হইবে মা! কিন্তু অন্তরে তাহাদের জন্য তোমার করুণা অপার। হায়! অবোধ সন্তানগণের উদ্ধার কিরূপে হইবে ভাবিয়া আকুল। তাই তুমি তাহাদিগকে স্বহস্তে নিধন করিয়া উদ্ধার করিতেছ।" সত্যসত্যই জীবের আসুরিকভাব—মদ, মোহ, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধাদি—করুণাময়ী মা ভিন্ন কে নাশ করিবে? সেই ভাব নষ্ট না হইলেই বা জীবের কিরূপে উদ্ধার হয়? তাই জীবের জীবভাব নাশে মার এত কঠোরতা। অসুরসমরের এই তত্ত্ব। মার চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা জীব একটু অনুধাবন করিলেই প্রতিপদে দেখিতে পাইবে। এই অধম মাতৃবিরহে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 'বাম' যে দীনদয়াল পতিতপাবন অধমতারণ তাহা অধম মাতৃশোকেই জানিতে পারে। মাতৃশোকই তাহার পক্ষে তারণদ্বার।

সন ১৩১১ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রে আমার স্নেহময়ী জননী ইন্দ্রবালা দেবী জনাই গ্রামে স্বামীপুত্রাদি সাক্ষাতে সাতদিনের জ্বরবিকারে

হিন্দুরমণীর স্পৃহনীয় মরণ প্রাপ্ত হন। উষার আলোকে তাঁহার শবদেহ শ্মশানে আনা হয়। মা আমার উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী পরমাসুন্দরী। শ্মশানে যখন তাঁহাকে বসাইয়া স্নান করাই, শ্মশান যেন তাঁহার রূপে আলোকিত হইল। শ্মশানের অদ্ভুত মহিমা। তথায় শোক থাকে না। পল্লীগ্রামের নিয়ম তারা দেখিয়া গৃহপ্রবেশ। তাই দাহের পর দ্বিপ্রহরে বাগানবাটীতে আসিলাম। হৃদয় শোকাকুল। ধৈর্য্য রহিল না। যুবা হইয়াও বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। বোধ হইল সোনার প্রতিমা চিরকালের জন্য নিরঞ্জন করিয়া আসিয়াছি। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমার পূর্ব্বে একটী ভগ্নী জন্মেন বটে, কিন্তু এই সংসারে আগমনির্গম সমসাময়িক। আমিই মাতার বাৎসল্যরসের একমাত্র পাত্র। আমাকে লইয়া তাঁহার সংসার। আমার স্নানের সময় মাথার কেশ ছিঁড়িলে তাঁহার ক্লেশ হইত। আমি মাটিতে চলিয়া গেলে তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিত। বাল্যকালে রোগে আমাকে তিনি আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। আমি কর্ম্মোপলক্ষে বাটীর বাহিরে কয়েক ঘণ্টার জন্য যাইলেও তিনি সহিতে পারিতেন না। যাত্রাকালে প্রতিদিন আমার মস্তকে রক্ষামন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি পাগলিনীর ন্যায় সদর পর্য্যন্ত আমার সহিত আসিতেন এবং পরে অনেকক্ষণ নিরাপদে প্রত্যাগমন কামনায় জপ করিতেন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে না আসিলে তিনি অধীরা হইতেন। যশোমতী বৈষ্ণবগণের আদর্শ পুত্রবৎসলা। আমার জননী যশোমতীর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। এরূপ মাতার চিরবিদায় যে শেলসম লাগিবে বলা বাহুল্য। আমার শোকের গুরুত্বের আরও এক কারণ এই যে যেমন আমি মাতার স্নেহের একমাত্র অধিকারী সেইরূপ শোকেরও একমাত্র অধিকারী হইলাম। ঐ শোকের অংশ পাইবার কেহ ছিল না। কবি চূড়ামণি ঠিক বলিয়াছেন।

মাতৃবিরহ

সিণিদ্ধজন সংবিহত্তং হি দুকৃখং সদ্ম বেঅনং হোই
[স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি]

শোক

যখন আপনার লোক দুঃখ বাঁটিয়া লন তখনই দুঃখ সহনীয় হয়।

পিতৃদেব আমার জন্য চিন্তিত। তিনি নিজের শোক আমার মুখপানে চাহিয়া চাপিয়া রাখিয়াছেন। নূতন বস্ত্রাদি ও দুগ্ধ বাগানে পাঠাইয়াছেন।

আমি তখন তক্তাপোষে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছি। কে বস্ত্র পরে কেই বা দুধ খায়। আমার একজন পিতৃষ্বসা সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। উঠিলাম, স্নানে গেলাম। 'কাচা' লইয়া আবার বাগানে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সেই রোদনের মধ্যে হঠাৎ কে যেন কাণে কাণে বলিল—"১০৮ রূপ চণ্ডী পড়্ তোর মাকে ফেরৎ পাবি।" বলা বাহুল্য এ কোন শরীরীর বাণী নহে। সেই বিশ্বমা। যাঁহার "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা" তাঁহারই এ আশ্বাসবাণী। এই কথায় মনে আশা জন্মিল। আশার সঙ্গে সঙ্গে শোক একটু কমিল। সঙ্কল্প করিলাম, "আগামী কল্য হইতে অর্গলাদি সপ্তশতী ১০৮ দিনে ১০৮ রূপ পড়িব।" তাহার পরদিন হইতে সমস্ত চণ্ডী একরূপ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মাতাঠাকুরাণীর উপগুরু নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমায় বলিলেন—"বাবু, আপনার অশৌচান্ত হয় নাই, এখন কাম্য চণ্ডীপাঠের বিধান নাই। সঙ্কল্প না করিয়া চণ্ডীপাঠে ফল নাই।" আমি তাঁহাকে সদাচারাদির জন্য শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু এ কথায় আমি চণ্ডীপাঠ হইতে বিরত হইলাম না। শ্রাদ্ধাদি একরূপ অবস্থানুযায়ী হইল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণাদির পদধুলি পড়িল। কলিকাতায় পিতৃদেব প্রভৃতির সহিত ফিরিয়া আসিলাম। তখন আমি চুঁচুড়া আদালতে ওকালতি করি। কলিকাতা হইতে নিত্য তথায় যাতায়াত করি। দুঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ চণ্ডী নিত্যপাঠান্তে আহারাদি করিয়া হাওড়ায় ৯টায় রেলগাড়ী ধরিতে হয়। বাঁধা পাল্‌কীতে হাওড়া যাই ও সন্ধ্যাবেলায় হাওড়া হইতে বাসায় ফিরি। পথে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহি না। কেবল ভগবানকে ডাকি আমার মাকে বাঁচাইয়া দাও। মাকে দুই তিন রাত্রে স্বপ্নেও দেখিতে পাই। প্রথম দিন স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিতে যাই। তিনি সরিয়া যান আমি অনুগমন করি। তিনি পুনরায় আসিব বলিয়া আকাশে মিশিয়া যান।

আশ্বাসবাণী

সঙ্কল্প

চণ্ডীপাঠ

আমার তাৎকালিক ভাব অবর্ণনীয়। হৃদয়াকাশ চতুর্দ্দিকে শোকঘনে ঘেরা। কিন্তু সেই কাদম্বিনীর মাঝে আশা সৌদামিনী খেলিতেছে যে ১০৮ রূপ চণ্ডী পড়িলে মাকে পাইব।

প্রাণের কি জ্বালা কি জানাইব। পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা প্রফুল্ল ছিলাম।

হাসির ফোয়ারা অন্তর হইতে অবিরাম উছলিয়া উঠিত। কলিকাতার ভীষণ মড়কেও বলিতাম—"বছর বছর যাহারা মরে তাহারাই মরিবে।" গাহিতে না জানিলেও পথে ঘাটে মাঠে আহারে বিহারে মুখে গুণ্ গুণ্ লাগিয়া থাকিত। বাজাইতে না জানিলেও টেবিল, বেঞ্চি চাপড়াইয়া তেরেকেটেতাক্ সাধিতাম। রেলগাড়ীতে চুঁচুড়া আদালত যাইবার ও তথা হইতে আসিবার সময় আমাদের কুক্কুট রাগিনী ও তক্তাচাপড়ানীর চোটে অপর যাত্রীগণ অস্থির হইতেন। কেহ কেহ ছেবলা বলিতেন। এক চাবুকের ঘায়ে এক মাতৃশোকে সব পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

প্রাণের জ্বালা

মুখে হাসির পরিবর্ত্তে বিষাদ কালিমা, রাগ ভাঁজার স্থলে বিলাপের বিনুনি, বাচালতার পরিবর্ত্তে মূকতা, বাজনা সাধার পরিবর্ত্তে করাঙ্গুলিতে জপ। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কথা কহি না। আদালতে হাকিমদের সহিত যতটুকু কাজের জন্য আবশ্যক বলি। উকিলখানায় চুপ করিয়া থাকি। মনে মনে কখনও মাকে ভাবি। কখন আবেগ আসিলে—

উকিলখানায়

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ ইত্যাদি—

স্তুতি গদ্গদ কণ্ঠে দেশকালপাত্রাদির বিচার না করিয়াই পড়ি। আমার ভাব দেখিয়া কেহ কেহ বা সহানুভূতি, কেহ কেহ বা তামাসা করেন। হুগলীর উকিল শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় যত্ন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের শ্রীগুরুর বিষয় অলৌকিক উপাখ্যান শুনাইয়া অন্তর্জগতের কথায় আমায় সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পান। একদিন উকিল শ্রীললিতমোহন মিত্র (বড় ললিতবাবু) আমার ভাব দেখিয়া বলেন —"Heavenly manna is to be showered on you soon." শীঘ্রই স্বর্গের শান্তিসুধা তোমার উপর বর্ষিত হইবে। তিনি এক্ষণে হাইকোর্টের উকিল। আমাকে ভালবাসেন। তাঁহার একথা মনে নাই। আমার প্রাণে প্রাণে সেকথা গাঁথা আছে। শ্রীরাম ভাবি ঘটনার ছায়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির করেন।

বাটীতে উদ্দামভাবে চণ্ডী পড়ি। প্রাতে নিত্য একরূপ, কোন কোন দিন আবার কাছারি হইতে আসিয়া রাত্রে একরূপ সমগ্র সপ্তশতী

অর্গলাদিসহ পাঠ করি। মনে মনে বিশ্বাস ১০৮ রূপ চণ্ডী পড়িলেই মাকে পাইব। যতশীঘ্র ১০৮ রূপ পাঠ শেষ হয় বলিয়া ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শোক চাপিয়া রাখিতে না পারায়, বালকের ন্যায়—'মা মা কোথায় গেলি' বলিয়া কাঁদিয়া শোকভার লঘু করি। পিতৃদেব স্বনামধন্য মহাভারত ও চরকাদির ইংরাজী অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীকিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার জন্য বড়ই চিন্তিত। আমার উদ্দাম চণ্ডীপাঠে তাঁহার আশঙ্কা যে আমার ভাবোন্মাদ ব্যাধি আসিতে পারে। এই ব্যাধির চিকিৎসা আবশ্যক এইরূপও দুই একদিন বলিয়াছেন। পত্নীশোকে তাঁহার হৃদয়ও জর্জ্জর। কিন্তু আমার জন্য তিনি শোক প্রকাশ করিতে পারেন না। কোন কোন দিন তাঁহার প্রাণের ব্যথা ফুটিয়া উঠিলে তিনি ঘনরামের ভাষায় বলিতেন "পত্নীশোক যেন কাঁচা বাঁশে ঘুণ।"

ভাবোন্মাদ

২। মাতৃদর্শন

উদ্যোতয়ন্মুদ্রিতনেত্রয়োর্মম
স্নেহৈকমূর্ত্তিং জননীং দিবং গতাম্।
ত্বং রাম মাং বিস্ময়শোকজর্জ্জরং
মৃত্যুঞ্জয়ে ধামনি গূঢ়মানয়ঃ ॥

হে রাম! তুমি আমার মুদ্রিতনয়নে (সেই) স্নেহময়ী স্বর্গগতা জননীকে (অদ্ভুতভাবে) উদ্ভাসিত করিয়া শোকে ও বিস্ময়ে অভিভূত আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে তোমার সেই ধাম যথায় জন্ম মৃত্যু জরাদি নাই তথায় আনয়ন করিয়াছ।

সংস্কৃত সাহিত্যাদি কিঞ্চিৎ শুকবৎ পড়িয়াছিলাম বটে কিন্তু "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" আমার অদৃষ্টে বিদ্যার সে ফল ফলে নাই। কুফলই ফলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাঙ্কণে আমি একটা 'কেওকেটা' নয় জ্ঞান হইয়াছে। আবার দুই পাতা সাঙ্খ্য, বেদান্ত, ন্যায় উল্টাইয়া আমি একজন পণ্ডিত বোধ আসিয়াছে। হৃদয় দম্ভে পূর্ণ। অদ্বৈতবাদীর নিকট অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, দ্বৈতবাদীর নিকট অদ্বৈতবাদ স্থাপন

বিদ্যার কুফল

চেষ্টা করি। কোন বাদেই বিশ্বাস নাই। পরলোকাদিতে আস্থা নাই। ইহলোককেই সর্ব্বস্ব জানি। আত্মবিচার কাকদন্ত পরীক্ষা বলিয়া ধারণা। ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। তবে তাঁহাদের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে বিস্মিত। তাঁহাদের ত্যাগ ও তপস্যাদি মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক মনে হয়। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' ইত্যাদি লোকায়তিক মতই মত। ভোগই জগতের সার এই বুঝি। তখন নব যৌবন। পরীক্ষাদি উত্তীর্ণ হইয়াছি। বাপের ভাতে আছি। সংসারের ভাবনা নাই। পিতামাতার কোলে যত্নে লালিত।

'জীবৎসু তাতপাদেষু নব দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ ॥'

বিপথে

ইহার উপর আবার ওকালতি কিছু কিছু পাইতেছি। পিতামাতা সে টাকা চান না। পুস্তকাদি কেনা ও নিজের ভোগবিলাসে সে টাকা ব্যয় করি। মানুষ অবস্থার দাস। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা। ক্রমে সন ১৩০৭ সাল হইতে কুভোগে মন গেল।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

"শাস্ত্রৈকদেশাঃ শুকবদ্‌গৃহীতা উপাধিলাভায় ময়া কথঞ্চিৎ।
রাম! স্মৃতং তেন পাদারবিন্দং আশা মমৈকা করুণাময়ত্বম্ ॥
কালুক্যমূর্ত্তেঃ স্মরকিঙ্করস্য শাস্ত্রে শ্রমঃ শূন্যজলাঙ্কণং মে।
রাম! স্মৃতং তেন পাদারবিন্দং আশা মমৈকা করুণাময়ত্বম্ ॥

অনন্তশাস্ত্রের একদেশমাত্র উপাধিলাভের জন্য শুকের ন্যায় অবোধপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়াছি! হে রাম! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করি নাই। (নাথ! আমার গতি কি হইবে?) তবে আমার এই ভরসা যে তুমি করুণাময়।

আমি মূর্ত্তিমান পাপ, কামের কিঙ্কর, আমার শাস্ত্রপরিশ্রম, শূন্যে জলাঙ্কণের ন্যায় বৃথা, হে রাম! তোমায় পাদপদ্ম স্মরণ করি নাই। তবে আমার এই এক ভরসা যে তুমি করুণাময়!

শোকের সুফল

জীবনের এই মহাসন্ধিস্থলে আমি দণ্ডায়মান। আমাকে ফিরাইবার জন্যই মাতৃশোক দিলেন। তাই বলি ভাই—তাঁহার 'চিত্তে কৃপা সমর-নিষ্ঠুরতা'। শোকে মনের গতি অন্য দিকে গিয়াছে; চাপ না পড়িলে কেউ বাপ বলে না। পঠদ্দশায়

পরীক্ষার ভাবনায় মানের কান্নায় 'কোথা হরি দয়াময় লজ্জানিবারণ', বলিয়া প্রতিরাত্রেই শয়নের পূর্ব্বে শয্যায় কাঁদিতাম। উদ্দাম যৌবনেও বিপদে পড়িলে 'কোথা বিপদভঞ্জন হরি! তরাও আমায়' বলিতাম। এক্ষণে মাতৃশোকে সেই ভয়ঙ্কর বিপদে শয্যায় ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শুনিয়াছি 'মহাপুরুষ আছে। আমার বিশ্বাস নাই বটে; কিন্তু আমি তাপিত জীব, তোমরা তাপহারী। আমাকে কি দয়া করিবে না? আমার তাপিত প্রাণে কি শান্তিবারি ঢালিবে না?

কি আশ্চর্য্য এইরূপ দিনকয়েকমাত্র কাঁদিবার পর মহাপুরুষ শ্রীরাম হাত বাড়াইয়া দিলেন। ৩১।৩২ রূপ মাত্র চণ্ডী পড়া হইয়াছে। শক্রাদি স্তুতি কলিকাতার বাসা-বাটীতে প্রাতে পড়িতেছি। একটু ভাবোদয় হইয়াছে। চক্ষুমুদ্রিত, ভক্তিরসে হৃদয় ঈষৎ আপ্লুত। হঠাৎ সম্মুখে রক্তকমলের মধ্যে স্নেহময়ী জননীর মূর্ত্তি আবির্ভূত। সেই আকৃতি, সেই অবয়ব, সেই মাথায় ঘোমটা টানা আমার দিকে স্নিগ্ধকরুণদৃষ্টিতে হাসিতেছেন। আমি চমকাইয়া উঠিলাম। নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত। গদগদস্বরে ঐ জননীকে উদ্দেশ করিয়া স্তুতি পড়িতে লাগিলাম:—

রামের দয়া

জ্ঞাননয়নে মাতৃমূর্ত্তি

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কণকোত্তম কান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥

চণ্ডী শেষ হইল। হৃদয়ে বিস্ময়ানন্দ জর্জর কি এক—ভাব। কাহাকেও এ ঘটনার কথা বলিলাম না।

আমার জীবন নাটকের এই অঙ্ক রাম পরে এইপ্রকার অঙ্কিত করিয়াছেন।

নীতা দিবা স্নেহময়ী চ মাতা
প্রজ্বালিতো মে হৃদি শোকবহ্নিঃ।
রাম! ত্বয়ৈবামৃতবর্ষণার্থং-
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কৃতস্তে॥১॥

জীবনের এই অঙ্ক

শতাষ্টবারং পঠতাত চণ্ডী
মুজ্জীবিতাম্বা তব ভাবিনীতি।
বিশ্রাবিতা মে ভবতা হি বাণী
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কৃতস্তে॥ ২ ॥
শোকার্ত্তকামী করুণং রুরোদ
কঃ কুত্রতো দর্শয় মাতরং মে।
ত্বঞ্চার্ত্তনাদমশৃণোর্দয়ালঃ
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কৃতস্তে॥ ৩ ॥
উদ্দাম চণ্ডীমপাঠয়শ্চ মাসং
ত্বং দর্শয়ামাসিথ রক্তবৃত্তে।
মামিন্দ্রবালাং জননীং সহাসাং
পাপে ময়ীদৃক্ করুণা কৃতস্তে॥ ৪ ॥

তুমিই রাম। অমৃতবর্ষণের জন্য স্নেহময়ী মাতাকে স্বর্গে লইয়া আমার হৃদয়ে শোকানল জ্বালিয়াছ। কেন এ ঘোর পাতকীর উপর তোমার এত করুণা।

একশত আটবার চণ্ডী পড়িলে আমার মাকে পুনরায় পাইব এই আশ্বাসবাণী তুমিই আমায় শুনাইয়াছিলে। কেন এ ঘোর পাতকীর প্রতি তোমার এত করুণা।

শোকাকুল কামনার দাস আমি কাতরভাবে কাঁদিলাম—কে কোথায় আছ আমার মাকে দেখাও? তৎক্ষণাৎ তুমি দয়াল সেই আর্ত্তনাদ শুনিলে। (চিত্তশুদ্ধির জন্য) আমাকে একমাস উদ্দামভাবে চণ্ডী পড়াইলে। আর রক্তমণ্ডলের মধ্যে আমার সেই স্মিতাননা জননী ইন্দ্রবালা দেবীকে দেখাইলে। কেহ এ ঘোর পাতকীর প্রতি তোমার এত করুণা।

৩। আকর্ষণ

বামেতি নাম্নি প্রথমং শ্রুতেঽপি মে ॥
রতিশ্চ বামে সহসা সমীরিতা-
শ্রীরাধিকায়া ব্রজসুন্দরে যথা ॥

বাম এই নাম শ্রবণমাত্র আমার মানসনয়নে বামের মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইল এবং সহসা ব্রজসুন্দরে শ্রীরাধিকার ন্যায় সেই বামে আমার রতি প্রবুদ্ধ হইল।

মাতৃমূর্ত্তি দর্শনের দুই একদিন পরেই বোধ হয় ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার চুঁচুড়া আদালতে শুনিলাম তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপা নামে এক মহাপুরুষ আছেন। তাঁহার শ্মশানে বাস, শবশিবাই সহচর, শবমাংসভক্ষ্য, সহজে ধরা দেন না। লোককে চিমটা লইয়া মারিতেও যান। কাহার মুখে শুনিলাম মনে নাই। কিন্তু শুনিবামাত্র ক্ষ্যাপাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ছুটিল। বৈষ্ণব কবিগণ যে গাহিয়া থাকেন—শ্যাম নাম রাধার হিয়ার পাঁজর কাটিয়া বসিয়া যায়—সেই নাম শ্রবণেই রাই পাগলিনী হইয়া কৃষ্ণদর্শনে ব্যাকুলা হন। বামের কৃপায় এই পাষণ্ড কামদাসও সেই বিশুদ্ধ শ্রীরাধাভাবের আভাস পাইয়াছে। শ্রীবাম তাঁহার মনের ভাব নিম্নলিখিত গীতে পরে বিবৃত করাইয়াছেন।

"কে তুমি হে পুরুষ রতন!
শুনি তাঁর নাম শিহরিল প্রাণ মন হ'ল উচাটন।
শুনি তুমি বামা ক্ষ্যাপা ভয়ঙ্কর
শৃগাল কুক্কুর লয়ে সহচর
শ্মশানে বেড়াও শবমাংস খাও
পূর্ব্বরাগ ধরা নাহি দাও সহজে কখন।
তবে কেন নাম শুনি হল এত আকর্ষণ।
না জানি কি গুণ আছে ঐ নামে
শুনিতে শুনিতে বৈঠল মরমে
টুটিয়ে আমার সরমভরমে
জাগাল আকুল পিয়াসা পরাণে
হেরিতে তোমার ওরূপ কেমন।

গায় মহাজনে শ্যামনাম শুনে
পাগলিনী রাই পাসরে আপন
তোমার কৃপায় আভাস যে পায়
সে ভাবেরও কিছু এ পামর জন।

প্রাণের ব্যাকুলতা চাপিতে না পারিয়া আমার পরম হিতৈষী শ্রীফণিভূষণ রায় চৌধুরীকে বলিলাম—কল্যই তারাপীঠে যাইব। তারাপীঠ পথের পরিচয় পাইলাম। রামপুরহাট দিয়া যাইতে হয়। রামপুরহাটে একরাত্রি থাকিতে পারি এমন লোক একজন তাঁহার পরিচিত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। ফণিবাবুর বহুলোকের সহিত আলাপ। যে জেলার বা যে গ্রামের কথা উঠুক তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার একজন না একজন কুটুম্ব বা পরিচিত আছেন বলিয়া থাকেন। এস্থলেও তাই ঘটিল। ফণিবাবু ভাবিয়া বলিলেন—"হাঁ বাবু! হুগলীতে মোক্তারী করিতেন, নগেন্দ্র মুখুয্যে বাবু এখনও রামপুরহাটে মোক্তারি করেন।" আমি নগেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিতে বলিলাম। ফণিবাবু আমায় বড় ভালবাসেন। তিনি বলিলেন, তিনিও আমার সঙ্গে তারাপীঠে যাইবেন। নগেন্দ্রবাবুকে আমাদের আতিথ্য নিমন্ত্রণ দিলেন। বৃহস্পতিবার যাইব স্থির হইল।

যাত্রাসঙ্কল্প

আমার মহাপুরুষ দর্শন লালসা যে নিষ্কাম তাহা কেহ মনে করিবেন না। জন্ম জন্ম কামের দাস কি সহজে নিস্কাম হইতে পারে? নাম শুনিবামাত্র মনে হইল এই মহাপুরুষ আমার মাকে বাঁচাইয়া দিতে পারিবেন। তাই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে এত ব্যাকুলতা। ফণিবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চুঁচুড়ার উকিলখানায় ছোটঘরে আসিয়া বসিয়াছি। চোখ বুজিতে না বুজিতে রক্তমণ্ডলের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষমূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিখানি বসা কোমর পর্য্যন্ত, লাল গেরুয়ার জামা গায়। মুখখানি প্রসন্ন। কতকটা তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় কিন্তু অত স্থূল নহে। মূর্ত্তি অল্পক্ষণ থাকিয়া গলিয়া গেল। কে চিনিতে পারিলাম না। কিরূপে চিনিব? ঐ মহাপুরুষকে পূর্ব্বে দেখি নাই। বিস্মিত হইলাম। কিন্তু মনে উদয় হইল না, যে মহাপুরুষের নাম এই শুনিলাম ও যিনি টানিলেন ইহা তাঁহার মূর্ত্তি হইতে

উদ্দেশ্য

অলৌকিক দর্শন

পারে। আমার মন অত্যন্ত স্থূল হইলেও দয়াময় দয়া করিয়া ঐ পটে নিজগুণে নিজচিত্র ফেলিলেন কিন্তু আমি স্থূলবুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিস্ময়পূর্ণহৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে আদালত হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছি। রেলগাড়ী চাতরা পার হয় এমন সময় আবার আমার মুদিত নয়নের সম্মুখে রক্তবর্ণমণ্ডলের মধ্যে সেই বসা পুরুষমূর্ত্তি! আমি চমৎকৃত হইলাম। কিন্তু তখনও মর্ম্ম বুঝিলাম না। তখন আমি জানিতাম না যে মহাত্মা অল্‌কট্‌কে ভারতে টানিয়া আনিবার জন্য তাঁহার হৃদয়হারী কুথ্‌মীবাবাও ঐরূপ নিজ ছবি বার বার দেখাইয়াছিলেন। তাই আমার সংশয়ও হইল না যে আমার হৃদয়াপহারক আমাকে তাঁহারই ছবি দেখাইয়া তাঁহারই নিকট টানিয়া লইতেছেন। বাম এমনি করুণাময় যে আমি বুঝিতে না পারিলেও বুঝার ফল ফলাইলেন। তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। তারাপীঠ গমনের সঙ্কল্প অটল। কলিকাতার বাসায় আসিয়া পিতৃদেবের নিকট তারাপীঠ যাইবার বাসনা জানাইলাম। তাঁহার মাতামহীর সপত্নী সত্যভামা দেবী প্রতিবাদ করিলেন। তিনি আমাদের প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার কাছেই ঘর করিতে আসেন ও তাঁহার কোলেই ইহধাম ছাড়িয়া যান। তিনিই আমাদের সংসারের কর্ত্রী। বিশেষতঃ মার পর সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি স্নেহের বশেই আমার গমনের বাধা দিতে চেষ্টা করেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, কিশোরি! হরিচরণ মার শোকে পাগলের মত হয়েছে। শুনেছি বামাক্ষ্যাপা পাগল, শ্মশানে থাকে, তার কাছে গেলে হরিচরণ আর সংসারে ফিরবে না।” দয়াময়ি! তুমি স্নেহের চক্ষে হরিচরণের হৃদয়কে নির্ম্মল বৈরাগ্যের ক্ষেত্র দেখিতেছিলে। তাহার ন্যায় নরাধম আর কে আছে? সে যে সংসারকীট কামজালে জড়িত। ঘোর বিলাসী। তাহার হৃদয়ে কি যথার্থ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে? এ যে শ্মশান বৈরাগ্য। তুমি বৃথা ভয় পাইতেছ, সে সংসার শৃঙ্খল কাটিবে। সে যে সংসারপীড়নে কাঁদিতেছিল ভগবৎপ্রেমে নয়। তখন তাহার সংসার অসার বোধ হয় নাই। এখনও সে সংসার বন্ধনে বদ্ধ। তবে তাহার বিশ্বাস যে বাম তাহাকে জগাই মাধাই অপেক্ষা লক্ষগুণে অধম জানিয়া শ্রীচরণ দিবার

আবার সে মূর্ত্তি

যাত্রা প্রস্তাব

প্রতিবাদ

জন্য টানিয়াছিলেন ; যে রাম ঘোরতর নারকীয় উদ্ধারলীলা দেখাইবার জন্য ঐ লীলা সূত্রপাত করেন সেই রাম একদিন না একদিন তাহাকে মুক্ত বিহঙ্গম করিবেন। মহাকাশের মধ্য দিয়া ব্যোমাতীত ত্রিগুণাতীত তমঃপারে তুরীয় ধামে কোলে করিয়া রাখিবেন। রামের কি কৃপা! এই পাতকীকে শ্রীচরণ দর্শনে ফিরাইবেন। সুতরাং পিতৃদেব এইরূপ প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমায় বিনা দ্বিরুক্তিতে যাইতে অনুমতি দিলেন।

অনুমতি

বলিলেন, "দিদি! হরিচরণের মন খারাপ হয়েছে। তা মহাপুরুষ দেখতে যাক্‌না, দোষ কি?" আমাকে বলিলেন, "বাবা! কবে ফিরবি?" আমি বলিলাম, "তিন চার দিন মধ্যেই।" পিতামাতা পরমগুরু তাঁহাদের অনুমতি বিনা মহাপুরুষগণ দীক্ষা দিতে চান না। শাস্ত্রেও ইহা নিষিদ্ধ। তাই আমার দয়াল ঠাকুর সহজেই পিতৃদেবের অনুমতি দেওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমার কি অবোধ মন। তখনও ভাবি নাই যে শ্রীগুরু আমাকে পাতকী জানিয়া কোল দিবার জন্য টানিতেছেন। আমার মনে আহ্লাদ হইল যে মহাপুরুষের নিকট যাইলে জননীকে প্রত্যুজ্জীবিতা পাইব।

৪। যাত্রা

৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া আদালতে আমার একটি মোকর্দ্দমা থাকে। ২০৲—৩০৲ টাকা পাইলাম। বাটী হইতেও কিছু টাকা লইয়া যাত্রার উপযোগী সাজসজ্জাসহ প্রাতে চণ্ডীপাঠাদি করিয়া ৯টার গাড়ীতে আদালতে চলিলাম। মোকর্দ্দমা উঠিল। ২টার মধ্যে শুনানি হইল। ফণিবাবুর বাসায় যাইলাম। তিনিও সাজসজ্জা এবং কিছু টাকা লইলেন। বাবার জন্য কিছু ফল ও এক বোতল বিলাতি কারণ (whisky) লওয়া হইল। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে বৈকাল ৪ টায় লুপমেলে উভয়ে শ্রীধাম যাত্রা

করিলাম। গাড়ীতে তত ভিড় নাই। আমি (Bunk-এ) উপরে শুইয়া চণ্ডী পড়িতে লাগিলাম। গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিতেছে। বর্দ্ধমানে সীতাভোগ প্রভৃতি মিষ্টান্ন পাওয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময় রামপুরহাট পৌছিয়া নগেন্দ্র বাবুর বাটী অতিথি হইলাম! তাঁহার বাসা ষ্টেশনের সন্নিকটে। তিনি পত্র পাইয়াছিলেন।

রামপুরহাটে

আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আসিলে তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিয়া প্রতিবেশীর বাটীতে গিয়াছেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। অতিথি সৎকার যত্নের সহিত সম্পাদিত হইল। তিনি বলিলেন, "দারুণ বর্ষা, এ সময় গরুর গাড়ী তারাপীঠে যায় না। পথ বিষম দুর্গম। এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে। আমার হাঁটা অভ্যাস নাই। শরীরেও বাল্যকাল হইতে তাদৃশ বল নাই। রামপুরহাট হইতে তারাপীঠ প্রায় চার ক্রোশ দূর॥ তাহার উপর দুরন্ত বর্ষা। পথও চেনা নাই, দেশও অজানা। কিন্তু এ সব বিভীষিকায় মন টলিল না। স্থির হইল প্রাতে একাকী মুটে লইয়া যাওয়া হইবে। রাত্রেই মোক্তারবাবু মুটে ডাকাইয়া দিলেন। বাম ও তারাপীঠ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার পাণ্ডা লুটবিহারী। তাহাকেই আমাদের পাণ্ডা করিতে বলিলেন।

রাত্রিশেষে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া (৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার) একবার চণ্ডী আদ্যোপান্ত পড়িলাম। ফণিবাবু আবশ্যক দ্রব্যাদি একটি ব্যাগে ভরিয়া লইলেন। বিনামা প্রভৃতি মোক্তারবাবুর বাটীতেই রহিল। আমার পরিধানে ছোট একখানি সাদা ধুতি। মাথায় একখানি লাল ডুরে নূতন গামছা। বগলে একখানি ছাপান ও একখানি হাতে লেখা চণ্ডী লাল চেলির টুকরায় জড়ান। ফণিবাবু বাবু সাজেই চলিলেন। কেবল শুধু পা, চাদর কোমরে জামার উপর জড়ান এবং মাথায় ছাতি। রামপুরহাট পার হইতে না হইতেই কাদা আরম্ভ হইল। এখানে পা দেই ত ওখানে হড়কিয়া যাই। উধাও প্রাণে ছুটিয়াছি। জ্ঞান নাই। কি এক বল আসিয়াছে। ফণিবাবু ও মুটে পশ্চাতে

পথে

পড়িয়া রহিল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার অবিরল ধারা। মাথার উপরে দিয়া তিন চার পশলা জল হইয়া গেল। কাপড় ভিজিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল গড়াইতেছে। হৃদয়ে মাতৃশোকানল এত ধূধূ জ্বলিতেছে যে শত শত

বর্ষার ধারাও সে অনলকে নিবাইতে পারে না। মহাপুরুষ টানিলেন। বর্ষা বা পিছল পথ কি সে টানে বাধা দিতে পারে? অন্য কোন লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য সেই রাম। কতক্ষণে তাঁহার নিকট পৌছিব। মাতৃশোকের কথা জানাইব। অমনি দয়াময় আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার মহাশক্তি-প্রয়োগে মাকে বাঁচাইয়া দিবেন। এই চিন্তাই হৃদয়ে জাগরূক। আমার সেই পাগলভাব দেখিয়া পথে গ্রামবাসীরা বলাবলি করিতেছে একজন গোঁসাই তারাপীঠে যাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা না করিতে করিতে আমার পথ বলিয়া দিতেছেন। কোথাও পথে কোথাও মাঠে হাঁটুভোর কাদা কোমরভোর জল ভাঙ্গিয়া বড়শাল, গোপালপুর, সানঘরে পার হইয়া দেখুড়িয়া হইয়া দ্বারকা নদীর ঘাটে আসিলাম। কোথায় ফণিবাবু, কোথায় বা মুটে!

তখন চটকা ভাঙ্গিল। দ্বারকা বর্ষায় পরিপূর্ণ, খরস্রোত। ঘাটে দেখি কোন নৌকা নাই। জানিলাম এ নদীতে কয়েকদিন মাত্র বান ডাকিলে জল থাকে। অপর সময় হাঁটু ডুবে না। তাই নৌকা চলে না। এদেশে নৌকা নাই। জোড়া তালের ডোঙ্গাতেই পারাপার চলে। ডোঙ্গাও ঘাটে একখানি মাত্র, একটি মাত্র পাটনী। ঘাটে ৫।৬ জন লোক জুটিলে খেয়া দেয়। একগাছি বড় লগিই হাল ও দাঁড়ের কাজ করে। ডোঙ্গা এ পার হইতে ছাড়িতে স্রোতে ওপারে ২০০।৪০০ হাত দূরে লাগে। ফণিবাবুর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চারিদিক দেখিতেছি; তাঁহারা সোজাপথে গোপালপুর হইতে উদয়পুরের ঘাটে পঁহুছিয়াছেন। আমি বাঁকিয়া দেখুড়িয়া গিয়াছি। উদয়পুর ও দেখুড়িয়া পাশাপাশি গ্রাম। উদয়পুর হইতে তারাপীঠ কাছে। কিন্তু দেখুড়িয়া পার ঘাট। ফণিবাবু আমাকে দেখিতে পাইয়া হাঁক দিলেন। মুটে সঙ্গে দেখুড়িয়াতে আসিলেন। আমার নিকট একটি কপর্দ্দকও ছিল না যে পার হই। তিনজনে ডোঙ্গায় উঠিলাম। ডোঙ্গা সাঁ সাঁ করিয়া তারাপীঠের উল্টা দিকে চলিল। বৃষ্টিও পড়িতেছে, নদীতে এত জল যে লগি থই পায় না। পাটনী এক লগিতেই দাঁড় ও হালের কাজ করিয়া আমাদিগকে নিরাপদে পার করিয়া দিল।

দ্বারকা পার

সরলপুরে উঠিলাম। ঘাটের উপর দুই চারিখানি ঘর গরীবদের বাস।

তাহারা মজুরি করিয়াই খায়। তখন কোন অনুসন্ধান করি নাই। তারাপীঠের দিকে ছুটিলাম। গ্রামের পথ কাঁচা উঁচু নীচু। কোথায় ঘরের ছাঁচ দিয়া গিয়াছে, কোথাও বাঁশতলা দিয়া গিয়াছে। গরুর গাড়ী চলিতে পারে। কাদা বেশ। বাঁশতলা কোমরভোর জল। আমার কাপড় ভিজে, জলের ভিতর দিয়া ছুটিতেছি। ফণিবাবু বাবু সাজে, সুতরাং আঁকিয়া বাঁকিয়া যতটা সম্ভব কাপড় বাঁচাইয়া আসিতেছেন। পথে ধর্ম্মরাজের মন্দির। গ্রামখানির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য দিগর। গোবিন্দবাবু অতি সজ্জন, বাবার ভক্ত। সে যাত্রায় তাঁহার সহিত পরিচয় হয় নাই। এক্ষণে তিনি আমাদেরই। গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। দ্বারকার বানে মাঠ ভাসিয়াছে। চবৃচব্ করিয়া হাঁটুভোর জল ভাঙ্গিয়া চলিতেছি। ক্লান্ত বোধ নাই। গন্তব্যস্থল নিকট। তাই শোকের মধ্যে প্রফুল্লতা আসিয়াছে।

সরলপুরে

অবিলম্বে তারামার মন্দির দেখিতে পাইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ দূর হইতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা মাত্র দর্শনে তথায় শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ভাবে বিভোর হন। শ্রীমুখ দিয়া এই অর্দ্ধশ্লোক স্ফুরিত হয়।—

শ্রীমন্দির দর্শনে

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্তারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥

দেখ দেখ নিতাই, ঐ মন্দিরের চূড়ায় কি সুন্দর বালগোপালমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিকশিত বদন কমল আমাকে দেখিয়া কেমন হাসিতেছেন।

শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবেগে যে আর্ত্তি, যে ক্রন্দন, যে ভূমিলুণ্ঠন ঘটিয়াছিল তাহার আভাস বৃন্দাবনদাস ঠাকুর দিয়াছেন। আমার হৃদয়ে তারামার মন্দিরচূড়া দর্শনে কোন ভক্তিভাবই উঠিল না। হৃদয়ে কেবল এইভাব কতক্ষণে সে মহাপুরুষকে দেখিব ও তিনি আমার মাকে বাঁচাইয়া আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।

গুরো? তোমার কি করুণা। এরূপ কামকামীকেও কৃপা করিবার

জন্য কামের ছলনায় টানিলে। ইহাকেই বলে অহেতুক করুণাসিন্ধু। আমি কখনও তোমায় জীবনে চাহি নাই। স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি এ অভাগাকে আগে ডাকিলে। আমি না ডাকিতে মানসপটে তোমায় ছবি দুইবার দেখাইলে। কবি তুমি ঠিক গাহিয়াছ।

সেধে দেখা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
তুমি সেধে দেখা দিয়েছ।

যখনই এই সঙ্গীত এ অধমের কাণে পৌঁছায় তখনই তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। বামের কৃপা মনে পড়ে। সে ইহাতে আকর দেয়।

তোমার আগে কারে বা গণি
তুমি দয়ালের শিরোমণি।
জয় জয় গুরো! জয় জয় গুরো!
জয় জয় গুরো! জয় জয় জয়।

এরূপ প্রেমের আকর্ষণ জীবনে আর পাই নাই। এ বাঁশরী আর হৃদয়ে বাজে নাই।

এ বাঁশী আর বাজিল না

বুঝি তেমন বাঁশী বাজেনা হেথায় (তাদের মথুরায়)
বাঁশী শুনে আকুল প্রাণে, কুল ত্যজেছে গোপীকায়।
শুন্‌তো বাঁশী সারিশুকে
শুন্‌তো কোকিল অধোমুখে
ভুলে যেত গুঞ্জরিতে কুঞ্জমাঝে ভ্রমরায়
শুন্‌তো সে মোহন বাঁশী
গগনের রবিশশী
তেমন বাঁশী প্রাণ উদাসী বাজে কি যথায় তথায়।

৫। ইঙ্গিত

সরলপুরের দক্ষিণেই চণ্ডীপুর। বসিষ্ঠের তারাসিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া তাহার নাম 'তারাপীঠ'। দ্বারকার পূর্ব্বদিকে উত্তর ও দক্ষিণ লম্বা প্রধান পথ দিয়া তারাপীঠে প্রবেশ করতঃ মহাশ্মশানের কতকাংশ দেখিতে পাইলাম। কিছু অগ্রসর হইয়া ডানদিকে একটী ঝোপ ও বামদিকে একটী বড় পুষ্করিণী দেখিলাম। ঐ ঝোপই প্রাচীন শ্মশান বা শিমূলতলা, পুষ্করিণীটাই জীবৎকুণ্ড। পুষ্করিণীর দক্ষিণেই তারামার মন্দির। প্রধান পথের উপর ঐ কুণ্ডের পশ্চিমপাড়ে একটী বাঁধান ছোট ঘাট। সেই ঘাটের নিকটে কল্‌কেফুলের ঝাড়। তাহার তলায় একজন শ্যামবর্ণ

অগ্র সম্ভাষণ

ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিই অগ্র সম্ভাষণ করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?" আমি উত্তর দিলাম, 'সম্প্রতি রামপুরহাটের নগেন্দ্র মোক্তারবাবুর বাসা হইতে।' পাণ্ডা বলিলেন, "নগেন্দ্রবাবু যে আমার যজমান।" নগেন্দ্রবাবু আমাদের নিকট ঐ পাণ্ডার নাম করিয়াছিলেন। এই কাকতলীয় মিলনে বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "আপনার নাম হুটুপাণ্ডা? নগেন্দ্রবাবু আপনার নাম করিয়াছেন।" পাণ্ডা ঠাকুর আনন্দিত হইয়া তাঁহার দাবী স্থাপন করিয়া বলিলেন—"তবে আপনারা আমার যাত্রী হইলেন।" উত্তর দিলাম—"বেশ, ক্ষ্যাপা কোথায়?" হুটাবিহারী বলিলেন—"বড় ভিজিয়াছেন, বাসায় চলুন কাপড় ছাড়ুন, তারামাকে দর্শনাদি করিবার পর ক্ষ্যাপার সহিত দেখা করিবেন।" পথে দুই তিন পশলা জল মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। এক কোমর এক হাঁটু জল কাদা ভাঙ্গিয়া কোমর পর্য্যন্ত বস্ত্র ভিজিয়াছে। সর্ব্বগাত্র দিয়া জল ঝরিতেছে। সে দিকে পূর্ব্বে লক্ষ্য ছিল না। কেবল বামকে কতক্ষণে দেখিব, তাই ছুটিয়াছি। কি আশ্চর্য যিনি এত টানিতেছিলেন, যাঁহার টানে উধাও প্রাণে এই দুর্গমপথ অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া আসিলাম, যাঁহাকে দেখিতেই তারাপীঠে আসা, যিনি আমার কামনা পূরণের একমাত্র আশাস্থল, যিনি

প্রাণমন হরণ করিয়াছেন, সেই চিতচোরার সন্নিকটে আসিয়া যেন আকর্ষণ কমিয়া গেল। প্রাণে আর দর্শনের সেই তীব্র অনুরাগ, সেই উৎকট বাসনা নাই। তখন কারণ বুঝিতে পারি নাই। বামের কৃপায় তারাপীঠের গুণ পরে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তারা শূন্যময়ী; শূন্যময়ীর ক্ষেত্রে, শূন্যময়ীর সাধকগণের প্রভাবে মাদৃশ ঘোর সংসার কীটেরও হৃদয় শূন্যময় হয়; ভালমন্দ সকল কামনা দূরে যায়, ঘরবাড়ীর কথা মনে থাকে না, জগৎ ডুবিয়া যায়। জীব যেন কি এক শূন্য পূর্ণময় ভাবে মগ্ন হয়। অন্তরে যেন কি আনন্দস্রোত কুলুকুলু বহিতে থাকে। তাই ক্ষ্যাপাকে না খুঁজিয়া পাণ্ডার কথায় আগে তাহার বাসায় চলিলাম। কয়েকপদ গিয়া তারামার মন্দির বাটীতে বার পাউটী সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম। বাঁধান আঙ্গিনা; দক্ষিণে মার প্রকাণ্ড পাঁচ ছয় তোলা উচ্চ শ্রীমন্দির। পূর্ব্বদিকে চন্দ্রচুড়ের মন্দির, পশ্চিমে মার মহোৎসবমঞ্চ দেখিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া ঐ মন্দির বাটীর পূর্ব্বদিকের খিড়কীর দরজা দিয়া পাণ্ডা পাড়ায় পড়িলাম।

শূন্যভাব

সেইখান হইতে গ্রামের বস্তি আরম্ভ; গ্রামে বিশ পঁচিশ ঘর পাণ্ডা ও কামার, কুমার, নাপিত, কলু, তেলি ও সেট আছে। পাণ্ডাদের মধ্যে সরস্বতীর চাষ কম; চাষের জমি ও প্রণামী হইতে তাহাদের জীবিকা চলে। যেদিন যাহার পালা সেদিনকার যাত্রীর প্রণামী তিনি পান। কার্য্যের মধ্যে তারামার পূজার আয়োজনাদি। সেবার ভার নাটোরের ছোট তরফের। হুটু পাণ্ডার বাটীতে পৌঁছিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া চণ্ডীর পুঁথি. নামাবলী ও গামছা লইয়া মন্দির বাটীতে আসিলাম। স্নান না করিয়া মন্দিরের ঘাটে জীবৎকুণ্ডে গা মুছিয়া মার মন্দিরে যাইলাম। শুনিলাম একজন তারাষ্টক পড়িতেছেন। তাঁহার ভক্তি গদগদ কণ্ঠ বড়ই মধুর লাগিল। তখন তারাষ্টক জানিতাম না। মাকে কাতরভাবে প্রাণের কথা জানাইলাম। যেন ক্ষ্যাপার প্রভাবে নিজ জননীকে জীয়াইয়া লইয়া যাইতে পারি। মার মূর্ত্তি দেখিলাম। উচ্চ বেদীর উপর বসা রূপার মুখ, গলা হইতে ঘেরাটোপ কেলা, তার উপরে বক্ষে দোলান ছোট ছোট রূপার মুণ্ডমালা ও চারিটী হাত। মার শিলাময়ী মূর্ত্তি তখন দেখিতে পাই নাই। পূজা করিয়া

পাণ্ডার বাটীতে

মার মন্দিরে

চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। এদিকে আবার ফণীবাবু বস্ত্রাদি ছাড়িয়া তারামাকে প্রণাম করিয়া ক্ষ্যাপার অন্বেষণে গিয়াছিলেন। মন্দির বাটীর সদর পৈঠা দিয়া পথে নামিলেন ও তথা হইতে শ্মশান ঘাটের পথে নামিয়া ঘাটে পৌছিলেন। দেখিলেন মহাশ্মশান এবং সেই শ্মশানে শ্মশানচারী বামলীলানুকারী বাম শবশিবা সন্নিকটে কালু প্রভৃতি সারমেয় সহচর পরিবৃতভাবে আসীন। যদিও আমার ন্যায় উদ্দাম কামনা না থাকায় আমার ন্যায় ফণিভূষণ আকৃষ্ট হন নাই—তথাপি তিনিও আকৃষ্ট; শ্রীবাম তাঁহারও মঙ্গলের জন্য তাঁহাকেও আকর্ষণ করিয়াছিলেন, নচেৎ তিনি অত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাইতেন না; তাঁহার হৃদয় আমা অপেক্ষা শুদ্ধ। তাহাতে সাংসারিক বাসনা বিশেষ ছিল না; কেবল মহাপুরুষ দর্শনে, মহাপীঠ গমনে তারামার পূজার পুণ্য বা আনন্দ তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই বিশুদ্ধ আনন্দের তরে তিনি নিজের ব্যয়ে চলিয়াছিলেন। এই সওদায় তাঁহারও বিশেষ লাভ হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বাবা হিন্দীতে বলিলেন,—"হুগলী কল্‌কাত্তাসে দো বাবু আয়া, কারণ ল্যায়া বাবা?" আমি কলিকাতা হইতে, ফণিবাবু হুগলী হইতে গিয়াছিলেন। আমি কলকাতায় থাকি হুগলীতে ওকালতি করি; আর ঐ যাত্রায় কলিকাতা হইতে হুগলী আদালত হইয়া তারাপীঠে আসিয়াছি, সর্ব্বজ্ঞ বাম তাহা জানিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় দিলেন। ফণিবাবু এই সম্বোধনে চমকিত। বামকে কে আমাদের পরিচয় দিল? ভাবিলেন—মহাপুরুষ অন্তর্যামী। ফণিবাবু উত্তর দিলেন, "হাঁ বাবা আপনার জন্য বিলাতি কারণ আনিয়াছি।" বাবা বলিলেন, "না বাবা, এখন আমাকে দেশী কারণ দাও।" বাবার নিকট আর দু'একজন কারণ প্রসাদ প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁহারা দেশী সরাপের দোকান কোথায় বলিয়া দিলেন। ফণিবাবু এক পাঁইট ধান্যেশ্বরী আনিয়া বাবাকে দিলেন। তিনি বলিলেন, "শুদ্ধি দিবি নি?" ফণিবাবু বুঝিতে পারেন নাই। শ্মশানচারী নররূপী হরের ভূতগণ শুদ্ধির অর্থ করিয়া দিলেন। ফণিবাবু মুড়ি আনিলেন। বাবা নরকপালে একটু কারণ "জয় তারা জয় তারা" মন্ত্রে শোধন করিয়া পান করিলেন। অনুচরেরাও প্রসাদ পাইলেন। কালু প্রভৃতি সারমেয়গণও মুড়ি প্রসাদের ভাগ লইলেন।

শ্মশানে বাম

প্রথম ইঙ্গিত

৬। ঘরে পরিচয়

শ্রীরামের অপার করুণা। তিনি এই অধমের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিবেন বলিয়া—এই মহাপাপীকে শ্রীচরণদানে উদ্ধার করিবেন বলিয়াই ডাকিয়াছেন। একা শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাই উদ্ধার করেন নাই। মহাপুরুষগণ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঐ লীলা করিয়া থাকেন। গৌরাঙ্গভক্তগণ তাই গাহিয়া থাকেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

আমার গৌররায় আমাকে জগাই মাধাই অপেক্ষা সহস্রগুণে পাতকী জানিয়াই, জগতে নূতন অধমতারণ লীলা দেখাইবেন বলিয়াই অদ্ভুতভাবে টানিয়া আনিয়াছেন। আমি না চাহিতেই আমার মানসপটে প্রশান্তমূর্ত্তিতে অযাচিতভাবে দেখা দিয়াছেন। আমি অবোধ বুঝিতে পারি নাই। কামকামী বলিয়াই কামনার ভিতর দিয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ পবিত্রক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তারামার মন্দিরে চণ্ডী পড়াইতে আরম্ভ করাইয়াছেন। তাই করুণাময় নিজেই এই নারকীকে স্বশরীরে সাধিয়া দেখা দিবার জন্য সেই মহাশ্মশান হইতে উঠিলেন। সহজেই তিনি পরশমণি; তাঁহার তারাময় প্রাণ, তারাময় মন, তারাময় শরীর। তথাপি যদি শরীরে অধ্যাস থাকে সেইজন্যই বোধ হয় তারামন্ত্রে কারণ করিয়া সম্পূর্ণ তারাময় হইয়া এই ঘোর অসুরকে উদ্ধার করিতে আসিলেন। এ অপূর্ব্ব অসুর। সুতরাং তাঁহার সংগ্রামবিধিও অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব অস্ত্র। শক্রাদিস্তবে দেবগণমুখে মহনীয় মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন—

যুগে যুগে উদ্ধার

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষপি তেঽতি সাধ্বী॥

অসুরনাশ

মা! দৃষ্টিমাত্রেই কি তুমি সকল অসুরকে ভস্মীভূত করিতে অক্ষম যে

তোমাকে শস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হয়। না না! তোমার শস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া শত্রুগণও দিব্যলোক প্রাপ্ত হউক—এই মতি তোমার হৃদয়ে উঠে বলিয়া অসুরগণের উপর শস্ত্রবর্ষণ কর। সে সব অসুর-সমরে মাকে অস্ত্রবর্ষণ করিতে হইয়াছিল; শোণিতসাগরে নাচিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ অসুর সংগ্রামে রাম কৃপাদৃষ্টিতে অসুরনাশ করিলেন। অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এ প্রেমের সমর। প্রেমময় পিতা কুপুত্রকে প্রেমদৃষ্টিতে ফিরাইলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না! কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। শ্মশান হইতে ধীর পদে "জয় তারা জয় তারা" রবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তারাপ্রেমে মাতোয়ারা রাম তারামার মন্দির প্রাঙ্গণে উঠিলেন।

শ্রীমন্দিরে

শ্রীকণ্ঠের স্বর পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তথাপি প্রাণ বলিল যে ঐ প্রেমমাখা অদ্ভুত জলদগম্ভীর মধুর তারানাদ সেই তারাপ্রাণ নাদসিদ্ধ মহাপুরুষ ভিন্ন আর কাহারও নহে। ক্রমে ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বোধ হইল বাবা মন্দিরে উঠিলেন। তখন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কবচ পড়িতেছি। তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। স্বরে প্রথম পরিচয় হইল। ভবভূতির সীতা নেপথ্যে প্রাণনাথের জলভূত মেঘগর্জ্জনের গুরুগম্ভীর ভারতী নির্ঘোষে সমুচ্ছ্বসিতা হইলে তমসা রামাগমবৃত্তান্ত গোপন করিবার জন্য সীতাকে বলেন—"অয়ি বৎসে! কিমবক্তেঽপি নিনাদ কৃতস্তেঽপি স্বমীদৃশী। স্তনয়িত্নো ময়ূরীর চকিতোৎকণ্ঠিতা স্থিতা। বাছা সীতা! কোথা হইতে কি একটা অস্ফুট স্বর উঠিল আর তুই মেঘগর্জ্জনে ময়ূরীর ন্যায় চমকিত হইলি?

পরিচয় বৈচিত্র

সীতা তাহাতে উত্তর করিলেন—"ভগবতি কি বলিতেছ, অপরিস্ফুট স্বর? আমি যে স্বর সংযোগে বুঝিয়াছি এ সেই আমার আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" রামের স্বর সীতার সুপরিচিত ছিল, সুতরাং সেই স্বরের প্রত্যভিজ্ঞানে বৈচিত্র্য কিন্তু আমার অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীরামের স্বর পরিচয় শ্রীরামলীলার বৈচিত্র্য।

অর্গলাবধি পড়িতে পড়িতে
'জয়তারা' ধ্বনি শুনি আচম্বিতে।
শুনেনি সে স্বর কখনও শ্রবণ
হৃদয় বলিল এই সে হৃদয়ধন।

৭। প্রথম মিলন

শ্রীরামকে দেখিবার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইল। কিন্তু চণ্ডী পড়িতেছি। কিরূপে উঠি কিরূপেই বা থাকি? 'ন যযৌ ন তস্থৌ' দশা ঘটিল।

মার অনুমতি

শ্রীরামের কি লীলা! তিনিও মন্দিরের রোয়াকে উঠিয়া বসিয়াছেন। আমারও চণ্ডীর উপক্রমণিকা পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডী পাঠে বিশ্রামের স্থল আসিয়াছে, তারামার ভোগও মন্দিরে আনা হইল। পুরোহিত মহাশয় আমাকে বলিলেন—"আপনি যদি একবার যান, আমরা দরজায় খিল দিয়া ভোগ দিয়া থাকি।" আমি বুঝিলাম, আসন হইতে উঠিবার অনুমতি তারামাই দিলেন; শাপে বর হইল; অসঙ্কোচিত চিত্তে নিজ ইষ্ট দর্শনে উঠিলাম। মন্দিরের বারান্দা দিয়া রোয়াকে আসিলাম। দেখি পূর্ব্বাস্য হইয়া রাম বসিয়া আছেন। কি

শ্রীমূর্ত্তি

সৌম্য প্রেমময় মূর্ত্তি! তারা প্রেমে টলমল, যেন সাক্ষাৎ শ্যামল শঙ্কর। দীর্ঘাকার লম্বোদর পীনবক্ষ আজানুলম্বিত বাহু। কিবা চরণযুগল! কি ঢলঢল শ্রীমুখ শোভা, কি নয়নের মধুরিমা! একে আঁখিযুগল তারানুরাগে আপনা আপনি রঞ্জিত, তাহার উপর কারণ পানে আরও কোকনদচ্ছবি। নয়নে যেন প্রেম শতধারে উচ্ছলিত। কি সকরুণ দৃষ্টি। হৃদয়ের করুণাসাগর হইতে যেন এই মহাপাপীর পাপময় হৃদয়কে প্লাবিত করিবার জন্ম সপ্রেম করুণ দৃষ্টিধারা ঝরণার মতন ঝরিতেছে। কি অপরূপ ভাতি! সে ভাব এ ক্ষুদ্র হৃদয় কিরূপে ধরিবে, এ ক্ষুদ্র লেখনী কিরূপে প্রকাশ করিবে? এ প্রাণ পাষাণময়। পাষাণ গলাইবার জন্যই আমার রাম তারানামামৃতকারণ পানে মাতিয়া আসিয়াছেন। সে ভাবে এ পাষাণও গলিল। আপনা আপনি প্রহ্ব হইলাম। শ্রীরামরূপ প্রথম দর্শনে লবের অবস্থা কবি এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাপুরুষের প্রভাব

আশ্চর্য্যম্!
বিরোধো বিশ্রান্তঃ প্রসরতি রসো নিবৃতিঘন
স্তদৌদ্ধত্যং কাপি ব্রজতি বিনয়ঃ প্রহ্বয়তি মাম্।
ঝটিত্যস্মিন্ দৃষ্টে কিমিব পরবানস্মি যদিবা
মহোর্ঘস্তীর্থানামিব মহতাং কোঽপ্যতিশয়ঃ॥

কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ ইহাকে দেখিবামাত্র বিদ্বেষভাব হৃদয় হইতে অপসৃত, তৎপরিবর্ত্তে আনন্দময় প্রেমরস প্রবাহিত হইতেছে। সে ঔদ্ধত্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বিনয় আমাকে নমিত করিতেছে। একি হঠাৎ ইহার দর্শনে ইহার অধীন হইয়া পড়িতেছি। অথবা ইহাতে বৈচিত্র নাই। তীর্থের ন্যায় মহাপুরুষদের কি এক বিচিত্র মহিমা। পঠদ্দশায় বহুবার এ শ্লোক পড়িয়াছিলাম; প্রাণেও ইহা আঘাত করিয়াছিল! কিন্তু ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। রামের প্রথম দর্শনে মহাপুরুষদের কি মহিমা কতক বুঝিতে পারিলাম। তিনি নাম শ্রবণে অনুরাগ জানাইয়াছিলেন। আকর্ষণেই জ্ঞানের গৌরব ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, দর্শনে তাঁহার পরাধীন হইলাম। তখন একরূপ আত্মহারা। তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে গেলে তিনি যে মারিতে আসেন প্রভৃতি কিংবদন্তী ভুলিয়া গেলাম। প্রাণে ভীতির সঞ্চার নাই, কোন সংকোচ নাই, হৃদয় বিগলিত, আঁখি ছল ছল। কি আনন্দভাব।

এই ভাবের প্রতিধ্বনি শ্রীরাম পরে এই যন্ত্রে এইরূপ তুলিয়াছেন।

কি হেরিলাম নয়নে
প্রেমে টলমল কিরূপ শ্যামল
উজ্জ্বল অমিয় কিরণে।
হৃদয়ে প্রেমের পাথার অপার
নয়নে উছলে প্রেম শতধার
গলাতে' পাষাণ পরাণ আমার
এসেছেন মাতি অপরূপ ভাতি
তারা নামামৃত কারণ পানে।
পাষাণ গলান করুণা মাখান
হেরিয়ে মূরতি গলিল পরাণ
পড়িনু তখনি আপনা আপনি
ছলছল আঁখি তাঁহারি চরণে॥

প্রণামের সময় দক্ষিণকরাঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবামাত্রই বোধ হইল যেন বিরুদ্ধ তড়িতবাহী দুইটা তার ছুঁইলাম। সর্ব্বাঙ্গ ঝি ঝি করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তড়িতের উগ্রতা নাই। কি এক ভক্তিভাব জাগিল। দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে।

চরণস্পর্শে

মুখে বাক্য নাই। প্রাণ কামনাশূন্য। প্রেমতটিনী অন্তরের কূলকূল বহিতেছে। মন অহংবুদ্ধি সমস্তই সে প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। জীবনে কখনও এমন অনুভব হয় নাই। পঠদ্দশায় 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর' বলিয়া ভগবানের নিকট প্রতিরাত্রে শয্যায় কাঁদিয়াছি, 'শরীরের পীড়া ভাল কর' বলিয়াও কত অশ্রুপাত করিয়াছি, পুত্রাদির কল্যাণেও চণ্ডী পড়িতে বহুবার নয়নবারি ঝরিয়াছে, মাতৃশোকে বিধুর হইয়াও রোদনের বর্ষা বহিয়াছে। কিন্তু এরূপ রোদন অদৃষ্টে ঘটে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রোদনে ভগবন্মহিমায় কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীরাম চরণস্পর্শে অহেতুক

প্রেমানন্দ

প্রেমের নীরব রোদনে যে আনন্দ পাইলাম তাহা অবাঙ্মানস গোচর। কামী স্বর্গানন্দভোগী দেবগণও ঐ নিষ্কাম প্রেমাশ্রুর আনন্দ পাইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গাদি প্রেমিকগণই তাহা অনুভব করিয়াছেন। পার্থক্য এই শ্রীরামের কৃপায় আমি উহার কণিকার ক্ষণিক আস্বাদ পাইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গাদি ঐ আনন্দেই বিভোর। শ্রীরাম ঐ আনন্দের সুপূর্ণ সিন্ধু। ঐ আনন্দের অনুভবেই তিনি আনন্দময়। ঐ আনন্দের প্রভাবেই সকলের ত্যাজ্য শবশিবা শ্মশানাদি তাঁহার গ্রাহ্য। ঐ আনন্দের কারণে সকলের অমঙ্গল্য তাঁহার মঙ্গল্য। নিজ বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ আনন্দামৃতসিন্ধুর কণা এই তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্যই পদস্পর্শে আমাতে সংক্রামিত করিলেন। দারুময় জগন্নাথের আবির্ভাবে পরমভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন হৃদয়াধিশ্বর দেবদেবের স্তব করিতেছেন।

ত্বাং সচ্চিদানন্দসুপূর্ণসিন্ধুম্
প্রাপ্নোস্তু যে জন্মসহস্রভাগ্যৈঃ।
কিংতে হি পশ্যন্তি অনৈকসৌখ্য
মনেক দুঃখং বিষয়েন্দ্রজালম্॥

হে দয়াময়! বেদে তোমায় সচ্চিদানন্দ বলিয়া থাকে। কিন্তু তোমার কৃপায় আমার বোধ হইতেছে তুমি সচ্চিদানন্দ নহ, সচ্চিদানন্দের সিন্ধু—

আনন্দসিন্ধু

কেবল সিন্ধু নহ পূর্ণ সিন্ধু, না না—পূর্ণ সিন্ধু কেন সুপূর্ণ সিন্ধু। আমার ভাষায় যে আর কুলায় না নাথ! তোমাতে পূর্ণানন্দলহরী উঠিতেছে পড়িতেছে। সেই লীলার একাংশ এই ব্রহ্মাণ্ড। সহস্র সহস্র জন্মের সৌভাগ্যবলে যে জন এইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দসিন্ধু

পাইয়াছে নাথ, সে কি আর বিষয়ে মজে! বিষয় যে ইন্দ্রজাল স্বরূপ, এই আছে এই নাই। মায়াবীর মায়াজাল। সে বিষয়ে যে দুঃখবাহুল্য সুখের কণামাত্র। সে কণাও যে তোমার আনন্দের ধার করা কণা। অতএব সে বিষয়ে কেন সে মজিবে।

শ্রীরাম! যে আনন্দকণিকা প্রথমমিলনে শ্রীচরণস্পর্শে দিয়াছ তাহা কেন কাড়িয়া লইলে নাথ! আমাকে ঐ আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া রাখ। কেন অনেক দুঃখপূর্ণ অনৈকসৌখ্য বিষয়েন্দ্রজালে আবার জড়িত করিলে? ভাই! ঐ আনন্দের ভাষাচিত্র রাম পরে এই ক্ষীণ তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন।

না জানি কি গুণ আছে ও চরণে
তোমার চরণ পাতকীতারণ বুঝিল পাতকী নব পরশনে।
ছুঁইতে চরণ সর্ব্বাঙ্গ আমারি
(যেন) তড়িত পরশে উঠিল শিহরি
দরদর ধারা ঝরে দুনয়নে।
সরে না যে বাণী, কি প্রেম তটিনী
বহে কুলু কুলু এ মরু জীবনে॥

৮। আশীর্ব্বাদ

মাতৃশোকরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপিত এ মরুময় প্রাণ প্রেমতটিনীর আনন্দ-হিল্লোলে প্লাবিত করিয়া এই স্থূলবুদ্ধির বোধগম্য মৌখিক আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।" আমি তখন আত্মহারা হইয়া ফেল্ ফেল্ নয়নে তাঁহার শ্রীরূপ দেখিতেছিলাম। কোন কামনা হৃদয়ে ছিল না। কেবল অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরী ছুটিতেছিল। তাঁহার আশীর্ব্বাদের ধ্বনিতে সে ভাব ভাঙ্গিল। অমনি মানসক্ষেত্রে অনাদি

আশীর্ব্বাদ

বাসনা বীজের কামরূপ মাকাল ফল ফলিল। তখন মনে হইল কিজন্য মহাপুরুষের নিকট আসিয়াছি। গর্ভধারিণীকে তাঁহার কৃপায় উজ্জীবিত পাইব এই দুরাশা মনকে নাচাইতেছিল। সুতরাং তাঁহার আশীর্ব্বাদ শুনিয়া সকাম হৃদয় কামচরিতার্থতা হইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইল। কিন্তু তাঁহার প্রভাবে ভক্তিভাব এতই প্রবল যে কামদর্প একবার ফোঁস্ করিয়াই আবার ভক্তি-স্রোতের অতল জলে ডুবিয়া গেল। আবার হাঁ করিয়া শ্রীরূপের শ্রীমাধুরী পান করিতে লাগিলাম। কিছুই বলিতে পারিলাম না। বাবাই বক্তা হইলেন। যাও বাবা! মাকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী শোনাও। মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ, তিনরূপ শুনাইবে—আজ কাল পরশু। তিনরূপ না শুনাইয়া যেতে নাই।" তাঁহার মুখ দিয়া এই বাণী নিঃসৃত হইল। আর মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ভোগ দেওয়া হইয়াছে। পূজারি ঠাকুর ডাকিলেন, 'বাবু, আসুন'।

আদেশ

করুণা নিধান

কে আছে শ্রীরাম তোমারি সমান।
পাপী তাপী বলে আপনি ডাকিলে
দেবতা দুর্লভ শ্রীচরণ দিলে
পুণ্যপ্রেমস্রোতে পাপীরে ভাষায়ে
চিনিতে নারিল 'চরণ' অজ্ঞান।
কামেরি কিঙ্কর এ পামর বলে'
প্রকাশ্য বচনে তাই আশিসিলে
পূর্ণ হউক কাম, কর চণ্ডীগান।
কি বিস্ময় কথা ও শ্রীমুখবাণী
বাহিরিল যবে পূজক অমনি
শ্রীমন্দিরদ্বার খুলিয়ে তখনি
প্রবেশিতে করে দাসেরে আহ্বান।

আমি মন্দির মধ্যে চণ্ডী পড়িতে গেলাম। তখন প্রেমে টলমল অবস্থা। "মার্কণ্ডেয় উবাচ" পড়িতে পড়িতেই "অন্তর্বাষ্পভারাপরাধসদিতং"। জীবনে চণ্ডী বহুবার পড়িয়াছি। চণ্ডী এত অভ্যস্ত যে স্তবাদি কণ্ঠস্থ ছিল।

চণ্ডীপাঠ

ভাষার্থও আয়ত্ত। কিন্তু সেই চণ্ডী এক্ষণে পড়িতে পড়িতে নূতন নূতন গূঢ়ার্থ প্রতিভাত হইতে লাগিল। মধু ও কৈটভ কাহারা? কেন তাহাদের উৎপত্তি? কমলযোনি কে? একার্ণবাকৃতি জগতে ভাসমান বিষ্ণুই বা কি? তামসীই বা কি? মধুকৈটভ যুদ্ধের মর্ম্ম কি ইত্যাদি শ্রীরামের কৃপায় সপ্তশতীর সেই সেই স্থল পড়িতে পড়িতেই বোধ হইতে লাগিল। হৃদয় প্রেমে আকুল। চক্ষে দর দর ধারা, স্বর বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আর যেন পড়িতে পারি না। বাবা মন্দিরের বাহির হইতে উৎসাহিত করিতেছেন, 'বেশ চণ্ডী পড়িতেছ বাবা'। আমার প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইতেছে। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ আবার অনাবৃত। বাবার তারাগ্রামের তারা নাদে তারার মন্দির গম্ গম্ করিতেছে। "তারামাকে চণ্ডী শুনাও বাবা—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ।" এই বলিয়া শ্রীরাম উঠিলেন। 'জয় তারা, জয় তারা' নিনাদে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ কাঁপাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার সেই মধুমাখা স্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অনন্ত আকাশে মিশাইয়া গেল! এখন বেলা ২॥ টা। ভোগ সরিয়াছে। যাত্রীর সমাগম নাই। যাঁহারা প্রসাদ পাইবার তাঁহারও প্রসাদ পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। আমি একা মন্দিরে শ্রীরামের কৃপায় তন্ময় হইয়া চণ্ডী পড়িতেছি।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বম্
ত্বমীশ্বরি! দেবি! চরাচরস্য॥

দেবদেব ঘরণি! আর্ত্তের আর্ত্তিনিবারণি! প্রসন্ন হও। তুমি নিখিল বিশ্বের জননী। তাই বলি মা তুমি সমস্ত বিশ্বের প্রতি প্রসন্না হও। তুমিই

বিশ্বের ঈশ্বরী। বিশ্বের সৃজন, পালন, নাশ সমস্তই তোমাদের ইচ্ছাধীন। তাই বলি মা প্রসন্না হও। বিশ্ব রক্ষা কর। তুমিই মা স্থাবর জঙ্গমের হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী ; তুমিই দেবী—দিব্যালোকময়ী—

জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতম্

জগতে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি যে তেজোময় পদার্থ আছে তাহাদের জ্যোতিঃ তোমাদের জ্যোতির কণিকামাত্র। তুমি অনন্ত জ্যোতির আধার। তমঃ তোমাতে নাই।

বিচিত্রদশা

প্রাণে কি যে ভাব খেলিতেছে তাহা প্রাণও জানে না। জানেন সেই রাম—যিনি এই খেলা খেলাইতেছেন। কখনও স্বর বন্ধ করিতেছেন, কখনও সর্ব্বপ্রাণব্যাপে স্বরলহরী তারাগ্রামের 'মা' পর্দ্দায় তুলিতেছেন। চণ্ডী সমাপ্ত হইতে প্রায় ৩টা বাজিল।

চরণ পরশে এ কি ঘটিল।
এ মরু হৃদয়ে কি ভাব প্রবাহ ছুটিল।
অবিরল ঝরে দুনয়নে বারি
অন্তর্বাষ্পভারে কণ্ঠ যায় ভরি
শ্রীচণ্ডী মহিমা পড়িতে না পারি
মন্দির প্রবেশ বৃথা কি হইল?
সম্বরিয়ে ভাব পড়ি প্রাণপণে
গদ্‌গদ্ স্বরে চণ্ডী বহুক্ষণে
নব নব অর্থ জাগিতেছে মনে
কি অদ্ভুত খেলা শ্রীরাম খেলিল।
'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মায়ে তিন দিনে
তিনরূপ বাবা শুনাবে যতনে'
এই উৎসাহচ্ছলে শক্তি দিয়ে দীনে
দয়াল ঠাকুর চলিয়ে গেল।

৯। কুলভঙ্গ

বাবা আমাকে চণ্ডী পড়িবার শক্তিসঞ্চার করিয়া উৎসাহবাণীতে তাহা কতক প্রকাশ করতঃ স্বীয় আশ্রমে ফিরিলেন। আশ্রমটী আনুমানিক সন ১৩০০ সালে প্রস্তুত। ইহা একখানি মেটে খড়ুয়া ঘর।* একটীমাত্র পূর্ব্বমুখ দ্বার। তিনধারে চালে ঢাকা দাওয়া। উত্তর ও দক্ষিণদিকের দাওয়া ইটের প্রাচীরে ঘেরা। পূর্ব্বদিকের দাওয়ার মধ্যস্থান প্রবেশ জন্য ফাঁকা, বাকী ইটের প্রাচীরে ঘেরা। দক্ষিণের দাওয়াটীর মেজে মেটে; বাকী দুটী দাওয়ার মেজে সান বাঁধান। দক্ষিণ দাওয়ার ভক্তগণ বাবাকে খাওয়াইতে চাহিলে পাক করিতে পারেন, চুল্লী আছে। বাবা পূর্ব্বদিকের দাওয়ার শেষ দশায় শয়ন করিতেন। শীতকালে উহার ফাঁকা প্রবেশপথে ভক্তরা কখনও পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিতেন। বাবার তাহাতে ইষ্টাপত্তি ছিল না। মন্দিরে আমি চণ্ডী পড়িতেছি, এদিকে ফণিবাবু বাবার আশ্রমে আসিলেন। আরও দুএকজন জুটিল ছোটবড় তামাক চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে শ্রীমুখ হইতে অর্দ্ধস্ফুট সরল বাণী বাহির হইতেছে। ফণিবাবু অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। কথাগুলি বাহ্যতঃ সাধারণ কিন্তু ভাবে পরিপূর্ণ। মহাপুরুষের অনুভাব বশতঃ প্রায়ই ভক্তগণ তাঁহার নিকট কথা কহিতে পারিতেন না। মনে মনে নানা ভক্ত নানা বিষয় জানাইতেন। বাবার শিক্ষা মানসিকী। মনে মনে তাঁহাদের তিনি উত্তর দিতেন।

কথারভঙ্গী

যাঁহারা মানসিক উত্তর ধরিতে পারিতেন না, তাঁহাদের জন্য কচিত দু'একটি কথা বলিতেন। তাহাও এমন যে সকল ভক্তেরই উত্তর হইত। মধ্যে মধ্যে বাবার তারা তারা ধ্বনিতে শ্মশান ঝঙ্কৃত হইতেছে। হঠাৎ আশ্রমের চালা হইতে একটি টিকটিকি ডাকিল। ফণিবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বাবা অমনি বলিলেন, "বাবা! ওর বিয়া হবে।" সকলে বিস্মিত, মনে করিল

---

* ১৩৬৭-৬৮ সালে বামা মিশন ইহা পাকা মন্দির ও নাটমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন (কার্য্যবিবরণী দেখুন)।

ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপামি করিতেছে। ফণিবাবুর কৌতূহল হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা টিকৃটিকির বিয়ে হবে কি ?" বাবা উত্তর দিলেন, "হ্যাগো বৰ্দ্ধমানে।" হেঁয়ালি আরো বাড়িল। ছড়ায় বলে—"ফড়িঙ্ বাবুর বিয়ে টিকৃটিকিতে ঢোলক বাজায় ধুচ্‌নি মাথায় দিয়ে।"

টিকৃটিকির বিবাহ। তাহার উপর টিকৃটিকি তারাপীঠে, বিবাহ বৰ্দ্ধমানে। সকলেই ভাবিল এ পাগলের পাগলামি ভিন্ন আর কিছু নহে। কিছুক্ষণ পরেই একজন বাইতি মাথায় মাদুর লইয়া আশ্রমের সম্মুখে আসিল। মাদুরের বোঝা ফেলিয়া বাবাকে প্রণাম করিল ও প্রসাদ পাইবার জন্য বসিল। বোঝার ভিতর হইতে একটা টিকৃটিকি বাহির হইয়া খর খর করিয়া আশ্রমের ভিতর ঢুকিল ও চালে উঠিল। চালের টিকৃটিকিও তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া দাম্পত্যসুখে রত হইল। ফণিবাবু অবাক্‌নেত্রে এই ব্যাপার দেখিলেন। সত্যই তো টিকৃটিকির বিয়ে ঘটিল। তিনি বাইতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা হইতে আসিতেছ ?" বাইতি বলিল—বৰ্দ্ধমান হইতে।" 'মাদুরের বোঝা কোথা বাঁধিয়াছ' প্রশ্নের উত্তর দিল—'বৰ্দ্ধমানে।' ফণিবাবু তখন ভাবিলেন বাম পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের ভাষাও বুঝেন। পাঠক মনে করিতে পারেন এটা কাকতালীয়ন্যায়ে মিলিয়া গিয়াছে। বাম সেরূপ শিক্ষক নহেন। সৰ্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা। তাই সেদিন মজলিস ভাঙ্গিবার পর বামের সঙ্গে ফণিবাবু শিমূলতলায় গেলেন এবং মনে মনে বাবাকে পারমার্থিক ইষ্টের কথা জানাইলে বাম তাঁহার গুরুকরণ কোথায় ও ইষ্ট প্রভৃতির পরিচয় দিলেন। ফণিবাবু আর বিস্মিত নহেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে বাম সৰ্ব্বজীবের অন্তর ও ভূতভবিষ্যৎ জানিতে পারেন। বাম বলিলেন—"বাবা তুমি তো সিদ্ধঘরের ছেলে" ইত্যাদি। যথার্থই ফণিবাবু বৰ্দ্ধমান জেলার ডাইনহাটের নিকটবর্ত্তী আতাইহাটের জগদ্‌গুরু ভট্টাচার্য্যদের শিষ্য। তাঁহারা সিদ্ধ রামানন্দের বংশধর। রামানন্দই জগদ্‌গুরু আখ্যা পান। 'কিরূপে জপ করিতে হয় ?' ফণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিলেন—'প্রতি নিশ্বাসে।' ফণিভূষণ সংশয়ী। তিনি বাবার নিকট জানাইলেন—"বাবা, আমার কিরূপে চলিবে ?" বাবা উত্তর দিলেন,

টিকৃটিকির বিয়ে

সৰ্ব্বজ্ঞ

জপ শিক্ষা

আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমার মাপা ও জপা।" বাবার কৃপায় ফণিবাবুর 'মাপা ও জপা' ঘটিয়াছে। লেখাপড়া তাদৃশ না জানিলেও উপার্জ্জন আছে। অভাব আসে কিন্তু শীঘ্রই পূরণ হইয়া যায়। তবে ভাঁড়ে তেল থাকিতে গুরু তেল দেন না। ফণিবাবুর হৃদয়ে দয়া আছে, দীনদুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হন। তিনি একজন বাবার পরম ভক্ত।

১০। জলকেলি

অধম পূজাশেষে পাণ্ডার বাটীতে আসিল। সঙ্গে সুরসাল রসাল লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা ও স্থানীয় গুড়পাটালি খাইলাম। বাবাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। তাঁহার অন্বেষণে ছুটিলাম। মন্দিরবাটী পার হইয়া পথে পড়িলাম। উত্তরমুখে আপনাআপনিই কে টানিয়া লইয়া গেল। কয়েক পা আসিতেই জীবৎকুণ্ডুর সেই রাস্তার ধারে ছোট বাঁধান ঘাট ও কদ্বেগাছতলা পাইলাম। দেখি সেই ঘাটে আমার মনোচোরা স্নান করিতেছেন। কি মধুর মূরতি? তখনও যেন প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে। ডুব গালিতেছেন।

মনোচোরা

বিভোর হইয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া বাবার জলকেলি দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিয়া গিয়াছিলাম যে আড়ালে পাইলে আমার মাকে জীয়াইবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিব। তাহাতে যদি না হয় ত চরণে ধরিয়া কাঁদিব। কিন্তু সেই রূপ দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলাম। কিশোরী আচ্ছা সাধিকা। ভক্তচূড়ামণি বৈষ্ণব মহাজন তাঁহার কৃষ্ণ দর্শন নানারূপে নানাভাবে দিব্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

জলকেলি দর্শন

জলকেলি করিতে করিতে বাবা কি বলিতেছেন প্রথমে ধরিতে পারি নাই। পরে যতদূর ধরিলাম তাহাতে বুঝিলাম তারামার সহিত কথাবার্ত্তা

হইতেছে। আদুরে ছেলে যেমন মার সঙ্গে আবদার করে তেমনই ভাব। বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন,—"তা বেটী খেতে না দিস্ তোর জোৎকুণ্ডের জল খাব। আর কিই বা খেতে দিস্। নিজেই বা কি খাস্ ডাঁটার ঝাল, খেসারির ডাল, গোটা চালের ভোগ। বৈকালে শক্ত দুই চারখানা লুচি যা কুকুরেও খায় না।"

মার সহিত কথা

সত্য সত্যই উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের দৃষ্টির অভাবে তারাপীঠে তারামার ঐরূপ দীনদুঃখীর ন্যায় সেবা হয়। রাজা রামকৃষ্ণ সেবার জন্য সম্পত্তি দিয়াছেন। শুনি তাহার উপরান্তও নাটোর রাজ্যের ব্যয় হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধান ও যত্নের অভাবে মার নিত্য সেবা মোটা।০ সের আতপ ও খেঁড়োর ডাঁটার ঝাল এবং কোনদিন খেসারির ডাল বা খোষাশুদ্ধ কলায়ের ডাল এবং চুণো মাছের অম্বল। মার তালুকে বড় বড় পুষ্করিণী আছে; কিন্তু মার অদৃষ্টে চুণো মাছ! অবশ্য সদর কর্ম্মচারী যাইলে বড় বড় মৎস্য ধরান হয় ও রাজভোগের ব্যবস্থা হয়। আমরা তারাপীঠে বিলাসিতার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু অল্লায়াসে রামপুরহাট হইতে মুগের ও অড়হর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ডাল ও সরু চাল আনান যাইতে পারে। তারাপীঠে মৎস্য মাংস ও কারণ ব্যতীত ভোগ হয় না। কিন্তু মৎস্যের উক্তরূপ ব্যবস্থা। মাংস অষ্টমীতে ও বিশেষ পাল পর্ব্বে ঘটে। কারণ ⁄।০ পোয়া হিসাবে আছে। তার ছিটা ভোগে পড়ে সে কথা ভাল। যে বোতল লয় লউক যাত্রিগণের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন আত্মবৎ সেবা শাস্ত্রে ব্যবস্থা ও যখন মার বাহ্য সেবার ভার রাজার স্কন্ধে তখন তাঁহার আসনাধিকারীর এ বিষয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মার সেবা

বাবার জন্য মধ্যাহ্নে ঐরূপ এক থালা প্রসাদ রাণীকে স্বপ্ন হওয়া অবধি নিত্য যাইত। সন্ধ্যার আরতির পর আটার মোটা ৪ খানি লুচি ও একটু দুধ আসিত। বাবা একটু মুখে দিতেন, বাকী কুকুরগণই তাঁহার সহিত ভোজন করিত। কোন বিকার ছিল না। কুকুরেই তাঁহার মুখ চাটিয়া আঁচাইয়া দিত। বাবার খাবারের অভাব ছিল না। যাত্রিগণ নিত্য কত ভাল ভাল দ্রব্য আনিতেন। তিনি গ্রহণ করিলে তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। কিন্তু বাবা সে সমস্ত ভোজ্যও ব্যবহারে

বামের আহার

কুণ্ঠিত হইতেন। শ্মশানচারী সর্ব্বত্যাগীর আবার ভোগে কি লালসা থাকিতে পারে? কামকামীর দ্রব্যাদি বদ্ তারা বলিয়া ছুঁইতেন না।

আমি বাবার কথার তখন 'ভাসা' অর্থই বুঝিলাম যে তারামার ভোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় তাঁহার ছেলের প্রাণে লাগিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কৃপায় উহার গভীর অর্থ ক্রমে বুঝিতেছি। উহা নাটোরের সেবার নিন্দা নহে। তাদৃশ মহাপুরুষ পরনিন্দা করিতে পারেন না. বিশেষতঃ তিনি কৌমার হইতে নাটোরে সেবান্ন গ্রহণ করিতেছিলেন। নাটোরের নিন্দা কেন করিবেন?

রাজা রামকৃষ্ণ, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সুখ্যাতি তিনি শতমুখে করিতেন। আমাকেও বলিয়াছেন, "মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ, বাবা, তারামার কি দিব্য সেবাই করিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ যোগীন্দ্র পুরুষ, বাবা, সেবা বেশ করিতেছেন।" বীরেন্দ্রনাথকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেন, বীরেন্দ্র অলৌকিকভাবে তাহার দ্বারা আকৃষ্ট। তবে কি বাবা সেবার সংস্কারের জন্য আমাকে ঐ কথা জানাইয়াছেন? তাঁহার ন্যায় আত্মারামের বাহ্যসেবায় কি আসে যায়, আর আমার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা সে সংস্কারই বা কিরূপে সম্ভবে? তিনি বুঝাইলেন প্রথমতঃ, তারাপীঠে বাহ্য প্রসাদের প্রলোভন নাই। সে লোভে এখানে কেউ বসিলে হতাশ হইবে। এ উগ্র তারার ক্ষেত্র সাধনা। এখানে বহু কঠোরতা স্বীকার না করিলে থাকা যায় না। যদি সাধকের এরূপ পণ হয় যে জোৎকুণ্ডুর জলেই ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিব তবে সে যেন এখানে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। "যদি খেতে না দিস্ জোৎকুণ্ডুর জলই খাব।" এই এই বচনে আরও জানাইলেন যে মার নিকট তিনি বাহ্য আহারের পারিপাট্য চান না। তাঁহার কুকুরগণও তাহা চায় না। তিনি জীবৎকুণ্ডুর জলেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত। তবে যে প্রসাদ গ্রহণ সে লোকাচার। তিনি এও ইঙ্গিত করিলেন যে সংসারের ভোগ তাঁহার কুকুরগণেরও নিকট হেয়। যতক্ষণ না সে ভোগে লাথি মারিতে পারি, ততক্ষণ তাঁহার কুকুর পদবাচ্যও হইতে পারিব না। তিনি স্বয়ং ব্যাসাবতার, কুমার সন্ন্যাসী, ঘোর শ্মশানবাসী, শবচীরধারী। সাক্ষাৎ হর। হরলীলা যে সত্য তাহা দেখাইতে

কথার মর্ম্ম

সাধনা কঠিন

তাঁহার অবতার। সেই হরের শ্রীচরণে যদি স্থান চাই, সংসারের ভোগকে ডাঁটার ঝাল বলিয়া ভাবিতে হইবে। তাহাতে আদৌ দৃষ্টি থাকিবে না। সে কুক্কুরেরও অধম। জীবৎকুণ্ডের জলেই অর্থাৎ আত্মানন্দ সরোবরের জলেই যথার্থ তৃপ্তি। আত্মারাম দ্বন্দ্বাতীত রাম সে জল সর্ব্বদাই পান করিতেছেন। তাহাতে তিনি বিভোর ছিলেন। তাহা প্রাপ্তির উপায় দ্বিবিধ। ভক্তিবাদিমতে ভগবানের কৃপা; জ্ঞানবাদিমতে আত্মজ্ঞান। পরমভক্ত শ্রীরাম বলিলেন, "মার কৃপাই প্রধান অবলম্বন। গৌণ অবলম্বন আত্মনিদিধ্যাসন। কিন্তু সে নিদিধ্যাসনেও জীবের কৃতিত্ব নাই। তাহাও মার।" তাই বলিলেন—"তোর জীবৎকুণ্ডুর জল খাব।" জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের কি সুন্দর সমন্বয় জ্ঞান ভক্তির অবতার রাম সহজ কথায় করিলেন। উপনিষদেরও এই সমন্বয়। কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীকে আত্মস্বরূপ, আত্মজ্ঞানের ফল ইত্যাদি বলিয়া গুরু যমরাজ শিষ্য নচিকেতাকে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন—

আত্মানন্দেই তৃপ্তি

ভক্তি জ্ঞান সমন্বয়

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ বেদাদি পাঠফল কিম্বা মেধাবলে, বা বহুশ্রুত অর্থাৎ বহুশাস্ত্রালোচনায় পাওয়া যায় না। জীব যে আত্মাকে জানিবার জন্য সর্ব্বপ্রাণে অনুসন্ধান করে সেই আত্মদ্বারা আত্মলাভ হয়। সেই আত্মাই সেই আত্মজিজ্ঞাসুর নিকট স্বীয়তনু প্রকাশ করেন।

আত্মকৃপা

আত্মকৃপাই আত্মলাভের দ্বার। ভক্তসন্তান তাহাকে 'তারামার কৃপা' বলিয়া এই অধমকে নিগূঢ় তত্ত্ব ইঙ্গিত করিলেন।

তারামা পরমাত্মা। কখনও জীবকে তিনি আপনাআপনি কৃপা করিয়া আত্মতত্ত্ব দেন; কখনও জীব বহু আয়াসে তাঁহারই কৃপায় আত্মতত্ত্ব পায়।

কোন সাধক বিড়াল শাবকের ন্যায় সর্ব্বদাই মিউ মিউ করিতেছে, কখন মা আসিয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া যায়। আর কোন সাধক বানর শাবকের ন্যায় মাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। উভয়কে কিন্তু মাই লইয়া যান। তিনি না লইলে উপায় নাই।

রাম! তুমি একাধারে বাবা ও মা। আমরা অধম সন্তান নিজবলে যাইতে পারিব না। তুমি দয়াময় অধমকে কোলে করিয়া লইয়া যাইও।

১১। শিমূলতলায়

বাবা আমার দিকে জোৎকুণ্ড হইতে করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। নয়নে কি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। যেন সর্ব্বাঙ্গ কৌমুদস্নাপিত হইল। ক্ষণেক পরে ক্ষ্যাপাঠাকুর জল হইতে উঠিলেন। পরিধান সামান্য কৌপীন। জলার্দ্রগাত্রে পথ দিয়া উত্তর পশ্চিম মুখে ছুটিলেন। আমাকে পশ্চাতে যাইতে ইঙ্গিত করায় আমিও ছুটিলাম। কয়েক পা গিয়া পথ পার হইয়া বামদিকে তাঁহার আশ্রমকে রাখিয়া উচ্চ জমি হইতে নামিলেন। তখন আমি ইহাকে শিমূলতলা বলিয়া জানিতাম না। তাঁহার আশ্রমও চিনিতাম না দেখিলাম পথ হইতে শিমূলতলা এক মানুষভোর নীচে। বহু বৃক্ষে আবৃত। খানিকটা পরিষ্কার জমি, বাকীটা লতাপাতায় জঙ্গলময়। মড়ার মাথা ভাঁটার মত গড়াগড়ি যাইতেছে। পরিষ্কার স্থানের উত্তরে একটি শৈবালাবৃত উত্তর দক্ষিণে লম্বা, পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রশস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত বেদী। তাহার সম্মুখে বাবা উত্তরমুখে দাঁড়াইলেন। আমি পশ্চাতে নির্ব্বাক্ দণ্ডায়মান। বাবা ঐ বেদীকে জয়তারা বলিয়া প্রণাম করিলেন। আমাকে বলিলেন—"বাবা এই শিমূলতলা, বসিষ্টের আসন, ঐ তারামার পাদপদ্ম। প্রণাম কর।" তখন আমি ঐ বেদীর উপর একখানি প্রস্তর দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিলাম। চিন্ময়ী বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি জলেস্থলে প্রস্তরে মৃত্তিকায় সর্ব্বত্রই বিরাজমানা। এই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মভূত দ্বন্দ্বাতীত সেই মহাপুরুষ তারামার পাদপদ্মবোধে সেই প্রস্তরকে পূজা করিতেন। বসিষ্ঠাদি সিদ্ধগণের আসনকে

শিমূলতলায়

পাদপদ্মে প্রণাম

এত গৌরব করিতেন। এই আসনের তিনিই অধিকার পাইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু কৈলাসপতি ব্রজবাসী ক্ষ্যাপা এই পীঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া পীঠাধিকার দিয়া গুরু অদৃশ্য হন। বাম অনাদি সিদ্ধ হইলেও এদেহে এই পীঠে লীলা করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং এই পীঠ এই আসন ও এই শিমূলতলা তাঁহার প্রাণের প্রাণ ছিল। তিনি শিমূলতলার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই শিমূলতলার জন্য অন্নপূর্ণার রাজ্য কাশীধাম, অমরাবতী সদৃশী কলিকাতা নগরী তৃণজ্ঞানে ত্যাগ করেন। সেই শিমূলতলায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট দীনহীন তাপিতকে শান্তি দিবার কারণ লইয়া গিয়াছেন!

প্রিয়ভূমি

সুতরাং শতমুখে শিমূলতলার মহিমা তাহার নিকট খ্যাপন করিলেন। "বাবা এ দিব্য অদ্ভুত স্থান। এখানে তারামা লীলা করেন। এ বসিষ্ঠের আসনে আড়াই লক্ষ জপ করিলেই মন্ত্র চৈতন্য হয়।" ইত্যাদি। আবার ঐ আসনে সাধনা অতি কঠিন তাহা বুঝাইতে কহিলেন, "জপ করবে কি বাবা মশায় টেনে নিয়ে যায়।" সত্যই ঐ জঙ্গলপূর্ণ প্রাচীন শ্মশানে ভয়ঙ্কর মশা। উহারা পশ্চিম পারেই দ্বারকা নদীর গর্ভে বালুকাময় পুলিনে নব্য মহাশ্মশান। নিত্যই শব সমাগমের ধুমধাম। শব দাহ না করিয়া কেবল মুখে অগ্নি দিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া যায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তেই তথায় প্রতীক্ষমান শৃগাল ও কুকুরগণ বালি খুঁড়িয়া শকুনিগণের সহিত মহোল্লাসে শবমাংস ভোজন করে। অস্থি ছড়াইয়া থাকে। এই শ্মশানের মড়াখেকো মশা এক একটী বেশ পরিপুষ্ট। ঐখানে জপতপে বিশেষ সাহসের আবশ্যক। বাবা তাহাই জানাইলেন। আসনাধিকারিগণের বিনা অনুমতিতে ঐখানে থাকা যায় না ও থাকিলেও কার্য সিদ্ধ হয় না।

মহিমা কীর্ত্তন

সাধনার কঠোরতা

এই শিমূলতলা সম্বন্ধে বামের ভাব তাহার ভাষায় নগেন্দ্রপাণ্ডার রচিত চিত্রে ব্যক্ত।

মন চল চল শিমূলতলা
(মনরে) কেন গৃহবাসী তারা সর্ব্বনাশী
যথা দিবানিশি করে খেলা

দ্বারকারি তীরে বসিষ্ঠ আশ্রম
জগৎ ঘুরে মুনি করে বহুশ্রম
(হেথা) গিয়ে শিখে তারাপূজার ক্রম
ঘুচলো মনের ভ্রম
মতিভ্রম জীবের জ্বালা।

জপিলে তিন লক্ষ মা হবেন প্রত্যক্ষ
এই আজ্ঞা তন্ত্রে আছে শিববাক্য।
মনরে করে ঐক্য রাখি গুরুপদে লক্ষ্য
জপ কর বর্ণমালা।

(হেথা) আছে তারার চরণ (তাহা) লহরে শরণ
হবে নিবারণ জনম মরণ
কেন অকারণ ভোগ বিড়ম্বন
করোনা রে হেলা।

কহে বামা ক্ষ্যাপা তারা বেদো বেটী
কুচলে বড়ি করে সকল করলে মাটি।
(বেটীর) কাজের বেলা দেখ মহাদাঁতকপাটী
মুণ্ডমালা জীবে কেলা।

বাবার প্রস্তরপূজা পৌত্তলিকতা নহে। দুঃখের বিষয় সর্ব্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের ভাব না বুঝিয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট শিলাদি পূজাকে পৌত্তলিকতা বোধে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ আমাদের পূজাপদ্ধতি হেয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যে ঋষিগণের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদ স্ফুরিত, যাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্মৈব পশ্চাদথ পৃষ্ঠতশ্চ।' ইত্যাদি মহাবাক্যে উপনিষদের জলদগম্ভীরনাদে জগতের চরমসাধনা ব্রহ্মৈকাত্মতা ঘোষণা করিয়াছেন, সেই ঋষিগণ কখনও কি পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট হইতে পারেন? তাঁহারা মৃত্তিকা বা প্রস্তরকে পূজা করেন না, ঐ মৃত্তিকায় ও প্রস্তরে যে চৈতন্য অনুস্যূত সেই চৈতন্যের পূজা করেন। সেই চৈতন্যের দ্বিবিধা দিক্‌ চিন্ময়ী ও শক্তিময়ী। চিৎ ও শক্তির পরমার্থতঃ প্রভেদ নাই। তাই তন্ত্রের প্রকৃতি

চিৎজড়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন

সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় কেবল জড়শক্তিময়ী নহে, প্রত্যুত তাহা চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি; সমস্তই একদিক হইতে দেখিলে শক্তির লীলা; আবার অপরদিক দিয়া দেখিলে চিতের লীলা। একদিক জড়, অন্যদিক চিন্ময়। চিজ্জড়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন। এই গভীর তত্ত্বের অভ্যাস আধুনিক জড়বিজ্ঞান কিছু কিছু পাইতেছে। তাই Atomic theory (পরমাণু-বাদ) Ionic theory তে (শক্তি-বাদে) পরিণত। ক্রমশঃ শক্তিবাদ চৈতন্যবাদে পরিণত হইবে। জড়বাদী ক্রমে ভগবানের শক্তি উপলব্ধি করিবে—

পাশ্চাত্য মিলন

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোমাদি জড় এবং মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি চিন্ময় পদার্থ সকলই সেই অনন্তশক্তিমান্‌ এক চিন্ময়ের ভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের মধ্যে আপাততঃ প্রতীয়মান ভেদ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ক্রমে অভেদ বলিয়া বুঝিতেছেন। ঐ একবস্তু যাহার দুইদিক্‌ জড় ও চিৎ তাহাকে বেদে ব্রহ্ম বা সর্ব্ববৃহৎ বলে। তাঁহার শক্তিকে বৈদিক ঋষি প্রণাম করিতেছেন—

ব্রহ্ম

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।

সেই এক মহাশক্তি লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ ধর্ম্মাবলম্বিনী অর্থাৎ রজঃসত্ত্ব-তমোময়ী। তিনি অনাদি, অজা, তিনি এই অনন্ত সন্তান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। কপিলদেব এই বেদের বাণী হইতে 'মূল-প্রকৃতিরবিকৃতিঃ' এবং সেই প্রকৃতির বিকৃতি মহদাদি সৃষ্টি দেখাইয়াছেন! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উঠে। সেই অহঙ্কারের সৃষ্টি ত্রিধারা। সাত্ত্বিকী সৃষ্টি মন, রাজসিকী সৃষ্টি ইন্দ্রিয়, তামসিকী সৃষ্টি পঞ্চতন্মাত্র। সুতরাং পরমার্থতঃ জড় ও চৈতন্য এক। চৈতন্য জড়ের প্রভাব আবার জড়ই অবিভাবিত চৈতন্য। এক অখণ্ড চৈতন্যই জগতে বর্ত্তমান। তাহার লীলাবস্থা বা মায়িকাবস্থাই

প্রকৃতি

সংখ্যাতত্ত্ব

শক্তি। শক্তিতে চিদংশ অপরিস্ফুট; তাই জীব তাহাকে জড় বলে। তাই ভগবান বলিয়াছেন—

সকলই চৈতন্যময়

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

হে ধনঞ্জয়! জানিও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। এই নিখিল জগৎ আমাতেই সূত্রে মণিগণের মত গ্রথিত।

একেশ্বরবাদিগণ! পৌত্তলিকতা কোথায়? যাহাকে পুতুল বলিতেছ তাহা যে অনন্তজ্ঞানের বিকাশমাত্র। পুতুলপূজাও যে জ্ঞানের পূজা! আর ভাইগণ! তোমরা জাননা যে হিন্দু পুতুলকে পুতুলজ্ঞানে পূজা করে না।

প্রতিমা পূজাতত্ত্ব

নিরাকার ধারণা বড়ই কঠিন। তাই সে নিরাকারের আকার কল্পনা করে। সেই আকার সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য খড় দড়ি প্রভৃতি দিয়া কাঠাম করে, মাটি দিয়া দোমেটে করে এবং তাহাতে রং ফলায়। কিন্তু তখনও প্রতিমাকে পূজা করে না। সেই

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

প্রতিমাতে মন্ত্রদ্বারা অনন্ত চিন্ময়ীর আবাহন করিয়া ঐ অবিভাবিত চৈতন্যকে জাগাইয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ সেই চিন্ময় বা চিন্ময়ীর পূজা করে। সে কি এত মূর্খ যে সম্মুখে দেখিতেছে তার হাতেগড়া খড় মৃত্তিকার বিকার আর তাহাকে ধ্যান করিবে—

ধ্যান

জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাং
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং
নবযৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্॥ ইত্যাদি

তুমি মা জটাজুট সমাযুক্তা, অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতভালী, ত্রিনয়না, পূর্ণচন্দ্রাননী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুলোচনা, নবযৌবন সম্পন্না, সর্ব্বাভরণভূষিতা। সেই নির্জীব মৃত্তিকার পদে জবাদি

আহুতি

দিয়া বলিবে—'দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা'—হে দুর্গতি-হারিণি, মা রক্ষাকত্রি, তোমাতেই সব আহুতি হইতেছে। সেই মৃত্তিকায় স্তব করিবে—

স্তব

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

তুমি বিশ্বব্যাপিকা বৈষ্ণবী শক্তি, তোমার প্রভাব অনন্ত। তুমিই বিশ্বের বীজ, তুমিই পরমা অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া। তোমার মায়াতে জগৎ মোহিত; তুমি মা প্রসন্ন হইলে এ ভবে জীবের মুক্তি দাও।

জগতে পৌত্তলিকতা নাই ও থাকিতে পারে না মসজিদে মহম্মদীয়গণ, গির্জ্জায় যিশুভক্তগণ যে সর্ব্বশক্তিময়কে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হয় সেই সর্ব্বশক্তিময়কেই হিন্দু মন্দিরে তাঁহার প্রতিকৃত করিয়া আত্মনিবেদন করে। সেই সর্ব্বশক্তিময়ের নিকট সরলপ্রকৃতি সাঁওতাল মরনসারুনায় হৃদয়ের কথা জানায়। কেন ভাই। পরের সাধন প্রণালী অবগত না হইয়া পরকে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা কর। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগন তোমা আমা অপেক্ষা জ্ঞানী। তাঁহারা অন্তর্জগৎ দেখিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনপ্রণালী কখনও দুষনীয় নহে।

যে দেশে যে সময়ে যেরূপ সমাজের যেরূপ সাধনা আবশ্যক তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। আবার সে ব্যবস্থার বৈচিত্র্য এই যে সমাজ যেমন সাধনবলে উন্নত হইবে তেমনি সাধনার উন্নতস্তরে উঠিবে।

১২। অন্তর্যামী

শ্রীবামের ভারা পাদপদ্মে প্রণামে উপরোক্ত ভাব আমার মনের ভিতর দিয়া তড়িতবেগে ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই মার কথা মনে পড়িল। মন গর্ভধারিণীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই ত বামের নিকট আসা। মনে হইতে লাগিল আড়ালে মহাপুরুষকে পাইয়াছি, প্রাণের কথা, অন্তরের ব্যথা জানাই।

প্রাণের ভাব

ইনি দয়ালু নিশ্চয়ই দয়া করিবেন। যদি শুধু জানাইলে দয়া না হয় পায়ে পড়িয়া কাঁদি যে আমার স্নেহময়ী জননীকে বাঁচাইয়া দাও। কিন্তু জানিনা রাম কি গুণ করিয়াছেন ; হৃদয় পুড়িতেছে কিন্তু মুখ ফুটিতেছে না। অন্তর্যামী আমার অন্তর জানিয়াছেন বুঝাইবার জন্য পরক্ষণেই বলিলেন —"বাবা, আমারও মা ছিল, সে যে দুধু মা, সে আর মাই দেয় না। এখন তারামার মাই খাই। এ মা আর মরবে না।"

ক্ষ্যাপা

আমি বিস্মিত হইলাম। মহাপুরুষ আমার মনের কথা যাহা এত নিভৃতে রাখিয়াছি ফণিবাবুর কথা দূরে থাকুক পূজনীয় পিতৃদেবকে, জননীকল্পা সত্যভামাদেবীকেও বলি নাই—সে কথা ক্ষ্যাপা কেমনে জানিল? সত্য সত্যই গর্ভধারিণী দুধুমা। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য বিশ্বমাতা তাঁহার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করেন। আর তিনিও চিরকাল তাহা দেন না। দুই তিন বা পঞ্চ বৎসর মাত্র দেন। সন্তান যেমন বড় হইতে থাকে মার উপর তাহার নির্ভরতা তেমনি কমিয়া যায়। তাই ভক্ত কবি গাহিতেছেন—

"মা মলে কি ছেলে বাঁচে না?"

সে মা তো নশ্বর। তাঁহার শরীর ত রক্ত মাংসের। শরীর চিরস্থায়ী নহে। তারামাই তো সনাতনী। তিনি জগতের মাতা। সমস্ত জীবই তাঁহার সন্তান। যদি এই দুধুমার সন্তানের প্রতি এত স্নেহ, এত মায়া, এত মমতা, সে অনন্ত সনাতনী জগদম্বার সন্তান প্রতি না জানি কত স্নেহ, কত মায়া, কত মমতা! পদে পদে তো তাঁহার স্নেহের আদরের পরিচয় সন্তান পাইতেছে। তিনিই তো—

দুধুমা

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"

সেই দেবী যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে সম্যক্ বিরাজমানা। হায় অবোধ সন্তান! সেই অনন্ত স্নেহময়ী মাতার অনন্ত স্নেহপূর্ণ স্তন্য পান না করিয়া সংসার বিষপানের জন্য তুমি ব্যস্ত! শ্রীরামের ন্যায় সন্তানই সেই মাকে চিনেন। সেই মার স্তনপান করেন এবং কখনও মাতৃহারা হন না। বুঝিলাম যদি যথার্থ মাকে চাই তো দুধুমাকে চাহিলে চলিবে না—তারামাকে মা করিতে হইবে। দুধুমা সেই

তারামা

তারামারই ছায়া। ছায়া-বাজী কতক্ষণ থাকে। বিম্বের অস্তিত্বেই প্রতি-বিম্বের অস্তিত্ব। বিম্বই স্থায়ী, প্রতিবিম্ব অস্থায়ী। বিম্বকেই চিনিতে হইবে। তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বুঝা যাইবে। সেই বিশ্বময়ী অনন্ত-স্নেহময়ী তারা মাই যথার্থ মা! সে মাকে পাইলে আর আমার কস্মিনকালে মাতৃশোক হইবে না। ধন্য বাম! এক কথায় দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝাইলে। তারামাকে আমার মা করিয়া দিবে তাহার ইঙ্গিত করিলে।

১৩। চক্র

আমার প্রাণের কথা ইঙ্গিত করিয়া বাবা ধীরে ধীরে শিমূলতলা হইতে ফিরিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথের দিকে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া পথের ধারে একখানি চালাঘরে আসিলেন।

আশ্রম

ইহাই তাঁহার আশ্রম বুঝিলাম। ইহার সম্মুখে পূর্ব্বদিকে একটু খোলা জমির পরে গ্রামের পথ। তৎপরে প্রকাণ্ড জীবৎকুণ্ড ও তারপর যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর খোলা আকাশ। অনন্তের ছবি কতকটা এখান হইতে পাওয়া যায়। ঐ খোলা জমির উপরও বাবা থাকিতেই কয়েক বৎসর পরে একখানি খোলা চারিচালা নির্মিত হয়। দেখিলাম ঘরে চাবি দেওয়া। বাবা ঘরের ভিতর থাকেন না। দরজার দক্ষিণ দিকে সান বাঁধান দাওয়ায় থাকেন। পরে জানিলাম ঘরের সাজসজ্জা মড়ার চ্যাটা, মড়ার মাথা, মড়ার মালসা, ৩।৪টী ত্রিশূল, ২।৪

আসবাব

খানি খাঁড়া ও ৩।৪টা চিমটা। আমি যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবাকে কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সযত্নে আনাইয়াছিলেন এবং এক মূল্যবান্ রূপার ফুরসি দেন। বাবাকে যে কিছু প্রণামী দিত তাহা প্রায়ই চুরি যাইত। কে নিত বাবা জানিতেন, কিছু

বলিতেন না। তাঁহার সেবক পাণ্ডাদের মধ্যে এই লইয়া বাদানুবাদ চলিত। তাই তাঁহারা বাবার প্রণামী টাকায় এক লোহার সিন্ধুক ক্রয় করেন। সেই সিন্ধুকও ঐ ঘরে থাকিত। তাহাতে রূপার ফুরসির সহিত মড়ার মাথাও ছিল। ঐ ঘরের একটী দ্বার ভিন্ন অপর কোন ছিদ্র না থাকায় উহা অন্ধকারময়। আর ঐরূপ শ্মশানের জঞ্জালে পরিপূর্ণ থাকায় উহাতে মধ্যে মধ্যে সর্পও বাস করিত। বাবা বলিতেন—"বড়লোকের ঘর বাবা! আলান খরিশ প্রভৃতি থাকা চাই।" ঘরের আসবাব দেখিয়া পুষ্পদন্তের বাণী মনে পড়ে—

আত্মারাম

মহোক্ষঃ খট্টাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিতঃ
কপালঞ্চেতীয়ৎ তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাম্
নহি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥

হে বরদ! (ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু) একটী বড় বৃষ, একখানি খট্টাঙ্গ, একটী পরশু, একখানি চর্ম্ম, চিতাভস্ম, সর্প ও নরকপাল—এই তো তোমার উপকরণ। কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ যে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন তাহা তোমার ভ্রূভঙ্গিতেই হয়। তবে তোমার কেন এদশা? তুমি যে আত্মারাম। আপনার পূর্ণানন্দে আপনি বিভোর। ক্ষুদ্রভোগানন্দে তোমার মন কেন যাইবে। বিষয় মরীচিকা কি কখনও স্বাত্মারামকে ঘুরাইতে পারে?

বাবা দাওয়ায় ঢুকিয়া ভিজা কৌপীন ছাড়িয়া আর একটী কৌপীন পরিলেন। তিনি দক্ষিণমুখে ও আমি ২।৩ হাত দূরে উত্তরমুখে সেই দাওয়ায় বসিলাম। মহাপুরুষকে যতই দেখিতেছি ততই মধুময় লাগিতেছে। পাদস্পর্শের জন্য ব্যগ্রতা নাই। মাঝে মাঝে ভুধুমার কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাকে বাঁচাইতে আসা। সুতরাং মন যেন ঐ ভাবে পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না। কিন্তু বৈরাগ্যময় মহাপুরুষের কি প্রভাব! ঐ ভাব একবার জাগিতেছে, আবার ডুবিতেছে। ক্রমে যেন মন শূন্য শূন্য লাগিল। ভালমন্দ সংসার অসংসার যেন কিছুই জ্ঞান নাই। এমন সময় ফণিবাবু বাসা হইতে বাবার জন্য আনীত বিলাতি এক বোতল কারণ ও অন্যান্য

অমূল্য শূন্য

ভোজ্য আনিলেন। বাবা ভক্তির উপহার সাদরে দর্শন করিলেন।

রক্তবর্ণ কারণ

তৎক্ষণাৎ দুই তিনজন লোক জুটিল। বিলাতি কারণ দর্শনে তাহাদের হৃদয় উৎফুল্ল, বাসনা সতৃষ্ণ। "বাবা! রক্তবর্ণ কারণ এসেছে, রক্তবর্ণ কারণ এসেছে," বলিয়া উঠিল। বাবা নিরুত্তর। বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহারা নিজেরাই ছিপি খুলিতে লাগিল। তার জড়ান ছিপি, খুলিতে সময় লাগে। তাহাদের আর অপেক্ষা সহে না। বোতলটীর মুখ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই যেন ভাল হয়। বাবা তামাসা দেখিতেছেন। নয়নকোণে ঈষৎ মধুর হাসি খেলিতেছে। সাধনায় সিদ্ধি। তাহাদের চেষ্টায় বোতলের ছিপি খোলা হইল। বাবার সম্মুখে বোতল রাখিয়া বলিল, "বাবা উৎসর্গ করিয়া দিন।" তাহারা বড়ই ব্যস্ত। বাবা প্রসাদ দিতে কেন এত বিলম্ব করিতেছেন। তাহাদের মনের ভাব —আর প্রসাদের আবশ্যকতা কি? কিন্তু মুখে তা বলিতে পারিতেছে না। বাবা শুনিয়াও শুনিতেছেন না। নিজ ভাবেই বিভোর! তাহারা বাবার

উৎসর্গ

চটকা ভাঙ্গাইবার জন্য বারবার বলিতেছে, "বাবা! তারামাকে কারণ দিন।" তখন বাবা বোতলটী বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ করে তাহার উপর জপ করিলেন। মনে মনে কি শোধন-মন্ত্র বলিলেন, জানি না। প্রকাশ্যে মন্ত্র হইল, "তারামা ঘোড়ার মুৎ খা, ঘোড়ার মুৎ খা।"

আগন্তুকগণ প্রসাদের জন্য উন্মুখ হইলেন। বাবা পাত্রে খানিকটা ঢালিয়া অবলীলাক্রমে সরবৎপানের ন্যায় পান করিলেন। কোন কোন শুদ্ধাচার পাঠকের মনে হইতে পারে ইহাতে আর বাহাদুরী কি? পাকা মাতাল তাই বিলাতি মদের ও ঝাঁঝ বামকে লাগিল না। কিন্তু বামের এ বিষয়েও অচিন্তনীয় প্রভাব যাঁহারা পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা জানিয়াছেন।

বিনা জলে বোতল বোতল বিলাতি মদও তিনি খাইতেন, তাঁহার মুখ-বিকার বা জিহ্বার জড়তা বা মনের বিক্ষেপ হইত না। আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইত তখন তিনি এক পাত্র খাইয়াই ঢলিয়া পড়িতেন। ফলকথা মদে তাঁহাকে খায় নাই, তিনি মদ খাইতেন। মদে তাঁহার মনের বিকার আনিতে পারিত না।

তিনি পানপাত্র গ্রহণ করিলে অভ্যাগতগণ যেন বাঁচিল। তাহারা তথা

হইতে মালা কুড়াইয়া যে যাহার মালা বাবার সম্মুখে ধরিল। বাবা সকলকে পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। তাহারা মুখবিকারের সহিত পান করিয়াই মুড়ি শুদ্ধি লইল।

আবার প্রসাদ চাহিল বাবাও প্রসাদ দিলেন। তাদের মন বিকাশত হইল। তাহারা বসিষ্ঠের সিদ্ধিক্ষেত্রে মহাশ্মশানে শ্রীবামের আশ্রমে চক্রে বসিয়াছে। সাক্ষাৎ বামরূপী বাম তাহাদের চক্রেশ্বর। সুতরাং তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব ভিন্ন অন্যভাব খেলিতে পারে না। মদের প্রথম গুণ মনোবিকাশ। তাদের মধ্যে একজন গান ধরিল—

প্রসাদ বিতরণ

হৃদয় বিকাশ

ব্রহ্মাণ্ডেতে খুঁজে এলাম ব্রহ্মময়ী মা তোমারে।
কোথাও না দেখতে পেয়ে দেখি শেষে হৃদ্‌মাঝারে॥

স্বর তরঙ্গ সেই মহাশ্মশানকে কাঁপাইয়া দিঙ্‌মহল মুখরিত করিল। আমার প্রাণের তন্ত্রীতেও ঝঙ্কার দিল। সত্য সত্যই ব্রহ্মময়ী মা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইলেও জীব যতক্ষণ না অন্তর্মুখীন ততক্ষণ তাঁহার উপলব্ধি না হইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ভাবেরও উদয় হয় না। ভাবিলাম মহাপুরুষের কি মহিমা! এরূপ অশিক্ষিত মদ্যপায়ীকেও কি ভাব দিলেন। ভাবের মধুরতায় স্বরও কি মধুর! এখনও যেন সে সুর কাণে লাগিয়া আছে।

সঙ্গীত ঝঙ্কার

ক্রমে পাত্রের পর পাত্র চলিতে লাগিল। বোতল ফুরাইল। তাহাদের বিকারভাব আসিয়াছে। অতিথিগণের ইচ্ছা আরও দু-এক বোতল ধান্যেশ্বরীও চলে। আমার ইচ্ছা আরও বাড়াবাড়ি না হয়। শ্রীবাম আমার বাসনাই পূর্ণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে কেচামেচি আরম্ভ হইল। পরে তাহারা বচসা করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাবার অচল অটল ভাব।

আমি তন্ত্র পড়ি নাই। তান্ত্রিকচক্র পূর্ব্বে দেখি নাই। কখনও পঞ্চমকারে সাধনাও করি নাই! হরিলুটের ছেলে বাল্যকালে হরির দিকেই টান ছিল। হরিনাম করিতে সময় সময় প্রীতি হইত। রামায়ণ মহাভারত পড়িতাম। শ্রীভগবানের চরিত বড় ভাগ লাগিত! শক্তিনামে তত আস্থা ছিল না! দুর্গোৎসবাদি বাটীতেই হইত। হৃদয় হইতে দুর্গা বলিতাম না। পাটা

তন্ত্রান্ভিজ্ঞ

কাটার সময় 'জয় মা দুর্গে' ছাগ গুড়াগুড় ধ্বনি মুখ হইতে বাহির হইত। রোগাদির পরীক্ষার ধমকে 'কোথা হরি' বলিয়াই বেশী ডাকিতাম। কিন্তু বৈষ্ণবাচারীও ছিলাম। মৎস্য, মাংস, হংসডিম্ব প্রভৃতি সবই চলিত। বৈষ্ণবভাব তো ছিলই না। সে ভাব কত উচ্চ।

তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

(যিনি তৃণ অপেক্ষা আপনাকে নীচজ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া স্বীয় মস্তকে বাতাতপ নীরবে সহ্য করিয়া আশ্রিতজনকে ছায়া দেন, যিনি মান গর্ব্ব সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, অথচ পরকে শ্রীভগবানের বিভূতিবোধে মান দিয়া থাকেন, তিনিই হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকারী।) আমার সে অধিকার ছিল না, এখনও হয় নাই। আমি শাক্তও ছিলাম না। আমার খিচুড়ি ভাব ছিল। কোন তন্ত্রেই বিশ্বাস ছিল না। আস্তিক্য বুদ্ধিও ছিল না। তবে আমি কারণের দলেও ছিলাম না। তাহার প্রতি আমার বিদ্বেষই ছিল। যৌবনোদ্গমে নানা পাপ করিয়াছি বটে, মদ্যপান করি নাই। উহাতে কেমন ভয় ছিল। উহা সংসারীর পক্ষে বিষ বলিয়া জানিতাম। বৈদ্যক শাস্ত্রে সুরার প্রশংসা পড়িয়াছিলাম।

না শাক্ত না বৈষ্ণব

মদ্যেবিরতি

প্রায়শোঽভিনবং মদ্যং গুরুদোষ সমীরণম্।
স্রোতস্রাং শোধনং জীর্ণং দীপনং লঘুরোচনম্॥
হর্ষণং প্রীননং বর্ণ্যং, ভয়শোকশ্রমাপহম্।
প্রাগল্‌ভবীর্য্যপ্রতিভা তুষ্টি পুষ্টি বলপ্রদং॥
সাত্ত্বিকৈর্বিধিবৎ যুক্ত্যা পীতং স্যাৎ অমৃতং যথা॥

—চরকসংহিতা, সূত্রস্থান ২৭ অধ্যায়।

মদের গুণ

প্রায়ই নূতন মদ গুরুপাক ও ত্রিদোষোত্তেজক। পুরাতন মদ্য দেহের রসাদি বাহী নাড়ীকে শোধন করে, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাক, রোচক, হর্ষজনক, প্রীতিকর, বর্ণবর্দ্ধক, ভয় শোক ও শ্রমের নাশক, প্রগল্‌ভতা, বীর্য্যপ্রতিভা তুষ্টিপুষ্টি ও বল বিধান করে। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি এই মদ্য যথাবিধি উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অমৃতের ন্যায় ইহা হইয়া থাকে।

নিয়মিত ব্যবহারে মদ্যের গুণ যে সুধার ন্যায় তাহা পাশ্চাত্যগণের দৃষ্টান্তে দেখিয়াছিলাম। তথাপি কখনও ঐ সুরার পক্ষপাতী ছিলাম না। কামিনী অপেক্ষাও মদের মোহিনীশক্তি অধিক। কামিনী বাগুরা হইতেও লোকে নিস্কৃতি পায়। কিন্তু মদিরা জাল হইতে মুক্তি পাওয়া দুর্ঘট। আবার দুইজালে যে জড়িত তাহার দফা রফা!

মদের দোষ

মদ মনকে বশীভূত করিয়া ক্রমে কাজের বাহির করিয়া ফেলে। মাতাল কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্রই ঘৃণিত। মাতাল পশুবৎ ও শেষে কাষ্ঠকুড্যবৎ হয়। এই পরিণামও আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলাম। মদ্যপানের বিষময়ফল বুঝিয়াই সমাজ রক্ষার জন্য পুরাণে যদুবংশ ধ্বংসাদি দৃষ্টান্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাতক। মদ সর্ব্বতোভাবে সংসারীর হেয়। কিন্তু শক্তিতন্ত্র মদের পক্ষপাতী। তন্ত্রের মত, যে পঞ্চ মকার সাধকেরাই বীর-সাধক ইত্যাদি শুনিয়াছিলাম। তখন মকারতত্ত্ব জানিতাম না। এখনও বাম আমাকে ঐ তত্ত্ব যেরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়াছেন তাহা স্থানান্তরে লিখিয়াছি। কিন্তু বাম আমাকে মকার সাধনা এখনও দেন নাই।

বামের চক্রদর্শনে তাঁহার আচরণের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ ভাব না আসিলেও স্মৃতি ও তন্ত্রের এই বিরোধ হিল্লোলে আমার মন দোলায়িত। বাম তাহা বুঝিয়াছিলেন। আমি মকার সাধনের অধিকারী নহি জানিয়াই আদর্শ গুরু মদের প্রতি অনুরাগ না আসে সেই জন্য মদকে 'ঘোড়ার মুৎ' বলিলেন।

১৪। কলিকাতার অভাব

প্রসাদ গ্রহণ

চক্রশেষ হইল। মুটুপাণ্ডা আমাকে তারামার প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন। তখন অপরাহ্ন প্রায় ৫টা। বাবার অনুমতি মনে মনে চাহিতেছিলাম। বাবা প্রকাশ্যে অনুমতি দিলেন; আমি আশ্রম হইতে উঠিয়া মন্দির বাটীতে আসিলাম। তখন সকলেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। একা আমি মন্দিরের দালানে বসিলাম, প্রসাদের ব্যবস্থা বাবা তো পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন।

দেখিলাম মোটা আতপের ভোগ, খোসা সমেত কলাইদাল, ডেটো থাড়ার চড়চড়ি, ঘুষো মাছের অম্বল, আর গুড়ের পায়েস। তারামার কি মহিমা! প্রসাদ যেন অমৃত লাগিল। দাতার 'জয়' দিয়া প্রসাদ পাইলাম। তদন্তে পাণ্ডার বাড়ীতে যাইলাম। ক্লান্তিবোধ হইয়াছিল, একটু শয়ন করিলাম না জানি রাম কি গুণ করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। এ ব্যাকুলতা স্বার্থ-প্রণোদিত। মনে হইল যাহার জন্য আসা রাম এখনও তো তাহা করিলেন না। আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই বটে, তিনি তো আমার মনের কথা সব জানিয়াছেন। তথাপি কেন আমার মাকে বাঁচাইয়া দিতেছেন না। দেখি একবার যাই, মনের ব্যথা মুখে জানাই। পায়ে ধরিয়া কাঁদি। দয়া হইতে পারে। সুতরাং বাবাকে দেখিতে ছুটিলাম। দেখিলাম আশ্রমের সম্মুখে পথে কল্কেফুলের গাছের তলায় বসিয়া আছেন। সঙ্গে দুই একটা কুকুর ও দুই তিনজন লোক। মুখ শ্মশানের দিকে। বাবা পদ্মাসনে আসীন, লম্বোদর, পীনবক্ষঃ বিস্ফারিত প্রেমোন্মত্ত নয়নযুগল, ঋজায়ত পুষ্টকায, দুইকর্ণে দুই কল্কেফুল। দেখিয়াই বোধ হইল সাক্ষাৎ শিব, কেবল বর্ণগৌর না হইয়া শ্যামল।

বিশ্রাম

শিবরূপ

প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট বসিলাম। মুখে কথা সরিল না। আমাকে দেখিয়া তিনি কলিকাতার কথা তুলিলেন। বলিলেন, "বাবা, আমি তোমাদের কল্‌কাতায় গেস্‌লাম। দেখ্‌লাম সাহেব বাবাদের বুজরুকি! আগুণে জাহাজ, আগুণে গাড়ী, ঝপাকাটা ঝপাকাটা গুড়গুড়। কত লোক, কত কি দ্রব্য। কিন্তু বাবা তারামাকে দেখ্‌লাম না।" কলিকাতার কি সুন্দর চিত্র এক কথায় দিলেন: কলিকাতা মহানগরী, পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও আশ্চর্য্যের আধার। দেশবিদেশের কত লোক এখানে সমবেত। অপরা বিদ্যার কত চর্চা। বিজ্ঞানের কত আবিষ্কারের ফল এখানে পরিদৃশ্যমান! কি বাণিজ্য বিস্তার! কিন্তু পরাবিদ্যার অনুশীলন এখানে আদৌ নাই। এখানে সকলেরই উদ্দেশ্য ঐহিক। ভোগের জন্য এখানে সকলেই লালায়িত। ঐ যে উদয়াস্ত পথে পথে অবিরত গোযান, অশ্বযান প্রভৃতির স্রোত বহিতেছে। ঐ যে পিপীলিকা শ্রেণীসম যাত্রী চলিতেছে। এই

কলিকাতার চিত্র

ছুটাছুটি কিসের জন্য ভাই? কেবল অর্থের চিন্তা, ঐহিক মান গৌরবের চিন্তাই উহার মূল। তারামার চিন্তা কলিকাতায় কই? কামের দাস আমরা স্বীয় অভীষ্টদেব কামকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া দিবারাত্র তাঁহার চরণেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি। চতুর্ব্বর্গ-দায়িনী তারামার মূর্ত্তি কলিকাতায় কয়জনার প্রাণমন্দিরে স্থান পায়? যে যাহার নিজের ক্ষুদ্র সংসার লইয়াই ব্যস্ত। প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনে না, হৃদয় বিনিময় নাই, প্রেম নাই, কেবল অর্থের বাঁধনই কলিকাতার বাঁধন। কি বাজারে, কি বিচারালয়ে, কি বিদ্যালয়ে, কি নাট্যমঞ্চে সর্ব্বত্র অর্থই লক্ষ্য। অর্থের কথা, অর্থের চিন্তা। কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কত প্রাসাদমালা নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার অনুপাতে কয়টা হিন্দুর মন্দির, কয়টা মুসলমানের মস্‌জিদ, কয়টা খৃষ্টীয়ানদের গির্জ্জা। কয়জন আবার সেই মন্দিরে হৃদয়ের আবেগে যায়। সেই মন্দিরেই কি শুদ্ধ প্রেমভক্তির আলোচনা হয়? গীতা প্রভৃতির আলোচনাও এখানে কেবল নিজের নাম বাজাইয়া অর্থোপার্জ্জনের দ্বার নয় কি? কলিকাতার অধিষ্ঠাত্রী কৈবল্যদায়িনী কালীমাও আমাদের হাতে পড়িয়া দোকানদার সাজিয়াছেন। আমাদের গুরুদাদা জগৎক্ষ্যাপা তাই বলিতেন —"কলিকাতা কলির কাতা ঐ দড়িতে কলি ভারতকে বাঁধিয়াছে।" কলিকাতা আমার সাহেব বাবাদের বুজরুকি অর্থাৎ জড়শক্তির বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। বাবার উপযুক্ত সন্তান ত্যাগী সাধক শ্রীসুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলি ভায়া তাই বলেন—"কলিকাতা ইংরাজের ভারত, ঋষির ভারত পল্লীগ্রাম।" এখনও পল্লীগ্রামে প্রেমভক্তি প্রভৃতি উন্নত ভাবের আভাস পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে ঠাকুর সেবা, আতিথেয়তা এখনও বর্ত্তমান। তথায় এখনও শান্তির ছবি আছে। কলিকাতার মত কেবল "কড়ি কড়ি" রব নাই। কোন কোন অদ্বৈতবাদী হয়ত বলিবেন যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তখন কলিকাতায় সেই ব্রহ্মময়ী তারার অভাব ঘটিতে পারে না। ক্ষ্যাপার ঐ কথায় বুঝাইতেছে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। দার্শনিক মহাশয় নিজপক্ষ সমর্থন জন্য হয়ত বেদ বেদান্তাদি হইতে নানা বচন তুলিবেন।

কেবল ঐহিক চিন্তা

প্রেমভক্তির অভাব

দোষাশঙ্কা

অনন্ত বিশ্ব সেই এক অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ বা অধ্যাস বটে কিন্তু

'নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তারামা' বলা সহজ, উপলব্ধি বড়ই কঠিন। সে বোধ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? কয়জন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন, আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিতে পারে? বাবা আমার ন্যায় সংসার কীটকে কলিকাতার পরিচয় দিতেছিলেন। সর্ব্বত্র বা সর্ব্বভাবে প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তিতে, সতে অসতে, জলে স্থলে আকাশে তারামাকে দেখিবার শক্তি আমার ছিল না, এখনও হয় নাই। বাবার কৃপায় সে ভাব ক্ষণিক ক্ষণিক একটু কদাচিৎ জাগে মাত্র। আমার ন্যায় অধিকারী বুঝিয়াই কলিকাতার ধর্ম্মভাব ক্ষীণ বুঝাইবার জন্য ঐরূপ বলিলেন। আরও আমায় বুঝাইলেন ঐ ধর্ম্মভাবহীন কলিকাতায় থাকতে হইলে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ আগে সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত ছিল। কলির ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ কলিকাতার ব্রাহ্মণ নিরগ্নি।

১৫। তারামা শ্মশানে

কলিকাতার ধর্ম্মহীনতা জানাইয়া ধর্ম্মভাব কোথায় পাওয়া যায় তাহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় বাবা শিমুলতলার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "শিমুলতলার আশ্চর্য্য মাটি, তারামা আমার শ্মশানে।" তাঁহার কথার অর্থ তখন বুঝি নাই। তাঁহারই কৃপায় ক্রমশঃ কিছু কিছু বোধ আসিতেছে।

বাহ্য শ্মশান

বাহ্য শ্মশান ঐহিক লীলা শেষাঙ্কের রঙ্গভূমি। এখানে রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সকলেরই একগতি। এখানে মান অভিমান, দম্ভ দর্প, ক্রোধ হিংসা সকলই চূর্ণ হয়। এই লয়স্থানে ঐহিকের নশ্বরত্ব আপনাআপনি মনে জাগে. বৈরাগ্যফলে জগৎ মিথ্যা বোধ হয়, তখন সত্যান্বেষণেও মন ছুটে। মহাকবির ভাষায় —তাই এ স্থানের ন্যায় সুন্দর হিতকারী স্থান পৃথিবীতে নাই। ভক্ত ঠিকই গাহিয়াছেন—

কে বলে শ্মশান কদর্য্যস্থান।

এইরূপ স্থলেই ধর্ম্মভাবের জাগরণ প্রত্যক্ষ।

মনের পঞ্চবিধ অবস্থা (১) বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে

বিচরণ। ইহাই মাদৃশ সংসারীর সাধারণ অবস্থা। (২) মূঢ় অর্থাৎ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণজনিত মনের যে অবসাদ আসে তজ্জন্য মন বিশ্রাম চায়। সেই অবসন্ন স্তব্ধভাবই মূঢ়। ইহার ফলে নিদ্রাদি। (৩) ক্ষিপ্ত অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল। ক্ষিপ্ত মন এত দ্রুত বিষয় হইতে বিষয়ে ছুটে যে সামঞ্জস্য থাকে না। এই গরু ভাবিল, পরক্ষণেই বৃক্ষ মনে পড়িল তৎপরক্ষণে বৃক্ষের উপর গরু এইরূপ ভাব উঠিল। ইহাকেই সাধারণতঃ উন্মাদ অবস্থা বলে। এই তিন অবস্থায় যোগ সম্ভবে না। ঐরূপ চঞ্চলভাব থাকিতে কখনও মন সেই পরম পুরুষার্থে লিপ্ত হইতে পারে না। সেই পরমেশ্বরে যোগ হইতে গেলে সংসারের সর্ব্ব বিস্তার বা লয় আবশ্যক। তাই—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তার সংযমনই যোগ। সংসার হইতে চিত্তের বিয়োগ ও এক সৎ পদার্থে যোগ। এই যোগের জন্য মনের স্ফুট অবস্থা একাগ্রতা আবশ্যক। মন সেই পরমাত্মাতে একমুখি হওয়া চাই। ঐরূপ একাগ্রতার ফলেই ধ্যান যাহাকে যোগশাস্ত্রে প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ একরূপভাবনা বলে। ধ্যান গাঢ় হইলেই ধারণা। ধারণার গাঢ়তাই সমাধি। মনের একাগ্রভূমিতে কোন বস্তু লইয়া ধ্যান আরম্ভ হয়। প্রথমে আমি ভাবিতেছি অমুক বস্তু ভাবনার বিষয় ও আমার ভাবনা এইরূপ বিবিধ পৃথক জ্ঞান থাকে। ভাবনা দৃঢ়ীভূত হইলে জ্ঞাতাজ্ঞেয়জ্ঞান আবার জ্ঞেয়ে পরিণত হয়। তখনই ধ্যানকে ধারণা বলা যায়। ঐ একমাত্র জ্ঞেয়াবলম্বনা ধারণা ক্রমশঃ সমাধিভাবাপন্না হইয়া থাকে। সেই সমাধিকে সবিমর্ষ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে কারণ তখনও একটী কোন পদার্থের বিমর্ষ বা সম্প্রজ্ঞান অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান রহিয়াছে। ঐরূপ বিমর্ষ বা জ্ঞানও ক্রমে লুপ্ত হয়। তখন সমুদয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ। এইজন্য নিরোধই মনের পঞ্চম অবস্থা, যোগের শেষভূমি। ঐ নিরোধের ফলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন মনের লয় হইয়াছে বটে—কোন বিষয়ের বা ভাবের বিমর্ষ বা সপ্রজ্ঞান নাই। তথাপি আত্মার অস্তিত্ব আছে কিন্তু অহংজ্ঞান না থাকায় সে অবস্থা অস্তিও বটে নাস্তিও বটে। বেদে তাহাকে "অস্তি নাস্তি ভাতি ন ভাতি" দশা বলে। তন্ত্রে ঐ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দশার নাম অজ্ঞাতমণ্ডল। কারণ তখন জগতের জ্ঞান ডুবিয়া গিয়া আত্মা কি এক অজ্ঞাত জগতে বিচরণ করেন। মন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া

সপ্তমচক্রে না উঠিলে ঐরূপ লয় হয় না। বৌদ্ধমতে ঐ অবস্থায় নির্ব্বাণ। ঐ অবস্থার পর অখণ্ড সত্বায় অখণ্ড জ্ঞান ভাসে। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে মন বুদ্ধি অহংজ্ঞানের লয় অবস্থাই অন্তঃশ্মশান। সেই শ্মশানেই তারা বা ত্রাণকারিণী বিদ্যার স্ফুরণ। ভক্ত এই ব্যাপার গীতোচ্ছ্বাসে সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন—

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে মা শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে
ধূ ধূ আগুন জ্বলছে চিতে
চিতাভস্ম চারিভিতে
রেখেছি মা আসিস্ যদি
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে মা চরণতলে
নাচ মা শ্যামা তালে তালে হেরি দুটি আঁখিমুদি।

যতক্ষণ না সর্ব্ববিধ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান ও তজ্জনিত স্মৃতি ও সর্ব্ববিধ কামনা এবং মূলীভূত বাসনা লয় হইয়া মন ঐরূপ শ্মশানে পরিণত হয় ততক্ষণ সেই তারিণী অর্থাৎ অখণ্ড চিদুপলব্ধি ঘটে না। ঐ লয়ই শাস্ত্রে তম নামে বিদিত। তাহার পরই বালসূর্য্যমণ্ডলে অনন্তজ্যোতিঃ।

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

ঐ অবস্থায় জীব মৃত্যুঞ্জয়ী নিষ্কামা শিবশক্তির লীলা দেখিয়া প্রেমে আত্মহারা হন। তখন সকলই প্রেমময়, আনন্দময় ও চিন্ময়। তখন সকলই 'তারা' দর্শন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গ। ব্রহ্মাণ্ডের নিস্তরঙ্গ অতীতাবস্থাই তাদৃশ তরঙ্গের আধার। তন্ত্রের পঞ্চচক্র পর্য্যন্তই ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমের লীলা, ষষ্ঠে মনের লয়, সপ্তমে রূপ-ভাবাতীত শূন্য। সেইখানে উঠিলেই সাধক গাহিতে পারেন—

"অরূপে চমকে তোর রূপরাশি।"

১৬। নানাকথা

কলিকাতার প্রসঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা উঠিল। বাবা বলিলেন, "তোমাদের কলকত্তায় আমাকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিয়ে গেস্‌লেন বাবা। যতীন্দ্রমোহন পাপিয়া পুরুষ।" পাপিয়া পুরুষের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পাণ্ডারা উহার টীকা করেন যে যতীন্দ্রমোহন বড়লোক। আমার টিপ্পনী যে পাপিয়া যেমন পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যতীন্দ্র সেরূপ মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পাপিয়া যেমন সুকণ্ঠ, যতীন্দ্র সেরূপ মিষ্টভাষী। যথার্থ তাঁহার ন্যায় শিষ্টাচারী, শিক্ষিত, প্রিয়ংবদ লোক অতি বিরল। তিনি তাই সকলকে আপনার করিতে পারিতেন। প্রেমময় বামের নিকট প্রেম লোকপরীক্ষার নিকষ। বোধ হয় তিনি যতীন্দ্রমোহনে এই প্রেমের ছায়া দেখিয়া এই পদবী দিলেন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি উপাধি অপেক্ষা ইহা যতীন্দ্রমোহনের গৌরবকর পরিচয়।

পাপিয়া পুরুষ

বাম সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি। যতীন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি যে মহারাজার সিঁতির বাগানে হর্ষে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই তাহাও আমায় বলিলেন, "বাবা তোমরা কলকত্তায় ঘরের মধ্যে বাহ্যে কর, আমি বাবা পারি নাই।"

বাবার বাক্‌সুধা অবাক্ হইয়া পান করিতেছি। বাবা আমার চণ্ডীপাঠ সম্বন্ধে বলিলেন, "চণ্ডীপড়া বাবা, খুব চণ্ডী পড়েন। মধুকৈটভবধ. মহিষাসুরবধ, ধূম্রনেত্রবধ, রক্তবীজবধ. শুম্ভনিশুম্ভবধ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বাবা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

পূর্বেও "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" এই দুইটি শব্দের উপর জোর দিয়া মন্দিরে বাবা আমাকে উৎসাহিত করেন। আবার এই দুইটি শব্দ এখানেও জোর দিয়া বলিলেন। আমার মনে হইল শুধু চণ্ডী বলিলেই হইত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী কেন বারবার বলিতেছেন। আমার সেই সংশয় ৭।৮ মাস পরে শ্রীবাম অপনোদন করেন। আমি একখানি 'রুদ্র চণ্ডী পাইলাম। তৎপূর্ব্বে রুদ্রজামলের অন্তর্গত যে রুদ্র চণ্ডী আছে জানিতাম না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীই একমাত্র চণ্ডী এই আমার

চণ্ডী বাহুল্য

ধারণা ছিল। রুদ্র চণ্ডী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম যে কৃষ্ণ চণ্ডী নামেও আর একখানি চণ্ডী আছে। উভয় চণ্ডী সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে।

রুদ্রেণারাধিতা চণ্ডী মহাসিদ্ধিপ্রদা ভবেৎ।
রুদ্ররূপা রুদ্রভাবা রুদ্রভুয়া সদাস্থিতা॥
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্রগেয়া রুদ্রবল্লভা।
সর্ব্বদা বরদাদেবী ব্রহ্মজ্ঞান প্রদায়িনী॥
সর্ব্বপাপহরা দেবী সর্ব্বরোগক্ষয়ঙ্করী।
সর্ব্বারিষ্টিশান্তিদাত্রী, সর্ব্বগ্রহনিবারিণী
শিবং দেহি শুভং দেহি সুখং দেহি শিবপ্রিয়ে।
রুদ্র চণ্ডী তুষ্টিং পুষ্টিং জয়ারোগ্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্॥
অকালে ম্রিয়তে বাপি কালমৃত্যুর্যদা ভবেৎ।
চণ্ডীস্মরণমাত্রেন মৃত্যোর্মৃত্যুকরং পরং॥
জ্ঞাত্বা দেবগণাঃ সর্ব্বে রুদ্রচণ্ডীতি সংজগুঃ।
রুদ্রচণ্ডী তদাখ্যাতা ত্রৈলোক্য পরমেশ্বরী॥
রুদ্রো ভবেন্মহারুদ্রশ্চণ্ডীপাঠ প্রসাদতঃ।
তদা পাপঃ প্রদাতব্যঃ স্বীয় সিদ্ধির্যদা শিবে॥
কৃষ্ণেণারাধিতা চণ্ডী কৃষ্ণচণ্ডী সুসিদ্ধিদা।
কৃষ্ণনামধরাদেবী সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥

রুদ্র কর্ত্তৃক আরাধিতা রুদ্র চণ্ডী মহাসিদ্ধিদায়িনী। সেই চণ্ডীই রুদ্ররূপা-রুদ্রভাবা, রুদ্রময়ী, (অর্থাৎ নামনামীর স্বারূপ্য)। রুদ্র ঐ চণ্ডীই ধ্যান করেন ও গান করেন। উহাই রুদ্রাণী। উহাই রুদ্রের প্রিয়া। উহাই সর্ব্বফলদায়িনী, বরদাত্রী, দেবী (জ্ঞানালোকময়ী), এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান-দায়িনী, উহাই সর্ব্বপাপহারিণী, ঈশ্বরী, সর্ব্বরোগনাশিনী, সর্ব্বাপচ্ছান্তিকারী, সর্ব্বগ্রহোৎপাতনিবারিণী। হে শিবপ্রিয়ে, রুদ্রচণ্ডি! তুমি আমাদের কল্যাণ দাও, শুভ দাও, সুখ দাও, তুমি আমাদের তুষ্টি পুষ্টি, জয়, আরোগ্য পরম মঙ্গল দাও। অকাল মৃত্যু বা কাল মৃত্যু ঘটুক। এই চণ্ডী স্মরণ মাত্র সাধক মৃত্যুর মৃত্যু ঘটাইতে পারেন। দেবগণ ইহার এই সকল গুণ জানিয়াই ইহাকে রুদ্র চণ্ডী বলিয়া উল্লেখ করেন। তদবধি ত্রৈলোক্য এই পরমেশ্বরী

অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী বিদ্যা রুদ্র চণ্ডী নামে খ্যাত হন। এই রুদ্র চণ্ডী পাঠের প্রসাদে রুদ্র রুদ্রত্ব পাইয়াছেন।

এই কৃষ্ণকর্তৃক আরাধিতা কৃষ্ণ চণ্ডী সুসিদ্ধিদা। তিনি কৃষ্ণনামধারিণী। সর্ব্বতন্ত্রে তিনি অত্যন্ত গুপ্তা। যথার্থই কৃষ্ণ চণ্ডী সর্ব্বতন্ত্রে সুগোপিতা। সেই

কৃষ্ণ চণ্ডী

চণ্ডীর সন্ধান অধম এখনও পায় নাই। আমার স্থির বিশ্বাস যে যখন শ্রীরাম 'চণ্ডীপড়া বাবা' নামকরণচ্ছলে চণ্ডীপাঠশক্তি দিয়াছেন ও চণ্ডীতত্ত্ব ক্রমশঃ বুঝাইতেছেন তখন কৃষ্ণ চণ্ডী মিলাইবেন ও সকল চণ্ডীর অধিকার দিবেন।

১৭। শ্যামায় শ্যাম

আজ উল্টা রথ। শুনিলাম রথযাত্রাদি শ্যামের পর্ব্ব তারাপীঠে শ্যামায় করা হয়। শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ পরিহার জন্য এই অভেদ উপাসনা বহুদিন এখানে প্রচলিত। শ্রীগুরুর কৃপায় ইহার তত্ত্ব এইরূপ পরে হৃদয়ে প্রকটিত।

যথার্থ সাধক জানেন যে—

অভেদোপাসনা

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল নানাপথজুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।

হে ভগবান্, তোমাকে পাইবার জন্য বেদ, সাংখ্য, যোগ, আগম, নিগম, বৈষ্ণবতন্ত্রাদিতে বিভিন্ন পথ নির্দ্দিষ্ট। কেহ ইহাকে, কেহ বা উহাকে হিতকর বিবেচনা করে। রুচি ভেদে মানব সরল কুটিল নানাপথে যাইতেছে বটে কিন্তু সাগর যেমন সকল স্রোতের, তুমি তেমনই সকল পন্থীর একমাত্র গন্তব্য স্থান।

সকল পথই আবার ঋজু। কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্ম, জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞান,

সকলপথই সরল

ভক্তের পক্ষে ভক্তি, যোগীর পক্ষে যোগ, সহজ ও সরল সাধনাই মহাপুরুষগণের দয়ার নিদর্শন। সকলেরই উদ্দেশ্য পরিচ্ছিন্নভাব হইতে মহাভাব প্রাপ্তি। বিষয়জ ক্ষণিকানন্দ

হইতে নিত্য জ্ঞানানন্দের অনুভূতি, ক্ষুদ্র প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেমাস্বাদন। জীবের রুচি বৈচিত্র্যে সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, ভাবাভাবময়ী সাধনা, পরম পুরুষার্থলাভের দ্বার মাত্র।

প্রথম অবস্থায় মনের গঠন ও গতি অনুযায়ী কোন বিশিষ্ট সাধনাই অবলম্বনীয় এবং মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এইরূপ একাগ্রতা আবশ্যক। তাই গীতাদিতে উক্ত হইয়াছে যে সাধন প্রণালী হঠাৎ পরিবর্তন করিতে নাই।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

নিজের ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরের ধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। একথা গোঁড়ামি নয়। আমি যে সমাজে যে কুলে যে প্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছি, আজন্ম আমার যে প্রবৃত্তি শিক্ষা দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে যাইলে একূল ওকূল দুকূল নষ্ট হয়।

প্রথম সোপানে স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ

ভগবান্‌কে দুর্গাকালী, হরিহর, সীতারাম, রাধাশ্যাম, তারারাম, আল্লা গড প্রভৃতি যে নামেই ডাক না কেন, ডাক সেই একস্থানে পৌঁছে। যদি সমাজ বা শৈশবাভ্যাস বশতঃ তাঁহাকে 'তারা' বলিতে শিখিয়া থাক কেন হঠাৎ তাঁহার নাম পরিবর্তন করিবে? তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি আছে।

কিন্তু সাধন পথে অগ্রসর হইলে, সকল সাধনার উদ্দেশ্য এক অনুভব করিলে পরিপূর্ণতার জন্য অর্থাৎ সকল ভাবের আস্বাদন ও পরিপুষ্টির দ্বারা মহাভাবের উদ্দীপন জন্য একভাবের সাধক অন্যভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। এরূপ সাধনা বিনিময়েও সাধক নিজস্বটুকু বজায় রাখেন। তখন ভক্তচূড়ামণি শ্রীমহাবীরের ভাব আসে—

ভাব বিনিময়

অভেদে জানকীনাথে শ্রীনাথে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

সত্য বটে জানকীনাথ, শ্রীনাথ ও পরমাত্মা সবই এক তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব। ক্ষ্যাপা বাবা চুট্‌কি কথায় এই তত্ত্ব বলিয়াছেন, "যে যার সে তার।" জীবের যে ভাব এবং যে রূপ তাহার হৃদয়ে স্তরে স্তরে গাঁথা সে রূপ তাহার নিজস্ব ধন।

যে যার সে তার

অন্যরূপ ও অন্যভাবকে সেইরূপ সেইভাবের সহিত এক করিবার জন্য তাহার সাধন আবশ্যক বটে ও তাহাই করিতে হইবে বটে তবে সেই সাধনে নিজরূপ ও নিজভাব প্রতিফলিত হইবে। তাই শ্যামাসাধক শ্যামাকেই শ্যাম সাজাইয়া গাহিয়াছেন—

কালী হলি মা রাসবিহারী
(নটবরবেশে বৃন্দাবনে)

তাই শ্যামাসাধক আয়ান শ্যামেও শ্যামাদর্শন করিয়া কুটিলাকে বলিয়াছেন—

কইলো কুটিলে কুটিল কালা, এযে কালী কপালিনী।

আবার শ্যামগতপ্রাণা রাধা শ্যামাপূজা করিতে গিয়া শ্যামায় শ্যামরূপ ভিন্ন অন্যরূপ দেখিতে না পাইয়া সখীকে প্রাণের কথা জানাইয়াছেন—

ধরম করম সকলি গেললো শ্যামাপূজা আমার হলো না
মন নিবারিতে নারি কোনমতে ছিছি একি বিড়ম্বনা ॥
ভাবি মুণ্ডমালী ভীমা অসি করে
হেরি বনমালি মুরলী অধরে
ত্রিভঙ্গিম ঠামে বঙ্কিম নয়নে
হেরি হই সখি বিমনা।
দিতে পুষ্পাঞ্জলি মায়েরি চরণে
সে বঙ্কিম ঠামে সদা পড়ে মনে
পীতবসনে বঙ্কিম নয়নে
মা আমারে করে ছলনা ॥

১৮। গৌরাঙ্গরূপ

নৃত্যন্ রথাগ্রে হরিনাম গায়ন্
মত্তঃ স বামো মদয়ন্ চ সর্ব্বান্।
প্রেমাশ্রু পূরাপ্লুত দেহভারঃ
গৌরাঙ্গরূপং প্রকটীচকার ॥

রথ সম্মুখে নৃত্য করিয়া হরিনাম গাহিয়া সেই ক্ষ্যাপা বাম সকলকে ক্ষ্যাপাইয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহে দেহ আপ্লুত হওয়ায় গৌরাঙ্গরূপ প্রকাশ করিলেন।

তারামার একখানি রথ আছে। উভয়বিধ রথযাত্রায় মা'র শিলাময়ী মূর্ত্তির প্রতিনিধিকে শৃঙ্গার বেশে রথে উঠাইয়া মন্দির হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত ও তথা হইতে মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। আজ

উল্টা রথ

উল্টা রথোপলক্ষে অপরাহ্নে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির লোক জুটিয়াছে। দেখিলাম পাঁপরভাজা ও মণিহারী প্রভৃতির দুই তিনখানি দোকান খোলা হইয়াছে। বেলা ৫টার মধ্যে নীরব তারাপীঠ লোকের কোলাহলে মুখরিত। বাবার আশ্রমের সম্মুখে লোকের ভিড়। তিনি তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব। তাঁহাকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে অনেকে আসিয়াছেন। তাঁহার পদধূলি পাইয়া মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এই আশায় তাঁহাদের আসা। আমি বাবার সঙ্গে আশ্রমে গিয়াছি। নীরবে সব দেখিতেছি ও কি ভাবিতেছি। তারামা'র

রথে তারামা

রথখানি সাজান। 'শিলাময়ী মূর্ত্তির প্রতীক লাল শালুতে ঘেরিয়া মাটীর চারিহাতে বসাইয়া, গলায় রূপার মুণ্ডমাল দোলাইয়া রথে তোলা হইল। লোকে রথের দড়ি ধরিতে ব্যস্ত। "জয়তারা" "জয়তারা" ধ্বনি হইতেছে। পাণ্ডাদের হরিসঙ্কীর্ত্তনের দলও আজ হরির পর্ব্বে বাহির হইয়াছে। ন্যাড়া পাণ্ডাই দলের মূল গায়েন। ভিন্ন গ্রাম হইতেও খোল করতাল লইয়া আরও একদল কীর্ত্তন আসিয়াছে "জয়তারা" ও "হরিবোল" রবের অপূর্ব্ব সম্মিলন শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নত্ব জাগাইতেছে।

রথ টানা আরম্ভ হইল। আশ্রমে কোলাহল উঠিল "মা আসিতেছেন।" বাবার প্রেমসাগর উদ্বেলিত। হৃদয়ের ভাব আকৃতিতে প্রকটিত। মুখমণ্ডলে সহজেই দিব্যজ্যোতিঃ আরও বিকশিত।

প্রেমসাগর উদ্বেলিত

কি প্রেমচ্ছবি সর্ব্বশরীরে ফুটিয়াছে! তারামাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইয়া নয়ন যেন বিস্ফারিত। "ঐ মা" বলিয়া তিনি আসন হইতে উঠিলেন এবং বালক যেমন মার কোলে ছুটিয়া যায় সেইরূপ মন্দিরের দিকে মা'র রথপানে ছুটিলেন। যাঁহারা আশ্রমে ছিলেন তাঁহারা এবং

আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবাক্ হইয়া বাবার পশ্চাৎ চলিলাম। লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। জ্যোৎকুণ্ডের ঘাটের নিকট তারামার রথ আসিয়াছে। সংকীর্ত্তনের দুইটী দল রথের সম্মুখে গাহিতেছে। বাবা গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাবাকে পাইয়া তাঁহারা উল্লসিত। তাঁহারা এক এক কলি গা হতেছেন, বাবা আখর দিতেছেন, "হরি বলে গৌউর নাচে।"

সংকীর্ত্তন

গৌর নাচে প্রেমে ঢলে নাচে
প্রেমে টলমল গোরা নাচে।
মুখে হরিবোল বলে।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল রে ॥

আজ তারা প্রেমে ক্ষিপ্ত রাম, হরি প্রেমে ক্ষিপ্ত। প্রেম যে এক। তারা, হরি প্রভৃতি নামরূপ প্রেমের উপাধি মাত্র। প্রেমময় রামের চক্ষে উপাধি ভেদ নাই। তাঁহার নামে সাধা হৃদয়বীণা এই হরিনামে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাই ক্ষ্যাপা হরি বলিয়া নাচিতেছেন সকলকে ক্ষ্যাপাইতেছেন। কীর্ত্তনীয়ারা গাহিতেছেন হরিবোল। খোল বাজিতেছে হরিবোল। সহস্র-কণ্ঠে ধ্বনি উঠিতেছে হরিবোল। প্রতিধ্বনিও করিতেছে হরিবোল। জলস্থল দিঙমণ্ডলে হরিবোল। আমার কাণে ঐ ঝঙ্কার অনির্ব্বচনীয় মধুময় লাগিল। যেন—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
বায়ু মধুময়, সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে
আকাশ মধুময় পৃথিবীর ধূলিকণাও মধুময়ী।

প্রেমের কি আকর্ষণ! এ পাষণ্ডও স্থির থাকিতে পারিল না। হরিবোল আবর্ত্তে পড়িল। বোবার মুখ ফুটিল, প্রথমে মৃদুস্বরে পরে উচ্চকণ্ঠে হরিবোল বলিতে লাগিল। বাবা তারামা'র রথ বেড়িয়া আত্মহারা হয়ে হরিবোল হরিবোল বলিয়া নাচিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কীর্ত্তনীয়ারাও রথ বেড়িয়া নাচিতেছেন। রামের প্রেমানন্দে সকলেই বশী। রামের প্রেমোন্মাদে সকলে উন্মত্ত।

তখন রাম আমাকে গৌরলীলা দেখান নাই। মহাপ্রভুর রথাগ্র নৃত্যবর্ণনা না দেখিলেও রামের দশা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল—

গৌরাঙ্গভাব

চোখে দরদর ধারা হরিপ্রেমে মাতোয়ারা
দেখাইতে গৌরলীলা বাম কি হয়েছে গোরা।

দাসঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ খেদ করিয়াছেন যে তাঁহারা হতভাগ্য যে শ্রীগৌরের সময় জন্মান নাই, তাই তাঁহার মধুরলীলা দর্শনে নয়ন সফল করিতে পারেন নাই। এ দাসের সে ক্ষোভ আর নাই। আমি সাক্ষাৎ গোরা সেদিন দেখিয়াছি। এই গৌরাঙ্গভাব প্রকটনের মর্ম্মও পরে বাম হৃদয়ে স্ফুরিত করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্মময়। শাক্ত বৈষ্ণবাদি প্রস্থানভেদে শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ। তাহা প্রকৃত সাধনার বিরোধী। পাঁচে এক, একে পাঁচ, না হইলে যথার্থ সাধন নহে, এই বুঝাইবার জন্য বাম শাক্তভক্তের নিকট বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণব ভক্তের নিকট শাক্তভাব কখনও কখনও

তাঁহার মর্ম্ম

ধারণ করিতেন। ময়ূরভঞ্জের ডেপুটী অবিনাশচন্দ্র রায় দাদা বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। তিনি যখন বামের নিকট প্রথম আসেন, তখন তাঁহার একদেশিতা ঘুচাইতে বাম তাঁহাকে তারাভাব দেখান। আমরা শাক্ত ঘরের ছেলে। বাল্যকালে হরিকে আমার ভাল লাগিত। উভয় ভাবই গ্রাহ্য। ইহার জন্যই তারাপীঠে বাবা আমাকে শ্যামার শ্যাম পর্ব্বে নিজে গোরা সাজিয়া তারা গোরার সমন্বয় দেখাইলেন।

১৯। আরত্রিক

বাম ঐরূপে হরি প্রেমে সহস্রাধিক দর্শককে ভাসাইয়া রথের সহিত নাচিতে নাচিতে চলিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। আমার ন্যায় পাষণ্ডেরও বাম ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই। সুতরাং কতক্ষণ নৃত্য হইল, কোন পথ দিয়া রথ টানা হইল আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। যখন বাবা তারা মন্দিরে খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন তখন আমার জ্ঞান আসিল। রথ অতদূর সঙ্গে আসে নাই। তাহা মন্দিরের পশ্চাতে পথে রাখা হইয়াছে।

মন্দিরে

বাবার সঙ্গে গায়কগণ ও কতিপয় লোক। বাবা তখনও নাচিতেছেন ও মুখে বলিতেছেন হরিবোল। কীর্ত্তনীয়ারাও বাজাইতেছেন ও হরিবোলের রোল তুলিতেছেন। বাবার

জুড়্কি পায়ের নৃত্য কি সুন্দর। ঐ মুদ্রা কি এখনও সন্ধান পাই নাই। বাবা তখন প্রেমে উন্মত্ত। আঙ্গিনায় পড়িয়া তারামার মন্দিরের সম্মুখে উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের দলও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে ও গাহিতেছে। মন্দিরের আঙ্গিনা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। সকলেই হরিবোল বলিতেছে, নাচিতেছে। আমিও সেই আবর্ত্তে ঘূর্ণিত।

শ্রাবণের দীর্ঘ দিনও গত। ধীরে ধীরে সান্ধ্যছায়া আসিয়া ধরার মুখ ঢাকিয়াছে। আকাশে তারকা বধূগণ মর্ত্ত্যে তারাপীঠের মন্দির প্রাঙ্গণে দিব্যলীলা দেখিবার জন্য একে একে দেখা দিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে। মন্দিরে দীপাবলী দেওয়া হইল। কীর্ত্তনীয়ারা ক্লান্ত হইয়াছেন। বামের ক্লান্তি নাই। তিনি "হরিবোলে গৌর নাচে" বলিয়া নাচিতেছেন। একদল কীর্ত্তনীয়া বিশ্রামে বসিল, অপর দল বাবার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। সে দল ক্লান্ত হইল, অপর দল উঠিল। তথাপি বাবার বিরাম নাই। তখন কতক পাণ্ডা আসিয়া কীর্ত্তনীয়ার প্রধান ফুটু পাণ্ডাকে দোষ দিতে লাগিলেন। ক্ষ্যাপাকে কেন ক্ষ্যাপাইলে? এখন সামলায় কে? ফুটু আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কতক পাণ্ডা গিয়া বাবার পা জড়াইয়া ধরিলেন। ভক্ত বৎসল বাম তখন থামিলেন।

সন্ধ্যা

তারামার মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। কাঁসরের ঢং ঢং শব্দ মন্দির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাহিরে ছাপাইয়া পড়িল। "জয়তারা" রব উঠিল। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপাদি তারাশীলার দিকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সকলে জোড়হাতে মন্দির প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান। যাহার যাহা হৃদয়ের বাসনা তাহা-মাকে জানাইতেছে। ক্ষ্যাপা মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িয়াছেন। প্রেমে ঢল ঢল নির্ব্বাক্। নীরব ভাষায় মায়ে পোয়ে কি কথা হইতেছে তাহা তাঁহারাই জানেন। আমি মাতৃশোক ভুলিয়াছি। আমার মনে আনন্দের ভর ভর ভাব। আরতি শেষ হইল। সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। পুরোহিত মহাশয় মার প্রসাদ লইয়া বাহিরে আসিলে সকলে তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমিও কণিকা পাইলাম। দুই একটি তারা সঙ্গীত হইয়া জনতা ভঙ্গ লইল।

আরতি

২০। শ্রীপদসেবা

বাবা আশ্রমে ফিরিলেন। সঙ্গে এ দাস ও অপর জন কয়েক। মা'র বৈকালিক হইতে বাবার নিত্য বন্ধানি আটার কয়েকখানি লুচি ও একটু দুধ আশ্রমে আসিল। বাবা প্রসাদ লইলেন। তিনি খাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার সহচর সারমেয়গণ আনন্দে ছুটিয়া আসিল। তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রকন্যাবোধে প্রসাদ বাঁটিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই এই অধম ভিন্ন সকলেই চলিয়া গেলেন। এই নির্মক্ষিকতার কারণ পরেই বুঝিলাম। বাবা দাওয়াতে শয়ন করিলেন। দক্ষিণদিকে মাথা, উত্তরদিকে পা। আমাকে ইঙ্গিত করিলেন "পা বাজিতেছে"। শুনিয়াছিলাম বাবা সহজে শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে দেন না। স্পর্শ করিতে গেলে ধমক দেন, এমন কি কখনও চিমটা লইয়া তাড়াও করেন। সেই ভয়ে আমি পা ছুঁইতে যাই নাই। প্রথম মিলনে আত্মহারা হইয়া শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়াছিলাম। তারপর সমস্ত দিনে যতবার দেখা যাইতেছে আমি সম্পূর্ণ আমিত্ব হারাই নাই। সেই কারণ পদস্পর্শ করিতে সাহস হয় নাই। অথচ মনে মনে পদসেবার ইচ্ছা ছিল। বাম বাঞ্ছা কল্পতরু। সদ্বাসনা কেন অপূর্ণ রাখিবেন? তাই আমাকে পদসেবার অবসর দিলেন। আমি উঠিয়া অতি সঙ্কোচে বাবার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পদতলে দক্ষিণ মুখে বসিলাম। বাবা প্রথমে দক্ষিণ পরে বাম চরণ এ পাপীর কোলে তুলিয়া দিলেন।

আশ্রমে

সেবা অবসর

আমি দক্ষিণ হস্তে পাখা লইয়া বাবাকে বাতাস করিতেছি ও বাম হস্ত শ্রীচরণে বুলাইতেছি। সে চরণ-কমল কি কোমল। কস্মিন্‌কালে বিনামা ব্যবহার করেন নাই। অথচ পদতল এত সুকুমার। মনে মনে অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছি। বাবা যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নাসারন্ধ্র ধ্বনি হইতেছে। পরে বুঝিলাম উহা নিদ্রা নয়, সুষুপ্তি নয়, যোগনিদ্রা যাহা শ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত। তখন ঐ চরণের মহিমা কিছুই বুঝি নাই। এখন তাঁহার কৃপায় কিছু কিছু বুঝিতেছি। যখনই মনে ঐ ছবি উঠে তখনই সব রোগ শোক তাপ জ্বালা কোথায় আনন্দ সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যায়। এখন কতক

পদসেবা

অনুভব হইতেছে যে ঐ চরণই "সাধনার ধন হৃদয় রতন ভক্ত প্রাণে পরশমণি", ও মণির পরশ যদি পায় লৌহময় দেহ সোণা হয়ে যায়—

চরণ মাহাত্ম্য

ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য চরণে লুটায়

ঐ অবস্থায় কতক্ষণ কাটিল জ্ঞান নাই অনুমানিক অর্দ্ধঘণ্টা। তখন হৃদয়ে কোন চিন্তা ছিল না। সংসার তো ডুবিয়া গিয়াছে। সেই বাসনাশূন্য তারা-বামাবতার বামের শ্রীচরণ মাহাত্ম্যে সর্ব্ববিধ কামনা আমার হৃদয় ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়াছে। কি এক শূন্য ভাব আসিয়াছে। আনন্দ প্রবাহ খরতর বহিতেছে। ইহাই বুদ্ধদেবের অমৃত প্রাপ্তি। হঠাৎ নিরাশা কুহকে বাসনাক্ষয়ে এই অমৃতরাশি তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জীবকে ডাকিলেন—"আয় কামবিষে জর্জ্জরিত জীব আয় তোকে এই অমৃত দিই। বাসনা ক্ষয় কর তবে এই অমৃত পাইবি।" তারাপীঠের এই আনন্দময় শূন্যভাব তখন আমি বুঝি নাই। বাবা বুঝাইবার জন্য পরে "তারামা আকাশ" আমাকে বলিয়াছিলেন। তাহাতেও অবোধের বোধ আসে নাই। বাবার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। মধুরস্বরে বলিলেন, "মহাপুরুষ বাবা, মহাপুরুষ। কি দিব্য বাতাস করিয়াছ। আমাকে কাঁপাইয়া দিয়াছ।"

সমাধি ভঙ্গ

আমার ন্যায় নারকীকে তিনি এইরূপ সম্বোধন করায় আমি আমার জীবনের দুষ্কর্ম স্মরণে লজ্জিত হইলাম। কিছু বলিতে পারিলাম না। এখন বুঝিতেছি সে চরণ স্পর্শে আমার এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটিয়াছিল। বাবা পাপজন্ম ঘুচাইয়া দিব্যজন্ম দিয়াছিলেন। তাই সত্যবাক্ মহাপুরুষ এইরূপ বলিলেন। নচেৎ তাদৃশ ত্যাগাবতার কখন তোষামোদের মিথ্যা মুখরোচক বাণী প্রচার করিতে পারেন না। তাঁহাদের বাক্যও কখন বৃথা হইতে পারে না।

লৌকিকানাং হি সাধুনাং বাক্ অর্থমনুবর্ত্ততে।
ঋষীনাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥

লৌকিক সাধুগণের বাক্য অর্থকে অনুসরণ করে কিন্তু আদিভূত ঋষিগণের বাক্যকেই অর্থ অনুসরণ করিয়া থাকে। সামাজিক সজ্জনগণের

বাক্যে আসক্তি যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তাঁহারা যদি অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র বলেন তাহা নিষ্ফল হইবে। কিন্তু শ্রীরামাদির ন্যায় সনাতন তত্ত্বজ্ঞানীগণ যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে। শ্রীচরণের মহিমা সম্বন্ধে বাবা পরে এহৃদয়ে এই উচ্ছ্বাস দিয়াছেন।

কি মধু রেখেছে নাথ ও চরণ কমলে।
মনোভৃঙ্গ মেতে উঠে কেন পদ স্মরিলে
নিখিল মুরতিখানি অনন্ত অমিয়খনি
মন কিন্তু মজে না'ক পদ না পাইলে।
শুনি তার ঘুচে তৃষ্ণা মিটে তার সব আশা
যে মজেছে একবার ওই পদ শতদলে।
শুনি কত যোগীবর পিয়ে মধু নিরন্তর
সুখ দুখ ছাড়ি ভাসে চিদানন্দ হিল্লোলে।
সৌরভে আকুল কর কেন আর ঘুরায়ে মার
দাও শ্রীচরণে ঠাঁই এচরণে পাগলে।

২১। সদালাপ

বাবা জাগিবার অল্পক্ষণ পরেই একজন পাণ্ডা আসিলেন। বুঝি বাবার তামাক খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিছু বলিতে হইল না, পাণ্ডা আসিয়াই তামাক সাজিয়া বাবাকে দিলেন। বাবা টানিতেছেন।

লোক সমাগম

এক আধটা কথা হইতেছে। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ফণিবাবু আশ্রমে জুটিলেন। বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুরদেরই কথা চলিতেছে। তিনজনেই কথোপকথনে যোগ দিয়াছেন। আমি বোবা হইয়া শুনিতেছি। ফণিবাবু গায়ক নহেন কিন্তু তাঁহার ভক্তি সঙ্গীত সংগ্রহ অসাধারণ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র, দাশরথি, নবাই, নীলাম্বর, অকিঞ্চন প্রভৃতি সাধকের শত শত দুর্লভ গীত তাঁহার কণ্ঠস্থ।

তিনি বর্দ্ধমান জেলার মূল গ্রামের চৌধুরী। অধিকাংশ শক্তি-সাধকই বর্দ্ধমানের বলিয়া তাঁহার একটী বিশেষ গর্ব্ব আছে। ফণাবাবুর মুখে শুনিলাম যে কমলাকান্ত একবার গাঁয়ের ওড় ডাঙ্গার মাঠে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। ডাকাতেরা তাঁহাকে চিনিত না। কমলাকান্ত নিজ পরিচয় দিলেন। তাহারা বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলিল তুমি কমলাকান্ত হইলে এখনি একটি মা'র গান বাঁধিয়া গাও। ভক্ত কমলাকান্ত মাকে ডাকিলেন—

কমলাকান্তের কথা

আর কিছু ধন নাই মা শ্যামা কেবল দুটি চরণ রাঙা,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি শুনে হলাম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত-দারা সুখের সময় সবাই তারা
বিপৎকালে কেউ কোথাও নাই ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা
নিজ গুণে যদি রাখ করুণা নয়নে দেখ,
(নইলে) জপ ক'রে যে তোমায় পাওয়া সে সব কেবল
ভূতের বোঝা
কমলাকান্তেরই কথা মাকে বলি মনের ব্যথা
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা জপের ঘরে রহিল টাঙ্গা।

এই প্রাণের ডাক মায়ের প্রাণে লাগিল। ডাকাতদের মন তিনি গলাইয়া দিলেন। ডাকাতেরা ভৃত্যের ন্যায় কমলাকান্তকে বর্দ্ধমানে কোটলহাটে তাঁহার আসনে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বাবা গান শুনিয়া প্রেমে ঢল ঢল।

কমলাকান্ত প্রসঙ্গে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতপচাঁদের তারারূপের গীত ফণীবাবু আওড়াইলেন।

মহাতপচাঁদের গীত

এ শশী কে নীলবরণা
মুণ্ডমালা বিভূষণা।
শঙ্করের হৃদি স্থিতা প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণা।
চতুর্ভুজা রমণী একত্রে কৃপাণ পাণি
নীলোৎপল কপালে ধারিণী ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা
লম্বোদরী খর্ব্বকায়া লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা
পিঙ্গল জটাধরা ফণি শিরে ধরে ফণা।

নিবেদন ভবধারা চন্দ্র তত্বজ্ঞান হারা।
কৃপা করি ও মা তারা ঘুচাও এ ভব যন্ত্রণা।

তারাই বামের সব। তাঁহার রূপবর্ণনায় আর কি বামের বাহ্য জ্ঞান থাকিতে পারে? একে সদাই সমাধিযুক্ত। সময়ে সময়ে যৎকিঞ্চিৎ দেহাধ্যাস আসিত। তাহার উপর তাঁহাব ধ্যান জ্ঞান গতি মুক্তি তারার নাম। বাবা একেবারে স্তম্ভিত। ফণিবাবুরও পাণ্ডার ডাকে উত্তর নাই।

বাহ্য শূন্য

২২। ভক্তবৎসল

কথাবার্ত্তা হইতেছে। নন্দ পাটনি আশ্রমে আসিল। নন্দ জাতিতে ডোম। দারকায় বন্যার সময় ঘাটে পাটনির কাজ করে। আর শ্মশানে শেষ ক্রিয়ার সে বন্ধু। শ্মশান নরাস্থিতে পূর্ণ। বৎসর বৎসর বন্যায় ধুইয়া যায় বলিয়া শশানে পা বাড়ান যায়। নচেৎ তাহা সম্ভব হইত না। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে নন্দর পায়ের তলায় একটা মড়ার হাড় ফুটিয়া পা বিষাক্ত হয়। নন্দর দীন হীন অবস্থা। অতিকষ্টে সংসার চলে। যাত্রীর নিকট বক্‌সিস্‌টা আসটা যাহা পায় তাহার অধিকাংশ "কারণে" খরচ হয়। তারাপীঠে কারণের খুব ধুম। সুতরাং নন্দ কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করাইতে পারিল না। ক্রমে পা পাকিল। সমস্ত দেহের শোণিত দূষিত হইয়া মহাব্যাধিতে পরিণত। গলিত কুষ্ঠের প্রকোপে গায়ে ঘা ফুটিল। পায়ের আঙ্গুল এমন কি হাতের আঙ্গুলগুলির প্রথম পর্ব্ব খসিয়া পড়িল। রোগ চিকিৎসার অতীত হইল। জীবনের আশা নাই। তখন নন্দ বামের শরণাপন্ন হইল। পূর্ব্ব হইতেই সে বামের সেবা করিত। বামকে ভক্তিও দেখাইত। কিন্তু কায়মনবাক্যে শরণ লয় নাই। চাবুক না খাইলে ঘোড়া সোজা হয় না। দুর্ব্বৃত্ত মানুষও রোগ শোকাদিগ্রস্ত না হইলে তারা মার দিকে ফিরে না। নন্দ পীড়ার ধমকে বামের সেবায় দেহার্পণ করিতে প্রয়াসী হইল। আর কি বামের দয়া না হইয়া থাকিতে পারে! তিনি নন্দকে

নন্দ

মহাব্যাধি

পদধূলি লইতে দিলেন। কি আশ্চর্য্য! নন্দর মহাব্যাধি সেই দিন হইতে কমিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গে ঘা শুকাইয়া আসিল। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের যে পর্য্যন্ত খসিয়াছিল তাহা ছাড়া বাকী রহিয়া গেল। অচিরে নন্দ ব্যাধি মুক্ত হইল। তদবধি নন্দ বাবাকে শ্মশানভৈরব জ্ঞান করিত।

প্রতীকা।

বাবার উপর নন্দের অচলা ভক্তি। অবসর পাইলেই বাবার নিকট আসিত। বাবার আশ্রমের কাজ করিত। মধ্যে মধ্যে রাত্রে বাবার সেবার জন্য শুইয়াও থাকিত। বাবার বালক ভাব। তারা ধ্যানে তন্ময়। রাত্রে হয়ত শয্যায় প্রস্রাব করিয়াছেন এবং প্রস্রাবে বালকের ন্যায় ভাসিতেছেন। নন্দ প্রাতে সেই শয্যা জ্যোৎকুণ্ডুতে কাচিয়া শুকাইত। শুশ্রূষার স্থুল ফলও নন্দ পাইত। বাবার ভক্ত ও যাত্রিগণ নন্দকে কিছু কিছু দিত। বাবার প্রণামী হইতেও সেবক পাণ্ডারা মাঝে মাঝে বেতনও দিতেন। নন্দ কুষ্ঠগ্রস্ত হওয়ার পরে লোকে তাহাকে নন্দা কুটে বলিত। বাবা তাহাকে আদর করিয়া "নন্দা কুড়ে" বলিতেন। নন্দর উপর বাম বড়ই প্রসন্ন ছিলেন। তাহাকে স্বেচ্ছায় উচ্ছিষ্ট দিতেন। নন্দ কারণ প্রসাদ মুখে না চাহিলেও পাইত। নন্দর শত অপরাধ বাবার নিকট মার্জ্জনীয়। যদি নন্দ প্রাতঃকালে আশ্রমের কাজ করিতে বিলম্বে আসিত এবং তজ্জন্য বাবার সেবক পাণ্ডা নন্দকে দুই চারি কথা বলিতেন, বাবা বাধা দিয়া বলিতেন "বেটার দুটো মাগ কি করে সকালে আসে?" নন্দ কাজে অবহেলা করিলে পাণ্ডারা বাবাকে তদ্বিষয় গোচর করিতেন ও ছাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু বাবা বলিতেন "তোমরা ওকে জবাব দিতে পার বাবা"। যদি পাণ্ডারা বলিতেন "আপনার ভৃত্য আপনি জবাব দিন"। বাবা তাহাতে উত্তর করিতেন "সে আমার জবাব লইবে না।" কি ভৃত্য-বৎসল! কি সরলতা!

আদর্শ প্রভু

নন্দকে এত ভালবাসিতেন যে নন্দ জল আনিয়া দিলে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে যদি কেহ কখনও সামাজিক প্রথানুসারে আপত্তি করিত, বাবা বলিতেন, "জল তো বাবা জ্যোৎকুণ্ডের, নন্দর নয়"। আবার নন্দ কুষ্ঠাক্রান্ত পদ জ্যোৎকুণ্ডে ধুইত বলিয়া বাবা কখনও কখনও জ্যোৎকুণ্ডকে বলিতেন "নন্দর চরণোদক'।

নন্দর কি সৌভাগ্য! সাক্ষাৎ রামরূপী বামকে আজীবন দেখিয়াছে, সেবা করিয়াছে। রোগের প্রকোপে তাহাকে বাম জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছে। আমাদের জনৈক গুরুদাদা বলেন "নন্দ বাবার উত্তর সাধক"। বাবার দেহান্তের অল্পকাল মধ্যেই নন্দেরও দেহান্ত হয়। এ জীবন বামের সেবায় অর্পণ করিয়াছিল পর জীবনও তাই করিল।

২৩। প্রার্থনা পূরণ

নন্দ আসিবার পর নুটুপাণ্ডা আমাদিগকে ডাকিতে আসিলেন। রাত্রি প্রায় দশটা হইয়াছে। শ্রাবণের আকাশ মেঘে ঘেরা। কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্রামের প্রান্তভাগে শ্মশানের উপর ফাঁকা দাওয়ায় আমরা বসিয়া আছি। শ্মশানে শব লইয়া শৃগাল কুকুরের কলহসূচক কলরব মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে। শ্রীবামের অনুভাবে আমাদের হৃদয়ে ভয়াদি পার্থিব ক্ষুদ্রভাব তিরোহিত। কি এক শূন্যভাব। কেবল মাঝে মাঝে গর্ভধারিণীর পুনরুজ্জীবনাশা মনে জাগিতেছে ও লীন হইতেছে। সে কথা বিরলে পাইয়াও মুখে বামকে বলিতে পারি নাই। এত লোকের সমক্ষে কি করিয়া বলিব?

পাণ্ডা গৃহে

ঐ শ্মশানের উপর আশ্রম চালায় খোলা দাওয়ায় আমরা শুইবার যোগ্য হই নাই। তাই বাবা আমাদিগকে বিদায় দিয়া বলিলেন "বাবা, যাও শোওগে"।

আমি ও ফণিবাবু নুটুর সহিত নুটুর বাসায় আসিলাম। অপরাহ্ণে আহার হইয়াছিল। ক্ষুধাবোধ ছিল না। সামান্য জলযোগ করিয়া পাণ্ডার সদর ঘরে তক্তাপোষের উপর কম্বল পাতিয়া শয়ন করিলাম। দিনটি ঘটনাপূর্ণ। তাই ভাবিতেছি। মাকে কি করিয়া পাইব তাহাও মনে হইতেছে। আমার প্রয়োজন মিটে নাই। কিন্তু ফণিবাবুর প্রয়োজন মিটিয়াছে। তিনি আমার ন্যায় বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আসেন নাই। তারামাকে ও বামকে দর্শন করিতে

শয়নে

আসিয়াছিলেন। দর্শন হইয়াছে। রামের পাদস্পর্শ করিয়াছেন। রামের সহিত গুহ্য কথোপকথনও হইয়াছে। রাম তাঁহাকে সংসারীর উপযুক্ত আশীর্ব্বাদও করিয়াছেন। "তোর জীবনে ক্লেশ হবে না। তুই তো মুক্ত পুরুষ বাবা। তোর মাপা ও জপা।" সুতরাং ফণিবাবু ফিরিতে প্রস্তুত। তিনি শুইয়াই বলিলেন "বাবু! চলুন কালই ফিরি। কয়দিন কাছারি ছাড়া। কাজকর্ম্ম ফেলিয়া আসিয়াছি।" আমার কামনা এখনও মিটে নাই। গর্ভধারিণীকে জীয়াইতে আসিয়াছি। এখনও রাম তাহার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাহার জন্য তাঁহার নিকট মুখে কিছু উল্লেখ পর্য্যন্ত করি নাই। একদিনে কি এত বড় কাজ হয়? সুতরাং আমার ইচ্ছা আরও কয়টা দিন থাকা। বিশেষতঃ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "বাবা! তারামাকে তিনরূপ চণ্ডী শুনাইয়া যাইবে —আজ কাল পরশু।"

আমি যে কামনা লইয়া আসিয়াছি তাহা কাহাকেও বলি নাই। "আমি জানি আর আমার মনই জানে।" ফণিবাবুকে সে কথা বলিতে ইচ্ছা নাই, এরূপ অসাধ্য সাধন সম্ভব নহে বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। তাই ফণিবাবুর কথার আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে রামকে জানাইলাম "প্রভু! তুমি ত অন্তর্য্যামী। জীবের মন ত্বরিতে ফিরাইতে পার। ফণিবাবুর মন ফিরাইয়া

নিবেদন দাও। অন্ততঃ তুমি যে বলিয়াছ তিন দিন মাকে চণ্ডী শুনাইতে হয় তাহা যেন পূরণ করিতে পারি"।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। ঘটনা বৈচিত্র্যে ভাবতরঙ্গে মন ক্লান্ত। নিদ্রাদেবী সহজেই আসিলেন। মৃচ্ছকটিকের বিদূষকের কথা অনুভব করিতে পারিলাম।

শীঘ্রই গভীর নিদ্রা। মধ্যে একবার ঘুম যেন একটু পাতলা হইল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল দেখি প্রাতঃকাল হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছে। ফণিবাবুও উঠিলেন। দুইজনে প্রাতঃকালীয় "ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী" প্রভৃতি পড়িলাম। পাণ্ডারা উঠিলেন। জল পড়িতেছে। বাহিরে যাইতে পারিলাম না। আর এক পাণ্ডা আসিলেন। শুনিলাম

প্রাতে তাঁহার আত্মীয়ের জ্বর হইয়াছে। তিনি চিন্তিত। আমার মনে হইল যেস্থলে মৃত গর্ভধারিণীকে পুনরুজ্জীবিত করিতে আসিয়াছি

সেখানকার লোক সামান্য রোগে চিন্তিত। তারামার চরণোদকের, শ্রীবামের আশীর্ব্বাদের কি এ প্রভাব নাই যে রোগী রোগ মুক্ত হয়?

আমি বলিয়া ফেলিলাম, "তারামা আপনাদের বাঁধা, জ্বরের জন্য আপনাদের ভাবনা কি? তাঁহার চরণোদক খাওয়াইয়া দিন।" পাণ্ডাঠাকুর একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "তা বটে। তবে মার উপর আমাদের সেরূপ বিশ্বাস কই?" শ্রীবামের কথা উঠিল। ঐ পাণ্ডাও বলিলেন "উনি সিদ্ধপুরুষ। যাকে যা বলেন তাই হয়।" আমার মনে হইল তবে তো বাবা কাল আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন "মনস্কামনা সিদ্ধ হউক" তাহা হইলে মাকে বাচাইয়া লইয়া যাইতে পারিব। পাণ্ডার মুখেই শুনিলাম রাত্রের বৃষ্টিতে দ্বারকায় বড় বান ডাকিয়াছে। নৌকার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখি জলে জলময়। দ্বারকার বানে শ্মশান ডুবিয়াছে। বাবার ঘরের পশ্চিম দেওয়াল পর্য্যন্ত জল ঠেল মারিয়াছে। সদর পথ জাগিয়া আছে মাত্র মাঠগুলি জলে ভাসিয়া গিয়াছে। মন্দির হইতে দেখিলাম তারাপীঠ যেন দ্বীপের ন্যায় জলের উপর ভাসিতেছে। নদীতে জল বাড়িতেছে। কুল কুল করিয়া তীর উপচাইয়া মাঠে জল ঢুকিতেছে। দ্বারকার বান দেখিতে সুন্দর। দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে এক টানা ভয়ঙ্কর স্রোত। দ্বারকার পাহাড় হইতে উঠিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। পাহাড়ে বৃষ্টি হইলে বান ডাকে। জল ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটে। জলের তোড়ে ফেনা জন্মে। ফেনার জমাট রথের চূড়ার ন্যায় দ্রুত বেগে তরঙ্গের উপর নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যায়।

দ্বারকার বান

বান না কমিলে তারাপীঠ হইতে ফেরা অসম্ভব। ফণিবাবু বলিলেন। "বাবু! আটকা পড়া গেল, আজ থাকিতেই হইল। কাল যেরূপ হয় করা যাইবে।" বাম ফণিবাবুর মন ফিরাইলেন। আমাদের যাওয়া বন্ধ করিলেন। গত রাত্রে শয়নের সময় কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বাবার এক প্রিয় সন্তান আমার এক খুল্লতাত পুত্র সুবোধ পরে বলিয়াছিলেন "বাবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা সহজেই পূরণ করেন।"

যেদিন মনে করি ভাল চিংড়ি মাছের কালিয়া খাব, না বলিলেও দেখি মা তাই রাঁধাইয়াছেন। আমিও জীবনে বাম বাঞ্ছা কল্পতরু ক্রমশঃ দেখিতেছি। তবে রামপ্রসাদ যে গাহিয়াছেন—

"(বেটী) সকল সময় সমান রাজি নারাজ শুধু কাজের বেলা" সে কথাটাও মিথ্যা নহে। বেটী ও বেটা তুইজনেই ছেলেকে চুষিকাঠি দিয়া ভুলাইতে চাহেন। ক্ষুদ্র সাংসারিক অভাব দূর করিতে প্রস্তুত। ক্ষুদ্র বিভূতি দিয়া ভুলায়। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের চাবি শীঘ্র খুলিয়া দেয় না। তাই বামও গাহিয়াছেন—

"বেটীর কাজের বেলা দেখ মহা দাঁত কপাটী"।

২৪। পূজাপাঠ

তারাপীঠে আটক করিবার কারণ পরে বুঝিলাম। আমি জননীকে চাহি। বাবা বিশ্বজননী দিবেন। আমি মোহান্ধ জীব। বিশ্বজননী চিনি না। যেমন লালচুষি দেখাইয়া মা বাপ ছেলেকে নিজ কোলে লইয়া ক্ষীর সর নবনী দিবার জন্য টানেন তেমনি বাম আমাকে জননীর পুনরুজ্জীবনাশা দিয়া নিজ কোলে টানিয়া বিশ্বজননী তত্ত্বের বীজ রোপণ করিলেন। আমার মনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা দগ্ধ করিবার জন্য ভীষণ মাতৃ শোকানল দিয়াছেন। সে অনলে হৃদয় অনেকটা নির্ম্মল হইলে অদৃশ্য ডুরিতে নিজ ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছেন। দেবতা দুর্লভ শ্রীচরণ দিয়াছেন। সেই চরণস্পর্শে শরীরে অলৌকিক বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছে। তারামার রথোপলক্ষে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখাইয়াছেন। চিত্তশুদ্ধি করিতে একদিন গিয়াছে। তিন রূপ মাত্র চণ্ডী এ যাত্রায় পড়াইবেন পূর্ব্বদিন বলিয়াছিলেন। সুতরাং আজ তো তারাপীঠে রাখিবেন।

উদ্দেশ্য

প্রাতে বাবার নিকট যাইলাম কিন্তু কি কি ব্যাপার ঘটিল মনে নাই। স্নান করিয়া তারামা'র মন্দিরে আসিলাম। সঙ্গে চণ্ডী। তখন মার স্নান হইতেছিল। দেখি কাপড়ের ঘেরা টোপ; মাটীর চারিটি হাত, রূপার মুণ্ডমালা, মুকুট প্রভৃতি খোলা। বসিষ্ঠারাধিতা শিলা বেদীর উপর বসান। যে পাণ্ডার সেদিন পালা ছিল তিনিই ঐ শিলাখানিই বসিষ্ঠারাধিতা তারা বলিলেন। উহাতে বৎসরূপী

তারাশিলা

শিবকে মা স্তন পান করাইতেছেন এই ছবি দেখাইলেন। ঘড়া ঘড়া জল দিয়া মন্ত্র পড়িয়া ঐ শিলাখানিকে ধুইয়া টোপ পরাইয়া হাত, মুণ্ডমালা প্রভৃতি সজ্জা করিলেন। পুষ্পপাত্র সাজান ছিল। চন্দনাদি ঘষা হইল। পূজার আয়োজন পূর্ণ হইল।

গতকল্য মার পূজা দেখিতে পাই নাই। আজ রাম তাই মন্দিরে আনাইয়া পূজা দেখাইলেন। পুরোহিত মহাশয় পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। আসনশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভূতশুদ্ধি করতঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রস্থলে চণ্ডীতে মহিষাসুর বধে মার আবির্ভাব সূচক শ্লোকগুলি পড়িলেন।

মার পূজা

অতুলং তত্রতত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজা-পত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবক তেজসা॥
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥

দেবগণের শরীর হইতে সেই স্থলে যে অতুলনীয় তেজঃ নির্গত হইল তাহাই একত্র সমবেত হইয়া এক অদ্ভুত নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই নারীর রূপ ছটায় ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত। শম্ভুর তেজ দ্বারা ঐ নারীর বদন, যমের তেজ দ্বারা কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজোরাশিতে বাহুসমূহ, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণ যুগল, সূর্য্যের তেজে পাদাঙ্গুলি, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, বহ্নির তেজে নয়নত্রয় হইল, সন্ধ্যার তেজে তাঁহার ভ্রূযুগ, বায়ুর তেজে তাঁহার শ্রবণ। সেই শিবময়ী অন্যান্য দেবগণের তেজ হইতে সম্ভূতা।

পুরোহিত যখন ইহা পড়িতেছিলেন মার বিরাট মূর্ত্তি আমার মনে উদিত হইতেছিল। তিনি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম তারাপীঠ গ্রামে এই সংকীর্ণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা শিলা নহেন। তিনি বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তি। প্রত্যেক দেবই তাঁহার ক্ষুদ্রশক্তি মাত্র। সেই অনাদি অনন্ত শক্তিকে মনুষ্য ভাষায় জানাইতে গেলে সকল দেবের শক্তিপূজা ভিন্ন অন্য কল্পনা করা যায় না। জগতের নিয়ন্ত্রিত শক্তিই দেবশক্তি, জগতের উচ্ছৃঙ্খল শক্তিই অসুর শক্তি। যখন অসুর শক্তি উদ্দাম হয় তখন ব্যষ্ঠি দেবশক্তিতে তাঁহা রোধ করিতে পারেন না, সমষ্টি—দেবশক্তিরই আবশ্যক। গীতায় ভগবানের বিশ্বরূপ, ভাগবতে ভগবানের বিরাট বপুঃ, আর চণ্ডীতে এই সর্ব্বদেবদেহা নারীমূর্ত্তি এ তিনই এক। পুরোহিত মহাশয় যথাজ্ঞান মার পূজা সমাপন করিলেন। আমি মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মানসিক পূজা করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রেমোদয় হইল না বটে, কিন্তু কতকটা গদগদ ভাব আসিল, কিঞ্চিৎ আনন্দও পাইলাম। ভাবের উচ্ছ্বাসানুসারে স্বরের উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। মন্দিরের বাহির দালানে বসিয়া পড়িতেছিলাম। সময়ে সময়ে স্বরলহরীতে মন্দির বাটী ঝঙ্কৃত হইতেছিল। চক্ষেও সময়ে সময়ে অশ্রুধারা আসিতেছিল। পাঠভিন্ন অন্যদিকে লক্ষ্য নাই। সময়ে সময়ে স্বরতরঙ্গে মন ভাসিয়া যাইতেছে। বিশ্ব যেন সঙ্গীতময় বলিয়া বোধ হইতেছে। যে সকল নব নব অর্থ পূর্ব্বদিন মনে জাগিয়াছিল তাহাও মধ্যে মধ্যে জাগিতেছিল। পাঠ সমাপনান্তে প্রণামের পর দেখিলাম যে পাঠ শুনিতে প্রবীণ কয়েকজন পাণ্ডা সমবেত ছিলেন। পাঠ তাঁহাদের মধুর লাগিয়াছে। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত নীরবে শুনিতেছিলেন।

দশশক্তিময়ী মা

২৫। দীনভাব

দ্বিপ্রহরে ভোগ সরিল। প্রসাদপ্রার্থীগণের সংবাদ জন্য কাঁসর বাজিল। আমাদিগকে নুটু পাণ্ডা ডাকিলেন। গিয়া দেখি পাকঘরের সম্মুখে অনেকগুলি থালা পড়িয়াছে। পরিচারকবর্গকে ও কতক পাণ্ডাকে প্রসাদ বাড়িয়া দেওয়া হয়। সাধকদের ও যাত্রিদের জন্য রাজা রামকৃষ্ণের ব্যবস্থা এক্ষণে পরিদর্শনাভাবে এইরূপ অবস্থায় পরিণত। তারাপীঠে সাধকের সংখ্যা অতি অল্প। ভীষণ শ্মশান। ঐখানে সাধনা দুরূহ। তখন ব্রহ্মচারী নামে একজন সাধক ঐখানে ছিলেন। তিনি বাবার আশ্রমের দক্ষিণে সদর রাস্তার পশ্চিমে প্রাচীন শ্মশানের উপরে একখানি আশ্রম করিয়াছিলেন। তাহাতে একখানি পাকগৃহ ও একখানি শয়ন গৃহ। উভয় গৃহের পশ্চিমে দাওয়া। তারপর একটু ফুলবাগান। তাহাতে জবা, করবী প্রভৃতি ফুলের গাছ। তাহার সঙ্গে কদলীবৃক্ষও ছিল। ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক, শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি যাজনও করিতেন। তিনি কখনও কখনও তারামার প্রসাদ পাইতেন। কখনও নিজেও চালায় পাক করিয়া খাইতেন। সেদিন তিনি প্রসাদ পাইতে মার মন্দিরে আসিয়াছিলেন। আমরা দশ বার জন ব্রাহ্মণ মার মন্দিরের পূর্ব্ব রোয়াকে ছায়ায় বসিতেছি এমন সময় ক্ষ্যাপা বাবা ঐ রোয়াকের নীচে পাকশালার উঠানে উপস্থিত। তিনি রোয়াকে উঠিলেন না, উঠানেই বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে কয়েকটী কুকুর ছিল। তাহারাও তাঁহার আশেপাশে বসিল। পাণ্ডারা বলিয়া উঠিল "তবে আজ ক্ষ্যাপা এখানে প্রসাদ পাবে। তাঁকে প্রসাদ দে।" বাবাকে নীচে বসিতে দেখিয়া আমি সসম্ভ্রমে উঠানে নামিলাম। পাণ্ডারা আমাকে উপরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন আমি উকিল। আমাকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল। তাই তাঁহারা উপরে সম্ভ্রান্ত স্থানে আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু যে মহাপ্রভুর নীরবাকর্ষণে আমি আসিয়াছি, যিনি আমার হৃদয়াধিকার করিয়াছেন, যাঁহাকে তারাপীঠের ভৈরব বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে, যাঁহার প্রভাব পদে পদে পূর্ব্বদিন অনুভব করিয়াছি, যাঁহার নিকট আমার দেহ মন প্রাণ বিক্রীত, সেই

প্রসাদ ব্যবস্থা

ক্ষ্যাপার আগমন

দীনভাব

মহাপ্রভু সেই হৃদয় দেবতা যখন দীনের ন্যায় নীচে উঠানে বসিলেন আমি কি আর উপরে থাকিতে পারি? উপরে বসাই আমার ভাল হয় নাই। দেবমন্দিরের পরান্ন প্রসাদ পাইব। দীনহীন কাঙ্গালের বেশেই তাহা পাওয়া উচিত। তখনও অহমিকা। বাবা ইহা ভাঙ্গিবার জন্যই ঐরূপ কাঙ্গালীর ন্যায় প্রসাদ পাইতে আসিলেন। নচেৎ নাটোরের রাণীকে তারামা স্বপ্ন দেওয়া অবধি বাবা খান আর নাই খান তাঁহার জন্য আশ্রমে নিত্য একথালা ভোগ যাইত। তাঁহার আসিবার কোন কারণ ছিল না।

সকলের পাতা পড়িল। পরিচারকেরা প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। বাবা কালু প্রভৃতি কুকুরের সহিত এক পাতে খাইতে লাগিলেন। কোন বিকার নাই। কুকুরগুলি তাঁহার প্রিয় সহচর। তাহাদের প্রতি কত আদর, কত যত্ন।

কুকুরের সঙ্গে ভোজন

তাহারা যেন পুত্র কন্যা। যাহা নিজের ভাল লাগিতেছে তাহাই তাহাদের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। তাহারা পাত হইতেও প্রসাদ পাইতেছে। কখন তাহারা আদর করিয়া বাবার মুখও চাটিতেছে। তাহারা ক্ষণেক পূর্ব্বে শ্মশানে মড়া খাইয়াছে। মুখে গায়ে সব গন্ধ। কিন্তু বামের ঘৃণা নাই; অভিমান নাই। কুকুরের উচ্ছিষ্ট লালায় বিষ আছে ভয় নাই।

"লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকৃতে নয়" কথায় বলা যত সহজ কার্য্যে কয়জনের তাহা ঘটিয়াছে।

গীতায় সমদর্শনের কথা পড়িয়াছিলাম কার্য্যে সমদর্শন দেখি নাই। অদ্য বাম সেই অলৌকিক সমদর্শন চিত্র দেখাইলেন। আরও এ পাষণ্ড ঘোর অভিমানীর অভিমান যাহাতে চূর্ণ হয় তজ্জন্যই বোধ হয় ঐ কুকুরের উচ্ছিষ্টান্ন প্রসাদ দিলেন। নির্ব্বিকারের কৃপায় এ সবিকারেরও মনে তৎকালে বিকার আসিল না।

কুকুরোচ্ছিষ্ট প্রসাদ দান

২৬। সংশয়

প্রসাদ পাইয়া বাবা চলিয়া গেলেন। আমরা মন্দিরের ঘাটে আঁচাইয়া বাসায় আসিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিতেছি, বাম সূক্ষ্মদেহে আমাকে দর্শন দিয়া টানিয়া আনিয়াছেন। তিনি অন্তর্যামী জ্ঞানময় সদানন্দময় মহাপুরুষ। তাঁহার শক্তি অসীম। আমার মৃত জননীকে সঞ্জীবিত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু কই সে আশা আজ দুইদিন হইল ফলিল না। বাম আদর যত্ন ভিন্ন আর কিছুই করিলেন না। আমাদের দুর্ব্বল মন। সংশয় উঠিতেছে তবে কি বামের সে শক্তি নাই। এ যে অসাধ্য সাধন। মানুষ মরিলে কি ফিরে। জগতে আবহমানকাল মানুষ মরিতেছে ফিরিবার দুই একটা দৃষ্টান্ত পুরাণে লেখা আছে মাত্র। আমার বামের শক্তি নাই, ইহা মন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। মন বলিতেছে তুমি বামকে এমন কি সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে যে তিনি তোমার জন্য এই অসাধ্য সাধন করিবেন। তখনি ইহার উত্তর মন দিতেছে তিনি দয়াময়। তাঁহাকে আবার সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করার কি আবশ্যক। তাপিত জীবের তাপহরণ জন্য তাঁহাদের ভবে অবতরণ। আমার ন্যায় তাপিত কে আছে। আমার প্রাণ যে মাতৃশোকানলে পুড়িয়া যাইতেছে। তিনি তাহা তো বুঝিয়াছেন। তবু কেন দয়া করিবেন না। তাহা হইলে যে তাঁহার দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। এইরূপ চিন্তা-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। শয্যায় থাকিতে পারিলাম না। বামের নিকট চলিলাম। মন্দির প্রাঙ্গন হইতে বার পাউটী দিয়া পথে পড়িলাম। সম্মুখেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম। তাঁহার সহিত প্রসাদ খাইবার সময় অল্প আলাপ হইয়াছে। তিনি তান্ত্রিক যজনযাজনে নিজ পটুত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। মনে হইল একবার দেখিনা, ইঁহার দ্বারা আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে কিনা? তাঁহার আশ্রমে যাইলাম। তিনি সাদরে বসাইলেন। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে জানাইতে লজ্জা পাইতেছি। আর কতদূর তাঁহার শক্তি ইহাও পরীক্ষা করিতেছি। নিজে তন্ত্র কিছু না জানিলেও অভিমান আমার কম নাই। বামের নিকট সব অভিমান চূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু দেখিলাম ব্রহ্মচারীর

চিন্তা

ক্ষীণাশা

নিকট ঐ অভিমান জাগরূক হইল। মারণ উচাটন প্রভৃতির কথা পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম মৃতজীবের প্রত্যুজ্জীবন কি ঘটিতে পারে? ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হাঁ তন্ত্রে সে ক্রিয়ার উল্লেখ আছে।" বলিলাম, "মহাশয় কি কখনও সে ক্রিয়া কি করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "না করি নাই তবে হইতে পারে।" কিছুক্ষণ জেরার পর তিনি স্বীকার করিলেন, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁহার নাই। আমরা যে ব্রহ্মচারী দ্বারা মাতৃসঞ্জীবনের ক্ষীণাশা জন্মিয়াছিল তাহা লোপ হইল। তখন বামের কতদূর শক্তি, তন্ত্রে কিরূপ অধিকার ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আরে ওটা গণ্ডমূর্খ; তন্ত্রের সাধনা কি জানে। কেন লোকে ওর কাছে আসে জানি না। আপনার মত পণ্ডিত কখনও ভুলিবেন না। মূর্খগুলো ভুলে।" ইহা শ্রবণে বিস্মিত। মনে করিলাম ব্রহ্মচারী শ্মশানবাসী হইয়াছেন, গৈরিক বসন লইয়াছেন তান্ত্রিক ক্রিয়াতেও পটু। এখনও আকুমার তারা প্রেমে উদাসী তারা প্রেমে মাতোয়ারা ত্যাগাবতার মহাপুরুষকে চিনিতে পারিলেন না। ইঁহাকে সাংসারিক লেখাপড়ার দ্বারা বিচার করিতেছেন। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি (যাহাকে জানিলে সব জানা হয়) সেই তারামাকে যিনি জানিয়াছেন তাঁহার সাংসারিক ক খ গ ঘ জ্ঞানের আবশ্যক নাই। তন্ত্রের ভাসা ভাসা অর্থ জানিলেই তন্ত্রাভিজ্ঞ হয় না, তন্ত্রের গুরুমুখী বিদ্যা। তাহার অর্থ বড় গূঢ় ও গভীর। মারণ উচাটনাদিরও গভীর অর্থ আছে। উহা অর্থের লোভে যজমানের সাংসারিক শত্রুমারণ নহে। উহা লম্পটের জন্য নায়িকা বশীকরণ নহে। কামক্রোধাদির যথার্থ শত্রুর মারণ উচাটন। সংবৃত্তি রূপ নায়িকার বশীকরণ। বাম সে মারণে, সে বশীকরণে সিদ্ধ। ব্রহ্মচারীর দশা দেখিয়া তাঁহার জন্য আমার যথার্থ দুঃখ হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সাংসারিক নাম ত্যাগ করিয়া বসিষ্ঠের পুণ্যক্ষেত্রে শ্মশানে সাধনা করিতে আসিয়াছেন। আর সেই পুণ্যক্ষেত্রের মহাপুরুষ সেই বসিষ্ঠাসনের অধিকারী, সেই শ্মশানের ঈশ্বর বামের প্রতি তাঁহার এইরূপ ভাব? তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভাব এখনও জাগে নাই। কথায় বলে—

বাম দুর্জ্ঞেয়

পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তানাসৌ প্রাকৃতঃ মানুষঃ। যিনি পাঁচজনের সাংসারিক ভার লন, তিনি সাধারণ লোক নহেন। শ্রীবাম শত শত

জগাই মাধাইয়ের পাপগোবর্দ্ধন অবহেলায় ধরিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে ভক্তি করেন, তাঁহাকে দেখিতে কত যাত্রী নিয়ত তারাপীঠে যাইতেছেন সেই বাম কি অন্তঃসারশূন্য হইতে পারেন? ব্রহ্মচারী অজ্ঞতার অভিমানে অভিমানী, নিজের প্রসার প্রতিপত্তির জন্য ব্যাকুল। তাঁহার নিকট যাত্রী আসে না, বামের নিকট যায়। তাই তিনি বামের প্রতি বিরূপ। পিত্তপীড়ায় তাঁহার মনশ্চক্ষু দূষিত! তাই তিনি সিদ্ধপুরুষের স্বচ্ছতা দেখিতে পাইতেছেন না। তাই তিনি সর্বজ্ঞ সিদ্ধপুরুষকে মূর্খ মাতাল বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াসী।

ব্রহ্মচারীর নিকট আমি নিজ মনোভাব গোপন করিলাম। তিনি অন্তর্যামী কি না পরীক্ষার জন্য বলিলাম। বাম তো লেখাপড়া জানেন না, খুব মদ গাঁজাও খান, তথাপি এত লোকে কেন তাঁহাকে ভক্তি করে বলিতে পারেন? ব্রহ্মচারী আমার মনের ভাব বুঝিলেন না। আমি বামে মজিয়াছি তাঁহার ধারণা হয় নাই। বরঞ্চ তিনি মনে করিলেন আমিও তাঁহার ন্যায় বামের অসারতাবাদী। তিনি বলিলেন, "ওকথা বলবেন না, মূর্খগুলোকে বললে, শুনে না বুঝে না। তারা মনে করে বাম একটা মহাপুরুষ। সেদিন একজন ভদ্রলোক ইংরাজী লেখাপড়া জানে, সেও এসে বামকে পীড়াপীড়া করতে লাগলো যে তাকে মন্ত্র দিতে হবে। বামের তন্ত্রজ্ঞান কি যে মন্ত্র দিবে? ভদ্রলোক কিছুতে শুনলেন না। মন্ত্রের উদ্যোগ কল্লে, বামের মুখে যা এল একটা সাপের মন্ত্র তাকে চুপে চুপে বলে দিলে। শেষে আমাকে ডাক্‌লে আমি তবে হোমাদি করলাম। তবু মূর্খগুলো ওর কাছে যাবে আর ওকে বাবা বাবা করবে, প্রণামী দেবে।" শেষ কথায় বামের প্রতি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের এত প্রেমময় ভাবের কারণ প্রকাশ পাইল।

পরীক্ষা

উপনায়ক

যেমন উপনায়ক না লইলে কাব্য-নাটকে নায়কের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিলেও তাঁহাদের মহিমা স্ফুটিকৃত হয় না বলিয়াই মহাপুরুষেরা কি প্রতিদ্বন্দ্বী নিজ পার্শ্বে রাখেন এবং তাহাদিগকে চিনিবার শক্তি দেন না? বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন পুরুষোত্তমে ছিলেন তখন তাঁহারও প্রতিদ্বন্দ্বী যুটিয়াছিল। সেই গৈরিক বসনধারীও গোস্বামীর প্রসার এবং প্রতিপত্তিতে বড়ই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি

ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া কি করিয়াছিলেন তাহা অনেকে জানেন। অবশ্য বামের অদৃষ্টে এতদূর গড়ায় নাই।

২৭। দয়ার সাগর

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মুখে মহাপুরুষের নিন্দা আর শুনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা হইল না। কালিদাসের বাণী স্মৃতিপথে পড়িল—

ন কেবলং যো মহতোহপ ভাষতে।
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥

যে মহতের নিন্দাবাদ করে কেবল সেই নহে, যে তাহার নিকট নিন্দা শুনে সেও পাপী।

আমার নিকট কোন আলী ছিল না। আমিও পুরাণোক্ত বামের বাম প্রণয়িণীর ন্যায় নররূপী বামে মজি নাই। সুতরাং বলিতে পারিলাম না—

উমার কোপ

নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ।
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতৌষ্ঠাধরঃ॥

সখি! এই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে নিবারণ কর। ইহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে। আবার (আমার হৃদয়বল্লভের) নিন্দাবাদ করিতে ইচ্ছুক।

স্থান ত্যাগই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মচারীর আশ্রম হইতে উঠিলাম। ব্রহ্মচারী এতদূর সাধনপথে অগ্রসর যে তখনও আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। বাবার আশ্রমের অনতিদূরে উত্তর দিকে উহা অবস্থিত তথায় আসিলাম। অন্তর্য্যামী বাম আমার ও ব্রহ্মচারীর ব্যাপার বুঝিয়াছেন। আমি যে তাঁহার শক্তিতে সংশয়ান্বিত হইয়া ব্রহ্মচারীর নিকট মাতার সঞ্জীবনার্থ গিয়াছিলাম, ব্রহ্মচারী ঠাকুর যে বামের প্রতি বড়ই প্রেমময় তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তাহাই ইঙ্গিতে দীনভাবে বলিলেন, "বাবা! আমি মূর্খ মাতাল, আমি তন্ত্রমন্ত্রের কিছুই জানি না, কেন আমার নিকট তোমরা আস!" কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় অধোবদন। মনে মনে আপনাকে

শতধিক্কার দিলাম। মুখ ফুটিল না। মন পুড়িতে লাগিল। কেন মহাপুরুষের শক্তিতে সন্দিহান হইয়া অপরের নিকট গিয়াছিলাম। ইহা যে সূর্য্যকে ত্যাগ করিয়া খদ্যোতের নিকট আলোক পাইবার আশা! হৃদয়াধিকারী মহাপুরুষের নিন্দাবাদ শুনিলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

বাম! আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, সহজে দুর্ব্বল। তুমি বল না দিলে সে কি অটল থাকিতে পারে? প্রভু যিশুর প্রিয় শিষ্য মহানুভব Peter-এর মন অটল থাকে নাই। তাঁহার হৃদয়দেবতা নীচ হিংসুক প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ষড়যন্ত্রে ধৃত হইলে তিনি প্রথমে ভয় পাইলেন। গুরুভক্তিবশতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেন বটে, কিন্তু সেই রাত্রে তিনবার তিনজন তাহাকে যিশুর দলভুক্ত বলিয়া অভিযোগ করিলে তিনি গুরুকে তিনবার অস্বীকার করেন। পরে "তুমি এইরাত্রে তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে," শ্রীগুরুর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রাণভয়ে গুরুকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আমি এমন দুরাচার ক্ষুদ্রমনা যে আমার স্বার্থ সাধন হইতে বিলম্ব হইতেছিল বলিয়া সেই পরম করুণাময় দেবের শক্তিতে সংশয়ান্বিত হইয়া তাঁহার নিন্দাবাদের প্রশ্রয় দিলাম ও তাহাতে প্রতিবাদ করিলাম না।

বাম কিন্তু দয়ার সাগর! আমার এ অপরাধ তিনি ধরেন নাই। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ এজন্য হ্রাস হয় নাই। কোন বিরক্তির ভাব দেখান নাই। প্রত্যুত আমাকে কোল দিলেন। কারণ সেই রাত্রেই অযাচিতভাবে আমাকে পরম যত্ন করিয়া জীবন জন্ম সার্থক করিলেন। ইহাকেই বলে অহেতু করুণাসিন্ধু। প্রভো! আমাকে আর যে কোন কঠোর পরীক্ষা করিতে হয় করিও, তোমাতে আমার সংশয় দিও না। সে বৃশ্চিকদংশন ভয়ঙ্কর। সে জ্বালায় যেন এ হৃদয় না জ্বলে। আমি যেন বিবেকানন্দের ন্যায় গাহিতে পারি—

বাম দয়ার সাগর

"কি সুখ জীবনে মম নাথ দয়াময় হে।"

২৮। বালকভাব

বাবার আশ্রমে বসিয়া রহিলাম। তাঁহার বালকভাবে দেখিতে লাগিলাম। ভক্ত ও পাণ্ডাগণ আসিলেন। ছোট বড় তামাক সেবনের সঙ্গে কথোপকথন চলিতে লাগিল। শুনিলাম বাবার সেবক পাণ্ডা দুইজন। হুটু ও ভূপতি। তখন হুটুর অধিকার। রাজ-তন্ত্র শাসনে রাজার ইচ্ছায় মন্ত্রী পরিবর্ত্তিত হয়। বামের দরবারেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার সেবক পরিবর্ত্তিত হওয়া অযৌক্তিক নহে। এই পরিবর্ত্তনে বামের বালকভাবে প্রকটিত হইত। একজন পাণ্ডা সেবা করিতেছেন। বাবার যাহা কিছু প্রণামী তাঁহার হাতে পড়িতেছে। তাঁহারই হাতে বাবার ঘরের চাবি থাকিত। সে ঘরের আসবাব পূর্ব্বে বলিয়াছি—মড়ার মালসা, মড়ার মাথা, মড়ার চেটা, চারি পাঁচটা চিমটা, তিন চারিটা ত্রিশূল, একটী তানপুরা, একটী লোহার সিন্দুক। সেই সিন্দুকে মড়ার মাথার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভক্ত্যুপহার রূপার ফুরসি থাকিত। সেবক পাণ্ডার হাতে সেই সিন্দুকের চাবি। বাবার প্রণামীর টাকা ও বস্ত্রাদি তিনি তাহাতেই রাখিতেন। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। তাহার আবার হিসাব কি? দুই তিনমাস সেবার ফলে সেবক পাণ্ডার হালচাল ভাল হইল, তাঁহাকে আর রূপার আবশ্যক নাই, তখনই বাবার হিসাবের প্রয়োজন হইল। হিসাব পাণ্ডার মুখে মুখে থাকিত। তিনি বলিলেন, কেন বাবা উহাতে তাহাতে খরচ হইয়াছে। বাবা সব বুঝিতেন। তিনি বলিতেন, "না বাবা তুমি বড় বদ, অমুক ভাল।" সুতরাং অমুকই বাবার সেবার ভার পাইল। পাণ্ডারা বাবার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। যখন যাঁহার আবশ্যক পড়িত তখন তিনি 'বাবা বাবা' করিতেন বটে, বামের বিভূতি কিছু কিছু অনুভব করিতেন বটে কিন্তু বামের তত্ত্ব তাঁহারা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যখন যে পাণ্ডার মনস্তুষ্টি বাবা করিতেন না, তিনি তখন বাবাকে যাহা মুখে আসিত বলিতেন। কখনও বাবার শরীরে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বাবা কখন তাহাতে হাসিতেন, কখনও বা বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ভাব দেখাইতেন। এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া পরে বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব স্বয়ং তদন্ত করিতে বাবার নিকট

সেবা প্রণামী

যান। বাবা কিছুতেই বলিলেন না যে পাণ্ডারা তাঁহাকে প্রহার করেন। পাণ্ডারা বাবার প্রিয় হইবার জন্য কখনও পরস্পরের নিন্দাবাদ করিতেন। বাবার বালকের ভাব। যখন যাহার তখন তাহার। একজন বলিল, "বাবা, অমুক পাণ্ডা তোমাকে এই বলিতেছিল।" বাবা যেন কোপ করিয়া বলিলেন, "সে বেটা আসুক"। সে আসিয়া বলিল, "বাবা অমুকের কথা শুন্‌বেন না, আমি আপনাকে কিছুই বলি নাই।" বাবা ছোট ছেলের মত বলিলেন, "বাবা কেন তুমি আমাকে বলিবে, আমি কি জানি না। তুমি ভাল লোক।" যাত্রীগণের সহিত বাবার বালকভাব। কেউ আসিয়া প্রণাম করিল, বাবা কথা কহিলেন না। সে মনে মনে দুঃখিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে তাহাকে ডাকিলেন, আদর করিলেন। সম্বর্দ্ধনায় তাহার যদি অভিমান হইল যে আমি বাবার প্রিয় পাত্র, অমনি বাবা কথায় কথায় তাহাকে ধমক দিলেন। সে ভয়ে জড় সড়। আবার বাবার স্নেহ উছলিল। কেহ প্রণাম করিলে বাবা চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বদ, ছুঁচু গন্ধ দিতে আসিয়াছে"।

আমি এই সমস্ত ব্যাপার শুনিতেছি ও দেখিতেছি। মনে মনে নিজ মাতৃজীবন ভিক্ষা করিতেছি। মুখে কিছু বলিতেছি না। যদিও পূর্ব্বদিন বাবা পদসেবার অধিকার দিয়াছিলেন ও স্নেহের যথেষ্ট পরিচয় দুইদিনে দিয়াছেন, তথাপি বিনা অনুমতিতে তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে সাহসী হই নাই।

২৯। অযাচিত কৃপা

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। আগন্তুকগণ চলিয়া গেলেন। পাণ্ডাগণ একে একে ভাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় আজও বাবা এবং আমি রহিলাম। বাবা সেই দাওয়ায় দক্ষিণদিকে মাথা উত্তরদিকে পা করিয়া শয়ন করিলেন ও আমাকে পদসেবার ইঙ্গিত করিলেন। আমি পদতলে গেলাম। বাবা শ্রীপদযুগল আমার অঙ্গে তুলিয়া দিলেন। বামের দয়া অপার। যে আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া অন্যলোকের নিকট

তাঁহার নিন্দাবাদ প্রশ্রয় দিয়াছি সেই পামরকে এত দয়া? ইহা না হইলে তোমার দয়াময় নাম কি জগতে রটে? ইহা না হইলে কি তুমি পতিত-পাবন হইতে পার? ইহা না হইলে কি তোমার জগাই মাধাই উদ্ধার লীলা ঘটে? পূর্ব্বদিনের ন্যায় পদসেবা করিতে করিতে অপার শূন্যভাবে হৃদয় পূরিয়া গেল। কি এক আনন্দের অবস্থা। তখন আপনহারা হইলাম। রাম কতক্ষণ পরে উঠিলেন। ঘরে আলো নাই। আকাশ মেঘে ঘেরা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। শ্মশানে শব লইয়া বিবদমান শৃগাল কুক্কুরের কোলাহল উঠিতেছে। আমার মন শূন্য শূন্য। পরম দয়াল রাম হঠাৎ আমাকে বিশ্বজননীর কথা বলিলেন। আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, "বাবা ও মাকে কি বলিয়া ডাকিব?" প্রত্যুত্তরে তিনি বীজ দিলেন। জপের প্রণালী দেখাইলেন। বীজ মনে গাঁথিয়া গেল। জপের প্রথা ধরিতে পরিলাম না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। পূর্ব্বে সংসারী গুরুর নিকট সংসারী শিষ্যের দীক্ষা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে কত আড়ম্বর, কত শসা, কলা, বস্ত্রাদির আয়োজন, সিন্দুর শোভিত ঘট আম্রপল্লব পঞ্চবর্ণের গুঁড়িতে মণ্ডল ইত্যাদি। তাই একজন বৃদ্ধ সংসারী আমাকে পরে গৌরব সহকারে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দীক্ষায় একঘর জিনিস হইয়াছিল, আমার দীক্ষায় সেরূপ ছিল না। সুতরাং ইহা দীক্ষা কিনা সংশয় হইল। বাবার কৃপায় পরে দীক্ষাতত্ত্ব বুঝিয়াছি; তাহাতে ইহা যে পরম দীক্ষা ইহা ধারণা হইয়াছে।

দীক্ষা

তৎকালে এই দীক্ষায় তৃপ্তি হয় নাই। আমি বিশ্বজননীকে চাই নাই। পার্থিব জননীকে সেই জননী ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমময় কোষকে পাইতে গিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ 'দুধুমা' আমার ভাল। অপ্রত্যক্ষ বিশ্বমাতা লইয়া কি করিব। আমার মনে এইরূপ উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিল না। রোগ হইলে রোগীর ভালমন্দ বিচার থাকে না। রোগী কুপথ্যই চায়। সদ্বৈদ্য তাহা দেন না। যাহাতে আরোগ্য হয়, তিনি তাহাই ব্যবস্থা করেন। রুগ্নের সে ব্যবস্থা তখন ভাল লাগে না। পরে সে তাহার উপকারিতা বুঝে। আমার অবস্থাও তাই ঘটিল। মাতৃবিরহে আমার ঘোর মোহ বিকার আসিয়াছে; গীতায় পড়িয়াছিলাম—

অতৃপ্তি

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥

এই আত্মাকে কেহ ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে দগ্ধও করিতে পারে না, ইহাকে আর্দ্রও করিতে পারে না, শুষ্ক করিতেও পারে না। ইনি নিত্য সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন। গীতার বাণীর মূল উপনিষদেও পাইয়াছিলাম কিন্তু ঐসব কথা হৃদয়ে আদৌ লয় নাই। নাস্তিকের নিকট ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ব্রহ্মসূত্র, শঙ্কর ভাষ্যাদি আওড়াইয়া আত্মার অস্তিত্ব, অবিনশ্বরত্ব, নিঃসঙ্গত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতাম। আবার আস্তিকের নিকট—

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ইত্যাদি

লৌকায়তিক যুক্তি দ্বারা আত্মার অভাব সপ্রমাণ করিতাম। আত্মার আত্মত্ব কিছুই বুঝিতাম না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল না। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ছিলাম। সংসারে মৃত্যু দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে আত্মীয়ের নহে। সুতরাং তাহাতে প্রাণে ব্যথা পাই নাই। ব্যথা না লাগিলে জিজ্ঞাসা আসে না। তাই বাম আমার পরমাত্মীয়া স্নেহময়ী জননীকে লইয়া প্রাণে দারুণ ব্যথা দিয়াছেন। মৃত্যু কি তাহা কতক বুঝিয়াছি। মার স্নেহ, মায়া মমতা, আদর যত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহার অভাব প্রতি পলে বোধ হইতেছে। সেই অভাবেই সেই বিরহেই মূঢ় মনঃ ক্ষিপ্ত প্রায়। ঐ শোক ভব বিকারের ঘোর উপদ্রব। আমার সন্নিপাতিক মোহ বিকার কাটাইতে হইবে কেবল তাহার উপদ্রব শোক নিবারণ কবিলে বিকার আরোগ্য হয় না। "দুধু মাকে" ফেরৎ পাইলে আপাততঃ শোক যাইবে বটে কিন্তু তাঁহার শরীর ও আমার শরীর উভয়ই নশ্বর। কেন দয়াময়ী তারামা তাহা স্থায়ী করেন নাই, সে বিচারের আবশ্যক নাই। হয় আমার শরীর পতনের পূর্ব্বে গর্ভধারিণীর শরীর পতন কিম্বা তাঁহার শরীর পতনের পূর্ব্বে আমার শরীর পতন হইবেই হইবে। তাঁহার কোলে আমি গেলে তাঁহার শোকের অবধি থাকিবে না। পুত্র হইয়া সে কামনা করা উচিত নহে। যে জননী আমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন, আমার সুখে যাঁহার সুখ, দুঃখে যাঁহার দুঃখ, আমার মঙ্গল চিন্তা যাঁহার তপোজপ সেই জননীর শিরে দারুণ পুত্রশোকরূপ বজ্রাঘাত পড়ুক

ভব বিকার

এই কথা পুত্রের হৃদয়ে স্থান পাওয়া উচিত নহে। মা থাকিলে আমার সুখ হইবে, অতএব আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তিনি থাকুন এবং আমার শোকে তিনি পরে পাগলিনী হউন, এ অপেক্ষা পুত্রের আর স্বার্থপরতা কি হইতে পারে? আরও পিতামাতার পূর্ব্বে পুত্র নাশ অস্বাভাবিক ও পিতৃ-মাতৃক্রোড়ে সন্তান যাইলে সন্তানের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং আমার মাকে আমার অগ্রে লইয়া রাম অন্যায় করেন নাই। আমি মোহের প্রভাবে তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাই স্বার্থবশতঃ মাকে পুনরুজ্জীবিত চাহিতেছিলাম রাম যদি তাঁহাকে বাঁচাইয়া শতবর্ষ পরমায় দিতেন, তাহা হইলেও যখনই তাঁহার দেহপাত হইত, তখনই আমি থাকিলে আমার শোক আসিত। জননীর প্রত্যুজ্জীবনে আমার মোহ ঘুচিত না। বিকারগ্রস্ত রোগীকে জল দিলে তাহার যে ক্ষণিক তৃষ্ণা যায় আবার প্রবল তৃষ্ণা আসে সেইরূপ ঘটিত। শ্রীরাম বৈদ্যনাথ। তিনি সুচিকিৎসাই করিলেন। রোগের মূল কারণ মোহ।

শ্রীরাম সদ্বৈদ্য

সেই মোহের কারণ আত্মাতে মনোধর্ম্ম সুখ দুঃখের অধ্যাস। সেই অধ্যাসই হৃদয়গ্রন্থি। সেই গ্রন্থি ভেদের পরম ঔষধ ভিষকরাজ ব্যবস্থা করিলেন। শত শত আত্মীয় বিয়োগ হউক, সংসার পুড়িয়া যাউক, তথাপি আমি বিচলিত না হই ইহার বিধান করিলেন। আমি কে, কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি জ্ঞান না হইলে কখনও অধ্যাস যায় না, তাই পরম দয়াল সে শ্মশানে শ্মশানতত্ত্ব দিলেন। হৃদয় শ্মশান হউক তবে তাহাতে মা নাচিবেন। মার নুপুর ধ্বনি শুনিয়া, মার নৃত্য দেখিয়া যাহাতে আনন্দে বিভোর থাকি তাহার পত্তন করিলেন। এ সংসার কেবল লীলাময়ীর আনন্দলীলা। ইহা যাহাতে হৃদয়ে উপলব্ধি হয় তাহার উন্মেষ করিলেন। অন্তশ্চক্ষু যাহাতে খুলে, যাহাতে সূক্ষ্ম জগৎ চক্ষে ভাসে সেই জ্ঞানাঞ্জন দিলেন। যে মা জরামরণ বর্জ্জিত, যে মার স্তন্যপানে শ্রীরাম মৃত্যুঞ্জয়, সেই মার সেই স্তন মুখে দিবার আয়োজন করিলেন। জীবন জন্ম সার্থক হইল।

কিন্তু অবোধ আমি সে মহৌষধের গুণ তখন বুঝিলাম না। ক্রমে তাঁহার কৃপায় একটু একটু বুঝিতেছি। ঔষধ হাড়ে হাড়ে দিয়াছেন। ঔষধের কাজ দেহে প্রাণে মনে অহংজ্ঞানে বুঝিতে বাহে অন্তরে প্রতি পলে

চলিতেছে। রাম এখনও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ জয় করান নাই বটে, তবে কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্যাদির অধিকার ক্রমশঃ কমাইতেছেন। সংসার তরঙ্গে এখনও আকুল করেন বটে, কিন্তু আকুলতার পরক্ষণেই আকুলতা ঘুচাইয়া দাও বলিয়া ডাকিতে শিখাইতেছেন। দারাসুত ধনজনে আসক্তি নাশ করেন নাই বটে, কিন্তু প্রতিদিনই সে আসক্তি যে অনর্থের মূল ইহা ধীরে ধীরে হৃদয়ে জাগাইতেছেন। সংসার বন্ধন ছেদন করেন নাই বটে, এখনও দাসের পদে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু দিন দিন বন্ধনের একটা না একটা গ্রন্থি শিথিল করিতেছেন। সে শৃঙ্খলের লৌহে শ্যামিকা দিতেছেন। সবই সেই তারা বামাবতার করুণাময় রামের কৃপা। ইহা গোঁড়ামীর কথা নহে। অহঙ্কারের বাণী নহে। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে প্রাণ নাচিয়া উঠে। মন মাতিয়া যায় তাই বলিতেছি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাঁহাদের হৃদয়াধিকার শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান করিতে যে অবস্থা পাইয়াছিলেন শ্রীরামের কৃপায় "কাষ্ঠের পুতুল প্রায় শ্রীরাম নাচায়"—অবস্থা কিছু কিছু এদাস অনুভব করিতেছে।

মহৌষধের গুণ

৩০। ভাবীর ভাব

গুহ্য ব্যাপারের পর বাবা আর আশ্রমে নির্জ্জনতা রাখিলেন না। ফণিবাবু আর হুটু পাণ্ডা আমাকে ডাকিতে আসিলেন। পাণ্ডা মহাশয় বাবার সেবার জন্য তামাক সাজিতে লাগিলেন। উভয়ে বাবার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। একথা জগজ্জননী সংক্রান্ত। ফণিবাবু সাধকদের দুইচারিটী গীত শুনাইলেন। তিনি দুইদিন মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়াছেন। মহাপুরুষ তাঁহাকেও কৃপা করিয়াছেন। প্রথম দিনেই তাঁহার গুরুকুল ইষ্টদেবী ও সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছেন। আজ বৈকালে বাবা নিজ প্রিয়তম ভূমি শিমুলতলায় তাঁহাকে একা লইয়া গিয়া পুণ্যস্থানের পরিচয় দিয়াছেন। "এখানে শিমুল গাছ ছিল বাবা শুকুইয়ে গেলো, আমি পুড়িয়ে দিলুম।" ফণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করে বাবা পুড়িয়ে দিলেন।" বাবা বলিলেন, "গাঁজার কল্‌কে ঢেলে।" এই

শাল্মলীদহন কথা

ব্যাপারের পূর্ব্বে পরিচয় দিয়াছি। বাবা বলিলেন, "গাছ পুড়িয়ে দেওয়ায় পাণ্ডারা আমাকে মেরেছিল।" ফণিবাবু বিস্মিত হওয়ায় বাবা বল্লেন, "পাণ্ডাদের বড় জোর বাবা, তারামা ওঁদের বাড়িয়েছেন।" তারা নামে তারাপ্রাণ বামের হৃদয়তন্ত্রী আরও ঝঙ্কার দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয় তারামা, জয় তারামা, পাণ্ডাদের বগল্‌দাবি।" ইহার অর্থ বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "বাবা, তারামা এইখানে। মন্দিরের তারামা পাণ্ডাদের বগল্‌দাবি-।" অর্থাৎ মন্দিবের সাজান তারামা কেবল দোকানদারি। যথার্থ তারা সাধনা শ্মশানভাব হৃদয়ে না জাগিলে হয় না।

ফণিবাবু বাবাকে তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করিলেন। 'বাবা মদ না খাইলে কি এখানে সাধনা হয় না?" বাবা বলিলেন, "কেন হবে না বাবা। তবে কি জান এখানে চীনাচার।" ফণিবাবু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে মহাপুরুষ তাঁহাব অজ্ঞাতে তারামৃত ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই ফণিবাবু এই মহাশ্মশানে গাঢ় তমস্বিনী রাতে রামপ্রসাদের গভীর সাধনার ঝঙ্কার তুলিতে পারিলেন।

এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভালভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাইমা
সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
কিবা দিবা সন্ধ্যা কিবা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা রেখেছি।
সোহাগে গন্ধক দিয়ে (মা)
খাসা রঙে চড়াইয়েছি।
মনোমন্দির জালায়ে দিব
এ বাসনা করিয়াছি।
সাধনতত্ত্ব
কালী নাম মহামন্ত্র
আত্মশির শিখায় বেঁধেছি
এবার শমন এলে
হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি।

প্রসাদের নিদ্রা নাই মা
যোগে জাগে জেগে আছি।
এবার যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়াইয়েছি।

সাধক এই গীতে সাধনার চরমতত্ত্ব বলিয়াছেন। গীতের ভাব কিছুই তখন বুঝি নাই। এখন শ্রীবামের কৃপায় যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের অর্থাৎ তন্ত্রের অজ্ঞাত মণ্ডলের, বেদের "অস্তি নাস্তি ভাতি নভাতি" ভাবের কিছু আস্বাদ পাইতেছি। সেই দেশের এক লোক শ্রীবামকে পাইয়াছি। সেই ভাবীর নিকট ভাব কিছু কিছু শিখিতেছি। ঐ ভাব তাঁহার কৃপায় পূর্ণ হইবে এ বিশ্বাস অল্পে অল্পে আসিতেছে। সেই মহাভাবের উদয় হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা জীব বুঝিতে পারিবে—

দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলে হৃদে অনুক্ষণ।

প্রসাদ সে ভাবের ভাবী। তাই সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করিয়াছিলেন। এই মহাভাবে যে সোহাগ আসে সেই সোহাগ বিশ্বপ্রেম। সেই সোহাগের রঙ্গ খাসা। বিশ্বপ্রেমিক বাম চৈতন্যাদি সেই রঙ্গে সদাই রঞ্জিত। প্রসাদ প্রভৃতি সাধকপ্রবরগণ সেই রঙ্গেই মনোমন্দিরে পূর্ণ ব্রহ্মময়ীর প্রতিমা গড়িয়া সদাই পূজা করেন। সেই ভূমির সাধককে মোহনিদ্রায় নিদ্রিত করিতে পারে না। তিনিই মোহকে নিদ্রিত করিয়া সদাই জাগ্রত থাকেন। ঐ জাগ্রতাবস্থাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে সাংখ্য যোগে বলিয়াছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥

সাধারণ জীবের পক্ষে অজ্ঞানময়ী নিশা তাহাতে জিতেন্দ্রিয় মুনি সর্ব্বদাই জাগরুক এবং জীবগণের পক্ষে যাহা দিবা তাহা সর্ব্বদ্রষ্টা মননশীল মহাপুরুষের পক্ষে নিশা। অর্থাৎ কামকামী জীব যে ব্রহ্মময় অবস্থায় নিদ্রিত, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ সেই অবস্থায় জাগ্রত এবং জীবগণ যে গন্ধরসরূপ স্পর্শ শব্দ ভোগে জাগ্রত সে ভোগে মহাপুরুষ নিদ্রিত। তিনি স্থূল ভোগ-পরায়ণ, জীব ভাবাপন্ন নহেন। তিনি জ্ঞানানন্দময় শিব ভাবাপন্ন। শিবে ও জীবে এই প্রভেদ। বাম সর্ব্বদাই ঐ ভাবীর ভাবে ভাবিত। লোকশিক্ষার জন্য কখনও কিছু অধ্যাস স্বীকার করিতেন মাত্র।

৩১। ভাবহিল্লোল

ভাবঘোরে গীতে ও সিদ্ধপুরুষের সঙ্গলাভে সিদ্ধক্ষেত্রগুণে আমাদের সকলের মনও উচ্চভাবে ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সংসারীর মন এত বিষয়ে লিপ্ত যে সে বেশিক্ষণ বিষয় ছাড়া থাকিতে পারে না। সাধক কবি তাহার উপমা দিয়াছেন—মীন যথা জল ছাড়িয়া বাঁচে না। রামকৃষ্ণদেব, বলিতেন, "নি" স্বরে অধিককাল থাকা যায় না। ফণিবাবুর হৃদয়বীণায় তাই বাম নরেশচন্দ্রের ব্যুত্থান ঝঙ্কার তুলিলেন—

তারাপদ আকাশেতে মনঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষ কুবাতাস লেগে ঘুড়ি গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল।
ব্যুত্থান
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে
মাথা নাইতো উঠ্‌বে কিরে সঙ্গী ছজন জয়ী হল।
মায়া কান্নে হল ভারি আর যে সহিতে নারি
দারাসুত কালের দড়ি ফাঁস লেগে সব ফেঁসে গেল।
নরেশচন্দ্রের হাঁসা কাঁদা না আসাই যে ভাল ছিল॥

যখন সাধক ক্রমশঃ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাদি স্থূল গন্ধরসরূপস্পর্শ-শব্দাদিতন্মাত্র বিষয়ে জ্ঞানময় করিয়া অহংজ্ঞানে অবস্থিত হন তখন তাঁহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উচ্চস্তর। অহংজ্ঞান ডুবিলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তখন সব জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়। তখন মন স্তিমিত। আমি নাই তুমি নাই কিছু নাই। উহাই তোমার প্রকৃতিময়, তন্ত্রের অজ্ঞাত মণ্ডলের শূন্য পূর্ণভাব। কি জানি মহামায়ার কি ভাব, সাধক সে অবস্থা হইতে নামিয়া পড়েন। ব্যুত্থানের প্রথম স্তরে আনন্দানুভব, তখন আমি জাগিয়াছি জগৎ জাগা নাই। ক্রমে জগৎ জাগিলে কামনারূপ কলুষ বাতাস লাগিয়া মনোরূপ ঘুড়ি সেই পরব্যোম হইতে গোত্তা খাইয়া পড়িয়া যায়। তখন তাহার জ্ঞানমুণ্ড ছিন্ন আর সে ব্যোমে উঠিতে পারে না। তখন সে মায়ায় জড়িত। মায়া কান্না তখন ভারি। তাই সঙ্গের ছয় রিপু যাহারা সমাহিত পরাভূত হইয়াছিল তাহারাই তখন জয়ী হইল। দারাসুত ঐ ঘুড়ির কলের দড়ি। ঐ ফাঁসেই মন ঘুড়ি ক্রমে ফাঁসিয়া যায়। তখন সাধক বলেন, "মা' কেন এ ব্যুত্থান দিলি।"

ব্যুত্থান ভাবোত্মক গীতের পর বাবা ফণিবাবুর হৃদয়বীণার সুর একটু চড়াইলেন। তিনি নবাইএর ভক্তিরসাত্মক গীত ধরিলেন।

নিরুপমা শ্যামা আমার যা করেন তাই ভাল লাগে।
থাকেন ল্যাংটাবেশে এলোকেশে ঐরূপ অন্তর জাগে।
শ্যামা অন্যে হলে বিবসনা নিন্দাকরে কতজনা
নিরুপমা শ্যামা মাযে বিবসনা
তার কাছে তো কেউ না লাগে।
দাঁড়িয়ে পতির হৃদি মাঝ
তথাপি নাহিক লাজ!
শ্যামা মায়ের পদারবিন্দে
তাইতো সবাই শরণ মাগে॥

শ্যামা বিবসনা, আলুলায়িতকেশা বরাভয় মুণ্ডখড়্গাধরচতুর্ভুজা, পতির হৃদয়ে দণ্ডায়মানা। এই রূপ সভ্যদের বিসদৃশ। কোলের ছেলের মেয়ের নগ্নত্বই সাজে। সন্তান একটু বড হইলেই সুসভ্য সমাজে তাহাদের বস্ত্রাদি পরান হয়। মাতার দিগ্বাস, আবার সেই মাতার পতিহৃদে দাঁড়ান জনসমাজে চলিতে পারে না। তবে জগন্মাতাকে কেন মাতৃভাবের সাধক হরহৃদি বিলাসিনী দিগম্বরী রণোন্মত্তা দানবদলনীরূপে দেখিতে গেল? জ্ঞানের দিক্ হইতে ঐ তত্ত্বের মীমাংসা শ্রীবাম এ হৃদয়ে যা স্ফুরিত করিতেছেন তাহা অন্যত্র দেখাইবেন। আপাততঃ ভক্তির দিক হইতে এই বলিলেই যথেষ্ট।

তৎ তস্য কিমপি দ্রবং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ। যে যার প্রিয়জন সে তাহার কি অপূর্ব্ব বস্তু—

গুণোঽপি দোষাস্পদমপ্রিয়স্য
প্রিয়স্য দোষাঽপিগুণৈকভূমিঃ।
সুধাপি চান্দ্রী বিষবৎ বিষিণ্যাঃ
সন্তাপহন্ত্রা তপনাতপোঽপি॥

যে অপ্রিয় তাহার গুণও দোষের আকর। প্রিয়ের দোষও গুণের একমাত্র আকর। পঙ্কজিনীর পক্ষে সুধাংশুর সুধাকে বিষবৎ এবং তপনের তাপও সন্তাপ হয়।

সবাই পরম ভক্ত সন্তান। তিনি শ্যামা মাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তাই শ্যামা তাঁহার চক্ষে নিরুপমা। তিনি দেখেন যে শ্যামা কালরূপে জগৎ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন—

শ্যামা যা করেন ভক্তের তাই ভাল লাগে। তিনি ঘোর বিপদ দিলেও ভক্ত তাহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মাথা পাতিয়া লন। মা যাই ভাবনা করুক না, অবোধ সন্তান মারই আঁচল জড়াইয়া ধরে। সে সন্তানের চক্ষে মার সবসনত্ব ও দিগ্বসনত্ব সমস্তই ভাল। তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য জ্ঞান হয় নাই। সে কেবল মাকেই চায়, মার দোষগুণ বিচার করিবার শক্তি নাই। তারাতন্ত্রের ভক্ত মাতৃভাবের সাধক ঐরূপ কোলের সন্তান হইতে চায়। বামের মাতৃভাব সাধনা ঐরূপ ছিল। তিনি তারামা ভিন্ন জানিতেন না। তাঁহার যা করেন তারামা। সে মাকে স্বপন জাগরণে সততই তারায় তারায় রাখিতেন। গীতা শ্রবণে বামের ভক্তি উৎস ছুটিল। দেহের এক অদ্ভুত বালোচিত ভাব দেখা গেল। আমাদের সকলের মনও তাঁহার কৃপায় ভক্তিতে একটু সরল হইল। বাবা ফণিবাবুর মনোবীণার স্বর একটু চড়াইলেন। ফণি কমলাকান্তের গান ধরিলেন—

মাতৃভাব

সদানন্দময়ী কালী
(মহাকালের মনোমোহিনী)
(তুমি) আপনসুখে আপনি নাচ মা
আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশিভালী
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথা পেলি ?
সবেমাত্র তুমি যন্ত্রী (মা) যন্ত্রবলে মোরা চলি
(তুমি) যেমন রাখ তেমনি থাকি (মা)
যেমন বলাও তেমনি বলি

অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি
সর্ব্বনাশী ধরে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি

শূন্যরূপা শশিভালী

গীতের গম্ভীর ভাব বামের প্রসাদে কিছু কিছু শ্রবণে অনুভব করিয়াছি। ইহা সৃষ্টিস্থিতিলয় লীলা। লীলাময়ীর লীলার কথা পরে বাম লেখাইতে

পারেন। তখন এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে—"আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশিভালী" এই কলি শুনিয়াই বাম মহাভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। আমার বোধ হইল যেন তিনি শূন্যরূপা শশিভালীর সহিত মিলিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষুনির্মীলিত, শরীর নিস্পন্দ। বাম! এ অধম তোমার দর্শন পাইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যখন কৃপাময় কৃপা করিয়া অধমকে টানিয়া চরণ দিয়াছ তখন তোমার শূন্যরূপা শশীভালীকে কি একবার দেখাইবে না? তুমি না দেখাইলে কে দেখাইবে নাথ?

৩২। রাজযোগ

গীতশেষে হুটু আমাদিগকে বাবার নিকট হইতে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বাবাকে তামাক খাওয়াইয়া বাবার শয়নের উদ্যোগ করিলেন। শ্মশানবাসীর শয্যার সৌষ্ঠব আর কি হইবে? এক তালাইএর উপর একখানি জজ্জরিত কম্বল পাতা হইল। একটি ছেঁড়া মশারি খাটাইতে লাগিলে আমার মনে হইল শ্মশানবাসীর আবার শয্যা এবং মশারি। অন্তর্যামী বাম তখনই প্রকাশ্যে আমার সংশয় দূর করিবার জন্য উত্তর দিলেন—"বাবা ঢের কষ্ট করেছি, আর কেন করবো? এখন রাজযোগ"। আমার মনে তখন পড়িল যে বাম তারামার জন্য জীবনে যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন এরূপ কয়জন জীব করিতে পারে। আজন্ম ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া মনঃপ্রাণ আমাদের পক্ষে আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান পরোক্ষ পদার্থ তারামায়ের চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন। সেই চরণ লাগি প্রত্যক্ষ সংসারের সর্ব্বসুখত্যাগ করিয়াছেন। পদ মান অর্থও ত্যাগ করা কঠিন, তাহা লাভের আশা ত্যাগ আরও কঠিন। তিনি সে সব আশাও জয় করিয়া সর্ব্বজীবের ত্যাজ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময় মহাশ্মশানে বসিয়াছেন, ঘৃণিত শৃগাল কুকুরের সাহচর্য্য করিয়াছেন। শব কপালই তাঁহার পানপাত্র, শব শয্যাই তাঁহার শয্যা, শবচীরই তাঁহার কৌপীন, শবভূমিই তাঁহার গৃহ। অনাবৃতস্থলে অনাবৃতগাত্রে দুরন্তশীত, প্রচণ্ডগ্রীষ্ম, অবিশ্রান্ত বর্ষাদি সহ্য করিয়াছেন। শেষ কয়বৎসর পাঁচজনে একখানি চালাঘর করিয়া

সর্ব্বত্যাগীর ভোগ

দিয়াছেন। সে ঘরের ভিতরও তিনি শুইতেন না, তাহার দাওয়ার কঠিন মেজেতে শুইতেন। ভগবানের ইচ্ছায় যদি এখন একখানি তালাই ও কম্বল ব্যবহার করেন তাহাতে কাহার কি আসে যায়। তাঁহার মন ভোগে নাই। এই সামান্য ভোগকেও তিনি ভাল বিবেচনা করেন না, তাই বলিলেন— ইহাই রাজযোগ বা রাজভোগের মধ্যে যোগ। জনকরাজের ভাবই রাজযোগ। পূর্ণরাজ্য করিতেছি অথচ তাহাতে আসক্তি নাই। বাম এত ত্যাগী যে এই সামান্য শয্যায় শয়নও তাঁহার চক্ষে পূর্ণ রাজত্ব ভোগ তুল্য।

মশারির অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহাতে ছিন্ন দুই তিনটি বড় বড় গর্ত্ত আছে। ঐ দেখিয়া ফণিবাবু বলিল—'বাবা! এ মশারি টাঙ্গাইয়া কি লাভ?" বাবা উত্তর দিলেন—"কেন বাবা?" ফণিবাবু বলিলেন—"এত বড় বড় ছেঁদা, শ্মশানের যত মশা মশারির ভিতরে আসিবে বাহিরে কেও থাকিবে না।" বালকের ন্যায় বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে বাবা উত্তর দিলেন, "কেন বাবা এ গর্ত্তগুলো যে কালু ভুলোর জন্য, মশার জন্য নয়।" কালু ভুলো বাবার সঙ্গী সারমেয়। রাত্রে শ্মশানে মড়া খাইয়া বাবার পাশে তাহারা ইচ্ছামত শুইয়া থাকে। মশারি টাঙ্গাইলে তাহারা প্রভুর স্পর্শসুখ পাইবে না, চীৎকার করিবে। তাহাদের সুবিধার জন্য মশারিতে ছেঁদা রাখা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ছেঁদায় সহচরগণের ন্যায় মশারও অবাধে গতিবিধি হয়। বাবার শয়ন নাম মাত্র। তাঁহার পক্ষে নিদ্রা সমাধের্বিধিঃ—নিদ্রাই সমাধি। দিবসে লোকসমাগমে তাঁহাকে অন্তরে তন্ময়তা ও বাহ্যে কিছু অধ্যাস রাখিতে হয়। রাত্রে শয্যায় পূর্ণ তন্ময়তা। মশকদংশনে সে সমাধির ব্যাঘাত হয় না। তাই তিনি বোধ হয় মশকের আগমন নির্গমন জানিতে পারেন না। অথবা হয়ত তাঁহার প্রভাবে উহা দ্বারা মশক যাইতেই পারে না। ফণিভূষণ বাবার সারল্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন "বাবা! কুকুররা যে গর্ত্ত দিয়া যায় তাহা দিয়া মশা যাইতে পারে না।" বাবা তখন বলিলেন, "সে কি বাবা! কালুভুলুদেব দরজায় মশারা কেন ঢুকিবেন?" ফণি হাসিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, "তাতো ঠিক বাবা।" ফণি তামাসা করিয়া উত্তর দিল কিন্তু বোধ হয় মহাপুরুষের প্রভাবে কথাগুলি মিথ্যা বলিতে পারিল না।

সারমেয়

এই প্রসঙ্গে Sir Isaac Newton-এর একটি গল্প মনে পড়ে। তাঁহার দুইটি প্রিয় কুকুর ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে গভীর গবেষণা করিতেন। কুকুর দুইটি প্রভুর নিকট যাইতে না পারায় দ্বারে আঁচ্‌ড়াইত, শব্দ করিত। তাহাতে তাঁহার চিন্তাদির ব্যাঘাত ঘটায় তিনি একটী সূত্রধরকে ডাকিয়া যাহাতে কুকুরেরা ঘরের মধ্যে ইচ্ছামত আসিতে পারে ও তথা হইতে বাহিরে যাইতে পারে সেই কারণে দ্বারে ছিদ্র রাখিতে বলিলেন। সরলপ্রকৃতি নিউটন তাহা দেখিয়া সূত্রধরকে বলিলেন—"আমার দুইটী কুকুর তুমি একটী ছিদ্র করিলে আর একটী চাই।" সূত্রধর অবাক্! তিনি ভাবিলেন, "এই কি পণ্ডিতপ্রবর নিউটন?" সঙ্কোচিত হইয়া সূত্রধর বলিল, "আমি বড় গর্ত্ত করিয়াছি তদ্বারা ছোটটীরও যাতায়াত চলিবে।" তখন নিউটন অপ্রতিভ। বাম এত সরল যে ফণির কথাতেও তিনি বুঝিতে পারিলেন না—কালুর জন্য কৃত-ছিদ্রে কেন মশা ঢুকিবে।"

তুলনা

নুটু বাবাকে শয়ন দিয়া আমাদের লইয়া নিজ বাটীতে আসিলেন। আমাদের অনন্তশয্যা বিস্তীর্ণ ছিল। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ফণিভূষণ ও আমি শয়ন করিলাম। ক্ষণেক মহাপুরুষের কথা চর্চা হইল। ফণি বলিলেন, "বাবু! অনেক সাধুসজ্জন দেখিয়াছি, এইরূপ ত্যাগী অন্তর্যামী বালকস্বভাব মহাপুরুষ দেখি নাই। আমি জীবনে বাম ভিন্ন আর কোন মহাপুরুষ দেখি নাই—নাম শুনিয়াছি ও শুনিতেছি বটে কিন্তু দেখিতে সাধ নাই।" বামকে দেখিয়া আমার মন প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। সে মূর্ত্তিই হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সেই আমার যেন কালীতারা দুর্গা হরিহর সকলি হয়।

শয়নে

৩৩। গুরুপূজা

এক ঘুমে রাত্রি কাটিল। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বাবার নিকট আসিলাম। কি ঘটিল মনে নাই। ফণিভূষণ বাটী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমারও তাদৃশ আপত্তি নাই। তারামাকে তিনরূপ চণ্ডী শুনাইয়া বাবা যাইতে বলিয়াছিলেন। আজ তিনরূপ সম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং পাঠান্তে ফিরিলে বাবার আদেশ লঙ্ঘন হইবে না। আহারান্তে ফিরিবার ব্যবস্থা হইল। ভূপতি পাণ্ডা কলিকাতায় যজমানগনের নিকট আসিবেন। তিনি আমাদের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাঠ ঘাট বাট আজও দ্বারকার বানে ডুবিয়া রহিয়াছে। জলপথে আসায় সুবিধা। ডোঙ্গায় সাতঘরে পর্য্যন্ত যাইতে পারা যাইবে। ফণিবাবু জোড়া ডোঙ্গা ভাড়া করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ

স্নানান্তে মার মন্দিরে আসিলাম। পূজা করতঃ চণ্ডী পড়িতে লাগিলাম। প্রাচীন শাস্তপ্রকৃতি নবীন পাণ্ডা প্রভৃতি দুই একজন পাঠ শুনিতেছিলেন। মার কৃপায় সপ্তশতীর ঝঙ্কারে কেবল আমার নহে শ্রোতৃবর্গেরও হৃদয়তন্ত্রী বাজিতেছিল। ইহা বিচিত্র নহে। বসিষ্ঠের সিদ্ধপীঠে, বসিষ্ঠের আরাধিতা শিলাকে পূজা করিতেছি। শত শত সিদ্ধপুরুষের, সহস্র সহস্র সাধকের, অযুত অযুত সংযমী ভক্তের ভক্তিঝঙ্কারে ঐ ক্ষেত্রের জলস্থল আকাশ নীরবে বাজিতেছে। যাঁহার কর্ণ খুলিয়াছে, তিনি ঐ ঝঙ্কার শুনিতে পান। বুঝি না বুঝি বামের কৃপায় আমার নবজীবন আসিয়াছে। বাম এ হৃদয়বীণা নূতন সুরে বাঁধিয়াছেন। সুতরাং সেই সূক্ষ্ম নীরব অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরাগ এ বীণায় আমার অজ্ঞাতে নীরবে বাজিতেছে। আমার বীণার ঝঙ্কারে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়বীণাও ঝঙ্কৃত।

নূতন সুর

পাঠ সমাপনান্তে মনে হইল বাম তো কল্য রাত্রে গুরু হইয়াছেন, অদ্য চলিয়া যাইব, গুরুপূজা করিয়া যাই। একমুঠা বিল্বপত্র, ফুল ও একঘটী জ্যোৎকুণ্ডের জল লইয়া বামের আশ্রমে আসিলাম। দয়াময় বাম আমার হৃদয়ে ঐরূপ প্রেরণা দিয়াছেন। অন্তর্যামী আশ্রমেই আছেন; অন্যস্থলে যান নাই। সেই চালাঘরের দাওয়ায়

গুরুপূজায় সাধ

দক্ষিণমুখে বসিয়া আছেন। বামজানু ভূতলে পাতিত, দক্ষিণজানু উত্তোলিত। চরণ দুইখানি সন্নিহিত। তাহাদের রক্তিমতল কোকনদের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রভু নিজের ভাবে বিভোর। উন্নত ললাট, বিশালবক্ষঃ, লম্বোদর প্রভৃতি দর্শনে আমার বোধ হইল যেন অর্ধসমাধিস্থ শঙ্কর।

আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাহিলেন। দৃষ্টিতে কি মধুরিমা। ভবভূতির ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবিও সে দৃষ্টি বর্ণনা করিতে পারেন নাই তাঁহার ভাষায় প্রেমদৃষ্টি স্নেহ-

গুরু অন্তর্যামী

নিঃসন্দিনী ও দুগ্ধকুল্যার ন্যায়। বামের স্নিগ্ধদৃষ্টি প্রাণোন্মাদিনী অমৃততুল্যা। আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। মন মাতিয়া উঠিল। আপনি আপনাকে ভুলিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। বাবাই আমার আত্মহারা ভাব ভাঙ্গিবার জন্য অমৃতময় স্বরে বলিলেন—"বাবা? চরণপূজা করিবে?" আমি বাবার সম্মুখে জলপূর্ণ ঘটী রাখিয়া উত্তরাস্যে বসিলাম। বাবা দক্ষিণ চরণখানি একটু বাড়াইয়া দিলেন।

গুরুপূজা কি মন্ত্রে করিতে হয় জানিতাম না। গুরুর ধ্যানও জানা ছিল না। হঠাৎ মনে উদয় হইল গুরুই শিব, শিবমন্ত্রে শিবজ্ঞানে পূজা করি। এ ভার শিবাবতার বামই দিলেন। গুরুর দক্ষিণ চরণে শিবায় নমঃ মন্ত্রে পাদ্য, বিল্বদলের অর্ঘ, স্নানীয় জল ও পুষ্প দিলাম। নৈবেদ্য, ফলমূল ও অন্নব্যঞ্জনাদ্যর্থ জলই অনুকল্প করিলাম। এইরূপে ফুলে ও জলে পঞ্চদশোপচার সারিয়া—

শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মনাং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিলাম। (শ্রীবামের নিত্য পূজা পদ্ধতি দেখুন)।

তখন বামের মহিমা তাদৃশ বুঝি নাই। এখন প্রতি পদে বুঝিতেছি তিনিই শিব অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়। যখনি অমঙ্গলের আবর্তে ঘূর্ণায়মান হই, তখনই মঙ্গলময় বাম আমাকে সেই বিষম পাক

শান্তিদাতা

হইতে উদ্ধার করেন। তিনিই শান্ত—শান্তিদাতা পরম শান্তির আশ্রয়। যখনই সংসারাশান্তির জ্বালায় জ্বলিয়া মরি, অমনি সেই শান্তিদাতার শ্রীচরণস্মৃতিপথে আসে এবং অগ্নিতে সলিল সেচনের ন্যায়

সেই জ্বালাও জুড়ায়। তিনি যে কারণত্রয়হেতু তাহারও কিছু কিছু আভাস পাইতেছি। নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি শারীর ক্রিয়া সঙ্কল্পবিকল্পাদি মানসিক ক্রিয়া, সমস্তই সেই—

"মহতো মহিয়ান্" শ্রীগুরুরই লীলা বলিয়া সময়ে সময়ে প্রতিভাত হয়। সেই এক গুরু বা মহতী শক্তি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তরূপে খেলা করিতেছেন ইহা বামের প্রসাদে কচিৎ কচিৎ অস্পষ্ট জাগে। তখন হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দভাব উঠে। মনে হয় যেন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক অনন্ত সর্ব্বময় চিন্ময় শক্তির সাগর—সেই ভাবাবেগে ক্ষণিক বোধ হয় যেন এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল ও তদ্বাসী পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ-নরাদি জীব, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ, এমন কি অনন্ত আকাশ, অনন্ত তারকাদি, অনন্ত ভুবন সেই এক মহান্ শক্তিসাগরের তরঙ্গ যেন বুদ্‌বুদসম উঠিতেছে ও ক্ষণিক লীলার পর আবার সেই সাগরেই মিশিতেছে। আমি, তুমি, তিনি, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বোধ সেই এক চিন্ময়গুরুশক্তিতে ডুবিয়া যায়—যেন অখণ্ড চিন্ময়সত্ত্বা চপলার ন্যায় চমকিয়া উঠে। বাম এ ভাব কবে স্থায়ী করিবে? কবে তুমিই আমার শিবশঙ্করবাম বলিয়া সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগিবে। কবে—

(গুরো) যা হেরি তা হেরি যেন তব মূরতি
এ সমস্ত বিশ্ব যেন হেরি তব বিভূতি।
অনন্ত গগনে অনন্ত ভুবন
শুনি যেন গায় তোমার আরতি
যেন চরাচর তোমাময় ভাবে
ডুবায়ে আমারে রাখে দিবারাতি॥

৩৪। ষোলআনা দিলি?

প্রণামান্তে ট্যাঁক হইতে একটী টাকা খুলিয়া বাবার দক্ষিণ চরণে দক্ষিণাস্বরূপ দিলাম। বাবা নীরবে শিবভাবে ভাবিত হইয়া আমার পূজা লইতেছিলেন। দক্ষিণান্তে তাঁহার ভাবভঙ্গ হইল। তিনি মৃদুমধুরভাবে বলিলেন, "বাবা! ষোলআনা দিলি?" আমি সংসার কীট। আমার মন বিষয়াসক্ত। সুতরাং বাবার কথার মর্ম্ম সংসারীর ন্যায় বুঝিলাম যে বাবা

একটাকায় সন্তুষ্ট হন নাই—আরও চাহিতেছেন। আন্দাজ ত্রিশটাকা আমরা লইয়া তারাপীঠ যাত্রা করি। পথখরচায় ও পূজাদিতে তিনদিনে প্রায় ২০।২৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এখনও পাণ্ডা বিদায়, প্রত্যাগমনের ব্যয় বাকী আছে। তাই বাবাকে কৃপণভাবে একটিমাত্র টাকা দক্ষিণা দিয়াছি। বাবা বেশি চাহিতেছেন মনে করিয়া ফাঁপরে পড়িলাম। কিরূপেই বা তাঁহাকে না দেই, দিলেও নিজেদের কিরূপে সঙ্কুলান হয়। স্থূলমনে পরক্ষণে এই পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাব আসিল যে বাবা হৃদয় পরীক্ষা করিতেছেন। আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের ট্রেন টিকিট আছে। পথে তাদৃশ খরচ না করিলেও চলে, কেবল পাণ্ডা বিদায় মাত্র। সুতরাং ভাবিলাম যে আরও একটি টাকা দেই।

দক্ষিণা

ভ্রম

বাবা আমার সঙ্কোচ বুঝিয়াছেন। তিনি টাকা চাহেন নাই। তাঁহার কথার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় আবার "ষোলআনা" শব্দের উপর জোর দিয়া কহিলেন—"ষোলআনা কি দিলি? তখন মাথায়, আসিল যে বাম সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ঘোর শ্মশানকে আশ্রয় করিয়াছেন যিনি রাজা মহারাজা ভক্তের নিকট কখনও কিছু চাহেন নাই, যিনি জীবশিক্ষার জন্য এক তারামারই নিকট—

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণ বল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥

হে অন্নপূর্ণে! হে সর্ব্বদা পূর্ণময়ি! হে শঙ্করের প্রাণ প্রিয়তমে! হে পার্ব্বতি! অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের কন্যাস্বরূপে! তুমি আমাকে "জ্ঞান ও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দাও" বলিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তিনি মাদৃশ নির্ধনের নিকট অর্থ চাহিবেন কেন? হঠাৎ তাঁহার প্রসাদে তাঁহার কথার ভঙ্গী কতক বুঝিলাম যে তিনি এই যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন —শিবধ্যানে, শিবমন্ত্রে গুরুপূজা করিলি, এ পূজা বাহ্য না আন্তরিক? আন্তরিক হইলেও ইহা কি অন্তরের অন্তর হইতে না অন্তরের উপর স্তর হইতে ভাব লইয়া করিলি?

বাক্যার্থ বোধ

"নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরং। বলিয়াছিস্ তাহা কি তোর প্রাণের কথা না মুখের কথা? যথার্থ কি আত্ম নিবেদন করিলি?

প্রাণ মন প্রভৃতি তোর যাহা কিছু আছে ষোলআনা শ্রীগুরুর চরণে দিতে পারিলি ?

পাঠক বলিতে পারেন যদি বাম অন্তর্যামী তবে কেন জিজ্ঞাসা করিলেন —"ষোলআনা দিলি ? ভাই ! তিনি আমার ন্যায় পাপাশয় কৃপণাতি-কৃপণের অন্তর জানিয়াও আমাকে উপদেশ দিলেন যে শ্রীগুরুকে টাকা দিলে দক্ষিণা দেওয়া হয় না, তাঁহাকে মনপ্রাণ ষোলআনা দেওয়া চাই। বামের শিক্ষা মানসিকী হইলেও এই স্থূলবুদ্ধির বোধজন্য তিনি কথায় ইঙ্গিত করিলেন। ধন্য দয়াময় ! ধন্য তোমার শিক্ষা !

আমার মুখে উত্তর সরিল না। আমি ষোলআনা কি এককড়াও বাবাকে দিতে পারি নাই। তাঁহাকে ষোলআনা দিতে হইবে মনে হইলেও প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। বৈষ্ণব ভক্তের কথা মনে পড়ে—

"যে করে আমার আশ করি তার সর্ব্বনাশ।"

সর্ব্বস্ব অর্পণ

ষোলআনা দিতে গেলে তো সর্ব্বনাশ হইবে। আমার বলিতে জগতে কিছুই থাকিবে না। আমার পুত্র; আমার পত্নী, আমার ধন, আমার পরিজন, আমার মান, আমার সম্ভ্রম সকলইতো ছাড়িতে হইবে। কই প্রভো, এখনও তো তার তিল ছাড়িতে বাসনা দিতেছ না। তোমার দয়ার পরিচয় পাইয়াও তো এখন—

তাতেও যদি না ছাড়ে আশ হই তার দাসের দাস।

এই মহাজনের আশ্বাস বাণীতে আস্থা আসিতেছে না। কবে তোমার উপর অটল বিশ্বাস আসিবে। কবে বলিতে পারিব—"তুমি যা করহে তোমার হলাম।" তোমার দর্শন পাইবার পূর্ব্বে তুমি যৌবনোদ্গমে নশ্বর পার্থিব প্রেমের তারল্যে একদিন ভাব দিয়াছিলে—

"সঁপিলাম প্রাণমন জীবন যৌবন তোমারে
রাখিতে হয় রেখো সখা যতন করে।
না জানি হেরে তোমারে কি ভাব হল অন্তরে
দিলাম যা ছিল সব কোন আশা নাহি ধরে॥

নাথ! তোমার দর্শনে ক্ষণিক আত্মহারা হইয়া অবোধপূর্ব্বক তোমাকে সব দিয়াছিলাম। কিন্তু কবে নিরন্তর এ বোধ গাঢ় হইয়া আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে ?

৩৫। বিদায়

ফণিবাবু ফিরিবার জন্য ত্বরা দিতেছিলেন। গুরুপূজা করিয়া শীঘ্র আশ্রম হইতে উঠিতে বাধ্য হইলাম। মনপ্রাণ বাবার নিকট পড়িয়া রহিল। বাসায় আসিয়া কলিকাতা যাত্রার সাজসজ্জা করা হইল। তারামার ভোগ সরিল। প্রসাদ পাইলাম। তিনদিনই রাজা রামকৃষ্ণের অতিথি হইয়াছি। ফণিবাবু ও ভূপতি পাণ্ডাসহ বাবার নিকট বিদায়ের জন্য আশ্রমে আসিলাম। বামের সহিত তিনদিনের মাত্র পরিচয়। কিন্তু বাম কি প্রেমময়। এই তিনদিনেই তাঁহার সহিত গুরুশিষ্য, দাসপ্রভু সম্বন্ধ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পিতাপুত্র সম্বন্ধ হইয়াছে। এমন কি জন্মদাতা পিতা আপেক্ষাও তাঁহাকে যেন আরও ভালবাসিয়াছি—

প্রেমের ধাধন

উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।

জন্মদাতা ও ব্রহ্মদাতা এই উভয় পিতার মধ্যে ব্রহ্মদ পিতাই শ্রেয়ঃ। এই মনুর বাণী যেন কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। বামকে ছাড়িয়া আসিতে হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে। প্রাণ পুড়িতেছে, মন হুহু করিতেছে। চোখে জল আসিতেছে। মনে করিতেছি—

নয়নেরি বারি শুকাবে নয়নে।

কিন্তু তাহা হইল না। বাবাকে বিদায়প্রণাম করিতে গিয়া চোখের জল টস্‌টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। মনে হইল আর সংসারে ফিরিব না। ঐ শান্তির আধার শ্রীচরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি। সকলি সময়-সাপেক্ষ। শিক্ষার উপর নির্ভর করে। জন্মজন্মান্তরের ভোগবাসনা কি একেবারে ক্ষয় হয়? মহাপুরুষেরা ইচ্ছা করিলে চকিতে জীবের কামপাশ ছেদন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা করেন না। সকাম জীব তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাই তাঁহারা আশ্রিতগণের মনোগতি ফিরাইয়া প্রবৃত্তি পথের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে নিবৃত্তি জাগান। শেষ চিত্তশুদ্ধি ঘটাইয়া মুক্তি দেন। একজন্মেই বহুজন্মের ফল ফলান। তাই বাম এই সংসারকীটকে সংসারের অসারতা দেখাইবার জন্য মাতৃবিয়োগ দিলেন এবং বিষয় হইতে ফিরাইয়া সেই মহাশ্মশানে আকর্ষণ করিলেন, এবং অযাচিতভাবে আমার হৃদয়ে শ্মশান-

ভোগের প্রয়োজন

তত্ত্বীজ আমি বুঝিতে না পারিলেও রোপণ করিয়া, ভোগ দ্বারা কর্ম্মক্ষয়ের জন্ত পুনরায় ভোগভূমি সংসারে পাঠাইলেন।

বিদায়ে কেবল আমার প্রাণে যে ব্যথা লাগিয়াছে তাহা নহে। বাবারও প্রাণে যেন ঘা দিয়াছে বোধ হইল। তিনি বলিলেন—"বাবা চল্লি।" তাঁহার ধীর মধুর স্বরে যেন স্নেহজনিত ব্যথার ঈষৎ কম্পন শুনিলাম। মহাপুরুষদেরও দেহাধ্যাস কিঞ্চিৎ থাকে। জীবগণের কল্যাণে তাঁহারা দেহধারণ করেন দেহ লইয়া জীবজগতে কার্য্য করেন। যন্ত্রীর কি যন্ত্রবোধ থাকিবে না? তাই কবিশিরোমণি শকুন্তলার পতিগৃহ গমনদিনে শাশ্বত ব্রহ্মচারী কণ্বমুণির মুখে বলাইয়াছেন—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্প ভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যহি মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈনবৈঃ॥

আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবে—এখনও যায় নাই। সেই শকুন্তলা মেনকার গর্ভে বিশ্বমিত্রের ঔরসে জন্মিয়াছে। আমার দুহিতা নহে। তাহার পিতা তাহাকে স্বীকার করে নাই। মাতাও নির্ম্মম হইয়া বিজনে ফেলিয়া চলিয়া যায়। শকুন্তল অর্থাৎ (পক্ষিগণ) কর্ত্তৃক রক্ষিতাবস্থায় আমি তাহাকে দেখি। আমার মনে দয়া হয়। তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসি। নাম দেই শকুন্তলা। আমার পত্নী নাই। আশ্রমে ভগ্নী গৌতমী তাহার পরিপালনের ভার লন। সে আবার অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভূতা হৃদয়াভিজাতা নহে, কেবলমাত্র পালিতা কন্তা। কন্তা সৎপাত্রে দেওয়া আমার উচিত। দিতে পারি নাই। দৈবসুযোগে সে রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের সুনয়নে পড়িয়া উভয়ে হৃদয় বিনিময় করিয়া গান্ধর্ব্ববিবাহবন্ধনে বদ্ধ। পরস্পরের প্রণয় প্রগাঢ়। শকুন্তলার প্রাণমন দুষ্মন্তেই নিহিত। সুতরাং সেতো পতির নিকট যাইতেই চায়। পতিগৃহে গমন উহার কল্যাণকর। সে তথায় রাজমহিষী হইবে।

শকুন্তলা বিদায়ে কণ্ব

এখানে তাহার সাংসারিক বড় অভাব। সেখানে সে কত সুখে থাকিবে! আমি পালক পিতা। আমার কর্ত্তব্য তাহার সুখ বিধান, তথাপি আমার হৃদয় এত উৎকণ্ঠিত। উৎকণ্ঠা এত প্রবল যে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না, বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। চক্ষে

জল পড়ে নাই বটে, কিন্তু অন্তর্বাষ্পভরে কণ্ঠরুদ্ধ স্বর গদগদ। বাক্য সরিতেছে না। হৃদয়ব্যঞ্জক নয়নও চিন্তায় বিষয়গ্রহণে বিধুর। আহা স্নেহের কি বিচিত্র লীলা! আমি বনবাসী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অকৃতদার, মুনি, কুলপতি, মহর্ষি নামে বিদিত। আমার ন্যায় ব্যক্তিও একটা লালিত কন্যার ক্ষণিক মঙ্গলময় বিরহে যদি অধীর হয়, জানি না মায়াজালে নানারূপে বদ্ধ গৃহী আপন ঔরস কন্যার পতিগৃহ গমনে প্রথম বিরহে কতই ব্যথা পায়।

শকুন্তলাবিরহাশঙ্কায় কণ্বের এই উৎকণ্ঠা বাহ্যে বিশেষ প্রকাশ হয় নাই এবং অধিকক্ষণও থাকে নাই। মহাপুরুষ ও সাধারণ জীবে প্রথমতঃ এই প্রভেদ যে মহাপুরুষের দেহাভিমাণ ক্ষীণ ও ক্ষণিক—নাই বলিলেই হয়। জীবের দেহাভিমান বদ্ধমূল ও প্রবল। দ্বিতীয়তঃ মহাপুরুষ যে সংসারী জীবের ব্যথায় ব্যথিত হন, তাহার কারণ ও ধারা পৃথক। তুমি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হও তাহা মোহমূলক। আমি মোহবশতঃ শোকে বা রোগে নিজ শারীরিক পীড়নে বা কোন পদার্থের অভাবে ব্যথা পাইতেছি। তাহা দেখিয়া তুমি কল্পনায় তোমাকে আমার অবস্থায় আনিয়া আমার দুঃখ অনুভব কর। কিন্তু মহাপুরুষ আমাকে বা তোমাকে শোকাকুল দেখিয়া তাহা মোহের বিকারে আমরা ভুগিতেছি বুঝিয়া ব্যথিত হন। জীবের জন্মজরা শোকমৃত্যু কবে ঘুচিবে, কবে জীব বুঝিবে সমস্তই শ্রীভগবানের লীলা, এ লীলায় আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ নাই—এইরূপ ভাবনায় মহাপুরুষের হৃদয় ঈষৎ উদ্বেলিত হয়। বাম আমাকে ক্রোড়ে লইয়াছেন, ঐহিক ও পারত্রিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছেন। কেবল মাতৃশোকের কেন ঐহিক সর্ব্ববিধ শোকরোগের মহৌষধি দিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার আত্মার মিলন ঘটিয়াছে, কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। আমি মোহান্ধ তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার দেহকে তিনি ও আমার দেহটাকে আমি বুঝিয়া উভয়জড়পিণ্ডের বিচ্ছেদকে বিরহ ভাবিয়া কাতর হইয়াছি দেখিয়াই বামের বোধ হয় দয়াবশতঃ ঈষৎ বিকার আসিয়াছে। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন—"আমার অজ্ঞান সন্তান কবে গুরুশিষ্যের নিজ সূক্ষ্ম মিলন বুঝিবে।" আমি তখন ইহা বুঝি নাই। আমি বুঝি আর নাই বুঝি করুণাময়ের করুণার ফল হাতে হাতে পাইলাম। তাঁহার নিকট নির্ব্বাক

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ

বিদায়ের পরই আশ্রম হইতে বাহিরে আসিতে না আসিতে আমার প্রাণ এমন উদাস হইল যে বিরহ ব্যথাদি সব কোথায় উড়িয়া গেল—হৃদয়ে কি এক শূন্যময় আনন্দভাব খেলিতে লাগিল। ফণিবাবু ও ভূপতি পাণ্ডার সহিত শ্মশানঘাটে আসিয়া দ্বারকায় জোড়াডোঙ্গায় তিনজনে চাপিলাম।

৩৬। ভবিষ্যৎ ছায়া

দ্বারকায় প্রকোপ দেখিলাম। ঘাট বাট মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই জল। নদী খরস্রোত প্রবাহিতা। জল কোথাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কোথাও ফুলিয়া ফুলিয়া তটের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মহাকলরবে ছুটিতেছে। কুটা ফেলিয়া দিলে কুটা ছিঁড়িয়া যায়। আমার মন উদাস। সুতরাং টিলটিলে ডোঙ্গায় ঐরূপ নদীবক্ষে তীরবেগে আসিতে ভীতির সঞ্চার হয় নাই। অর্দ্ধক্রোশ আসিয়া চিলে নদীর সঙ্গমে পড়িলাম। একজন মাত্র নেয়ে দাঁড়ি মাঝির কাজ একগাছা লগি দিয়া করিতেছে। গুণপণা আছে। ঐ প্রবল প্রবাহের মধ্য

জলপথে

দিয়া ডোঙ্গা চিলে নদীতে প্রবেশ করাইল এবং উজানে বহিতে লাগিল। চিলে দ্বারকা অপেক্ষা গভীর। তাই বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া দেখা গেল। শুনিলাম চিলে কুম্ভীরে ভরা। উহা ২০।৩০ হাত মাত্র প্রশস্ত। কিছুদূর উজান বাহিয়া চিলে পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। চারিদিকেই জল। যেখানে টান বেশি নয়। বায়ু বহিতেছে। তাহাতে হিল্লোল উঠিতেছে। প্রাণ শূন্য থাকিলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতেছি। ক্রোশ দুই অতিক্রম করিয়া শেষে রামপুর হাটের কোলে সানবাটার মাঠে ডোঙ্গা লাগিল। দ্রব্যাদির ভার ফণিবাবু ও পাণ্ডা মহাশয় লইলেন।

আমি একটি হাল্‌কা পুঁটুলি লইয়া নামিলাম। মনে মনে কয়দিনের অদ্ভুত ঘটনাবলী তোলাপাড়া হইতেছে। কিজন্য আসিলাম, কি পাইলাম। জননীর পুনরুজ্জীবন ঘটিল না। তৎপরিবর্ত্তে এক মন্ত্র ও সিদ্ধ পুরুষের ছায়া

পাইলাম। ছায়া হৃদয়ের পাঁজর কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রাণ কতক জুড়াইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ কিছুই প্রতিভাত হয় নাই। মন্ত্রজপে বিশ্বাসও নাই। মনে হইতেছে কেন উহা জপ করিব। কিন্তু কি জানি রাম ঐ মন্ত্রে কি শক্তি দিয়াছেন উহা মনে মনে আওড়াইতেছি। এইরূপ নিরাশাময় সুখদুঃখপূর্ণ উদাস-ভাবে রামপুরহাটে নগেন্দ্রবাবুর বাটীতে সায়াহ্নে পৌছিলাম। রাত্রে নগেন্দ্রবাবু যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিলেন। তারাপীঠ ও ঐ পীঠের জীবন্তভৈরব ক্ষ্যাপা বাবার কথায় এবং গভীর নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে লুপমেল তিনজনে ধরিলাম। রামপুরহাট ছাড়াইয়া মল্লারপুর পৌছিবার কিছু পূর্বে রেলপথ হইতে তারাপীঠের তারা মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া দেখা গেল। সকলে প্রণাম করিলাম। তারাপীঠের ক্ষ্যাপার চিন্তা করিতে করিতে কয়েক ঘণ্টায় বেলা ১১টার সময় চন্দননগরে পৌছিলাম। তখন চুঁচুড়ায় লুপমেল ধরিত না, তাই ফণিবাবু চন্দননগর পর্যন্ত টিকিট লইয়াছিলেন। আমার ও পাণ্ডা মহাশয়ের হাওড়ার টিকিট ছিল। চুঁচুড়া আদালত হইয়া ফণিবাবুর বাসা হইতে দ্রব্যাদি লইবার জন্য আমরা সকলে চন্দননগরে নামিলাম। ঘোড়ার গাড়িতে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া চুঁচুড়ার কাছারী পর্য্যন্ত যাইবার জন্য এক নৌকা করা হইল। নৌকা পশ্চিম তীর দিয়া উজানে চলিতেছে। তটে চন্দননগর ও চুঁচুড়া নগরের হর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইতেছে। ঐ দৃশ্য সে অবস্থাতেও আমার মনোহারি বোধ হইল। ফণি ও ভূপতি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি নিরুত্তর, অন্যমনস্ক। গন্তব্য ঘাটের নিকট নৌকা আসিয়াছে, হঠাৎ আমার কাণে উহাদের কথোপকথন গেল। ফণি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ক্ষাপা বাবার কোন সন্ন্যাসী উন্নত শিষ্য আছে?" ভূপতি বলিলেন—"হাঁ একজন ক্ষ্যাপা চেলা আছেন। তিনিও সিদ্ধপুরুষ।" ইহা শুনিয়া আমার মনে হইল—ক্ষ্যাপা বাবাতো জননীকে বাঁচাইয়া দিলেন না। অন্য ক্ষ্যাপা দিয়া কি আমার বাসনা পূর্ণ হইবে না? তাঁহার আস্তানা কোথায় জানিবার কৌতূহল হইল। আমি জিজ্ঞাসা না করিতেই ফণিবাবুর ঐরূপ প্রশ্নে পাণ্ডা

মন্ত্রশক্তি

রেলপথ

গঙ্গাবক্ষে

অগ্রজের ছায়া

বলিলেন—জুরানপুর। ছোট ক্ষ্যাপাকে দেখিবার বাসনা উঠিল। বাম কল্পতরু; সে বাসনা কিছুকাল পরে পূর্ণ করেন। তাহার বিবরণ পরে আসিবে।

৩৭। শোকহারী

চুঁচুড়া হইতে সেই দিনই সায়াহ্নে কলিকাতায় ফিরিলাম। পিতৃদেব প্রভৃতিকে তারাপীঠের কতক কতক পরিচয় দিলাম। জননীকে উজ্জীবিত করিবার আশায় গিয়াছিলাম ইহা কাহাকেও বলিলাম না। আশা ফলবতী না হওয়ায় বিমর্ষ হইয়াছি। বামের শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হয় নাই। তিনি পরম দয়াল হইয়া আমাকে অযাচিতভাবে ডাকিয়া মাতৃলাভ আশা মনে জাগাইয়া কেন নিরাশ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

সঙ্গ অনল

ভগবানকে পণ্ডিতেরা অগ্নির সহিত তুলনা করেন। অগ্নির কেহ প্রিয় নাই; অপ্রিয় নাই। যিনি যত অগ্নির সান্নিধ্যে আসেন তদনুরূপ ফল পান। বামই আমার ভগবান্। তাঁহার কথায় তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছি। সুতরাং বুঝি বা না বুঝি সুফল পাইলাম। মাতৃ শোকানলে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল, শরীরও শীর্ণ হইতেছিল।

শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্—

তাহা রক্ষা করা চাই। মনও শোকাকুল থাকিলে তারামার চরণে পড়িবে না এই কারণেই বোধ হয় দয়াল বাম অচিরেই আমার শোকানল নির্ব্বাপিত করিলেন। তিনিই মন ফিরাইবার জন্য অনল জ্বালিয়াছিলেন, তিনিই নিবাইলেন। গীতে শুনিয়াছিলাম—

যে দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তোমার জেনেছি গো দুখহরা।
সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে
তাই বহিতেছি শিরে সুখদুখ পসরা।
আমি তোমার পোষা পাখী
যা শিখাও মা তাই শিখি

তুমি শিখায়েছ তারা
তাই ডাকি মা তারা তারা।
তুমি মা দীনতারিণী শরণাগতপালিনী
আমি মা পাতকী বলে হয়েছি মা তোমা হারা।

বামের নিকট হইতে ফিরিয়া তাঁহার কৃপায় অচিরে, এইভাব কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

শোক দুঃখের প্রকারভেদ। মনের প্রতিকূলবেদনই দুঃখ। মন যাহা চায় তাহা না পাইলেই মনের যে প্রতিকূল জ্ঞান হয় তাহাকেই দুঃখ বলে। ইষ্টবিয়োগ মনের প্রতিকূল বেদনাই শোক। ইষ্টবিয়োগ বোধ দূর হইলেই শোকও দূর হয়। ঐ বোধ দূরীভূত হইবার সাধারণ কারণ ইষ্টবিয়োগ বিস্মরণ। কালের প্রভাব কেবল জড়জগতের উপর নহে, মানসিক জগতের উপরও তাহার শক্তি পরিলক্ষিত। কালপ্রভাবে সুখদুঃখাদি স্মৃতি এবং রূপাদি জ্ঞানও মলিন হয়। অসহায়া পতিপ্রাণা পুত্রাদিবিহীনা হিন্দুরমণী পতিশোকে কতই না কাতর হন চারিদিকে অন্ধকার দেখেন। জগৎ তাঁহার চক্ষে জীর্ণারণ্য। তিনি পতির চিতায় আত্ম বিসর্জ্জন দিতে চাহেন। সেই তাঁহার দুর্ব্বার শোকও কালে মন্দীভূত হয়। পত্নীশোকেও পতি উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে কতই না ভাবেন, কতই না বলেন কতই না লিখেন। আবার সেই পতিই কালক্রমে সেই পত্নীকে, সেই পত্নীর গুণরাশি ভুলিয়া, নব দারপরিগ্রহে নূতন করিয়া সংসার পাতেন।

কালের প্রভাব

বাম আমার শোক মাতৃস্মৃতির মালিন্য পরিবর্ত্তে উজ্জ্বলীকরণে অপনীত করিলেন। শয়নে বিচরণে, স্বপনে জাগরণে মার ধ্যান আমার বাড়িয়া গেল। তারাপীঠ হইতে ফিরিয়াই আমি একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে এক সাগরকূলে উচ্চসৌধে দেখিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়া যেন অন্তর্হিত হইলেন। শীঘ্রই তাঁহার অস্তিত্ব খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে লাগিলাম। স্নেহময়ী জননী যেন অহর্নিশি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, আমাকে মধুরবোলে সান্ত্বনা দিতেছেন, আমার দুঃখে দুঃখী, আমার সুখে সুখী, এই জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহার সহদেহাবস্থায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন সর্ব্বদা ঘটিত না এবং

মাতৃসাধনা

যখনও ঘটিত তখন সে চরণদর্শনে বিশুদ্ধানন্দ পাইতাম না (এখন রামের কৃপায় কল্পনায় তাঁহার চরণদর্শন ইচ্ছামাত্রেই ঘটিতেছে; এবং তদ্দর্শনে অপার আনন্দ হিল্লোল উঠিতেছে। তাঁহার জীবিতাবস্থায় যখন তাঁহার নিকট থাকিতাম তখনই তাঁহার স্নেহপ্রস্রবণে স্নপিত হইলাম। চক্ষের অন্তরালে সেভাব থাকিত না। এখন দিবারাত্র রামের প্রসাদে সেই প্রস্রবণের শীতলসলিলে হৃদয় প্লাবিত। শ্যামোন্মাদিনী রাধার মুখে মহাজনেরা যাহা বলাইয়াছেন—রামের কি যাদুমন্ত্রে যেন আমিও যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে স্নেহময়ীর মুর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহবিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈবৈকা বিরহে তন্ময়ং জগৎ ॥

তাঁহার সঙ্গলাভ বা বিরহ এই উভয়ের মধ্যে তাঁহার বিরহই সঙ্গ অপেক্ষা
বিরহে তন্ময়ত্ব প্রেয়ঃ। সঙ্গে তিনি একা বিরহে সমস্ত জগৎ তন্ময়।

অলঙ্কার পাঠের সময় অবিশুদ্ধ আদিরসের ভিতর দিয়া ঐ উক্তির বিশুদ্ধ মধুরিমা পাই নাই। শুদ্ধবুদ্ধযুক্ত স্বভাবে শ্রীরামের করুণায় বিশুদ্ধ ভক্তিরসের দ্বারা উহার শুদ্ধমাধুর্য্য এখন বুঝিতে পারিলাম। আর কি শোক থাকিতে পারে? রাম তোমার সকলই অদ্ভুত! ধন্য, তুমি ধন্য সেই জীব যাঁহারা তোমার চরণাশ্রয় পাইয়াছেন।

৩৮। আচার নিয়োগ

প্রাণের আবেগে ভক্ত গাহিয়াছেন—

শুনেছি হে তৃষাহারী
তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি।

এ অধম এই পুণ্যোচ্ছ্বাসের মর্ম্ম রামের কৃপায় কিছু কিছু বুঝিতে
পারিতেছে। মাতৃশোকানলে আমি কাতর হইয়া কে
অমৃতদান কোথায় মহাপুরুষ আছ বলিয়া কাঁদিতেছিলাম।
অমনি রাম আমাকে ডাকিলেন এবং শোকানল নির্ব্বাপিত করিলেন।

একটুকু মাত্র করিলে এ পিপাসুকে তাঁহার জলমাত্র দেওয়া হইত, অমৃত দেওয়া হইত না। তিনি যে দয়ালের অগ্রগণ্য, জল চাইতে সুধা দেন।

তাই আমি না চাহিলেও আমার হৃদয়ে তিনি তারাতত্ত্বামৃতবীজ রোপণ করেন এবং সেই বীজের পরিপুষ্টির জন্ম আমাকে সাধনাও দিলেন। ঐ সাধনাদানও অদ্ভুত। মুখে তিনি কোন ধ্যান বা অনুষ্ঠান আমাকে বলিয়া দেন নাই। তাই আমার সংশয় হইয়াছিল যে তিনি দীক্ষা দিলেন কিনা। কিন্তু ঝটিতি দূরে নয়নের অন্তরাল হইলে তিনি আমার অজ্ঞাতসারে শাক্ত তন্ত্রের প্রথমানুষ্ঠান বেদাচার আমার মনে স্ফুরিত করিলেন।

বুঝিলাম জীবহিংসা কমিতেছে। অল্পদিন মধ্যেই মৎস্য মাংস ছাড়াইলেন। কর্ত্রীমা তাহাতে দুঃখিতা হইলেন। তিনি আমাকে মৎস্যমাংস খাইতে কত অনুরোধ করিলেন। পিতৃদেব কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইহাও বামের খেলা।

শুদ্ধাচারে

আমার স্থির সংকল্প দেখিয়া শেষে স্নেহময়ী মাতৃকল্পা কর্ত্রীমা অভিমানরূপ অমোঘাস্ত্র আমার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "হরিচরণ! যদি তোর মা থাকৃতো তুই কেমন করিয়া মাছ মাংস ছাড়্‌তিস দেখতুম। আমি ত মা নই, তাই আমার কথা রাখ্‌বি কেন? বামই এই অস্ত্র প্রয়োগ করাইলেন, আবার বামই তাহা প্রতি সংহার করিলেন। কর্ত্রীমা নিজেই পরে বলিলেন—"তা ভাল, যখন তোর জীবহিংসা করিতে মন যায় না, আমি তোকে সে পথে লইয়া যাইতে আর অনুরোধ কর্‌বো না।" আমার প্রাণে হঠাৎ বাম মৎস্যাদির জন্ম একটা অনির্ব্বচনীয় দয়া দিয়াছেন। তাহাদের বধে বা পীড়নে আমার প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগে।

বাম স্বয়ং মৎস্যাদি পঞ্চতত্ত্বের সাধক। তাঁহার চরণ স্পর্শে আমার মৎস্যমাংসের বিরতি বিচিত্র। আমি তখন কারণ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি উহা পশ্বাচারের প্রথম সোপান। হিংসা থাকিতে জীবে প্রেম আসিতে পারে না। সেইজন্মই শ্রুতির দুন্দুভিনাদ—

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

জীবহৃদয়ে হিংসাও আছে, দয়াও আছে। অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী দ্বারা ঐ নীচ ও উচ্চভাবের বৃদ্ধি ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজে

অজাতদন্ত শিশুকে কর্ত্তিত কুক্কুটচরণ চুষিতে ও ডিম্বাদি গুলিয়া পানীয়ের সহিত দেওয়া হয়। বয়স হইলে নানাবিধ মাংসের ব্যবস্থা। সুতরাং তাহার প্রাণে দয়ার প্রস্রবণ শুকাইয়া যায়। মৃগয়ু অভ্যাসবশতঃ মৃগবধে দয়া বোধ করে না। হিংসার দমন ও দয়ার উদ্রেক চাই। তাহা কি উপায়ে করা যায়। যদি একেবারে হিংসানিষিদ্ধ হয়, সেই কঠোর শাসন সমাজ মানিবে না। আর্য্যঋষিগণ তাহা বুঝিয়া সুন্দর নিয়ম করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—

অহিংসা

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

মাংসভক্ষণে দোষ নাই। মদ্যপানেও নাই। মৈথুনেও নাই। উহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তি মহাফলা। মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ। তাহার পক্ষে মহাফল নিবৃত্তি মার্গই অবলম্বনীয়। পশুর ন্যায় তাহার অনর্থকর প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বনীয় নহে। মনুষ্যের হৃদয়ে এইরূপ আত্মগরিমা জাগাইয়া, অন্যজীবও তাহার ন্যায় ক্লেশানুভব করে ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা তাহার দয়া উদ্রিক্ত করিয়া শাস্ত্র তাহাকে ক্রমশঃ অহিংসাপথে লইয়া গিয়াছেন। হিংসাবৃত্তির ক্রমশঃ দমনোদ্দেশ্যেই শ্রুতি সেই বৃত্তির কিঞ্চিদবকাশ জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যজ্ঞার্থে পশুমালভেত।

যজ্ঞের জন্য পশু মারিবে। স্মৃতিও তদনুসরণে বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা স্তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।

যজ্ঞের জন্যই পশুর সৃষ্টি। সেই হেতু যজ্ঞে পশুবধ বধ নহে। এইরূপ নিয়ন্ত্রিত পশুহিংসার অবসর অত্যল্প। যজ্ঞ মুখের কথা নহে। তাহার সম্ভার ও অর্থ আয়াস সাধ্য। শাস্ত্রযজ্ঞে পশুবধের প্রসর দিয়াও তাহা আবার কমাইবার জন্য কতিপয় যজ্ঞে কেবল পশুহননীয় করিয়াছেন। অধিকাংশ যাগই বীজধান্যাদি সাধ্য। এই বীজাদিরও প্রাণ আছে।

বৈধহিংসা

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ।

লতাগুল্মাদিরও ভিতরে ভিতরে বেদনা আছে। তাহাদের সুখদুঃখ

বোধ আছে। তাই তপোবন বালাগণ পত্রপুষ্পচনেও ব্যথিতা হইতেন।

সমন্বয় যাজ্ঞিক হিংসাতেও পাপ নিশ্চিত। পঞ্চ শিখাচার্য্য বলিয়াছেন—

স্বল্প সঙ্করঃ সপরীহার: সপ্রত্যবমর্ষঃ।

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগজনিত পুণ্য পশুবীজাদি হিংসাজনিত পাপের সহিত মিশ্রিত। সেই পাপপরিহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ফলভোগ করিতেই হইবে। এইরূপে শাস্ত্র ক্রমশঃ হিংসা বর্জ্জনীয় করিয়াছেন।

কালক্রমে ভারতে হিংসাবৃত্তি জাগিলে শাক্যসিংহের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি অহিংসাধর্ম্মের প্রধান যাজক হইলেন। মনৌ পূর্ব্বাঙ্গমো ধর্ম্মঃ। বিম্বিসারের যজ্ঞস্থলে শত শত পশুঘাত হইবে শুনিয়া তথায় গিয়া যখন কথায় নিবারণ করিতে পারিলেন না তখন ঐ নিরীহ পশুর পরিবর্ত্তে আপনাকে বলি দিবার অনুরোধ করতঃ যূপকাষ্ঠে তিনি নিজ শিরঃ রাখিলেন। এই দয়ার চিত্রদর্শনে রাজা পাত্র মিত্রাদি সকলেই স্তম্ভিত। তাঁহাদের হৃদয় গলিল। শাক্যসিংহের চরণে সকলে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের শক্তিতে অহিংসামন্ত্র পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। অহিংসা বৈষ্ণবাচারের ভিত্তি বলিয়া বৈষ্ণবভারত তাঁহাকে বিষ্ণুর দয়ার অবতার বলিয়া মানিলেন। বৈষ্ণব কবি গাহিলেন—

শাক্যসিংহ

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।

হিংসাসমাকুল যজ্ঞবিধিমূলক শ্রুতি সমূহকে তুমি নিন্দা কর। পশুঘাত দর্শনে তোমার হৃদয়ে (অভূতপূর্ব্ব) দয়ার উদ্রেক হয়। হে কেশব, তুমিই বুদ্ধরূপ ধরিয়াছ। হে জগদীশ হরি! তোমার জয় হউক।

জীবের হিংসাবৃত্তি সহজ বলিয়া কালে বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রের প্রভাব খর্ব্ব হইতেছে। শাক্তভন্ত্রের বীরাচারমর্ম্ম না বুঝিয়া শাক্তাপদ্গণ সেই আচারানুষ্ঠানচ্ছলে স্বীয় রসনাতৃপ্তির বিধান করিলেন। তখন প্রেমের

ঠাকুর দয়াল নিমাই জগতে আসিয়া প্রেমবন্যায় ভারতকে ধৌত করিলেন।

বীরাচার — "নিম মর্থঃ কিঞ্চিৎ ন্যূন" আমি বীরাচারের পাত্র নহি বলিয়া আমার নিমাই আমাকে বেদাচার দিলেন। তাপিত সংসারীর তাপহরণের জন্য আমাকে দূত করাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় এখনও সেই আচারে রাখিয়াছেন।

৩৯। চিত্তশোধন

চিত্তশুদ্ধি সাধনপথের প্রবেশিকা। চিত্তের প্রধান মালিন্য ভোগমুখী কাম। ঐ কাম হইতেই লোভ, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য ও মোহ। জীব হৃদয়ে ঐ কামেরই প্রাধান্য কবিগণ তাই কামকে অনঙ্গ হইলেও বিশ্ববিজয়ী ধনুর্দ্ধী বলেন। সেই কাম ভক্তমতে হরকামিনীর অপাঙ্গবলেই বলী।

কাম

ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বী মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা\
বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুৎ আয়োধনরথঃ।\
তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমিগিরিসুতে! কামপি কৃপা\
—মপাঙ্গাত্তে লব্ধা জগদিদমনঙ্গো বিজয়তে॥

—আনন্দ লহরী।

কামের ধনু ফুলময়, জ্যা মধুকরময়ী, বসন্ত সারথী, মৃদুমন্দবাহী মলয়ানিল আয়োধন ও রথ, অপর পাঁচটি মাত্র। তথাপি একমাত্র দেহহীন রথী কাম, অয়ি হিমাচলনন্দিনি! তোমার কটাক্ষ কৃপায় (অদ্ভুত বল) লাভ করিয়া নিখিল জগৎ জয় করিতেছে। মদনের শ্লাঘা অতিরঞ্জিত নয়—

কুর্য্যাং হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে। আমি আপনি পিণাকপাণি হরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারি। আমার সমান আর কে ধনী আছে? লেখক কামের বিশিষ্ট দাস। তাহার তৎকালিক হৃদয়ভাব—

কালিঙ্গনং ভুজনিপীড়িত বাহুমূল-\
ভুগ্নোন্নতস্তন মনোহর মায়াতাক্ষ্যাঃ।

ভিক্ষোপবাস নিয়মার্কমরীচিদাহৈ
—র্দেহেপে শোষণবিধিঃ কুধিয়াং ক চৈব ॥

—প্রবোধ চন্দ্রোদয়।

কামিনী

কোথায় সেই বিস্ফারিত লোচনা কামিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে ভুজযুগ নিপীড়ন বশতঃ পীবরস্তনযুগের পরিমর্দ্দনে অপার আনন্দ? আর কোথায় কুবুদ্ধিগণের ভিক্ষা উপবাস প্রভৃতি কঠোর নিয়মরূপ সূর্য্যকিরণদাহে দেহের উপশোষণ বিধি?

ঐরূপ উদ্দাম কামের ফল বিষময়। ভোগাধিক্যবশতঃ অগ্নিবর্ম্মার দশা ঘটে। তখন দারুণ অনুতাপ আসে। শরীর অপটু, মন দুর্ব্বল, জীবতারা ডুবুডুবু। ইহকাল ও পরকালও যায়। তাই শাস্ত্রে কাব্যে নাটকে ভোগের কুফল ও অসারতা খ্যাপনপূর্ব্বক যথাসময়ে জীবের বিবেক জাগাইবার এত প্রয়াস। তাই যাঁহারা বৈরাগ্য বলে শান্তি লাভ করিয়াছেন তাহারা পটহনিনাদে জানাইয়াছেন—

কান্তেত্যুৎপললোচনেতি বিপুলশ্রোণীভরেত্যুন্নত-
পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরেতি সুমুখাম্ভোজেতি সুভ্রূরিতি।
দৃষ্ট্বা মাদ্যতি মোদতেঽভিরমতে প্রস্তৌতি বিদ্বানপি,
প্রত্যক্ষাশুচিপুত্রিকাঃ স্ত্রিয়মহো কামস্য দুশ্চেষ্টিতম্।

ভোগের অসারতা

পূষঃ শোণিতাদি রক্তপূযঃ প্রভৃতি অশুচি উপাদানে যে নারী গঠিত তাহাকে দেখিয়া বিজ্ঞ ও কান্তা, পদ্মপলাশাক্ষী, নিতম্বিনী, পীনোন্নতস্তনী, চন্দ্রাননী, সুভ্রূ প্রভৃতি বোধে প্রমত্ত হয় এবং আমোদ পায়, এবং তাহাতে অভিরমণ করে ও প্রশংসা করে। হায় কামের কি দুর্ব্বিলাস!

জীবের মোহাপনয়ন জন্য তাঁহারা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন—

নারীস্তনভর নাভিনিবেশো মিথ্যামায়ামোহবিলাসঃ।

এইরূপ উপদেশ চিরকাল জীব শুনিতেছে। তথাপি তাহার চৈতন্য হয় না। তাই ভক্ত ভগবানের নিকট কাতরে জানান—

তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিনমর্ম মুছায়ে।

আমার ভগবান্ রামকে আমি এইরূপ কখনও জানাই নাই। আমি তাঁহার নিকট পার্থিব ভোগের কামনা লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি এমনি

দয়াল যে অযাচিতভাবে আমার মলিনমর্ম্ম মুছাইবার ভার লইলেন। নীরবে দূর হইতে আমার হৃদয়াধিকার করিয়া তাঁহার মঙ্গলময় করে ক্রমশঃ আমার

নির্ম্মলী করণ

মর্ম্মের মালিন্য মুছাইতেছেন, আমার মত্তমাতঙ্গসম উদ্দাম কামকে দমিত করিতেছেন ও তাঁহার পুণ্যালোকে আমাকে অন্ধকার হইতে লইয়া যাইতেছেন। আমার লক্ষ্যশূন্য লক্ষ লক্ষ বাসনা গভীর আঁধারে এখনও ছুটিতেছে বটে, কিন্তু তিনি অভয় দিতেছেন—"তোর মন অতলগরলসাগরে ডুবিবে না, এই আমি তোকে ধরিয়া আছি।" সময়ে সময়ে আমাকে অনুভব করাইতেছেন, তিনি জলে স্থলে অনলে অনিলে আকাশে, বিটপীলতায়, শশিতারকায়, তপনে, গগনে আছেন। তবে সে ভাব এখনও গাঢ় করিতেছেন না। ঐরূপ ভাব চপলার ন্যায় চমকাইয়া লুকায়। কখনও বা জ্ঞান পিপাসা জাগাইয়া বলান—

আমি বুঝি নাই কিছু জানি নাই কিছু
দাও হে বুঝায়ে জানায়ে।

আবার কখনও বা বলান—

আমি না চাহি জটিল ন্যায়ের বারতা
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা
তুমি হে আমার হৃদয় দেবতা
তাই তোমায় বরি হে।

আমার মালিন্যাপসরণের প্রথা এইরূপ। অসৎ প্রবৃত্তি জাগিলে প্রভু বাম তৎক্ষণাৎ তদ্বিপরীত প্রবৃত্তি জাগান। আমরা কলির ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণোচিত শমদমদয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ আমাদের নাই। কেবল ক্রোধ অভিমানাদি দোষ আছে। ইচ্ছার বিঘাতে বা কল্পিত অপমানে ক্রোধাগ্নি ধক্ করিয়া জলিয়া উঠে। কিন্তু করুণাময়ের আমার প্রতি কি করুণা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এইভাব দেন যে—"কেন রাগিলে? যার প্রতি কোপ করিলে তাহার কি দোষ, বিচার কর। তাহাকে কটূক্তি কেন করিলে? কটূক্তি যেমন তোমার অপ্রিয়, তেমনি পরেরও প্রাণে ব্যথা দিলে কি লাভ? যাঁহাকে বাক্‌পারুষ্য দেখাইয়াছি, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতে বাসনা হয়। ক্ষমা চাহিবার বলও বাম দেন। নষ্ট শান্তি আবার খুঁজিয়া পাই। লোভ হইলে ঠাকুর আত্মমর্য্যাদা জাগরিত করেন। মনে মনে হয়,

"কি? নিষ্কাম শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছি। এখনও এই ক্ষুদ্র বিষয়ে লোভ সম্বরণ করিতে পারিব না?" লোভ শমিত হয়। মাৎসর্য্য হৃদয়ে উদিত হইলে শ্রীগুরু যেন বলিয়া দেন—"পরের শ্রীতে কাতর হইয়া হৃদয় পুড়াইতেছ কেন? উহাতে লাভ নাই। বরঞ্চ ঐ শ্রীতে আনন্দপ্রকাশ কর; হৃদয় জুড়াইবে।" মদ বা অভিমানে হৃদয় ভরিলে তিনি আমাকে যেন বুঝান—"তোমার অভিমান করিবার কি গুণ আছে? পরে যে তোমাকে বলিয়াছে তাহাতো সত্য। সে তোমার চক্ষুরুন্মীলিত করিতেছে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া অভিমান করিতেছ?"

ক্রোধাপনয়ন

কামের উদ্রেকে কামারি রাম রতিভাবের প্রতিকূল জুগুপ্সা জাগান। আমার মনে হয়—যে কামিনীসম্ভোগে এত আগ্রহ সেই কামিনী রক্ত-মাংসের সঙ্ঘাত মাত্র। যদি জুগুপ্সায় কাম না যায় তাহা হইলে প্রভু কামের অমোঘ ঔষধ সৎ কাম উদ্রিক্ত করেন। আমাকে বুঝান—"বাবা! রমণী সঙ্গ-সুখ চাহিতেছ। স্থূলসঙ্গ ক্ষণিক। তজ্জনিত সুখও ক্ষণিক। তাহাতে শরীর নষ্ট, ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সমাজেও কলঙ্ক ঘটে। সে সুখ সমল। নির্ম্মলানন্দ চাও ঐ নারীকে তারামা বলিয়া ভাব, এবং উহার চরণে মালাদি পুষ্পাঞ্জলি দাও। দেখিবে কি বিমলানন্দ পাইবে।" আমার মন অবশ হইয়া তাহাই করে। কাম ভুজঙ্গের ফণা তৎক্ষণাৎ অবনত হয়। অসৎকাম সৎকামে পরিণত হইয়া আমাকে স্বর্গ-রাজ্যে লইয়া যায়। আগে আগে পরনারীর প্রতি মাতৃভাব জাগাইয়া আমার কামকালিয় দমন করিতেন, এক্ষণে কন্যাভাবও জাগান। সম্ভোগেচ্ছা ডুবিয়া যায়।

কামদমন

তুচ্ছং ব্রহ্মপদং তদা পরবধূ সঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ

তখন ব্রহ্মপদও তুচ্ছ হয়। পরনারী সঙ্গমের প্রসঙ্গ তখন কোথায়? ভাবুক শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে গাহিয়াছেন—

ওপথে যেও না কুপথ বলিয়ে
কাণে কাণে কত কয়েছ।
আমি তবু ছুটে যাই ফিরায়ে আনিতে
আমার পাছু পাছু তুমি ছুটেছ।

শ্রীবামের এই লীলা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। অধম বলিয়া তিনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন। আমার কাণে কাণে নিত্যই তিনি বলিতেছেন, "বাবা ওপথে যেও না, ও কুপথ।" আমি কখনও সে কথা শুনি, কখনও না শুনিয়া কুপথে যাই। তখন তিনি দুই বাহু প্রসারিয়া আমাকে ফিরাইবার জন্য আমার পাছু পাছু ছুটেন এবং আমাকে ফিরান। যখন কামাদির প্রকোপ এরূপ প্রবল হয় যে তাঁহার জাগরিত জুগুপ্সাদিভাবে শমিত হয় না তখন প্রভু যেন আমাকে আগলাইয়া থাকেন; কামাদি চরিতার্থতার অবসর দেন না। সুতরাং রক্তবীজের রক্ত ভূমিতে পড়িতে পায় না. অন্য রক্তবীজও উঠে না।

সঙ্গে বিচরণ

শ্মশানে ফুলবাগান

(আমার) হৃদয় ছিল শ্মশান সমান
কি যাদুতে ও যাদুকর করলে এরে ফুলবাগান।
এখন সেই বাগানে ফুল ফুটেছেরে
সৌরভে প্রাণ আকুল করে॥

৪০। প্রতিনিধি প্রেরণ

বেদাচারের পর বাম আমার মানসে নীরবেই বৈষ্ণবাচারের লক্ষণ দিলেন। তাহাও ভাল বুঝিতে পারি নাই। কেবল হিংসা কাম ক্রোধাদি কমাইতেছেন ইহা বুঝিতে পারি। মন্ত্রের অর্থবোধ বা উপকারিতা জ্ঞান হয় নাই। তথাপি প্রাণে প্রাণে তাহা এমনি গাঁথিয়া যায় যে তাহা সায়ংপ্রাতঃ এবং অবসর হইলেই অন্য সময়ও জপ করাইতে লাগিলেন। নিত্য গঙ্গাজলে গুরুর ও ইষ্টদেবীর পূজা ও চণ্ডীপাঠও করান। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ইষ্টপূজার পদ্ধতি প্রভৃতি কিছুই জানা ছিল না। তবে সংসার হইতে অবসর পাইলেই চিত্তচোরার নিকট চিত্ত বিচরণ করিত। দূরস্থ হইলেও অচিরে তাঁহার অন্তেবাসী হই। তাঁহার কথা শুনিতে প্রাণ চাহিত। তাঁহার গুণগানে মন উৎফুল্ল হইত। তাঁহার শ্রীপদবন্দনার চিত্রে হৃদয় জুড়াইতে লাগিল। ইহাই বৈষ্ণবাচারের অনুষ্ঠান—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

সেই বিশ্বব্যাপক পরমদেবের লীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও তাঁহার শ্রীপদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, তাঁহার প্রতি দাসভাব, তাঁহার সহিত সখিত্ব ও তাঁহাকে আত্মনিবেদন—ভক্তির এই নববিধা। পরে পাতঞ্জলপাঠে বুঝি যে মহাপুরুষের সতত স্মরণই সমাধির উপায় বিশেষ—

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।

যাহার মানস হইতে রাগদ্বেষ বিশেষরূপে গত সেই মহাপুরুষে চিত্ত অর্পণ করিলেও সমাধি আসে।

কিন্তু গায়ত্রী প্রভৃতি পাওয়া এবং তন্ত্রের অনুষ্ঠানও জানা চাই। দূর হইতে তাহা স্ফুরিত করিবার শক্তি পিতার থাকিলেও আমার চিত্ত সমল বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক তিনি শীঘ্র আমার উপকারের জন্য নিজ প্রিয় পুত্র ছোট ক্ষ্যাপার সহিত মিলন ঘটাইলেন। ইহারই নাম তারাপীঠ হইতে ফিরিবার পথে নৌকায় ভূপতি পাণ্ডার মুখে শুনি।

১৩১৩ সালের চৈত্র মাসে চুঁচুড়া কাছারিতে অপরাহ্নে উকিল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দাদা আমাকে বলিলেন, "হরি! তোদের ক্ষ্যাপা আমার বাসায় আসিয়াছেন, তাঁকে দেখতে যাবি না?" আমার মনে হইল, "ক্ষ্যাপাবাবা তো বড় কোথাও আসেন না। তিনি কি কারণে হুগলিতে আসিলেন?" গিরীশ দাদা পরক্ষণেই বলিলেন—"তোর ক্ষ্যাপা বাবার বড় চেলা ছোট ক্ষ্যাপা আসিয়াছেন।" আমি যাইতে সম্মত হইলাম এবং গিরীশ দাদার গাড়ীতে তাঁহার বাসায় আসিলাম। তখন গিরীশ দাদার নিজের বাটী হয় নাই। ইহার সম্মুখে বাসাবাটী ছিল। দেখিলাম বৈঠকখানায় কৃষ্ণকায় দীর্ঘকেশ শ্মশ্রু গৈরিকবসন একজন সন্ন্যাসী ও আর একজন সংসারী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর জ্যোতিঃ আছে। আমি যাইতেই অন্য ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন—"দাদা, এই তো সে!" পরে জানিলাম যে কিছু পূর্ব্বে আমার আকৃতি তাঁহার মানসপটে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার সহিত পরিচয় না থাকায় তিনি চিনিতে পারেন নাই। ছোট ক্ষ্যাপাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গৌরবর্ণ কে যুবা আমাকে দেখা দিল?" ক্ষ্যাপা উত্তর দেন—"হবে কেহ আসিতেছে।"

ক্ষ্যাপাদাদাকে প্রণাম করিলাম। গিরীশ দাদা তাঁহাকে আমার পরিচয় দিলেন। দাদা যথার্থই দাদার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন দেখাইলেন।

প্রথম দর্শনেই প্রাণ বিনিময় হইল। অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসিব এইরূপ ইচ্ছা আমার ছিল। কারণ মাতৃদেবীর দেহান্তে পিতৃদেব একাধারে পিতা ও মাতা হইয়াছেন। হুগলি হইতে আমার ফিরিতে বিলম্ব হইলে মাতৃদেবীর ন্যায় তিনি তখন ঘরবাহির করিতেন। ক্ষ্যাপা দাদা আমার অন্তর জানিয়া বলিলেন—"আজ এখানে থাক।" তাঁহার কথায় আমি কাছারির পোষাক ছাড়িলাম। জলযোগ হইল। ক্ষ্যাপার সঙ্গে ব্যক্তির সহিত পরিচয় ঘটিল। তিনি হরিপদ মৈত্র। গিরিশদার গুরুভাই, ময়ূরভঞ্জে কাজ করিতেন। আমাদেরও গুরুভাই শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও তথায় থাকেন। ক্ষ্যাপা ময়ূরভঞ্জে গিয়াছিলেন। হরিপদদার সহিত হুগলিতে আসিয়াছেন। গিরীশদার অন্য গুরুভাই উকিল বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় শীঘ্রই আসিলেন। সকলে গঙ্গাতীরে গেলাম। তথায় সদালাপে মৃদুমন্দ পুণ্য সমীরণে স্নিগ্ধ হইয়া সকলে ফিরিলাম। সন্ধ্যাবন্দনা গিরীশ-দাদার ঠাকুর ঘরে হইল। কেবল ক্ষ্যাপা সন্ধ্যায় গেলেন না। তিনি বৈঠকখানায় নিজ আসনে কর্ম্ম সারিলেন। সান্ধ্যকৃত্যের পর গিরিশদা তানপুরাযোগে ভক্তিসঙ্গীতে আনন্দ দিলেন। আমি মুখে ঘুঙুর দিলাম। উঁহারা ঐ শব্দ কোথা হইতে উঠিল বুঝিতে পারিলেন না। বিষ্ণুদা বলিলেন—"শোন! অলক্ষ্যে কে নূপুর পায়ে নাচিতেছে।" আহারের কাল উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদাদা নিজ বাসায় গেলেন। গিরীশদা ও হরিপদদা অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আমি ও ক্ষ্যাপা দাদা বৈঠকখানায়। ক্ষ্যাপা মৃগচর্ম্মে শয়ান। তিনি আমাকে বলিলেন, "ওরে! আমার মেরুদণ্ডে একটু পুরাণ ঘৃত মালিস করিয়া দেতো।" তাঁহার শিশি হইতে ঘৃত লইয়া আমি মালিস করিতেছি। আমার চিত্ত বড়ই সংশয়ী। ক্ষ্যাপা দাদার উপরই সংশয় হইয়াছিল। সুতরাং মনে হইল—"দাদা! এতবড় যোগী আকুমার ব্রহ্মচারী। তাঁহার মেরুদণ্ডের দৌর্ব্বল্য।" দাদা তৎক্ষণাৎ মধুরস্বরে বলিলেন "ওরে অতিরিক্ত হঠের ফল।" মালিস করিতেছি দাদার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। তাঁহার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছি। মনে করিলাম—"ক্ষ্যাপা বাবাতো কোন অনুষ্ঠান দিতেন না ইহার নিকট কি তা পাইব না? ইনি কি গুরুকৃত্য করিবেন না? তন্দ্রাবস্থাতেই দাদা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন—"কি একজনকে মাথা বেচিয়া আবার অন্যজনকে তা

বেচিবার ইচ্ছা।" আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। সত্যসত্যই তো আমার শির শ্রীক্ষ্যাপার নিকট বিক্রীত। আবার অন্যত্র তা আমি কিরূপে বিক্রয় করি। ক্রেতা অন্য কাহারো নিকট তাহার ক্রীতদাসের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিতে পারেন। কিন্তু দাসের আত্মবিক্রয়ের অধিকার নাই। আহারের আহ্বান হইল। দাদা নিজে একটু পৃথক্ সুজি পাক করিলেন। আমরা চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় পাইলাম। আহারান্তে ঐ ঘরে আমার শয্যা পড়িল। দাদা কাহারও ব্যবহৃত দ্রব্য ব্যবহার করেন না। তাঁহার মৃগ-চর্ম্মের উপর পাগ্‌ড়ির উপাধান। উভয় সহোদরে কথোপকথন হইতে লাগিল। ক্ষ্যাপা বাবার নিকট আমার যাইবার ঘটনা কতক কতক বলিলাম। দাদাও নিজ পরিচয় কিছু কিছু দিলেন। জুরনপুরে তাঁহার আস্তানা জানিয়া আমার জুরনপুরে যাইবার বাসনা উঠিলে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন—"আমার গণ এখন সেথায় যাইতে পারিবে না।" ফলে তাহাই ঘটিয়াছে চেষ্টা সত্ত্বেও সন ১৩৩০ সালের পৌষ মাসের পূর্ব্বে জুরনপুরে আমার যাওয়া ঘটে নাই। তাহার বহু পূর্ব্বেই ক্ষ্যাপা দাদা ঐখান হইতে আসন তুলিয়াছিলেন।

কথোপকথনে দাদা বলিলেন, "তোর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ইহার চিহ্ন শ্রীগুরু ময়ূরভঞ্জ হইতে আসিবার পথে দিয়াছিলেন। নিবিড় বনপথে হঠাৎ দেখিলাম আকাশ দিয়া হনুমান যাইতেছে। তুই কি তবে বামের হনুরে?" আমি অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি বাম আমাকে তাঁহার দূত করিয়াছেন বটে। যদি শ্রীমহাবীরের ন্যায় ভক্তি ও শক্তি দেন তাহা হইলে আমার ন্যায় ভাগ্যবান আর কে?

আমার বাসনা হইয়াছে যে দাদা পরদিন আমার বাসায় পদধূলি দেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এখানে কয়দিন থাকিবেন।" তিনি বলিলেন—"আগামী কল্যই কলিকাতায় যাইব।" আমি ভাবিলাম—মুখে বলিব না, দেখি আমার বাসনা পূর্ণ করেন কিনা। পরে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লইলাম। প্রত্যুষে দাদা উঠিয়া আমাকে উঠাইলেন। গিরীশদার আতিথ্য স্বীকারান্তে অপরাহ্নে উভয় ভ্রাতায় কলিকাতা যাত্রা করিলাম। ব্যাণ্ডেলে রেলগাড়ী ধরিয়া হাওড়ায় নামিলাম। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার জন্য গাড়ী করা যাক। কোথায় যাইবেন?" তিনি হাসিয়া

বলিলেন, "তোর ইচ্ছা যখন তোর বাসায় লইয়া যাস তখন সেথায় যাইব।" আনন্দে তাঁহাকে নিজ বাসায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লইয়া আসিলাম। তখন পিতৃদেব ও কর্ত্রীমা সত্যভামাদেবী জীবিত আছেন। দাদা নিজেই বলিলেন—"আজ রাত্রে আর একজন তোর অতিথি হইবে। তিনি দুধ ও খই খাইবেন।" দাদার জন্য আমি যথাশক্তি ফল ও দুগ্ধ আনাইলাম। দাদা বেড়াইতে গেলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহার প্রিয়তম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি আমার বাসায় আসিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত। শুনিলাম আমার বাসায় দাদাকে অন্বেষণ করিতে আসিলেন ও তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রিয়দাদা কলেজের বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক এবং উন্নত সাধক। দাদা আসিয়াই তাঁহাকে আমার বাটীতে রাত্র যাপন করিতে বলিলেন। উভয়ে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। রাত্রে বৈঠকখানায় আমাকে মধ্যে লইয়া তাঁহারা দুইজনে শয়ন করিলেন। সদালাপে কতক্ষণ কাটাইবার পর আমি নিদ্রিত হইলাম। প্রাতঃকালে প্রিয় দাদা চলিয়া গেলেন। ক্ষ্যাপাদাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া স্বপাক করিলেন। অপরাহ্নে বিদায় লইবেন। বলিলেন, "গতরাত্রে তোর উন্মীলন হইল।" আমি বুঝিতে পারিলাম না। দাদা আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। মধ্যে মধ্যে এ অনুচরের বাসায় পদধূলি দেন। তাঁহার দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত। তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁহার নিকট আমি গায়ত্রী ও তান্ত্রিকানুষ্ঠান পাইয়াছি। তিনি আমাকে দুর্লভ তারা বিদ্যার সন্ধান দিয়াছেন। তিনি পরে প্রকাশ করেন যে তিনি আমার নিকট বামের প্রেরণায় আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পক্ষে শ্রীবামের প্রতিনিধি।

ইনি কঠোর ব্রতী, নিষ্ঠাবান, গঙ্গাজল ছাড়া ব্যবহার করেন না। স্বপাক আহার করেন, অতি অল্পাহারী, প্রাচীন মুনিঋষিদের মত ত্যাগী, জ্যোতির্বজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ। ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান অভ্রান্ত। যোগসিদ্ধি তাঁহার করতলগত।

১৯৩১ সালে একদিনের এক ঘটনা জানাই। তারাক্ষ্যাপাজী মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া একা একটি বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। একদিন দুপুরে বিডন রোর একটি বাটীতে গিয়া দেখি, তিনি ঘরের মেঝের মাদুরে শুইয়া ছটফট করিতেছেন। কেহ কোথাও নাই। "কি ব্যাপার" জিজ্ঞাসা

করায় হাউ হাউ করিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া উঠিলেন ও হাহুতাশ করিতে লাগিলেন। আমি ত হতভম্ব, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই, ভাবা নাই। পরে তিনিই চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, আমি কি অন্যায় করেছি! অরে আমি আল্‌খান্ কচ্চি একাই। 'মা' নিজে এসে আমায় পাথার বাতাস দিচ্ছেন। আমি চোখ মেলে চেয়ে দেখি, ব্যাপার বুঝে 'মার' হাত হতে পাখা ছিনিয়ে নিয়েছি রে, মার হাতে কত লেগেছে। কি অন্যায় আমি করেছি রে।" বলিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করা গেল। এ সিদ্ধি কি সহজলভ্য!

তারাক্ষ্যাপাজী বহরমপুরে উমাবনম্ নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ১৯৪৫ সালের ২৩শে নভেম্বর দেহরক্ষা করেন। ইহার পূর্ব্বে প্রায় ২ বৎসর কেবলমাত্র ফলের রস সেবন করিয়া থাকিতেন। সামান্য একটু জ্বরভাব হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইবার তিন দিন পর দেহত্যাগ হয়। তাঁহার বয়স তখন শতাধিক হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তগণ উমাবনম্-এ তাঁহার সমাধির উপর মঠাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ও তাঁহার তিরোধান দিবসে উৎসবাদি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তমাত্রেই সে পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।

৪১। পিতৃবিয়োগে

শ্রীগুরুর চিন্তনে ও মধ্যে মধ্যে গুরুপ্রতিনিধির সঙ্গলাভে আনন্দ পাইতেছি। অর্থের অভাবও বাম রাখেন নাই। মহাভারতের ইংরাজি অনুবাদাদিতে অদ্ভুত কৃতিত্ব হেতু পিতৃদেব বিলাতি বন্ধু ও প্রশংসকগণের চেষ্টায় সরকার বাহাদুর হইতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন।

সাংসারিক সুখে

চরকের ইংরাজি অনুবাদও চলিতেছে। প্রকাশক কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন অর্থ জোগাইতেছেন। আমারও ওকালতিতে আয় আছে। ১৩১১ সালের চৈত্র মাসে নিজ মহকুমা শ্রীরামপুরে প্রথম অস্থায়ী মুনসেফি পদও পাইলাম। শ্রীরামপুরের উদারচেতা ডাক্তার গোপালচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় পিতৃদেবের অকৃত্রিম বন্ধু। আমার দীর্ঘব্যাপী জ্বর হইতে ও কৈশোরে বাতশ্লেষ্মা বিকারে বহুবার

কপর্দ্দক গ্রহণে আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তাঁহার ঋণ পরিশোধ আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি শাপভ্রষ্ট দেবতাকল্প। তিনি শ্রীরামপুরে আমাকে পৃথক বাসা করিতে দেন নাই। আমার সমস্ত বেতনই বাঁচিতেছে। দুইমাস পরে আমার হুগলি আদালতে যোগ দিয়া প্রসার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়বার নোয়াখালি জেলায় লক্ষ্মীপুর চৌকিতে অস্থায়ী মুনসেফি পদ পাইয়াও পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না। সন ১৩১২ সালের ফাল্গুন মাসে তৃতীয়বার ময়মনসিংহের মুনসেফি অস্থায়ী চাকরির প্রস্তাব আসিলে পিতৃদেবই ময়মনসিংহের জলবায়ু মন্দ নহে বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তথায় প্রায় ছয় মাস কার্য্য করিলাম। প্রথমে মন টেঁকে নাই, পরে অন্যান্য রাজকর্মচারী ও উকিল প্রভৃতির সঙ্গে সময় সুখেই কাটিল। কলিকাতায় কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন কয়েকখানি ইংরাজিতে কবিরাজি পুস্তক প্রণয়নের জন্য ভার দেন। তাহার পরিশিষ্টে আয়ুর্ব্বেদীয় তরুগুল্ম লতাদির পরিচয় দিতে হয়। সেইভাবে আম ময়মনসিংহে লিখিয়া পিতাকে সাহায্য করি। সুতরাং তাহাতেও অতিরিক্ত আয় হইতে থাকে। ময়মনসিংহে পূজাপর্ব্বেরও ব্যাঘাত হইত না। পিতৃদেব আমাকে পাঠাইয়া ব্যাকুল হওয়ায় তথা হইতে শীঘ্রই চলিয়া আসি। আর মুনসেফি করিব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াই পুনরায় হুগলিতে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। আয় কমিল না। এই সুখের মধ্যে দুঃখের কারণ, পিতৃদেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পরে তাঁহার গঙ্গালাভ। তবে বাবার কৃপায় এ হেন শোকও সম্বরণের শক্তি আসিল।

৪২। পুনরাহ্বান

পিতৃবিয়োগের কিছু পরে সন ১৩:৪ সালের ১৪ই চৈত্র শুক্রবার একটী পুত্র জন্মে। কৃশাকৃতি হইলেও তাহার মুখশ্রী সুঠাম গঠন ছিল। সম্মুখে একটী দাঁত উচ্চ থাকে। পুত্রটী আমার পিতৃদেবের রাশি পাওয়ায় তাহার উপর পিতৃদেবের প্রসাদ দৃষ্টি ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। অল্প বয়সে সে হাঁটিতে এবং কথা কহিতে শিখে এবং বুদ্ধি প্রাখর্য্যের পরিচয় দেয়। তাহাকে দিয়া বাব কতকটা চিত্ত-

বিনোদনও করান। শ্রাবণমাসে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে তাহার নিউমোনিয়া হইলে ডাক্তার অক্ষয় দত্তের চিকিৎসায় ও বামের প্রসাদে সে আরোগ্য লাভ করে। হুগলিতে ওকালতি পূর্ব্ববৎ করিতেছিলাম। সাংসারিক অভাব ছিল না। সন ১৩১৫ সালের শারদীয়া পূজায় জনাই যাইয়া নবপুত্রের অন্নপ্রাশন অবস্থামত দেই। হুগলির এক ধনী মক্কেলের মোকদ্দমা উপলক্ষে বাম পূজার পর কাশীধাম যাইবার অবসর দেন। আহার ঔষধ দুই হইল। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন হইল। অর্থও আসিল। কাশীতেই জ্যেষ্ঠ কন্যার পাত্রানুসন্ধানে শ্রীগুরু দাসকে প্রয়াগেও লইয়া গেলেন। তথায় বেণীঘাটে শাস্ত্রীয় বিধিপালনান্তে গয়াধামে আনেন। রেলে নিদ্রাভঙ্গে প্রভু দুই দেবী মূর্ত্তিও দেখান এবং ফল্গুতে স্নানাদি করাইয়া গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গণে চণ্ডীপাঠকালে নীলজ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পাইয়া আনন্দ দেন। ফল্গুতে পিতামাতার পিণ্ডদানের পর গদাধরের পাদপদ্মে তাঁহাদের ও জ্ঞাতি-বান্ধবাদি পিতৃগণের পিণ্ড দেওয়ায় আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত করেন। মাতৃ-ষোড়শিকা পিণ্ড দানকালে মাতার অগাধ স্নেহরাশি স্মরণে উদ্বেলিত হই। এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করাইয়া প্রভু এই দাসকে দেশে আনাইলেন।

গুরুভ্রাতা পিতৃব্যপুত্র সুবোধ ভায়ার সঙ্গলাভে পূজাবকাশ মহানন্দে কাটে। তিনি বিদ্বান ও নির্ম্মল হৃদয়, যথার্থ গুরুভক্তি তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাতে উন্মেষিত হইতেছিল। তাঁহার সহিত স্থির হয় যে আগামী বড়দিনে উভয়ের

শ্রীধাম যাত্রা

শ্রীধামে বামদর্শনে যাইব। বড়দিন আসিতেছে। শীতের প্রকোপ পড়িয়াছে। মনে হইতেছে বাহিরে যাইলে ক্লেশ হইবে। সুবোধ না আসিলেই ভাল হয়; কিন্তু বাম টানিয়াছেন। সরিয়া থাকিবার উপায় নাই। সুবোধকে দূত করিয়াছেন। তিনি বড়দিনের পূর্ব্বদিন ৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার আসিলেন; অপরাহ্নে যাত্রার উদ্যোগ হইল। পূজার জন্য ফল মিষ্টান্ন ও এক বোতল বিলাতি কারণ লওয়া হইল। আমার পত্নী পীড়িত। তাঁহার ইচ্ছা আমি না যাই। কিন্তু রাত্রে ১০টা ২৪ মিনিটের ট্রেনে হাওড়া হইতে দুই ভ্রাতা শ্রীধাম যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে একদল গায়ক বাদক চলিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। হুগলির পর একজন গৈরিকবসনধারী উঠিলেন। তিনি নাম গাহিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানে নামিয়া পার্শ্বে

লুপলাইনের গাড়িতে উঠিয়া শেষ রাত্রি সুনিদ্রায় যাপিত হইল। প্রত্যুষে গাড়ী ছাড়িয়া রাত্রি ৮॥• টায় মল্লারপুরে নামিয়া গোযানে বামকথায় আনন্দে চলিলাম। শীতের প্রভাব বোধ হইল না। কবিচন্দ্রপুরে আসিলে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলাম। মৃদুল পবন হিল্লোলে শরীর হর্ষিত। হৃদয়াধিকারীর দর্শনাশায় হৃদয় উল্লসিত, চিত্তচোরার সঙ্গলাভ নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া চিত্ত প্রফুল্ল। বাম যেন শ্যাম হইয়া গেলেন। গোপীভাব আসিল। মুখ দিয়া গীতের কলি বাহির হইল—

চল সখি যাই শ্যাম দরশনে।

সুবোধভায়া কলিকাতায় বলিয়াছেন, "দাদা তুমি বৈষ্ণব হয়েছ। যাইলেই বাবা পাঁটা খেতে বলবেন তখন কি করবে? প্রসাদ খাবে না? আমি উত্তর দিয়াছি, "তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য, আমি অবিচারিত ভাবে তাঁহার প্রসাদ লইব। তোমার কথা তিনি নিশ্চয় রাখিবেন। কিন্তু আমারও আব্দার শুনিবেন যে একদিন ভিন্ন পাঁঠা হইবে না।" অর্জ্জুন ও

সুধন্বার প্রতিজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণের দশা বামের হইয়াছে।

মান

বাম আমাদের আগমন জানিতে পারিয়া পাণ্ডাকে ইসারায় বলিয়াছেন। আমরা দ্বারকা পার হইয়া আশ্রমের নিকটে আসিলে হুটু বলিয়া উঠিল, "বাবা! ঠিক বটে, ঐ সুবোধদা আসছেন।" সুবোধ প্রণাম করিলে বাবা তাঁহাকে আদর করিলেন আমি প্রণাম করিলে বাবা ঔদাস্ত দেখাইলেন। হুটু আমার পরিচয় করিয়া দিলেও তিনি বলিলেন, "কে বাবা! আমি চিনিতে পারলাম্ না।" রাধার নিকট শ্যাম চন্দ্রাকে চিনিতে না পারিলে চন্দ্রার যে ভাব মহাজন বর্ণনা করিয়াছেন বাম আমাকে সেই ভাব দিলেন। আমার অভিমান আসিল, কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না। মনে হইল— আমাকে পরীক্ষার জন্য তোমার এই ছল। আর তুমি চিন কিম্বা না চিন তাহাতে ক্ষতি নাই। তোমার কৃপায় আমি তোমাকে কিছু চিনিয়াছি। আমার হৃদয়পটে তোমার মোহনমূর্ত্তি অঙ্কিত। তুমি কি আর আমায় ছাড়িতে পার?" আমার মনের ভাব কতকটা এইরূপ—

তোমারি কৃপায় হরি তোমাবে চিনেছি।
নীল নলিন আঁখি হেরিয়া মজেছি॥

কামনার মোহ ফাঁস ছিঁড়ে দাও শ্রীনিবাস
প্রেম পরমনিধি হৃদয়ে এঁকেছি।
(অনুপমা সুষমা তাই হৃদয়ে এঁকেছি)

"বাবা কি খাবেন?" বলিতেই বাবা সুবোধকে উত্তর দিলেন, "পাঁঠা খাব।" সুবোধ নিজ পণ রক্ষিত হওয়ায় হৃষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন, "হরিদা! কেমন? দাও টাকা, পাঁঠা আন্‌তে দেই।" আমি বলিলাম, "ঐ তহবিল হইতে যাহা আবশ্যক লও।" সুবোধ হুটু পাণ্ডাকে শ্মশানে পূজার জন্য ছাগাদির মূল্য দিয়া বাবার সম্মুখে বিলাতি কারণের বোতল দিলেন। বাবা নিজেই বোধ হয় বোতল খুলিলেন এবং স্বীয় কপাল পাত্রে প্রায় অর্দ্ধেক বোতল ঢালিয়া উৎসবান্তে অল্প নিজে পান করিয়া বাকি আমাকে দিলেন। আমি হাত বাড়াইয়া প্রসাদ লইলাম। প্রায় এক পোয়া বিলাতি ব্রাণ্ডি ছিল, কখনও জীবনে মদ খাই নাই। ভয় হইল পাছে অতটা পান করিলে বেগতিক হয়। বাবা চিত্তজ্ঞ। আমার হস্ত হইতে প্রসাদের পাত্র ফিরিয়া লইলেন। কণিকা গ্রহণে আমার ইচ্ছা ছিল। তিনি তাই দিলেন, আমি কিঞ্চিৎ জিহ্বায় দিয়া কপালে ফোঁটা পরিলাম। বাবা বাকী সমস্ত নিঃশেষ করিলেন।" তখন আমার মনে অনুতাপ আসিল। গুরুর প্রসাদে দ্বিধা করিলাম। বোধ হয় ঐ প্রসাদের ভিতর দিয়া তিনি শক্তি সঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আমি তাহা না লইয়া বড়ই ভুল করিলাম। মনকে আমার এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম—বাবা বুঝিলেন আমি বীরাচারের উপযুক্ত নই; তাই উহা দিলেন না। কখনও মনে হয় যে ইহজন্মে সিদ্ধিলাভের ঐ এক অবসর আসিয়াছিল, নিজে তাহা ছাড়িয়াছি। আবার মনে ভাবি বামই প্রবৃত্তি দাতা। তিনি যখন প্রসাদ গ্রহণের প্রবৃত্তি দিলেন না তখন তাহাই আমার ভাল। সুবোধ প্রসাদ চাহিলে বাবা আর এক পাত্র ঢালিয়া তাহাকে অর্দ্ধপাত্র দিলেন। সুবোধ পরম ভক্ত। আমার ন্যায় তাঁহার দ্বৈধভাব আসিল না। নিঃসংকোচে তিনি তাহা পান করিয়া শয়ন করিলেন ও তন্দ্রালু হইলেন।

প্রসাদ গ্রহণে সঙ্কোচ

আমি দ্বারকায় স্নানে গেলাম। তথায় অবিনাশ চৌধুরীর সহিত পরিচয় হইল। আমাকে বাবা প্রসাদ দানের সময় তিনি আশ্রমে ছিলেন

তিনি আমার প্রসাদ প্রত্যাখ্যান দেখিয়া আমাকে দোষারোপ না করিয়া ভালই বলিলেন। আমার মন কিন্তু তাহাতে প্রবোধ মানিল না। তিনি বামের ভক্ত। বামের কাহিনী তিনি সংক্ষেপে পত্রে ১২।১৪ পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে দেন।

বলির গুণাগুণ

স্নানান্তে আশ্রমে আসিয়া চণ্ডীপুস্তিকা হস্তে, বামের অনুমতির জন্য দাঁড়াইলে, শিমূলতলায় পূজাপাঠের জন্য বাম আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। আমি তথায় বেদীতে যাইয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম। উহা বসিষ্ঠের সিদ্ধাসন। মাদৃশ কামীর উহাতে উপবেশন সম্ভবপর নহে। বাম অনুমতি দিয়াছেন, তাই আমি বসিতে সাহসী হইয়াছি। বামের বিনানুমতিতে কত উন্নত সাধক ঐস্থানে বসিয়া বিভীষিকা দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। অনুমতি দিলে আমাকে উহাতে বসিবার শক্তি দিয়াও বাম বোধ হয় উত্তর সাধকতার জন্য শিমূলতলায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তখন তাঁহার শরীর স্থবির।

শিমূলতলা ৫।৭ হাত নিম্ন। তিনি পাণ্ডা প্রভৃতির স্কন্ধে ভর দিয়া তথায় বেদীর নীচে বসিলেন। জয়তারা রবে আমার প্রাণে উৎসাহ ও ভক্তি দিলেন। প্রেমানন্দে চণ্ডী পড়িলাম। পাঠান্তে সসম্ভ্রমে পীঠ হইতে নামিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলাম। আমি

বলির দোষ

তাঁহার প্রসাদ গ্রহণও করিলাম। তাঁহার দাস হইবার উপযুক্ত নহি। তথাপি এত কৃপা যে আমার মস্তকে দক্ষিণ চরণ দিলেন। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া কারণ করিয়া আমাদের উপর ভর দিয়া আশ্রমে আসিলেন এবং আমার দিকে পদ প্রসার করতঃ শয়ন করিলেন। আমি পদসেবা করিতে করিতে শুনিলাম আমার চণ্ডীপাঠ সময়ে ছুটুপাণ্ডা শ্মশানবাসিনী মার পূজার জন্য ছাগাদি আনিয়াছিলেন। সুবোধভায়া নিজহস্তে ছাগবলি দিবার প্রয়াসী। ক্ষ্যাপাবাবার নিকট যাইবার পূর্ব্বে এভাব তাঁহার ছিল না। তাঁহার ও আমার বংশে দুর্গোৎসবাদিতে বলি নাই। বাবার নিকট বীরাচার পাইবার পর তাঁহার বীরভাব আসিয়াছে। তিনি বলিতেন "বলি নিজ হস্তে দিলে বলিদানে পশুর কাতরতা উপলব্ধি হয় এবং তদ্বারা সংসারের মায়া কাটে। মহর্ষিগণের কতকটা এইরূপ মত, তাই আড়াই পোঁচে বলি।" ছুটু সুবোধকে

এই ক্ষেত্রে বলি দিতে বারণ করেন। বাবাও ঠারে ঠোরে তাই বলিলেন। সুবোধ তথাপি নিরস্ত হইল না। বরঞ্চ বাবাকে বলিলেন, "আপনি, বাবা, পাঁঠা বেঁড়ে করিলেন শুনিয়াছি, আমি কখনও করি নাই।" 'বেঁড়ে' কথা বাবার। তাহার অর্থ একযোগে কাটিতে না পারা। বাবা বলিলেন, "তুমিও বাবা, বেঁড়ে করিবে।" বোধ হয় সুবোধের বলি দেওয়া প্রবৃত্তি একেবারে কাড়িয়া লইতে চান। তাই বোধহয় তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য এমন উদ্দাম প্রবৃত্তি এইবার দিলেন যে সুবোধ নিষেধ না শুনিয়া খড়্গহস্তে ঘাতকের ন্যায় শিমূলতলায় দাঁড়াইলেন। নিরীহ ছাগকে হাড়কাটে ফেলা হইল। সে বে বে করিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহার মুখ চাপা গেল শ্বাস কণ্ঠেই বন্ধ হইল। সুতরাং সুবোধ সবলে খড়্গাঘাত করিলেও খড়্গ কেবল গলদেশ হইতে লাফাইয়া উঠিল। দ্বিতীয় বার সুবোধ কোপ দিলেন! তথাপি মুণ্ড আদপে কাটিল না। তখন সুবোধের ভীতি ও দয়া যুগপৎ উদিত হইলে তিনি খড়্গ ছাড়িয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আশ্রমে গেলেন। পাণ্ডা খড়্গ লইয়া মুণ্ড দ্বিধা করিলেন। এই দৃশ্যে সুবোধের প্রাণে এমন আঘাত লাগিল যে তাহার পর অদ্যাবধি তিনি খড়্গাদি অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক বঁটি ছুরি প্রভৃতি স্পর্শ করেন না। মনই বামের খেলা। সুবোধকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখিয়া বাবা আদর করিয়া তাঁহাকে বলেন—"বাবা! তারামা বেঁড়ে পাঁঠাও খান।" এই ব্যাঘাতে সকলের মন উদ্বেলিত। বেলাও হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রহরান্তে অন্নাদি ও ঐ মাংস পাক করিতে গেলে অপরাহ্ন হইবে। এই কারণে বাবার অনুমতি লইয়াই হুটু স্থির করিয়াছেন যে দিনে তারামার প্রসাদ আমাদেরও জন্য আসিবে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাকাদি করিয়া ৮।৯টার মধ্যে রাত্রে রাত্রে বাবার সেবা করাইবে। আশ্রমে পৌঁছিলে বাবা আমার দিকে পদ প্রসারিত করিয়া শয়ন করিলেন। আমি পদসেবা করিতে লাগিলাম। রাত্রে যৎসামান্য জলযোগ করিয়াছিলাম। বেলা ২টা এখনও জল স্পর্শ করি নাই। ক্ষুধা বেশ পাইয়াছে। সুবোধ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। হুটু আমাদের জন্য তারামার প্রসাদ আশ্রমে আনিলেন। বাবা কিন্তু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি আহার না করিলে আমরা কিরূপে আহার করি। সুবোধ আমা অপেক্ষা উন্নত। তিনি বলিলেন—"গুরুর স্থূলদেহ গুরু নন। এস উহার সূক্ষ্মদেহকে নিবেদন করিয়া তারামার

প্রসাদ পাই। আমার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি মুখে বলিলেন মাত্র কিন্তু গুরুর পূর্ব্বে আহার করিতে পারিলেন না। শয়ন করিলেন ও চিন্তা করিতে করিতে যেন নিদ্রিত লইলেন। আমি সানন্দে বাবার পদসেবা করিতে করিতে ক্ষুধা বিস্মৃত হইলাম।

অপরাহ্নেই হুটু পাণ্ডা আশ্রমের চুল্লী জ্বালিয়া রাত্রি ৮ টায় মধ্যে অন্ন মাংসাদি পাক করিলেন। বাবারও যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। বাহ্যজ্ঞান হইলে আদর করিয়া বলিলেন—"আজ আমার জন্ত সুবোধদার ও এই বাবার আহার হয় নাই। হুটু শীঘ্র পারশ কর।" হুটু অন্নাদি রাখিয়া দিল। আশ্রমের দাওয়ায় বাবা দক্ষিণমুখে, সুবোধ সম্মুখে, আমি তাঁহার দক্ষিণে পূর্ব্বমুখে বসিয়াছি। বাবা তারামাকে নিবেদন করিয়া নিলেন। সুবোধ প্রসাদের জন্ত হাত বাড়াইল। বাবা তাহাতেও না দেওয়ায় সুবোধ প্রসাদ চাহিল। বাবা বলিলেন—"হাঁ সবাইকে প্রসাদ দিয়া আমার কমিয়া যাক।" কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রসাদ তাঁহার হাতে দিলেন। আমি মুখে কহি নাই। মনে মনে চাহিয়াছি। বাবা তাই বলিলেন—"এ ব্যাটার ভিটকেলমি দেখ, মনে মনে চাহিতেছে মুখে কথাটি নাই। তা তুইও নে।"

প্রসাদ দান

কালুভুলু প্রভৃতি সারমেয়গণ বাবার সহিত ভোজনের জন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বাবা তাহাদের মুখে পাঁঠার মাংস দিতেছেন। তাহারা মাংসাশী। অন্ত সময় আমাদের সহিত পাঁঠার মাংস খাইত। বাম এবার নিজে দিতেছেন তাহারা খাইতেছে না। বাবা প্রকাশ্যে বলিলেন, "পাঁঠা খাওয়া বন্দ, দেখ না কুকুরেও পাঁঠা খায় না। পাঁঠার মা কাঁদে।" অহিংসাবাদ এককথায় এরূপ হৃদয়স্পর্শি-ভাবে কোথাও আছে কিনা জানি না। আমার হৃদয়ে ঐ কথা গাঁথিয়া গিয়াছে। কানেও বাজিতেছে। বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেরও হৃদয় "পাঁঠার মা কাঁদে" রবে শিহরিয়া উঠিবে। বামের কি অদ্ভুত শিক্ষাপ্রণালী।

পাঁঠার মা কাঁদে

আমাদের আহারান্তে হুটু প্রভৃতি আহার করিলেন। পরে বাবার শয্যা রচিত হইল। ইকড়ার হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় বাবার প্রিয় সন্তান। তিনি একখানি কম্বল বাবার জন্ত দিয়া যান। সন্তানের দেওয়া উপহার পিতার অত্যন্ত প্রিয়। তাই বাবা

যোগনিদ্রা

তাহাতে শয়ন করেন। উহা ও মাথায় বালিশ এবং একখানি লেপ পাতা হইল। এবার কোন মশারি দেখিলাম না। বাবা দাওয়ায় দক্ষিণদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিলেন। পাণ্ডা আমাদিগকে বাসায় লইয়া যাইতে চাহিলে বাবা বলিলেন, "না"। আমি ও সুবোধ ঐ দাওয়ায় বাবার বিপরীত দিকে কম্বল পাতিয়া পুটুলি মাথায় দিয়া শুইলাম। দাওয়ায় দরজা নাই। শয়নস্থানে একখানি পর্দা ফেলা হইল। একটি বাতি মৃদুভাবে জ্বালাইয়া রাখিলাম। বাবার অচিরে যেন নিদ্রা আসিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উহুঁ উহুঁ করিতেছেন। সুবোধকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "সমাধির দুই অবস্থা। সবিমর্ষ ও নির্বিমর্ষ। প্রথমে নানা অলৌকিক চিত্র সম্মুখে আসে। তাহা বিভূতি। বাবা সেগুলি চান না। তাই তাহা সরাইয়া দেন ও ঐরূপ কণ্ঠধ্বনি হয়। সমাধির দ্বিতীয় স্তরে অরূপ অবর্ণ অশব্দ অনন্ত মিলন। তাহাই বাবার অভিপ্রেত। ঐ দশায় শরীর নিস্পন্দ।" সুবোধ পাতঞ্জলাদি না পড়িয়াও বাবার কৃপায় সমাধির বিভিন্ন দশা অনুভব করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিত্যযোগী।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম পাইলাম। নিশীথে পাণ্ডা ফিরিবার উপক্রম করিলে জাগিয়া দেখি যে একটি কুকুর সুবোধ ও আমার মধ্যে আমাদের গাত্রবস্ত্র চাপিয়া শুইয়াছে। আর একটি আমাদের মস্তকের উপরে ও আর একটী পদতলে শয়ান। অতিত্রস্তে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। শেষরাত্রে বাবা ডাকিতেছেন, "সুবোধ দা সুবোধ দা।" আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সুবোধ পূর্ব্ববৎ যোগনিদ্রায় বা নিদ্রায় অভিভূত। আমি উত্তর দিলাম, "কেন বাবা? মধুরস্বরে বাবা কহিলেন—"তুমি বাবা জাগিয়াছ? আমায় শৌচে যেতে হবে।" আমি উঠিয়া বাবাকে তুলিলাম। তিনি আমার কাঁধে ভর দিয়া আশ্রমের বাহিরে কিছুদূরে যাইতে না যাইতে বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়া তরল মলত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "পাঁঠা খাওয়া বদ। পাঁঠা খেলে হজম হয় না। বীরাচারীর মুখে মাংসের ব্যবহার নিন্দা বোধ হয় আমাকে বেদাচারে বা বৈষ্ণবাচারে রাখিবার জন্যই শিক্ষা। আমি জ্যোৎকুণ্ড হইতে জল আনিয়া বাবার শৌচাদি করাইয়া জীবন সার্থক করিলাম। আমার কাঁধের উপর ভর

প্রাতঃকৃত্য

প্রভাত

দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। পূর্ব্বাস্যে বসিয়া বলিলেন, "বাবা! ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত। আর শয়ন করিতে নাই।" আমিও বসিয়া রহিলাম। কিছু পরে তারামায় মন্দিরে চর্চ্চরী বাজিল। প্রভাত সমীরণ বহিতে লাগিল। বিহগগণের কাকলী উঠিতেছে। পর্দ্দা তুলিলাম। সম্মুখে পূর্ব্বদিক বহুদূর পর্য্যন্ত খোলা। মাঠ ও আকাশ একত্র মিশিয়াছে। সূর্য্যদেব যেন মাঠ হইতেই উঠিয়া পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন।

৪৩। ব্রহ্মে মিলন

বাবা কহিলেন, "আমাকে ঐ নিমগাছের তলায় বসাইয়া দাও।" আমি আবার তাঁহার দিব্যদেহ স্পর্শে পবিত্র হইলাম। তাঁহার পবিত্রাঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য দিনমণিও যেন ব্যস্ত। শীঘ্র শ্যামলকায় বালার্ক অপূর্ব্ব শোভা ধরিল। নন্দ পাটনি বাবার আশ্রমে পাট করেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন বাবা রাত্রে বালকের ন্যায় শয্যায় প্রস্রাব করিয়াছেন। বাবাকে ঐ বিষয় বলায় তিনি কহিলেন, "তা হবে বাবা! নল দিয়া জল গড়াইয়াছে।" নন্দ শয্যা তুলিয়া তাহা জ্যোৎকুণ্ডে ধুইয়া রৌদ্রে দিলেন। শাস্ত্রে তন্ময়তা শুনিয়াছিলাম। বামে প্রথমবার তাহার নিদর্শন পাইয়াছিলাম। কিন্তু এইরূপ অবস্থা অদ্ভুত। প্রৌঢ় সজ্ঞান অথচ পূর্ণ বালক স্বভাব। শিবমানসস্তোত্রে আছে—"নিদ্রালস্যাথেৰ্বিষ্ণিঃ।" বামে তাহার পরিচয় পাইলাম। সুবোধ উঠিলেন। তাঁহার টলমল ভাব। তিনি বামের তন্ময়তা অভ্যাস করিতেছেন। হুটু পাণ্ডাও আসিল।

আমি শৌচে গেলাম। পবিত্র শিমূলতলায় শ্মশানে ঐ কার্য্য কিরূপে করি ভাবিয়া শীর্ণ দ্বারকা পার হইয়া কবিচন্দ্রপুরের মাঠে যাইলাম। পার হইয়া শ্মশানে লোটা মাজিতেছি। অহোরাত্র শ্রীবামের সঙ্গলাভ হইয়াছে। ঘণ্টা দুই মধ্যে তাঁহার দিব্যাঙ্গ স্পর্শ বারবার ঘটিয়াছে। তখন আমার মন বৈরাগ্যময়। সুতরাং বৈরাগ্যভাব আসিল। মনে মনে বাবাকে জানাইলাম, "বাবা! এই বয়সে এক পুত্র ইহাকে মানুষ করিতে পঁচিশ বৎসর যাইবে। এইরূপেই ত ষাট বৎসর

বৈরাগ্য ও মায়া

আমার সংসারে বাঁধিবে। তবে আর কবে বন্ধন মোচন করিবে? শ্মশান হইতে উঠিলেই মায়া আসিয়া মনকে অধিকার করিল। তখন ভাবিলাম, "একি পুণ্যক্ষেত্রে গুরুস্থানে, সিদ্ধকল্প গুরুর নিকট নবজাত পুত্রের মরণই কামনা করিলাম।" মায়া প্রভাবে বৈরাগ্য দূরীভূত। সুতরাং বাবাকে আবার জানাইলাম, "না বাবা! ভুল বলিয়াছি। পুত্রকে বাঁচাইয়া রাখিও।"

স্নানান্তে চেলিবস্ত্রে চণ্ডীহস্তে বাবার নিকট অনুমতির জন্ম দাঁড়াইলে বাবা শিমূলতলায় পূজার জন্ম ইঙ্গিত করিলেন। ঐ দিন ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ছাগ বলি হইবে না। বাবা তাহার পক্ষপাতী নন। শিমূলতলায় বেদীতে বসিয়া পূজা সারিয়া চণ্ডী পড়িলাম। বাবা পূর্ব্বদিনের স্থায় বেদীর নিম্নে বসিয়া আমার উত্তর সাধকতা করিলেন। পাঠান্তে বাবাকে প্রণাম করিলে বাবা মস্তকে চরণ দিলেন। বাবার বালভোগ চলিতেছে। এক বোতল কারণ, মুড়ি ও ভাজাভুজি। কে বলিল, "বাবা হরিবাবুকে প্রসাদ দিবেন না?" বাবা অভিমানের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"আমি মদ খাই। বাবা কি আমার প্রসাদ লইবেন?" গতকল্য কারণ প্রসাদ প্রত্যাখ্যানে বাবার এই মৃদু উপালম্ভ। আমি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলাম। বাবা দয়াময়। তখনি আমাকে দুটা মুড়ি ও আলু ভাজা দিলেন কিন্তু কারণ দিলেন না।

দ্বিপ্রহরে ভোগ আসিলে বাবা আমাদের লইয়া নিমতলায় ভোজন করিলেন। কারণ চলিতেছে। বাবা সুবোধকে কারণ দিতেছেন আমাকে দেন নাই, যৎকিঞ্চিৎ অন্নপ্রসাদ দিয়াছেন। বাবার প্রেমোদয় হইয়াছে। গান ধরিলেন—

মরবো আর অমনি যাবো ব্রহ্মে মিশাইয়ে।
কাজ কিরে ভাই পাপসংসারে আর থাকিয়ে॥

গীতটী মোক্ষদানন্দ বাবার রচিত। বাবা প্রায়ই উহা গাহিতেন। বাবার মহিমাভিপ্রায়ে আমার মুখ দিয়া প্রায় বাক্য সরিত না। আমারও হৃদয়-বীণা বাজিয়াছে, তাই হঠাৎ আমি বলিলাম, "বাবা! মরে কি ব্রহ্মে মিশায়? শাস্ত্রে তো বলে জীবদ্দশায় ব্রহ্ম মিশায়।" বাবা অমনি দক্ষিণকরের অঙ্গুলি দ্বারা কি এক মুদ্রা ধরিয়া তাহা ধীরে তুলিয়া শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এই যে বাবা! ব্রহ্মে মিশে আছি।" পরে স্তিমিত হইলেন। তাঁহার

ব্রহ্ম মিলন ছবি যেন আমার স্থূলহৃদয়েও পড়িল। শুনিয়াছিলাম কুলকুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে উঠাইয়া সাধক ব্রহ্মরন্ধ্রে মিশাইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। বামের কুণ্ডলিনী সর্ব্বদাই ব্রহ্মরন্ধ্রে বিরাজমান। তিনি যে যোগীরাট্ কতকটা বোধগম্য হইল। মাদৃশ পাপীতাপীর জন্য কখনও তাঁহার বুঝানেও তাঁহার ভক্তিভাব প্রবল হয়, সে ভক্তিতেও তন্ময়ত্ব। স্তিমিত দশাভঙ্গে বাবা ঐ গীতের প্রথম কলি এইরূপ পাল্টাইয়া গহিলেন—

মর্‌বো আর অমনি রব, ঐ শিমূলতলায় লুকাইয়ে।

হঠাৎ বীরভাব জাগিল; সদর্পে কহিলেন, "কোথায় আর যাব। এই শিমূলতলায় থাকিব, লাখ্ লাখ্ ক্রোড় ক্রোড় পাঁঠা খাব, সাদা পাঁঠা বাবা।"

ইহার অর্থ বুঝিলাম না। প্রভু কি বলিলেন, তিনি তারা বাম তাঁহার মৃত্যু নাই—তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব। তিরোভাব শিমূলতলায় অর্থাৎ তারাতত্ত্বে। সে তিরোভাবে অনন্ত দৃক্‌শক্তি বিদ্যমান। তদবস্থাতে তিনি জগৎ পরিচালনা করেন। অবোধ জীবসমূহের পশুভাব মোচন করেন। "সাদা পাঁঠা" বলিবার প্রয়োজন কি? ইউরোপের মহাসমর বাধিবার পর মনে হয় "বোধ হয় বাবা ঐ সময়ের ছায়া দিয়াছিলেন।"

আশ্রমেই মধ্যাহ্নের বিশ্রাম হইল। অপরাহ্নে একটি স্ত্রীলোক তাঁহার ষষ্ঠ সপ্তম বর্ষীয় পুত্রকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দাওয়ার উত্তরের খোপে বাবা বসিয়া আছেন। আমিও তাঁহার সম্মুখে। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত কাতরভাবে পূর্ব্বেই বাবাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রটীকে প্রণাম করিতে বলিলেও বালক তাহা করিল না। মাতা যত তাহার মাথা নোয়াইয়া দিতেছেন, পুত্র ততই মাথা তুলিতেছে ও কাঁদিতেছে। আমার বোধ হইল বালকের কোন ফাঁড়া আছে। তাই মা প্রাণের দায়ে বাবার নিকট আসিয়াছেন। রমণী কাতরকণ্ঠে বাবাকে বলিতেছেন—"বাবা, পায়ের ধুলো আমার ছেলেকে দিন।" বাবা ধীরভাবে আসীন। আমার প্রাণে দয়া আসিল। অবলার কাতরস্বরে আমি বাবার বিনানুমতিতেই তাঁহার চরণধূলি আমার দক্ষিণকরে লইয়া বালকের শিরে দিলাম। বাবা অমনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "ব্যাটা! এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার পায়ের ধূলি আমায় না-[illegible] দিলি। তোর ব্যাটার কষ্টের ভয় নাই।" কষ্ট শব্দ বাবা মৃত্যু

অর্থে ব্যবহার করিতেন। আমি ভীত হইলাম, কিছু বলিলাম না। মনে মনে বাবাকে জানাইলাম—আমি আপনার অনুমতি না লইয়া অন্যায় করিয়াছি, ক্ষমা করুন। দয়াপরবশতাই আমার এই মর্য্যাদা লঙ্ঘনের প্রণোদক। করুণাময় গুরু তখনই শীতল হইলেন। মা এই দৃশ্য দর্শনে ভীতা হইয়া উঠিয়া গেলেন। কেন আসিয়াছিলেন কিছুই বলিলেন না। বাবাও ঐ বিষয় কোন ইঙ্গিত করিলেন না।

রাত্রে দুগ্ধাদি জলযোগের ব্যবস্থাই হইল। সুবোধ যোগী। তাঁহার আহ্নিকাদি নাই। আমি ভোগী হইলেও সন্ধ্যাদি করিবার ইচ্ছা আমার হইল না। বাবার চরণসেবাই আমার সন্ধ্যা বাসনা নষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত সাধকের দিবারাত্রই ঐভাব—

কিবা দিবা সন্ধ্যা দিবা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।

আশ্রমে দীপ জ্বালা হইয়াছে। শুনা গেল বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্কন্যা আটলা হইতে তারাপীঠে আসিয়াছেন। বাবার কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র খুড়া মহাশয় কিছু পূর্ব্বে দেহ রাখিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি অনটনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রাচীন প্রভু ব্রজনাথ সাহা তাঁহাকে অংশী করিয়া সাহেবগঞ্জে যে দোকান করিয়া দেন ঐ দোকান রামকাকা রাখিতে পারেন নাই। ব্রজবাবুর পুত্র রামকাকার দোষ দিতেন। যাহা হউক ঐ দোকান উঠিয়া যাইবার পর রামের আর কোন চাকরি জুটে নাই। কয়েক বৎসর বাটীতে বসিয়াছিলেন। ধান জমি হইতে সচ্ছলে চলিত না। পরে রাম বিধবা পত্নী ও দুইটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বাবা সহোদরের জন্য কখন শোক করিতেন, "আহা রাম ভাই চলিয়া গেল।" আবার কখনও বলিতেন, "তা রামভাই পাপ করেছে তাই মরেছে—আমার মরণ নাই।" রামের মৃত্যুর পর সংসারের অনটন বৃদ্ধি হয়। খুড়িমা ইন্দুমতীর পক্ষে সংসার চালান দুর্ঘট। তাই তিনি জ্যেষ্ঠ কন্যাকে কখনও কখনও বাবার নিকট সাহায্যের জন্য পাঠাইতেন। ভগ্নী আশ্রমে আসিয়া জেঠার নিকট আবদার করিলেন, জেঠা বাবা! বড় শীত আমাদের গায়ের কাপড় নাই।" বাবা তাঁহাকে আদর করিলেন এবং সুবোধকে গাত্রবস্ত্রের ব্যবস্থার জন্য ইশারা করিলেন। আমি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচেতা। ভগ্নী আসিয়া গাত্রবস্ত্র চাহিতেই আমার ভয় হইয়াছে যে আমাকেই ঐ ব্যয় বহন করিতে

হইবে। যে বাম আমার এত উপকর্তা যাঁহাকে হৃদয়াধিকারী বলিয়া জানি তাঁহার অনাথা ভ্রাতুষ্কন্যা কাতরে শীতের বস্ত্র চাহিতেছেন, মায়াতীত বাবেরও প্রাণে মহামায়ার ঐ কাতর আবেদন লাগিয়াছে। সুবোধের প্রাণে ব্যাকুলতা আসিয়াছে। কিন্তু আমার হৃদয় এতই ক্ষুদ্র যে আমি তাহাতে গলিলাম না। বাবা তাই আমাকে ইঙ্গিত না করিয়া সুবোধকে ইঙ্গিত করিলেন। সুবোধ আমাকে বলিল, "হরিদা আমাকে ৪৲ টাকা ধার দাও।" আমি বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "ভাই! ধার লইবার প্রয়োজন নাই।" তহবিলে সামান্য টাকাই আছে। পথ খরচা রাখিয়া যাহা লইলে ভাল হয় লও। সুবোধ ৪৲ টাকা লইয়া ভগ্নীকে দিলেন। টাকা দিয়াও আমার চিত্তপ্রসাদ আসিল না। কৃপণের ঐ দোষ। ঘটনাক্রমে ব্যয় করিতে হয়। ব্যয়জনিত ক্লেশই পায়; বাবা আমার মনের ভাব নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন ভাবিয়া আমি মনকে ধমক দিলাম এবং কিছু পরেই সঙ্কীর্ণতাও দূর হইল।

একপ্রহর রাত্র পরেই সুবোধ ও আমি সামান্য জলযোগ করিলাম। বাবা সন্ধ্যার পরই তারামার প্রসাদ পোয়াটাক দুগ্ধ পান করেন ও কয়েকখানি লাল আটার পুরি কুক্কুরদিগকে দেন। পূর্ব্ববৎ বাবা আশ্রমের দাওয়ায় উত্তরাংশে দক্ষিণদিকে মাথা করিয়া এবং আমরা দক্ষিণাংশে উত্তরদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিলাম। প্রত্যুষে বাবা উঠিয়া আমাকেই ডাকিতেছেন, "বাবা জাগিয়াছ।" আমি শয্যা ছাড়িয়া বাবাকে তুলিলাম। দেখি বাবা শয্যায় প্রস্রাব করিয়া বালকের ন্যায় তাহাতে ভাসিতেছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে বাবার বালকবৎ মুগ্ধ সরল স্বভাব দেখিয়াছিলাম, এবার বালকের ন্যায় বাহ্য আচরণ দেখিলাম। পূর্ব্ববার বাবাকে সবল দেখি, এবার শরীর অপটু দেখায় বয়স অনুসন্ধান করিয়া জানি যে আন্দাজ ৭১ বৎসর হইয়াছে। এই বয়সে মহাপুরুষের দেহ মন কেন ভাঙ্গিল সুবোধকে বলায় সে বলিল, "বাবার শরীরে অধ্যাস নাই।" সে বুঝিয়াছিল বাবা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবেন। আমি স্থূলবুদ্ধি। আমার মনে তাহা আসে নাই।

শৌচান্তে স্থির হইল যে অদ্য শিমূলতলায় ভোগ হইবে। হুটুপাণ্ডা ভোগের ভার লইলেন। অর্থ দিয়া আমি স্নানে গেলাম। আশ্রমে আসিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধানে বাবার ইঙ্গিতমত শিমূলতলার বেদীতে আমি পূর্ব্বদিনবৎ পূজায় বসিয়াছি। বাবাও আমার উত্তর সাধকতার জন্য বেদীর নিম্নে বসিয়া "জয়তারা" রবে আমাকে উৎসাহিত করিতেছেন। আমার পূজার প্রধান অঙ্গ চণ্ডীপাঠ। তাহা আরম্ভ করিয়াছি। এমন সময় স্বরসংযোগে বুঝিলাম কোন প্রধান ভক্ত আসিয়া শিমূলতলায় বাবার সহিত মিলিত হইয়াছেন। আমি শুনিলাম বাবা যেন বলিতেছেন—"পরেশ দাদা।" প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে হাওড়ায় জনৈক ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছিলাম যে পরেশ নামে ক্ষ্যাপা বাবার এক উন্নত সন্ন্যাসী শিষ্য আছেন। ছোট ক্ষ্যাপাকে তখন আমি পাইয়াছি। পরেশদাদাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই মনে হইল পরেশদাদা বোধ হয় আসিয়াছেন। অচিরে তাঁহার সহিত মিলন হইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলাম।

পাঠান্তে বেদী হইতে নামিয়া বাবাকে প্রণাম করিলে বাবা শিরোদেশে দক্ষিণচরণ দিলেন। তখন তিনি কারণ করিতেছিলেন। মুড়ি ও ভাজাভুজি শুদ্ধি ছিল। আগন্তুক ভক্তের সহিত পরিচয় হইল। তিনি পরেশদাদা নন; তাঁহার নাম জ্ঞানানন্দ পরমহংস। তাঁহার বিবরণ স্থানান্তরে আছে। তাঁহার দীক্ষাগুরু চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর উপরে মেধসাশ্রম আবিষ্কার করিয়া তথায় দশমহাবিদ্যা স্থাপনে উদ্যত। ঐ কার্য্যে অর্থ সংগ্রহ জন্য তিনি জ্ঞানানন্দদাদাকে কাশী হইতে বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছেন। বর্দ্ধমানে তখন জনৈক সাবজজ ছিলেন। তিনিও বেদানন্দের শিষ্য। জ্ঞানানন্দ তাঁহার নিকট চাঁদা তুলিবার জন্য যাইতেছেন। পথে চিত্তচোরাকে দেখিবার জন্য লুপলাইন দিয়া রামপুরহাটে নামিয়া তারাপীঠে ছুটিয়া আসিয়াছেন। বাবা তাঁহার প্রাণের আশা বুঝিয়াছেন। তাঁহাকে আদর করিতেছেন। জ্ঞানানন্দদাদা আমার পরিচয় পাণ্ডার নিকট পাইয়া আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করতঃ বাবাকে বলিলেন, "বাবা!

জ্ঞানানন্দ

এঁকে একটু প্রসাদ দিন।" বাবা তখন মানের ভাব তুলিয়া কহিলেন, "আমি মদ খাইতেছি। ইনি তো মদ খান না। ইনি কি আমার প্রসাদ লইবেন? আমি গতকল্য বাবার কারণ প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করায় বাবার অভিমান হইয়াছে বুঝিয়া মরমে মরিয়া গেলাম। বাবা কারণ জানেন। আমার হৃদয় অনুতপ্ত বুঝিয়া আমাকে কিছু মুড়ি ও ভাজা প্রসাদ দিলেন। কারণ দিলেন না।"

দ্বিপ্রহরে শিমূলতলায় ভোগ আসিল। মাংস হয় নাই, মৎস্য জুটে নাই। বাবার এমন কি সুবোধেরও আপত্তি উঠিল না। বাবা তাঁহার আশ্রম গৃহের চাবি আনিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। আমি পাইলাম না। ঐ চাবির আবশ্যকতাও ছিল না। আমার ইচ্ছা প্রসাদান্তে চাবি খোঁজা যাইবে। বাবা তাহাতে আমার উপর কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"চাবি না পেলে ব্যাটার ভোগ কে খাবে? তিনি শিখাইলেন যে—

আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া।—রঘুবংশ, ১৪ সঃ।

গুরুজনের আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত ইহা শিষ্যের বিচার্য্য নহে। চাবি হুটু পাণ্ডা লইয়া গিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম। শিমূলতলায় আমাকে ও বাবাকে নিরামিষ দেওয়া হইল। তিনি দক্ষিণাস্যে বসিলেন, আমি পূর্ব্বাস্যে, সুবোধ ও জ্ঞানানন্দদাদা উত্তরাস্যে বসিলেন। আমাদের তিনজনের শালপাতায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি। একযন্ত্র দেশী কারণ ও স্থবিতানন্দ আছে। গতবার তন্ত্রের চক্রে দেখিয়াছিলাম, এবার চক্রে বাবা স্থান দিলেন।

তারাই আশ্চর্য্য ভৈরবী

আমার মনে হইল বিনা ভৈরবী চক্রানুষ্ঠান কিরূপে তন্ত্র-সম্মত হয়। বাবা আমার ভ্রম ভাঙ্গাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তারাই আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী।" জ্ঞানানন্দদাদা বলিলেন, "হাঁ বাবা, তাতো ঠিক।" বাবা বলিলেন, "দেখ না বাবা! বামে তো ভৈরবী বসিয়াছেন।" আমার আঁখি অন্ধ. তিমিরে তিমিরহরাকে দেখিতে পাইল না। বাবা চক্রেশ্বর। তিনি কারণপাত্র অগ্রে লইয়া জ্ঞানানন্দ ও সুবোধকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে দিলেন না। আমি দুঃখিত হইলাম না। আমার প্রাণ উদাস, শিমূলতলায় শূন্যভাবে ভাবিত। হুটুকে একটু কারণ প্রসাদ দিলেন। অন্ন প্রসাদ সকলকেই বাবা দিলেন। আমার কারণ

প্রসাদ আমা ব্যতীত বাকি কয়জন পাইলেন। ফুটু তখন একটু চঞ্চল হইয়াছে। জ্ঞানানন্দদাদার পদ ধরিয়া কাঁদিতেছে ও বলিতেছে, "তুমি আমার গুরু, আমাকে প্রসাদ দাও।"

চক্র

জ্ঞানানন্দ বলিতেছেন যে তিনি প্রসাদ দিবেন না। দিলে তাঁহার শক্তি ক্ষয় হইবে। আমার শক্তি নাই। শক্তি আমি পাই নাই। সুতরাং আমি উহাদের ভক্তিকলহ মিটাইবার জন্য জ্ঞানানন্দদাদার পাতা হইতে ফুটুকে কিঞ্চিৎ অন্নপ্রসাদ দিলাম। উভয়েই তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন।

চক্র চলিতেছে। বাবা আমাকে আর প্রসাদ দিতেছেন না। সুবোধ ও জ্ঞানানন্দদাদার মধ্যে মধ্যে প্রার্থনামত অল্প কারণ প্রসাদ ও ত্বরিতানন্দ প্রসাদ দিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে খাইতেছি। একঘণ্টার উপর কাল অতিবাহিত। আমার উদর পূর্ণ। আর বসিতে ভাল লাগিতেছে না। বিশেষ হাতে উচ্ছিষ্ট কড়কড়াইতেছে। বাবা আমার মনোভাব বুঝিয়া আমাকে উঠিবার অনুমতি দিলেন। আমি জীবৎকুণ্ডে আচমন করিয়া পুনরায় শিমুলতলায় নিজস্থানে আসিয়াছি, অমনি বাবা বলিলেন, "তোকে তো প্রসাদ দেওয়া হয় নাই, এই নে, বলিয়া এক থাবা ভাত তরকারি আমাকে দিলেন। আমি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাহা লইয়া মুখে তুলিয়া খাইতেছি, বাবা আমায় এক ভাব দিলেন। তখন বাবার দুটী অনুচর সারমেয় দুইদিক হইতে আসিয়া আমার অঞ্জলি হইতে আমার সঙ্গে প্রসাদের ভাগ লইতে লাগিল। বাবা

গুরুপ্রসাদ

আর এক থাবা প্রসাদ দিলেন। আমার ঘৃণা বা কোন সঙ্কোচ আসিল না। ফুটু দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় হরিবাবুর জয়, ধন্য গুরুভক্তি"! জ্ঞানানন্দদাদা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, "দেখিতেছ না! বাবার কৃপায় হরি ভাবস্থ। তোমার চীৎকারে ভাবভঙ্গ হইতে পারে।" নির্ব্বিকার বাম নিজভাব আমার হৃদয়ে কিছু সংক্রামিত করিয়াছেন। চীৎকারে সে ভাব কি ভঙ্গ হয়? আমি পরমানন্দে বামের প্রিয়পার্শ্বচরগণের সহিত বামের প্রসাদ পাইলাম। বাম ঐ ভাব ঐ আনন্দ কি বদ্ধমূল করিবেন না? তখন বুঝি নাই, পরে বুঝিতে পারি যে প্রভু পূর্ব্বদিন আমাকে বীরাচারের দ্বারা শক্তিসঞ্চার জন্য কারণ প্রসাদ দিয়াছিলেন। আমি তাহার অধিকারী নহি বলিয়া তাহা গ্রহণে আমার দ্বৈধভাব আনেন ও ঐ প্রসাদ ফিরাইয়া

লন। অন্ত বেদাচারের নিরামিষ অন্ন প্রসাদ দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিলেন, নচেৎ মাদৃশ পশু কখন শবভোজী সারমেয়ের সহিত নির্ব্বিকার চিত্তে ভোজন করিতে পারে না। শক্তি সঞ্চারের ব্যাপার রাম পরে ইঙ্গিতও করেন।

৪৫। বরদান

প্রসাদ দানে এই অধম দাসে শক্তি সঞ্চার করিয়া রাম চক্র সমাপন করিলেন। তিনি নির্ব্বিকার। আচমন করিলেন না। জ্ঞানানন্দ ও সুবোধ আচমন করিতে জীবৎকুণ্ডে গেলেন। বাবা আমার ও পাণ্ডার উপর ভর দিয়া শিমূলতলা হইতে উঠিয়া আশ্রমের উত্তর পার্শ্বে নিমতলায় বসিলেন। রামের দত্ত অন্নপ্রসাদে আমার হস্ত উচ্ছিষ্ট। আচমন করিবার প্রবৃত্তি আমার হইল না। জ্ঞানানন্দদাদা আসিলে বাবা পশ্চিমদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিলেন। জ্ঞানানন্দদাদা বাবার পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সুবোধ তন্ময়ভাবে পার্শ্বে আসীন। আমি শূন্য ভাবে ভাবিত। জ্ঞানানন্দ সন্ন্যাসী, ভক্ত! রামের সহিত চক্রে বিশেষতঃ রামের পদস্পর্শে তাঁহার হৃদয়বীণায় ভক্তিরাগিণী বাজিল। তিনি জ্ঞানী। সুতরাং জ্ঞান মিশ্র ভক্তির গীত মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন—

জয় মা তারা আদ্যাশক্তি জয় মা তারিণী তোমারি জয়।
তোমাতেই স্থিতি তোমাতে উৎপত্তি তোমাতে জীবের হয় মা লয়॥
জল বিম্ব যথা জলেতে উঠিয়ে ক্ষণতরে তাহে ভাসিয়ে ভাসিয়ে।
ভোগ অবসানে শক্তিহীন হয়ে পুনঃ সেইজলে মিশায়ে যায়॥

পূর্ণা শক্তি তথা তবশক্তি বলে
জীবগণ ভবে চলে কলে বলে।
সে শক্তির অভাব হইলে মা ঘটে
মানুষে তাহারে মরণ কয়॥
কখন কি ঘটে কিরূপ মা কর
কিঞ্চিৎ মহিমা জানেন শঙ্কর।
তাই শিরে ধরি শম্ভু গদাধর
কখন পতিতপদে শবের প্রায়॥

জ্ঞানানন্দরূপে এ ঘটে আসিয়ে
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অজপা জপিয়ে।
হংসমন্ত্র যেন শেষে উল্টাইয়ে
সোঽহং হয়ে তোমাতে মিশায়ে যায়॥

গানটী জ্ঞানানন্দের না হইলেও প্রাণের আবেগে জ্ঞানানন্দদাদা ভণিতা নিজেরই দিলেন। আরও একটী কলি আছে—

নৈশ সমীরণে প্রেম পরিচয়
ইশারা ইঙ্গিতে কি জানি কি হয়।
শাম্ভবী তারিণী তোমারি জয়॥

গীতটী বাবার প্রিয়। আমি ইহা প্রথম শুনিলাম। দেশ কাল ও পাত্র বশতঃ ইহা আমার অত্যন্ত মধুর লাগিল। আমার প্রাণ যেন গলিয়া গেল।

জ্ঞানানন্দ কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া গেলেন। আমি বাবার শ্রীচরণ ধরিলাম। বাবা পূর্ব্ববৎ শয়ন এবং সমাধিস্থ। মহানন্দে পদে হাত বুলাইতেছি। মন বাসনাশূন্য। হস্ত যে উচ্ছিষ্ট তাহা মনে নাই। আমাদের বাসনা অনাদি ও অনন্ত। তাহার বীজ দগ্ধ হয় নাই। সুতরাং মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনটি বাসনা জাগিল। তবে তাহা অসৎ নহে। বাবাকে মনে মনে জানাইলাম—যেন ধর্ম্মজগতে স্থান পাই, দানজগতে স্থান পাই, সাহিত্য জগতে স্থান পাই। আরও নীরবে বলিলাম—"যদি এই বরত্রয় বাবা দিতে সম্মত হন তাহা হইলে তিনি তৎনিদর্শনস্বরূপ দুইটি চরণ তৎক্ষণাৎ আমার মুখে তুলিয়া দিবেন।" অন্তরজ্ঞ রাম তৎক্ষণাৎ একখানি করিয়া ক্রমে দুইটি চরণই আমার মুখমণ্ডলে স্থাপন করিলেন। আমি তাহা জিহ্বাদ্বারা লেহন করিলাম। ধূলি ধূসরিত পাদপদ্মের কি অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ। লেহনের ফলে বিমলানন্দে বিভোর হইলাম! ঘণ্টাভোর পদসেবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। পরে বাবা উঠিলেন। জ্ঞানানন্দও বিশ্রামান্তে বাসা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বাবাকে গাঁজা সাজিয়া দিলেন। আমাকে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় দিলেন। সৎকথায় শীতের সংক্ষিপ্ত দিবস অতিবাহিত হইল। রাত্রে বাবার জন্য তারামার প্রসাদ আসিল। আমাদের উদর পূর্ণ। যৎসামান্য জলযোগান্তে আশ্রমে পূর্ব্ববৎ বাবা, আমি ও সুবোধ রাত্রি-যাপন করিলাম।

৪৬। উপাধি লাভ

অদ্য জ্ঞানানন্দ ফিরিবেন। আমাদেরও কর্ম্মসূত্রে গৃহে টানিয়াছে। আমরা তিনজন একত্রে বেলা ২৷৷০ টার ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিব স্থির হইয়াছে। গো-শকট স্থির আছে। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে তারাপীঠ হইতে যাত্রা না করিলে ট্রেণ ধরা অসম্ভব। সুতরাং বাবার ইশারামত খেচরান্ন ও শাক-ভাজাদি ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্নানান্তে পূর্ব্ববৎ শিমূলতলার বেদীতে বাবার ইঙ্গিতানুসারে পূজাপাঠ করিলাম। চণ্ডীপাঠে প্রফুল্লতা আসিল। পূজাশেষে বাবাকে প্রণাম করিলে বাবা আমার মস্তকে দক্ষিণচরণ দিয়া আমাকে ডাকিলেন, "শিমূলতলার ভট্টাচার্য্য বাবা।" আমি তাঁহার কথার অর্থ তখন কিছুই বুঝি নাই। এক্ষণে অল্প অল্প বুঝিতেছি যে শিমূলতলার অর্থাৎ তারাপীঠের তারাতত্ত্বের ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ ব্যাখ্যাতার পদ আমাকে তিনি দিলেন। আমি বাবার অত্যন্ত অধম অকৃতী সন্তান, কামের দাস, সত্যাপলাপ ব্যবসায় আছি। তথাপি আমার উপর তাঁহার এত কৃপা? ইহা আমার গুণে নহে, তাঁহার অপার দয়ার ফলে।

আমি অধম অকৃতি বলে
তুমি কম ক'রে কিছু দাও নি।
আমি অযোগ্য অপাত্র বলে কেড়েও তো কিছু নাও নি।

বেলা ১০টা হইয়াছে। খিচুড়ি ভোগ আসিল। আশ্রমের পার্শ্বে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বাবা আহারে বসিলেন। আমরা তিনজনেও বসিলাম। তিন দিন আসিয়াছি। প্রথম দিন বাক্যপূরণার্থ ছাগবলি হইয়াছে। সুবোধ উন্নত সাধক। তাহার বাক্য তো রক্ষা হইবে। আমি অধম। অভিমানভরে তারাপীঠ যাত্রাকালে আমি সুবোধকে বলিয়াছিলাম যে একদিনমাত্র আমিষ। বাবা আমার কথাও রাখিবেন। বাবা তাহাও পূর্ণ করিলেন। কাল ঠাকুরটিকেও একবার এইরূপ দুইভক্তের বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা রাখিতে হইয়াছিল। ভক্তপ্রধান সুধন্বার সহিত যুদ্ধে পার্থ প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি কৃষ্ণে আমার মতি থাকে তবে এই বাণে সুধন্বার শিরশ্ছেদ করিব, সুধন্বাও প্রতিজ্ঞা করেন যে ঐ বাণ ছিন্ন করিব। সুধন্বা অর্জ্জুনের বাণ ছিন্ন করিলেন বটে কিন্তু ছিন্ন

বাণ সুধধার শিরশ্ছেদ করিল। তাঁহারা উভয়ে ভক্ত। সুবোধ বাবার পরম ভক্ত। আমি তো ভক্ত নহি। তথাপি যে বাবা আমার অভিমানের বাণী শুনিলেন ইহা তাঁহার বাঞ্ছাকল্পতরুত্বের পরিচায়ক।

এই দিন পূর্ব্বদিনের ন্যায় বাবা চক্র করিলেন তবে অধিক বিলম্ব করিলেন না। একঘণ্টায় আহার হইল। জ্ঞানানন্দদাদা সুরা দিতেছেন। বাবার নিকটই বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার বদন সহাস্য। জ্ঞানানন্দ করযোড়ে বাবাকে বলিলেন, "তুমিই কাশীতে পাঠাইয়াছ তাই গিয়াছি ও তথায় মন্ত্র লইয়াছি কিন্তু গুরু তুমিই, তোমাকে আমি ছাড়িব না।" বাবা তাঁহাকে আদর করিলেন, "তুমি আমার পরমহংস।" জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "হাঁ বাবা, তোমার কৃপাতেই আমার সব।" বাবা এইবার আমাকে "আবার আস্বি" বলিলেন না, সুবোধকে বলিলেন। ফলে আমি আর স্থূলে তাঁহার সঙ্গ পাই নাই। সুবোধ আরও বহুবার পাইয়াছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্য ও তপস্যা প্রবল।

যেন হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া বাবার নিকট বিদায় লইলাম। মন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ। কিন্তু বাবার কি অচিন্ত্য মহিমা, শ্মশান পার হইয়া মাঠে শকটে উঠিতেই মন প্রফুল্ল হইল! তিন ভ্রাতায় বাবার কথোপকথন করিতে করিতে ষ্টেশনে আসিলাম ও অপরাহ্নে রেলগাড়িতে উঠিয়া রাত্রি ১১॥০ টার সময় কলিকাতার বাসায় পৌছিলাম। রাত্রে জলযোগ মাত্র হইল। তিনজনে একত্র বৈঠকখানায় শয়ন করিলাম।

প্রভাতে সুবোধ জনাই গেলেন। জ্ঞানানন্দদাদা ও আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম। পূজাপাঠ করিলাম। আমার অনূঢ়াকন্যাগণের মুখে শঙ্করকৃত অন্নপূর্ণাস্তবাদি শুনিয়া দাদা বড়ই প্রীত হইলেন। মধ্যাহ্নে একত্র প্রসাদ পাইলাম। তিনি আমাকে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সঙ্কেত বুঝাইলেন। বাবা শিমুলতলায় ভট্টাচার্য্যপদের অধিকার দিয়াছেন। হৃদয়ে তন্ত্রতত্ত্ব প্রতিভাত করিতেছেন বটে, কিন্তু তন্ত্রের ভাষাও বুঝা চাই। জ্ঞানানন্দ দাদা পণ্ডিত। সেইজন্যই বোধ হয় আমার সহিত তাঁহার যোগাযোগ করাইয়া তন্ত্রের অগ্রগণ্য মহানির্ব্বাণের ভাষার চাবি আমাকে দিলেন।

পরদিন জ্ঞানানন্দদাদা বিদায় লইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই!

সন্ন্যাস লইয়াছি গৃহস্থের ঘরে একদিনের অধিক অবস্থিতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। দেখ না তোমার সহিত কয়েকদিনের সাহচর্য্যে তোমাকে তো ভালবাসিয়াছি। একদিনমাত্র তোমার পুত্রকন্যাগণকে দেখিয়া যেন মায়ামুগ্ধ হইতেছি। এইবার কার্য্যে কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিব বটে, কিন্তু এক গৃহস্থের আতিথ্য একদিনের অধিক লইব না। আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম। বাবার দেহরক্ষার পর রামপুরহাটে তুইবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় ও একত্র তারাপীঠ যাই। আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সংবাদও পাই নাই।

৪৭। চিত্রদর্শন

তং মৌনদীক্ষাংশুবিবুদ্ধপদ্মান্ শিষ্যান্ শরণ্যং খলু দর্শয়ন্তম্।
রূপাক্ষরারূপ তুরীয়তত্ত্বং বামাভিধানং পুরুষং নমামি॥

তারাপীঠ হইতে দ্বিতীয়বার ফিরিবার পর বামের কৃপার পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তাঁহার প্রতি আকর্ষণ বাড়িল। অসৎ প্রবৃত্তি কমিতে লাগিল। ধ্যানধারণা গাঢ় হইল। অলৌকিক চিত্র আলোক মধ্যে দেখিতে লাগিলাম। দীক্ষার পূর্ব্বেই বাম আমার জননীর মূর্ত্তি ও স্বীয় মূর্ত্তি দেখান। দীক্ষার পর দেবীমূর্ত্তি ছায়া ছায়া দেখিতাম।

সন ১৩১২ সালে রুশ জাপান সংগ্রামে সন্ধ্যার পর সুষিমার জলযুদ্ধের চিত্র দেখাইয়া দূরদৃষ্টির কিঞ্চিদনুভূতি দেন। গয়ায় শ্রাদ্ধের দিন ট্রেণে প্রত্যূষে কালী ও তারার স্পষ্ট মূর্ত্তি অন্ধকারে চপলার ন্যায় চমকাইয়া যায়। বিষ্ণুপদ মন্দিরে স্বামী স্নিগ্ধনীলজ্যোতিতে নয়নমন মোহিত করেন। গণেশমূর্ত্তির শিরোদেশে বৃহন্নালের উপর কর্পূরগৌর শ্রীশঙ্কররূপ সুস্পষ্ট মানস নয়নে ভাসান। জ্যোতির্ম্মণ্ডলে মেঘশ্যাম চতুর্ভুজ গদাপদ্মধারী এবং মুরলীবদন তৃতীয় নয়নের সম্মুখেও শ্রীগুরু ধরিলেন।

সন ১৩১৩ সালে ভাদ্রমাসে শুক্লাচতুর্দ্দশীতে কলিকাতাতে পূজাকালে মুদিতনয়নে চিত্রের পর চিত্র বদলাইলেন।

কি অদ্ভুতদৃশ্য আজি দাসে পূজাকালে।
কৃপা করি কৃপাময় শ্রীবাম দেখালে॥
কোথা কাশী পুণ্যধাম আনন্দ নগরী।
কোথা রজোগুণ এই কলিকাতা পুরী॥

কাশীক্ষেত্রে বিশ্বনাথ শ্রীমন্দির পীতকর্ণিকার শিবলিঙ্গ লোল জিহ্বা ফণি বামাঙ্কেতে নীলা থর্ব্বা বামপাদ আকুঞ্চিতা দক্ষিণ লম্বিতা দশমহাবিদ্যামূর্ত্তি একের পর এক উঠিয়া শূন্যে লয় হইলেন।

বাম চিত্রদর্শনের ক্ষোভ আর বড় রাখেন নাই। সকল দেবীর রূপ উজ্জ্বলালোকে মানস নয়নে ধরিয়াছেন। সুষুম্নার ও ষট্‌চক্রের চক্রে চক্রে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ও বীজ কিরূপ তাহা বুঝাইয়াছেন। বিদেহ হইবার পর মানস চক্ষু যেন অধিক খুলিয়া দিয়াছেন। পরচিত্তজ্ঞানও দিতেছেন। এই দাসের সান্নিধ্যে অপরকে জ্যোতিঃ এবং জ্যোতির্মণ্ডলে দেবদেবী চিত্র দেখাইতেছেন। সে লীলা এস্থলে প্রকাশ্য নহে। এই সূক্ষ্মদেহের লীলা প্রচারের জন্যই শ্রীবাম অনতিবিলম্বে তাঁহার নরদেহের লীলা সম্বরণ করিলেন। সে ঘটনা অতঃপর বর্ণিত হইল।

৪৮। মহাপ্রস্থান ও সমাধি

ক্ষ্যাপাবাবার মহাপ্রস্থান ২রা শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী ১৩১৮ সালে। এই তিথির আট দিন পূর্ব্বে পূর্ণিমা তিথি রাত্রি ১।৪৫ মিঃ সময় বাবার জন্য তারামার ভোগ যাহা রাখা ছিল ময়ুরভঞ্জের উকিল হরিভূষণদাদা বাবার সামনে ধরিলেন। দিনের বেলায় আহারাদির ফলে বাবার দেহ বেশ সুস্থ ছিল না। আবার রাতে প্রসাদ খাইবার জন্য হরিভূষণদাদার পীড়াপীড়ি শ্রীনগেন্দ্র বাগচীর ভাল লাগিল না। তাঁহার আশঙ্কা গুরুতর আহারে বাবা আরও অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। বয়স ত হইয়াছে। শেষ জীবনে নগেন ছায়ার মত বাবার পাছে পাছে থাকিতেন ও ঘৃণা ও দ্বিধা ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক মনে বাবার বিষ্ঠা মূত্র পরিষ্কার ও অন্যপ্রকার যাবতীয় সেবা করিতেন। কিন্তু উপস্থিত ভক্তগণ, যথা ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের



বামা ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি মন্দির

—পশ্চিমবঙ্গ টুরিস্ট এসোশিয়েসনের সৌজন্যে

মুনসেফ অবিনাশ রায়, ময়ূরভঞ্জের পেসকার জয়চন্দ্র, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সঙ্গী অমূল্যবাবু, ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য্য, ব্রজ পাঠক ও এক পাগলা সাধু কেহই ইহার প্রতিবাদ করিলেন না। অবশ্য বাবা দুই চারটী ভাত ও মহাপ্রসাদ ইত্যাদি নামমাত্র মুখে দিলেন। শ্বেতফুল ও কালু কুত্তা দুইটি দুইপাশে প্রসাদ পাইল। হঠাৎ দুই কুত্তা উন্মত্ত হইয়া দুইদিক হইতে পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল। মধ্যে বাবার থালা ও বাবা বসিয়া আছেন। নগেন বাগচী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া দুইএর ফাঁকে হাত দিয়া দুই কুত্তাকে সবেগে দুইদিকে ঝটকাইয়া ফেলিয়া দিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাবার নাসারন্ধ্র হইতে কয়েক ঝলক তাজা রক্ত নির্গত হইতে দেখা গেল। বাগচী প্রমুখ সকলেই অনুমান করিলেন যে কুত্তাদের নখ বা অন্য কোনভাবে আঘাতের ফলে উক্ত রক্ত বাহির হইল। সেই রাত্রি সে ভাবেই কাটিল উক্ত ঘটনা বাবার আশ্রম ঘরের সম্মুখ বাহির অঙ্গনে দোচালায় ঘটে। সেই চালের পাশে এক বিরাটকায় কেলিকদম্ববৃক্ষ ছিল। এই কেলিকদম্বমূলে তখন তিনি বসিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাপার যাহা ঘটিল কুকুর দুইটি নিমিত্ত মাত্র। আসলে বাবার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া রক্ত বাহির হইল। এ ব্যাপার তখন উপস্থিত কেহই বোধ হয় বুঝিলেন না। পরদিন তাঁহাকে একটু অসুস্থ দেখা গেল। ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। অবিনাশদাদা অক্লান্ত পরিশ্রমে বাবার শুশ্রূষা করিয়া জীবন ধন্য করিলেন। এইরূপে ৪।৫ দিন কাটিল। বাবা একটু সুস্থ হইয়াছেন, বোধ হইল। পরে দেখা গেল আর একজন পাগলা সাধু খালি গা, ছোট কাপড় পরা বৈকালে আশ্রমে উপস্থিত হইল ও বাবার সামনে বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। বলিল, "আর কেন ওকে বত্রিশ বাঁধনে বেঁধে রেখেছিস, বার কর।" এ কথায় সকলে বিরক্ত বোধ করিলেন। তখন "আমার কথা বিশ্বাস হ'ল না। আচ্ছা দেখতেই পাবি" বলিয়া নিরস্ত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এইদিন রাত্রে ১—৩৫ মিঃ সময় তারামার অষ্টমী পর্ব্বের প্রসাদ মুখে দেওয়ামাত্র তিনবার "তারা, তারা, তারা" বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা দেহ রাখিলেন। তখন ভক্তগণের হাহাকার রবে শ্মশান গৃহস্থের অঙ্গনে পরিণত হইল। পাণ্ডাগণ ও তদঞ্চলবাসী সকলে আসিয়া নিজ প্রিয়জনের বিরহে

আকুল হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুত্তাগুলিও বাদ গেল না। একটী কুকুর সটান রামপুরহাটে গিয়া করুণ আর্ত্তনাদে মহেন্দ্র কুণ্ডকে সংবাদ দিল। পরে শ্রীরামের সমাধির স্থান লইয়া নগেন্দ্র বাগচীর সহিত অন্যান্যদের বিষম মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ আশ্রম ঘরেই সমাধি দেওয়া উচিত বলিলেন। তখন বাগচী সকলকে বাবার আদেশ জানাইলেন—যাহা গত দুই মাস যাবৎ প্রত্যহ দুই তিনবার তিনি তাঁহার শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছেন ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছেন—"এই নিমতলায় মোক্ষদানন্দের সমাধির পাশে আমায় উত্তরমুখে বসাইয়া সমাধি দিবেন, বাবা!" যখন লোকে তাঁহাকে শ্মশানে পূজার জন্য লইয়া যাইত, তখন তিনি ঐকথা বাগচীকে পূজায় বসিবার পূর্ব্বে দৈনিক দুই তিনবার বলিয়া ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশে স্থান দেখাইয়া তবে পূজায় বসিতেন। এই কথা অন্য সকলে বিশ্বাস করিলেন না। সমাধির ব্যাপার লইয়া বেশ দ্বিধা ও মতভেদ চলিল। পরদিবস সাহাপুর নিবাসী জমিদার মুরারীমোহন পাল ও পোপাড়ার জমিদার যোগীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাগচীর নিকট সবিশেষ শুনিয়া ক্ষ্যাপাবাবার আদেশমত পূর্ব্বোক্ত নিমতলায় সমাধি দেওয়াইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে পাগলা সাধুটি দুই মাস যাবৎ আশ্রমে আসিয়াছিলেন সমাধি দেওয়ার পর মুহূর্ত্তেই কোথায় উধাও হইয়া গেলেন, তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যখন নিমতলা খনন করা হইল, তখন দেখা গেল এক প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি মাটির নীচে আছে। তাহার উপরে সমাধির মন্দির নির্ম্মাণ করা হইল। কিংবদন্তী আছে এই মন্দিরের ভিত্তি তারামার প্রাচীন মন্দিরের। ক্ষ্যাপাবাবার প্রিয় ভক্ত হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় অন্যূন ২০০০৲ টাকা ব্যয়ে বাবার বর্ত্তমান সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দেহরক্ষার দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই ক্ষ্যাপাবাবা বলিতে থাকেন, "ঘোড়া গাড়ী এল, পাল্কী বেহারা, ভাণ্ডারী, খানসামা, ঘোড়া গাড়ী এল?" তাঁহার ভাষা বিচিত্র, কিন্তু গভীর অর্থযুক্ত। তারাক্ষ্যাপা বলিতেন, তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, যে বাবা সপ্তাশ্বযোজিত সূর্য্যালোকের পথে চলিলেন।

রবের্মধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ
হুতাশাৎ পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ ব্রহ্মক্ষরাক্ষর।

শ্রীরাম বলিতেন—

মরব আর অমনি যাব ব্রহ্মে মিশায়ে, তারামার চরণে লুকায়ে, শিমূলতলায় লুকায়ে।

তারামা "আকাশ তারা" শূন্যরূপ শশীভালী। শিমূলতলা অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনীতলা, ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ, অর্থাৎ সহস্রার কে বুঝিবেন বুঝুন, শ্রীরাম কি ছিলেন, কোথায় গেলেন! আমরা বলি তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। যে তাঁহার ভক্ত, যে তদ্গত চিত্ত, সেই দেখে, সেই বুঝে, তিনি তাহারই সহিত লীলায় রত! তাঁহার বিদেহ লীলারহস্য তাই অনুভূতি সাপেক্ষ। চক্ষুষ্মান ভক্ত গাহিয়াছেন—

আনন্দচিৎসত্যমরূপমাদ্যং
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং।
লীলাময়ং ব্রহ্ম পরমং পুরাণং
রামাভিধানং পুরুষং নমামি।
জয়তারা, জয়রাম।

উঠবি। সস্ত্রীক জপ করবি, অন্ন খাবি। তাহলেই উঠতে পার্বি, তোর ঠাকুর-মার টাকা নিতে রাজী আছি। সেও সাধ্বী ছিল?" ভক্ত পূর্ব্বজন্মের সংবাদে ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে আনন্দে আত্মহারা, তবুও সংশয় মনকে ছাড়ে না। ঘটনা চক্রে ভক্ত তাঁহার জনৈক বন্ধুর মুখে কাশীতে ভৃগুজ্যোতিষ কার্য্যালয়ে প্রাচীন কোষ্ঠি গণনার কথা শুনিয়া অবধি তাঁহার এই জ্যোতিষ গণনার ইচ্ছা জাগে। তিনি একবার কাশীতে গিয়া নিজেই গণনা করান। কার্য্যালয়ের পণ্ডিত ভক্তের জন্মলগ্ন অনুসারে সঠিক কোষ্ঠি বাহির করিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়া দেন। তাহাতে তিনি জানিয়া অবাক্ হইলেন যে ক্ষ্যাপাবাবা যে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের হত্যা দোষের কথা উল্লেখ করেন ভৃগুও কোন্ প্রাচীনযুগে রচিত কোষ্ঠিতে এই দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছেন—যথা পূর্ব্বজন্মে তীর্থস্থানের কলহকালে জাতকের দাপটে একটি শিশু মারা যায়। সেই হত্যা অপরাধে জাতক নিঃসন্তান ও দরিদ্র। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেও সন্তান সম্ভাবনা নাই।

বলা বাহুল্য বাবার আশ্রম মন্দির বামামিশনের কর্ম্মীদের দ্বারা তাঁহার ঘরের উপরই নির্মিত হইয়াছে। যে সাধ্বী বিধবার টাকার কথা বাবা বলিয়াছিলেন, সে টাকাও বাবার জমি ক্রয়ের কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিটি ভবিষ্যৎ বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠে, ক্ষ্যাপাবাবা ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সিদ্ধকল্প শিষ্যদ্বয় শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীতারানাথ ব্রহ্মচারীকে (বহরমপুরের তারা ক্ষ্যাপা) পূর্ব্বোল্লিখিত সংবাদ দুইটি নিজেই জানাইতে পারিতেন? তবে কেন ইহার জন্য এই ভক্তটিকে দূতরূপে নিয়োগ করিলেন? মহাপুরুষের অভিসন্ধি ভেদ বড় কঠিন। তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, প্রিয় ভক্তটির কল্যাণে তাহাকে এই উন্নত শিষ্যদ্বয়ের স্নেহনীড়ে বাঁধিবার জন্য এই আয়োজন। ইহাদের জীবিতাবস্থায় ভক্ত প্রকৃতই তাঁহাদের অনুগ্রহে আধ্যাত্মিক জীবনে উৎকর্ষ লাভ করেন এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে আজও অন্তঃস্বত্ত্বায় অনুভব করেন এই মহাপুরুষদ্বয় তাঁহার মঙ্গলে সদা জাগরুক।

৩। তৃতীয় ঘটনা। বাবার তিরোধান উৎসব, ২০শে শ্রাবণ ১৩৪১ সাল, স্থান তারাপীঠ ক্ষ্যাপাবাবার সমাধিমন্দির, একাদশী রাত্র ১—২টা। অতিথি অভ্যাগতদের বাবার প্রসাদাদি বিতরণ করিয়া কর্ম্মীরা ক্লান্ত হইয়া আশ্রম

গৃহে বিশ্রাম করিতেছে। এমন সময় ইন্দু পাণ্ডা বাবার পাকা ভোগ লইয়া আসিয়া বলিলেন—সমাধিতে বাবার ভোগ নিবেদন করিতে হইবে, চলুন। সকলেই ক্লান্ত। একজন ভক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া হাত মুখ ধুইয়া শ্মশানে সমাধি মন্দিরে চলিলেন। ভক্ত বাবার সম্মুখে আসনে বসিলেন। দেশালাই পাওয়া গেল না। পাণ্ডা ঠাকুরকে আশ্রম হইতে উহা আনিতে বলা হইল। তিনি চলিয়া গেলে সারাদিন উপবাসী ভক্ত আসনে স্তিমিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ তিনি অনুভব করিলেন তাঁহার দেহ যেন শূন্য শূন্য, যেন তন্দ্রাঘোর অনুভব করিতেছেন। দেহে যেন কম্পন ও রোমাঞ্চ। সহসা তাঁহার মূলাধার হইতে উর্দ্ধদিকে সুষুম্নায় সহস্রার পর্য্যন্ত কয়েকটি বীজের ঝঙ্কার উঠিল ও আবার নীচে নামিল ও আবার উঠিল আবার নামিল। বারবার তিনবার বাবা বলিলেন এই তোর মন্ত্র; ভক্তের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিল। পরমুহূর্ত্তে দীপ জ্বালা হইল। ভোগ নিবেদন করিয়া ভক্ত আবেগভরে বাষ্পাকুল হৃদয়ে টলিতে টলিতে আশ্রমে আসিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া শাস্ত্রাদি অনুসন্ধানে জানিলেন যে তিনি বাবার কৃপায় সত্যই মহামন্ত্র পাইয়াছেন। জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন। শ্রীবাম তাঁহাকে ভাগ্যবশে কৃপা করিলেন। ইহা বাবার অহেতুক কৃপা।

ভক্ত মহাত্মা তারা ক্ষ্যাপাকে একদিন প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —বাবা, আমার দীক্ষাকালে যে মন্ত্র হইয়াছে, সে কিরূপ"। উত্তরে ক্ষ্যাপাজী বলেন--একদিন তারাপীঠে রাত ১২টার পর বাবার সমাধিমন্দিরে বসিস, বুঝিতে পারিবি।" এতকাল পরে এই সুযোগ আসিল সুফলও ফলিল। মহাপুরুষের বাক্য কখনও বৃথা যায় না।

পরে ক্ষ্যাপাবাবা সাধক ভক্তকে করণ-কারণ ও ক্রমদীক্ষাও দিয়া কৃতার্থ করেন। বাবার লীলা অতি গুহ্য। স্থান কাল পাত্রে কি অঘটন ঘটিল। ভক্তের জীবন ধন্য হইল।

৮। চতুর্থ ঘটনা। ১৩৭১ সালে আশ্বিন ভক্ত ভোর ৪টায় নিদ্রাভঙ্গে শয্যায় শুইয়া একাগ্র চিত্তে ক্ষ্যাপাবাবাকে স্মরণ মনন করিতেছেন। পরে মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, "আজ কাশীধাম যাইতেছি, সেখানে গিয়া, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে, অন্নপূর্ণা মার মন্দিরে বিশালাক্ষী মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করিব।

অমনি শুনিলেন, বাবা বলিলেন—কালীতারা মন্দিরেও চণ্ডীপাঠ করিস্।" ভক্ত একটু স্তম্ভিত হইলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন কালীতারা মন্দির আছে কাশীতে, কই কোথায় জানি না ত? যাহা হউক তিনি এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন—যে কাশীধাম যাত্রা বাবা এইভাবে অনুমোদন করিলেন। ভক্ত যখন যে তীর্থে যান বাবার কাছে জানান। এবার কিছু জানাইতে সাহসী হন নাই, কারণ টিকিট ক্রয় করিতে ও বাড়ীভাড়া সংবাদ আসিতে দেরী হইয়াছে, তাঁহার ভয় পাছে বাবা অনুমতি না দেন। তথাপি ভক্ত উদ্বিগ্ন যে তাঁহার সঙ্গী বন্ধু যে কাশীতে একতলায় দুখানি ঘর ভাড়া স্থির করিয়াছেন সেগুলি কিরূপ স্বাস্থ্যকর হইবে। কাশীতে একতলার ঘর প্রায়ই নর্দ্দমার গন্ধে ভরপুর ও অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর হয়। ভগ্ন শরীরে কাশী গিয়া এইরূপ ঘরে বাস করিয়া না দেহে নূতন করিয়া রোগের সৃষ্টি হয়! যাহা হউক বাবার এই আদেশ পাইয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া যথা সময়ে রওনা হইয়া গেলেন। বন্ধুর সহিত হাবড়ায় মিলিত হইয়া ট্রেনে উঠিলেন। পরদিন ১১টার পর ট্রেন হইতে নামিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে একা ছাড়িয়া 'দয়া বাঙ্গালী টোলার পথ ধরিলেন। পথে যাইতে যাইতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা তুমি ত প্রতি বৎসর কাশী বেড়াইতে আস, কালীতারা মন্দির কোথা জান? "বন্ধু বলিল না ভাই আমার ত জানা নাই। কোনদিন নামও শুনি নাই"। ভক্ত প্রমাদ গণিলেন। একেত একতলার ঘরে স্বাস্থ্য বিষয়ে উৎকণ্ঠা, তাহার উপর আবার এই এক সমস্যা। "দেখা যাক্ বাবা কি করেন" বলিয়া অগ্রসর হইলেন। যতই এগোন ততই অন্য গলি তস্য গলি। শেষে আর একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গলিতে ঢুকিলেন। দুইদিকে আকাশচুম্বী দুর্গন্ধযুক্ত জঞ্জাল। ভক্তের হৃদয় দুরু দুরু। বাবাকে ডাকিতেছেন—এ কি ব্যাপার বাবা, যা ভয় করেছিলাম তাই হল। এই অন্ধকূপে নিয়ে এসে শেষে কি মারবে, বাবা।" পরক্ষণেই সরু গলি পথে অগ্রসর হইয়া একেবারে গঙ্গার ধারে পৌছিয়া এক বাটীতে ভক্ত দেখিলেন—পূর্ব্বদিকে গঙ্গা সব ফাঁকা ঘর দুটি রৌদ্র ঝলকে উজ্জ্বল। কোন নর্দ্দমা বা দুর্গন্ধের লেশ ত্রিসীমানায় নাই।" জয় রাম, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। একটা সমস্যার চমৎকার সমাধান ত বাবা করিয়া দিলেন।

পরে জিনিসপত্র সব গুছাইয়া স্নানাহ্নিক সারিবার জন্য বন্ধু যোগিণী ঘাটে

গেলেন, ভক্তও পরে গেলেন। যোগিণী ঘাটে স্নান ও যোগিণী মন্দিরে পূজা পাঠ সারিয়া সেখানে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মনের প্রবল বাসনা কালীতারা মন্দিরের রহস্য ভেদ। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এক কথায় এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন—ভক্ত যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। পুরোহিত বলিলেন—হ্যাঁ কালীতারা মন্দির আছে বৈকি ? এইত যোগিণী গলি পার হয়ে বাঁদিকে তিন চারখানি বাড়ীর পর প্রথম যে পাথরের বাড়ার দরজা পাবেন সেইটিই কালীতারা মন্দিরের দরজা। তুইতিন মিনিটের পথ। রাণীভবানীর কীর্ত্তি। এখানে কৃষ্ণ রাধিকা, গোবিন্দ, বিশালাক্ষী দুর্গা মন্দির এক চত্বরে, আর কালী-মন্দির পেছনে ও তার পূর্বদিকে ভিতর দিকে তারা মন্দির, একসঙ্গে সব দেখবেন।" ভক্তের একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল।

কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি ছুটিয়া চলিলেন পুরোহিত নির্দিষ্ট দরজায় প্রবেশ করিয়া রাণী ভবানীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারীদের সহিত আলাপ পরিচয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন, এই কালীতারা মন্দির। পরদিন ম্যানেজারের অনুমতি লইয়া তারা মন্দিরে চণ্ডীপাঠে ব্রতী হইলেন। সামনের চত্বরে প্রথমেই পাথরে বাঁধান উঠান। উহার তিনদিকে একতলা সমান উচ্চ রোয়াক ও বিগ্রহ তিনটির পূজাগৃহ, পূজার সামগ্রী রাখার ঘর। ব্রাহ্মণ পূজকাদি যাঁহারা ভোগ প্রসাদ পান তাঁহারা উঁচু রোয়াকে ও অনিমন্ত্রিত জনসাধারণ নিম্ন উঠানে বসেন। রাণীমার দয়ায় বহুলোক এখনও ভোগ প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই দৃশ্যে তারাপীঠে রাণীমার সেবার কথা মনে পড়িল। ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ক্ষ্যাপাবাবা কাশী যাত্রায় যে ছত্রে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন সে কথা মনে আসিল। মনে হইল ১২৭১ সালে বাবা সম্ভবতঃ এই ছত্রেই পায়ের ধুলা দিয়া এস্থানকে ভক্তের নিকট তারাপীঠের ন্যায় পবিত্রক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। (১৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। তারাপীঠেও বাবা রাণী ভবানীর সেবা গ্রহণ করিতেন, কাশীতে তাঁহারই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন একথা মনে করিবার একটু কারণ আছে। মন্দিরে যে বেদীর উপর তারামূর্ত্তি দণ্ডায়মান উহা রাণী ভবানীর কন্যা সাধিকা "তারার" সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত, স্থান জাগ্রত। কেহ সন্ধ্যার পর ওখানে একা বসিতে পারে না। ভক্তের মনে হইল এমন স্থানে রাণীমার কোন প্রতিকৃতি কি দেখিতে পাইবেন না!

ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইলেন না। শেষে মনের ইচ্ছা মনে চাপিয়া কয়েক দিন চণ্ডী পাঠের পরে একদিন তারামূর্ত্তির সামনে বারান্দায় ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত প্রায়। দেহ সহসা দুলিয়া উঠিল। মন ডুবিয়া গেল। সহসা দেখিলেন বেদীর মধ্যে মৃতের উপবিষ্ট কঙ্কাল মূর্ত্তি। তাহার সামনে একজন ব্রাহ্মণ ৪০।৪৫ বৎসর বয়স কৃষ্ণ শ্মশ্রু বিশিষ্ট যোগীবর উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে আর একজন স্থূলকায় মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণও বসা অবস্থায় দেখা দিলেন। ইঁহারা গুরু ও পুরোহিত হইবেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এক মহীয়সী নারী বয়স ৬০।৬৫ বৎসর। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, কাঞ্চনবর্ণা, বিধবার বেশ ক্ষৌম বস্ত্র মাথায় টানিয়া বরণডালা বাম হাতে ধরিয়া সামনে দাঁড়াইলেন ও শঙ্খটি ডান হাতে দিলেন। কতক্ষণ এই মূর্ত্তিগুলি সামনে ছিল ভক্তের কোন খেয়াল নাই। যখন আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া উঠিলেন তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু। প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বুঝিলেন কেন বাবা এই কালীতারা মন্দিরে আনিলেন ও ২০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে জীবিত সাধিকা রমণীর সাক্ষাৎ করাইয়া মঙ্গল আশীর্ব্বাদ দেওয়াইলেন। তাঁহার মনে বদ্ধমূল ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে এই সেই ছত্র যাহার উল্লেখ ১৬৮ পৃষ্ঠায় আছে। এখানে আর একটি ব্যাপার স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাবার ন্যায় মহাপুরুষের কাছে কালের ব্যবধান কোন বাধাই নয়। যোগবলে ব্যাসদেব মৃত কুরু বীরগণের প্রেতগণকে আহ্বান করিয়া তাপসমণ্ডলী পাণ্ডবাদি ও রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রকে দেখাইয়াছিলেন (পৃ. ২০২)। শ্রীরাম তাঁহার প্রিয় ভক্তকে কাশীতে চণ্ডীপাঠ স্থলে, টানিয়া আনিয়া রাণীমার মূর্ত্তি দেখাইয়া ভক্তের কল্যাণে মঙ্গল শঙ্খে আশিস দেখাইয়া দিলেন, কি বিচিত্র লীলা।



শ্মশ শিমূলতলার বেদী ব ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি

(খ) শিমুলতলায় সাধনা

১। পঞ্চ মকার সাধনা

(আর্য্যদর্পণ, ১৩৬৭ সাল, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত)

সদাত্মভাবসন্তুষ্ট মুক্তপুরুষ শ্রীবামা শ্মশানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ দিনে আসন্ন বৃষ্টিপাত নিবারণ করিয়া মেঘশাসন বিদ্যার পরিচয় দেওয়ায় তাঁহার সিদ্ধবার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইলে দলে দলে লোক তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসে ও শ্মশানে ভিড় জমায়! কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ আত্মভোলা, কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। একবার দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্বর্গীয় রামেশ্বর সিং পুত্রকামনায় ও জটিল পারিবারিক মোকদ্দমায় বিপর্য্যস্ত হইয়া সুফল আশায় তারাপীঠে ক্ষ্যাপাবাবার শরণাপন্ন হন ও বসিষ্ঠাসন শিমূলতলায় চক্রেশ্বর হইয়া চক্রের অনুষ্ঠানে তাঁহাকে রাজী করান। অনুষ্ঠান যথারীতি পালিত হইল। বলা বাহুল্য মহারাজের উভয়বিধ কামনাই পূর্ণ হইল।

ব্রহ্মমন্ত্রী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং তত্ত্বচক্রং সমারভেৎ।

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

ব্রহ্মমন্ত্রসিদ্ধ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ সাধককে চক্রেশ্বর করিয়া তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মহারাজের সৌভাগ্যক্রমে দুর্লভ বস্তুও তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়াছিল। তাই সুফলও ফলিয়াছিল অনিবার্য্য। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠানে ভৈরবীর উপস্থিতি তন্ত্রসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু ক্ষ্যাপাবাবার বাহ্যতঃ কোন ভৈরবী ছিল না। একবার শিমূলতলায় ভৈরবী-চক্রের অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রিয় শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণেতা), ক্ষ্যাপাবাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা আপনার ভৈরবী কই?" উত্তরে ক্ষ্যাপাবাবা বলেন, "বাবা তারামা আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী, এই যে বাবা পাশে বসে আছেন।" যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়াছে

তিনিই দেখিলেন—অপরে ভাবিলেন পাগলের প্রলাপ। এই সব অনুষ্ঠানে বাহ্য মৈথুন ব্যতীত অন্য মকার ব্যবহার হইত না। কারণ তিনি ছিলেন শুক্লপন্থী। পঞ্চ মকার সাধনা তান্ত্রিক বামাচারের বিশিষ্ট অঙ্গ। মন্ত, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চতত্ত্ব। পূজায় যথারীতি মন্ত্র দ্বারা ও নানান প্রক্রিয়া দ্বারা শোধন করিয়া দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া "চিদগ্নৌ হবিঃ শেষং হুত্বা" গ্রহণ করিতে হয়। ইহার মধ্যে আদ্য ও শেষতত্ত্বই ব্যভিচারের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ অজিতেন্দ্রিয় তথা অনধিকারী ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট হইয়া মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ নিষেধ আছে—নির্বিকল্প ও নির্বিকার না হইলে কুল পথে মদ্য ও মৈথুনতত্ত্বের সেবা করিবে না। যথা—

কুলদ্রব্যং নিষেবেত যদি স্বত্বাধিকা মতিঃ।
অন্যথা সেবনে দেবি। পতনায়ৈব কল্পাতে।
নির্বিকারণে দেবেশি! নির্বিকল্পেন চেতসা
সেব্যমানং কুলং ভদ্রে ভুক্তি মুক্তি প্রদায়কম্
সবিকল্পো মহেশানি রৌরবংযাতি নিশ্চিতম্।

—কৈবল্যতন্ত্র, ২য় পর্য্যায়।

দেবি, মতিশুদ্ধ হইলে তবে কুলদ্রব্য অর্থাৎ মদ্যাদি সেবন করিবে, নতুবা পতন। নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প চিত্তে সেবা করিলে ভক্তি ও মুক্তি লাভ হয়; সবিকল্প চিত্তে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করিলে নরকগামী হইতে হয়। কলির জীব দুর্ব্বলচিত্ত ও নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়া জানিতে পারিবে না বলিয়া সদাশিব পার্ব্বতীকে উপদেশ দিয়াছেন যে মৈথুন পরিবর্ত্তে নিজ ইষ্টদেবীর পাদপদ্মচিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে ও মদ্যের পরিবর্ত্তে মধুরত্রয় অর্থাৎ দুগ্ধ শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া ইষ্টকে নিবেদন করিবে। কুলার্ণব তন্ত্রের সাবধান বাণী শুনুন।

কৃপাণধারা গমনাৎ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসাধনম্।

উদ্যত কৃপাণশ্রেণীর উপর দিয়া গমন বরং সহজ, ব্যাঘ্রের কণ্ঠালিঙ্গন বরং সহজ, ফণীর ফণায় হস্তক্ষেপও বরং সহজ কিন্তু কুলসাধন এই সকল অপেক্ষাও অত্যন্ত কঠিন। ইহার কারণ রুদ্রযামল দেখাইয়াছেন। যথা—

বামে চন্দ্রমুখী মুখে চ মদিরা পাত্রং করাম্ভোরুহে
মূর্দ্ধি শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতী ধ্যানাস্পদং মানসং।
জিহ্বায়াং জপসাধনং পরিণতিঃ কৌলক্রমাভ্যাগমে
যেষাং বৈ নিয়তং পিবন্তু সুরসং তে ভুক্তি মুক্তিগতা।

বামে সুন্দরী যুবতী, মুখে মদিরা, হস্তে পানপাত্র, মস্তকে শ্রীগুরুচিন্তা, মনে ভগবতীর ধ্যান, জিহ্বায় মন্ত্রজপ কৌলসাধনায় যাঁহাদের ইদৃশী পরিণতি তাঁহারা সুরস পান করুন, ভোগ ও মোক্ষ তাঁহাদেরই করায়ত্ত। এই প্রকার চিত্তবিকারের কারণ প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও যাঁহাদের অবিচলিত মন দেবতার ধ্যান মাত্রেই আসক্ত, এই প্রকার স্থিরচিত্ত সাধকের এই ভৈরবীচক্রে অধিকার (পৃ. ১৭৮)। অজিতেন্দ্রিয়ের অধিকার নাই, কেননা, কৌলমার্গ চরমভূমিকা, মুক্তিমার্গের শেষ সোপান। এতৎসত্ত্বে কি তন্ত্রের দোষ আছে? কুলপূজার উদ্দেশ্য হইল চিত্ত শুদ্ধি, চিত্ত স্থৈর্য্য ও চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক দেবীর ধ্যানে দৃঢ়তালাভ করিয়া মন্ত্রার্থস্ফুরণ, ইহাই ভবপাশ নিবৃত্তির উপায়। মহামায়ার প্রসাদে 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানোদয়ে পরম পুরুষার্থ লাভ ও মুক্তি। এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় যে শাস্ত্রে দেখাইয়াছে, তাহাতে ভ্রষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পঞ্চ মকার বা পঞ্চতত্ত্বকে বলা হইয়াছে, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম। আর কুল অর্থে জীব, প্রকৃতি তত্ত্ব, দিক, কাল ও পঞ্চ মহাভূত। যিনি এই সবের স্বরূপ-জ্ঞান অর্জ্জন করেন তিনিই কুলজ্ঞ বা কৌল (পৃ. ২০৭)। তবে এপথে স্তর ভেদ আছে,—আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত, উন্মনা ও অনবস্থ উল্লাস। প্রথম পাঁচটি উল্লাসে বাহ্য ক্রিয়াপ্রকট, প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচার। যাবৎ না মন্ত্রসিদ্ধি তাবৎ বিধিনিষেধ, তারপর জড়োন্মত্ত-পিশাচবৎ অবস্থা। তদন্তোল্লাসের পর মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সাধক উন্মনী উল্লাসে আরূঢ় হইলে মন বাহ্য বিষয় হইতে নিরস্ত হইয়া হৃদয়ে সন্নিরূঢ় হয় ও ব্রহ্মানন্দ কথঞ্চিৎ অনুভূত হয়। পরে অনবস্থ উল্লাসে মন জীবাত্মা ও পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায় ও ধ্যাতা ধ্যান তখন ধ্যেয়ে লীন হইয়া বিশ্বব্রহ্মময় হয় ও পূর্ণানন্দ অনুভূত হয়। তাই পরশুরাম কল্পসূত্রে বলা হইয়াছে—

আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্,
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাস্তৈরথার্চ্চনম্।

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, আনন্দ দেহেই অবস্থিত, পঞ্চ মকার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। তাই পঞ্চ মকার দ্বারা দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে। শিব-শক্তি সামরস্যই আনন্দের পরাকাষ্ঠা, আগমসারে এই পঞ্চমকার সাধনা বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। পূর্ব্বে বাহ্য পঞ্চ মকার সাধনার কথা বলা হইয়াছে। আগমসারে আন্তর পঞ্চ মকার সাধনা সবিশেষ প্রকট। যথা—

মদ্যসাধনা—

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রান্ বরাননে!
পিত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ।

হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে, তাহা পান করিলে লোক আনন্দময় হয়। ইহারই নাম মদ্যসাধনা।

মাংসসাধনা—

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে!
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি! স এব মাংস সাধকঃ।

হে রসনপ্রিয়ে! মা শব্দে, জিহ্বা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্য যিনি পান করেন অর্থাৎ যিনি বাক্‌সংযমী মৌনী, তিনি মাংস সাধক।

মৎস্যসাধনা—

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ।

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য চরিতেছে অর্থাৎ বাম নাসিকাস্থিত নাড়ী গঙ্গা ও দক্ষিণ নাসাস্থিত নাড়ী যমুনা, এই ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের মধ্যে প্রবাহিত শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ুকে মৎস্য বলে। এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রাণায়াম যোগে রুদ্ধ করিয়া মনকে নিশ্চল যিনি করেন তিনিই মৎস্যসাধক।

মুদ্রাসাধনা—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলঃ পারদোপমঃ
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে।

যিনি সহস্রদল কমল কর্ণিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন তিনিই মুদ্রাসাধক।

মৈথুনতত্ত্ব—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসং কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌস্থিতঃ প্রিয়ে।
আকার হংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।

এই মৈথুনতত্ত্ব সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ; শাস্ত্রে ইহাকে পরমতত্ত্ব বলা হইয়াছে। ইহাতে সিদ্ধি লাভ ঘটে ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

'র'-কার-শক্তি, কুণ্ডলিনী, ইনি দেহ মধ্যে কুণ্ডে অর্থাৎ মূলাধারে অবস্থিত। 'ম'-কার—পুরুষ, পরমাত্মা, পরমশিব—ইনি মহাযোনি অর্থাৎ সহস্রদল কমল কর্ণিকা মধ্যগত ত্রিকোণ মধ্যে আছেন। 'আ'-কার অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা সম্পাদিত হংস এই অজপা মন্ত্র। 'র'কার কুণ্ডলিনী শক্তি 'আ'কার রূপ হংসে আরোহণ করিয়া 'ম'কাররূপ পরম শিবের সহিত মিলিত হইলে তাঁহাদের সামরস্য জনিত যে মৈথুনানন্দ অনুভূত হয় তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান, সাধকের প্রকৃত মিথুনানন্দ।

ধ্যানবিন্দুপনিষদে উল্লেখ পাওয়া যায় যোনিমণ্ডলে গলিত বিন্দু যোনিমুদ্রা হঠপ্রক্রিয়ার দ্বারা সবলে উর্দ্ধগত করিবে। উদ্দেশ্য শিবশক্তির মিলন। বিন্দু শিব রজঃ শক্তি। এই মিলনে দেহ সুদৃঢ় হয় ও মনজাল শোধন হয়। যিনি শিব অর্থাৎ পরমাত্মরূপ অগ্নি দ্বারা শরীরকে দগ্ধ করিয়া শক্তিরূপা সোমামৃতের দ্বারা আপ্লাবিত করেন তিনি অমৃত অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। যথা—

শিবাগ্নিনা তনুং দগ্ধ্বা শক্তিসোমামৃতেন যঃ
প্লাবয়েদ্ যোগমার্গেন সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।

—বৃহজ্জাবালোপনিষদ

যোগ্যবিদগ্রগণ্য ব্রহ্মময় পুরুষ বামা ক্ষ্যাপাবাবা তারাতত্ত্বে সতত রমণ করেন, তাঁহার বাহ্য ভৈরবীর কি প্রয়োজন?

নিম্নে এই আদ্য ও শেষ ম কার সাধনা সম্বন্ধে ক্ষ্যাপা বাবার নিজের উক্তি উদ্ধৃত হইল। পাঠক দেখিবেন ক্ষ্যাপাবাবা কৌলশাস্ত্রের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি কত

অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পঞ্চ মকার কি বীরাচারীর বাহ্যিক সাধনা? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সাধারণ অধিকারীর জন্য মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পঞ্চ মকার প্রবৃত্তির পথে, আর আর আগমসারের পঞ্চ মকার নিবৃত্তির পথে। সধবা নারীর পতিপ্রেম আর বিধবা নারীর পতিপ্রেম যেমন তফাৎ সেই রকম। রাধিকা বৃন্দাবনে কেলে ঠাকুরটির সঙ্গে খেলা করিতেন, তখন মহানির্ব্বাণতন্ত্রাদির ভাব আর যখন কেলে ছোঁড়া মথুরায় চলে গেল তখনকার ভাব, আগমসারাদির ভাব।"

"ভালবাসা দুই প্রকারে নিবৃত্তি হয়,--বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া ও বাঞ্ছিতকে চিন্তা করিয়া: বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া যাহা তাহা প্রবৃত্তিমার্গে। আর তাঁহাকে চিন্তা করিয়া যে তৃপ্তি তা নিবৃত্তিমার্গে। কালের শক্তি কালী। তন্ত্রের মতে কালী সাধনা না করিলে লোক ঈশ্বর উপাসনার অধিকারী হইতে পারে না; কেহ বা প্রত্যক্ষ ভাবে, কেহ বা পরোক্ষ ভাবে অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাবে এই সাধনা করে।"

"মেরুদণ্ডের দুইধারে ঈড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি ও মধ্যে সুষুম্না নামে একটি নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীর নীচে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে। যখন ঐ শক্তি জাগিয়া উঠে, তখন ঐ নাড়ীর ভিতর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। যতই সে উঠিতে থাকে ততই যোগীর নানাবিধ অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ পায়। যোগিগণ প্রাণায়াম শক্তি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগান, তান্ত্রিকগণ পঞ্চ মকার দ্বারা তাহা সহজে জাগাইতে পারেন।"

"মদ্য পানে জাতি পাত হয়। মদ্য পানে মাতলামি করা বা কোনরূপ খারাপ আচারব্যবহার করা কোন তন্ত্রের কোথাও লেখা নাই। তান্ত্রিক সাধনায় অভিষেক আছে। অভিষেক মানে শিষ্যকে উপযুক্ত মনে করিলে এক পদ হইতে অন্য পদে তুলিয়া দেওয়া। এই শোধিত মদ্য নিয়মিত পরিমাণে পূজার সময় ব্যবহার করিলে, নির্জীবপ্রাণ সজীব হইয়া উঠে। তাই শাস্ত্রে উহাকে সঞ্জীবনী সুধা বলিয়াছে। শিষ্য অভিষিক্ত না হইলে পঞ্চ মকারের অধিকারী হইতে পারে না। এমন কি স্পর্শ করিলে নরকে পচিতে হয়। সাধক গুরুর কৃপায় অধিকারী হইলে কেবল নির্জ্জনে পূজার সময় আসনে বসিয়া পঞ্চ মকার যথার্থ মন্ত্রপূত করিয়া পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করিলে চিত্ত চাঞ্চল্য হইবে না। ইহা শাস্ত্রসম্মত

সত্য। তবে যদি যথেচ্ছ ব্যবহার কর, তাহা হইলে শাস্ত্র কি তাহার জন্য দায়ী? তুমি যদি বিধির বিধান উল্লঙ্ঘন কর, সে দোষ কাহার? শোধিত পঞ্চ মকারে আসুরিক বৃত্তি আসিয়া সাধককে উত্তেজিত করিতে পারে না; নিয়মিত পরিমাণে সেবনের প্রকৃত অধিকারী না হইয়া শুক্রাচার্য্য প্রভৃতির শাপমোচন না করিয়া সেবন করিলে শূকরের প্রস্রাব পান করা হয়। মদ মায়ের চরণামৃত। যাহারা মদের জন্য মদ খায়, মাতাল হয় তাহাদের ইহকাল পরকাল নাই। শুক্রের শাপে তাহাদের নরকে পচিতে হইবে। আর যাহারা সদানন্দে থাকিবার জন্য সদানন্দময়ীর চরণসুধা পান করে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগায়, তাহারা কি মাতাল?"

"ধর্ম্ম আচরণ করিতে গিয়া চরিত্র নষ্ট করিলে উন্নতি কোথায়? চরিত্রই মানুষের অমূল্য সম্পত্তি। চরিত্র নষ্ট করিলে ত মনুষ্যত্ব নষ্ট করিলে। তবে সাধনক্ষেত্রে এক অঘোরী অবস্থা আছে। তাহা অবধূতের অবস্থা, ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা, সাধারণের চক্ষে মৃতের অবস্থা। তখন তাহার কিছুই বিচার থাকে না। সে অবস্থা সাধনার চরম অবস্থা; তখন আর তাহাতে সে থাকে না। তখন তাঁহাতে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। বেটী যে কোন পথ দিয়া আপনার কোলে টানিয়া লন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তারামায়ের ইচ্ছা যেমন। আমি অত তত্ত্ব বুঝি না বাবা। কলিতে ভক্তি আর বিশ্বাসই সার, আর ইহাই অতি সহজ পন্থা। তবে ঐ অঘোরীরা চতুর্থ আশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের পথে; তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করেন না, লোকালয়ে আসেন না, তাঁহারা আসব অর্থাৎ সিদ্ধ মদ্যপানে সদাই মত্তাবস্থায় অবস্থান করেন, তখন আর তাঁহাদের আমিত্ব থাকে না। তত্ত্বমসি হইয়া যান। সে অবস্থায় লোককে সহজে চেনা যায় না। তখন আর তাঁহাদের বাহ্যিক কোন বিষয় জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা তখন দেহ হইতে পৃথক হইয়া যান। দেহের সহিত তাঁহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং জগতের সহিত ও আর সম্বন্ধ কি? তাঁহারা মায়ের সহিত একমাত্র সম্বন্ধ রাখিয়া অন্য সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। বাবা, সে অবস্থা কি সহজ?"

ক্ষ্যাপাবাবা বামদেব ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে, পঞ্চ মকার সাধনা দূতীযোগে পূর্ণারূঢ় সদাশিবতুল্য যোগীরাই সমর্থ। এ প্রকার অধিকারী সাধক কলিতে বিরল। তাই কলির ৩০০০ বৎসর পরে দূতীযোগ নিষিদ্ধ।

২। জপ সাধনা

বামা ক্ষ্যাপাবাবা বলিতেন, "এই শিমূলতলা, বসিষ্ঠের আসন ; ইহা দিব্য অদ্ভুত স্থান, এখানে তারামা লীলা করেন, আড়াই লক্ষ জপ করলে মন্ত্রচৈতন্য হয়।" জপাৎসিদ্ধির্জপাৎসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ, একথাও আবার বলিতেন। মহাপুরুষের বাক্য গূঢ় অর্থযুক্ত। এই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া জপ করিলেই সিদ্ধিলাভ এই ফল। কিন্তু কত জন এই আসনে জপ করেন, তন্মধ্যে কয়জন সিদ্ধির অধিকারী হন। বরং দেখা যায় অনেকে গভীর রাত্রে জপে বসিয়া বিভীষিকা দেখেন, কেহ বা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান, কেহ বা স্থানের উগ্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়া যান। আরও কত বিভ্রাট ঘটে। এই সব ব্যাপার আজ নূতন নয়। শুনা যায় বীর সাধক ভাবুকের কৈলাসপতি মহারাজও ভৈরবী সঙ্গে এই শিমূলতলায় জপ করিতে বসিয়া অনুভব করেন পিঠে কি চাটিয়া দিল। ফলে তাঁহার প্রবল জ্বর আসে। সেই কালস্পর্শ—এই জ্বরেই তাঁহার দেহান্ত হয়। অন্যে পরে কা কথা (পৃ. ১৯১)। কেন এমন হয় ? জনৈক ভক্ত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ক্ষ্যাপাবাবা বলেন—"বাবা, বসিষ্ঠের আসনে বসিতে জানা চাই ; আসনের যথায় তথায় বসিলে চলিবে না। তাহা হইলে বিঘ্ন ঘটিবে। আসন মধ্যস্থিত মুণ্ডের মস্তকে সহস্রার পদ্ম আছে। সেই পদ্মের সহিত সাধকের গুহ্যস্থিত মূলাধার পদ্মের সংযোগ করিয়া বসিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না। যাহারা এই সাধনা জানে না তাহারা ত নষ্ট হইবেই।" তিনি আরও বলিতেন—"তারামা শ্মশানে," অর্থাৎ যথার্থ তারা সাধনা শ্মশানভাব হৃদয়ে না জাগিলে হয় না। তাই প্রকৃত সাধু না হইলে, চিত্ত শুদ্ধ, শান্ত, নিরাসক্ত ও সমাহিত না হইলে শ্মশান সাধনা নিরর্থক ; সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

শিমূলতলায় বসিষ্ঠাসন

বাবা মন্ত্রচৈতন্যের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ও তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ—একই কথা। এখন প্রশ্ন উঠে মন্ত্র কি ? মন্ত্রচৈতন্য কি, কুণ্ডলিনী জাগরণই বা কি ? এই প্রশ্নের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

বহু বিষয় বস্তু আছে যাহার সম্যক প্রণিধান না হইলে এ গুলির সঠিক মীমাংসা সম্ভব নয়। প্রাচীন মনীষীগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনার প্রাকালে তাই সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—যেমন মহাভারত, গীতা, বেদান্ত পুরাণ, ঋষি প্রণীত বহু সংহিতায়। আবার তন্ত্রে দেহতত্ত্ব, ষড়চক্র ; পাতঞ্জল শাস্ত্র ও অন্যত্র যোগপথ বিশদভাবে নির্ণীত হইয়াছে। আমরাও এখানে সত্যদর্শী বুধগণের পন্থা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত শাস্ত্র দৃষ্টে ঐ সকল কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান যতদূর সম্ভব সরলভাবে করিবার চেষ্টা পাইব। প্রথমে সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করা যাক্।

মন্ত্রচৈতন্য, কুণ্ডলিনী জাগরণ ও যোগপথ

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন —এক অদ্বিতীয় সৎব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা হইল,— আমি প্রজারূপে বহু হইব—"একোঽহম্ বহুস্যাম্ প্রাজায়েয়।" ইচ্ছামাত্রেই তেজ সৃষ্টি হইল। এই পরমাত্মা সৃষ্টির বিধানে যোগ অবলম্বন করিয়া আপনি দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ 'পুরুষ', বামাঙ্গ হইলেন 'প্রকৃতি'। উক্ত প্রকৃতি ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যা, সনাতনী ও মহামায়াস্বরূপ। যেমন অগ্নি ও তাঁহার দাহিকাশক্তি একত্র অবস্থান করেন তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন। প্রজা সৃষ্টির মানসে পরমাত্মা অন্তর্গর্ভ হইয়া পরাপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখনই এক তেজোময় অণ্ড উৎপন্ন হইল। ইহার দুই অংশ (ছোলার মধ্যকার অংশদ্বয়ের ন্যায়) পরস্পর সংলগ্ন। পরমাত্মা ও তাঁহার চিৎশক্তি এইরূপ অভিন্ন। এই জ্যোতির্ম্ময় অণ্ড আবার দুইখণ্ডে সশব্দে বিভক্ত হইল। তখন বিন্দু ও নাদের উৎপত্তি হইল। বিন্দু ও নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু হইতে সত্ত্ব, রজঃ তম তিন গুণের ও তাহা হইতে যথাক্রমে সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজঃগুণে ব্রহ্মা ও তমঃগুণে মহেশ্বরের উৎপত্তি হইল। আর নাদ হইতে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান তিন শক্তি ও এই তিন শক্তি হইতে লক্ষ্মী, ব্রাহ্মী ও গৌরী এই শক্তিত্রয় প্রাদুর্ভূতা হইলেন। পরপৃষ্ঠার বংশবৃক্ষে এইগুলি ও অন্যান্য সৃষ্টিক্রম দেখান হইল।

সৃষ্টিতত্ত্ব

পরম ব্রহ্ম (পরমাত্মা, ব্রহ্মবস্তু বা পুরুষোত্তম গীতায়)
(ইনি নিত্য অনাদি, অনন্ত, মধ্য রহিত, অজর, অমর, অব্যয়, অচ্ছেদ্য, অপ্রমেয়।)

মূলা বা পরমা প্রকৃতি (মায়া, প্রধানা, ত্রৈগুণ্য, অব্যক্তা-নামান্তর)

পুরুষ (গীতায় পরাপ্রকৃতি)

প্রকৃতি (গীতায় অপরাপ্রকৃতি)

সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ

মহত্তত্ত্ব (গীতায় বুদ্ধিতত্ত্ব)

অহঙ্কার

সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে — ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়; ৫ কর্মেন্দ্রিয় ও ১ মন

তমঃগুণের প্রাবল্যে — ৫ তন্মাত্রা (সূক্ষ্ম ৫ মহাভূত) — স্থূলভূত

১ অপ্রকৃতি-অবিকৃতি — ১ পুরুষ
ইনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতিও নন—স্বতন্ত্র, উদাসীন

১ মূল প্রকৃতি

৭ প্রকৃতির বিকৃতি— ১ মহত্তত্ত্ব
১ অহঙ্কার
৫ তন্মাত্রা

১৬ বিকৃতি— ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়
৫ কর্মেন্দ্রিয়
১ মন

মোট ২৫টি তত্ত্ব

সাংখ্য বলেন, সংসার দুঃখময়, জীব ত্রিবিধতাপে তাপিত; এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জ্ঞান; কিসের জ্ঞান? উপরে লিখিত পঁচিশটি তত্ত্বের জ্ঞান; প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান; এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ও উহার সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ এই জ্ঞান। ২৩টি বিকারসহ মূলা প্রকৃতি ও পুরুষ বা অষ্টপ্রকৃতি, ১৬ বিকার এবং ১ পুরুষ,—এই পঞ্চ-

সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্ঞানের আবশ্যকতা

বিংশতি তত্ত্বজ্ঞান। প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় [illegible]। প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান। প্রকৃতির সাম্যভঙ্গে, প্রকৃতির বিকারে প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব। তারপর এই মহত্তের বিকারে অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকারে ৫ তন্মাত্রা ও ১১ ইন্দ্রিয়, [illegible] বিকারে পঞ্চ-মহাভূত। আর সর্ব্বোপরি পুরুষ। সর্ব্বসমেত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। প্রকৃতি হইতে জগৎপ্রপঞ্চ কিরূপে উৎপন্ন হয় দেখা যাউক। (পৃ. ১৭৫)

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছক হইতে দেখা যায় মহত্তত্ত্বাদি সপ্তপদার্থ (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা) পরস্পর ভিন্ন থাকিয়া উৎপন্ন হয়। তাই তাহারা প্রথমে জড়দেহ সৃষ্টি করিতে পারে না,—যেমন সোনায় খাদ না মিশাইলে গহনা গড়া যায় না সেইরূপ। পরে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া তবে হস্তপদাদি-বিশিষ্ট স্থূল শরীরে পরিণত হয়। এই মিলনকে শাস্ত্র বলেন, পঞ্চীকরণ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ) ও পঞ্চ তত্ত্বের সব তন্মাত্রা মিলিত উভয়েন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ও পঞ্চতন্মাত্রা,—মোট এই ষোড়শটী পদার্থ বিরচিত লিঙ্গ শরীর স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্ব্বভূতের আদি কর্ত্তা মায়াকে আশ্রয় করিয়া সেই লিঙ্গ শরীরে প্রবেশ করিলেন। দেবীভাগবতে ভগবতী দেবতাগণকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিতেছেন—

স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি

সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিশাম্যহম্,
মায়া-কর্ম্মাদি সহিতা গিরে প্রাণপুরঃসরা।

"লোকে অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, মিথ্যা প্রভৃতি যাহা যাহা চিন্তা করে, পরজন্মে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই বিষয়েই রত হয়। কর্ম্মসর্ব্বস্ব ব্যক্তিরাই পুরুষকার, দৈব বা স্বভাবকে (Nature) কার্য্যের কারণ বলিয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরম ব্রহ্মকেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া জানেন। এই মায়াময় সংসারে একমাত্র পরমাত্মাই প্রধান। তিনিই উপাধিযোগে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণযুক্ত হইয়া প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতুভূত বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহার পরে নানা যোনি প্রাপ্ত হয় কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করেন।—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার সৃষ্টি পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সম্ভব হয়। পুরুষ কিন্তু অকর্তা অসঙ্গ। প্রকৃতির গুণ-সঙ্গবশে উহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। অজ্ঞান কাটিয়া গেলেই প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়িয়া যায়। তখন পুরুষের পরমার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়। দেহে যিনি ক্ষেত্ররূপে আছেন, তিনিই সর্ব্বভূতে অব্যক্তরূপে আছেন। জীবাত্মা দেহরূপ ক্ষেত্রে অবস্থিত বলিয়া ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ বা অধিষ্ঠাতা পুরুষ। প্রকৃতির দুই রূপ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় বিধায়িনী প্রকৃতি অবিদ্যা, আর তদতীতা যিনি তিনি বিদ্যা। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য, তাই নির্গুণ যখন সগুণ, প্রকৃতি তখন জড়। জীবাত্মা সত্ত্বাদি গুণ প্রভাবে স্বয়ং বহুরূপ ধারণ করিয়া ঐ সকল রূপকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে কর্তৃত্বাভিমান করিয়া পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃতিই জীবাত্মাকে আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন।

পুরুষ প্রকৃতি জীবাত্মা

সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর গুণসমূহ জীবাত্মাতে সন্নিহিত আছে। পরাশক্তি ঐ সকল গুণ দ্বারা জীবাত্মাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। জীবাত্মা ঐ সকল গুণ ও শুভাশুভ কার্য্যসমূহে পরিবৃত আছে। ইন্দ্রিয়গণ শিষ্যের ন্যায় তাঁহার নিকট আজ্ঞা-কারী হইয়া অবস্থান করে। জীবাত্মা যখন সমুদায় কার্য্যকারণ অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন তখন আর তাঁহার পাপ পুণ্যের লেশ থাকে না।

এই জীবাত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে। জীবাত্মার বিনাশ নাই। শান্তিপর্ব্বে ভৃগু বলিয়াছেন, "শরীর মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মনোময় জ্যোতিঃ বিদ্যমান আছে উহাই জীবাত্মা।" পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধির অংশ মনের উৎপত্তি। এই মন ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং কর্ম্ম বা অবিদ্যা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণ হয়। অপঞ্চীভূত সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি। ইহার চারিভাগ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। সংকল্প বিকল্প বৃত্তি মনের। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধির, অভিমানাত্মিকা বৃত্তি

জন্মান্তর রহস্য

অহঙ্কার আর অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধি চিত্তের। ঐ যে ক্রমে পরমাত্মা হইতে মনের উৎপত্তি হয়। এই প্রতীতি হয় যে শুদ্ধ মন বা চিত্ত মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানই মনের ধর্ম, এবং ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞান দেহে অবস্থিত। অতএব মনকে সংযত করিয়া বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জীবাত্মায় ও জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিতে পারিলেই লোকের মুক্তি বা অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়।

সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য, বেদান্ত, গীতা ও অন্যান্য ভক্তি শাস্ত্র ও তন্ত্রে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য থাকিলেও মূল সিদ্ধান্তে বিশেষ প্রভেদ নাই। ভগবান কপিল মুনির সাংখ্যে যাহাকে প্রকৃতি বলে, বেদান্তে তাহাকে বলে মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান। তন্ত্রে বলে মহামায়া, আদ্যাশক্তি কালী, দুর্গা ইত্যাদি। সাংখ্যের মতে পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতে অচেতন জড়, চেতনের মতন হয়। আত্মার চৈতন্য জড়প্রকৃতির ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষীস্বরূপ পুরুষ নিজেকে ভুলিয়া যান। প্রকৃতির চিন্তা, ইচ্ছা, ক্রিয়া নিজের বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই পুরুষের মুক্তি।—শ্রীঅরবিন্দ গীতা।

বিভিন্ন শাস্ত্রে পুরুষ প্রকৃতি-বিভেদ

সাংখ্য নিরীশ্বর, বেদান্ত ঈশ্বরবাদী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষই মূলতত্ত্ব; প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম, তাই উনি প্রসবধর্মী। বেদান্ত বলেন— ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের প্রকৃত কারণ।

গীতার যাহা অপরা প্রকৃতি সাংখ্যে তাহা মূল প্রকৃতি ও গীতার যাহা পরাপ্রকৃতি সাংখ্যে তাহাকে পুরুষ বলা হইয়াছে। গীতায় অপরা প্রকৃতি জড়, পরা-জীব চৈতন্য—এই দুই প্রকৃতির সংযোগে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি। গীতায় পুরুষোত্তমই জগতের মূল কারণ; সকলই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতেই অবস্থিত। প্রকৃতির সমস্ত গুণময় ভাবের দ্বারা জগৎ মোহিত। প্রকৃতিই পুরুষোত্তমের অতি দুস্তরা গুণময়ী মায়া। পুরুষোত্তম হইতেই প্রকৃতির উদ্ভব। পুরুষোত্তম প্রকৃতির বা মায়ার অধীন নহে।

অন্য ভক্তি শাস্ত্রে—(বৈষ্ণবগ্রন্থে) অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি স্বীকার করেন। তটস্থাখ্যা জীবশক্তি

ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাহার উপরে, অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি প্রকৃতির পরে, সৎচিৎ আনন্দ এই নাম ধরে।

আর তন্ত্রে শক্তির প্রাধান্য। তন্ত্রে শিব শয়ান, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, দ্রষ্টা, সাক্ষী, অনুমন্তা। তাঁহার সম্মুখে নৃত্যপরা ক্রীড়াশীলা প্রকৃতিই কালী।

বেদান্তে—ইনি পরমব্রহ্মের স্পন্দনশক্তি। মণিতে যেমন স্বাভাবিক ঝলক উঠে, শান্ত, চিণ্ময় ব্রহ্মেও সেরূপ স্বাভাবিক স্পন্দন উঠে। এই স্পন্দনই মায়া।

তন্ত্রে—প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় যিনি শান্ত শিব অদ্বৈত; সৃষ্টিতত্ত্বেই তিনি শিব-শক্তি, শক্তিমান্ ও শক্তি এক। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কার্য্যক্ষমতা নাই। তাই শক্তি উপাস্যা।

পঞ্চমহাভূতের পরিণাম এই স্থূল বিশ্ব। পঞ্চভূতের পঞ্চীকৃত সদসৎ কর্ম্মজন্য সুখদুঃখের ভোগ লয়, স্থিতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম ক্ষীণতা ও বিনাশ, এই ষটপ্রকার বিকারযুক্ত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার জীবের শরীরই স্থূলদেহ। এই স্থূল শরীরের উপাদান স্বরূপ পঞ্চবিংশতি গুণও উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, পৃথিবী হইতে অস্থি, মাংস, নখ, নাড়ী, ত্বক ও লোম। জল হইতে শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র। তেজ হইতে নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কান্তি ও আলস্য। বায়ু হইতে ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ। আকাশ হইতে কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ।

জড়দেহ ও সূক্ষ্মদেহ

আর্য্য ঋষিগণ প্রথমে স্থূল শরীর তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে দেহভাণ্ডে; অন্তঃকরণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়া বিশ্বসংসারের যাবতীয় শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল বুঝিয়াছিলেন। মানবদেহই ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের চরম উৎকর্ষ, পূর্ণাবস্থা। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে এই দেহ তিনটি। পঞ্চস্থূল ভূত (অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) দ্বারা গঠিত দেহ স্থূলশরীর। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা লইয়া গ' ত লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর,

আর সকলের মূল কারণ প্রকৃতিই কারণ শরীর। স্থূলদেহ চর্ম্মচক্ষুতে দেখা যায়, সূক্ষ্মদেহ দেখিতে জ্ঞানচক্ষু চাই।

মৃত্যুতে পঞ্চভূতাত্মক স্থূলশরীর বিনষ্ট হয়। সূক্ষ্মশরীর লইয়া জীব উৎক্রমণ করে। গীতায় বলা হইয়াছে, জীবের দেহবন্ধন ঘুচে না (গীতা ১৫।১০)। মৃত্যুর পর পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়ী জীব নূতন স্থূলদেহ ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মশরীর লইয়াই পাপ-পুণ্যাদি ভোগ করে। এই কারণেই উহার মন, বুদ্ধি, ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার অর্থাৎ স্বভাব, পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়ীই হয়। তবে জন্মগ্রহণ কালে পিতামাতার দেহ হইতে লিঙ্গশরীর যে দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লয় তাহাতে তাহার দেহস্বভাবের ন্যূনাধিক ভাবান্তর ঘটে। সুতরাং কেবল স্থূলদেহের সংসর্গ লোপ হইলেই জীবের মুক্তি হয় না। সূক্ষ্মশরীরও যখন লোপ পায় তখনই কেবল জীবের সত্যস্বরূপ প্রতিভাত হয়।

জীবের মৃত্যুর পর দেহান্তর গ্রহণ

জীবদেহে আত্মার বিভিন্ন আবরণকে কোষ বলে। এই কোষ পাঁচটি যথা—

স্থূল শরীর — (১) অন্নময় কোষ (ইহাই পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ)।

সূক্ষ্ম শরীর — (২) প্রাণময় কোষ (পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণসহকৃত, ইহাকে ক্রিয়াশক্তিযুক্ত কার্য্যরূপও বলে)।

(৩) মনোময় কোষ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন)।

(৪) বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়)।

কারণ শরীর — (৫) আনন্দময় কোষ (প্রিয়, হর্ষ, আমোদ, বৃত্তিমৎ, অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণ—কারণ শরীর)।

মহাভারতে উল্লেখ আছে—যম সত্যবানের দেহ হইতে এক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষকে (সূক্ষ্মশরীরকে) আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ।

যোগিগণ সূক্ষ্মদেহ লইয়া স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া অন্যদেহে প্রবেশ করিতে পারেন। ব্রহ্মচারিণী সুলভা যোগবলে জনক রাজার শরীরে সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও মৃত রাজার শরীর আশ্রয়ে পুনরুজ্জীবিত হ্যায় রাজসহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্য

করেন। মানবের সূক্ষ্মদেহ নিদ্রাকালে (সুষুপ্তি) দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, আবার নিদ্রাভঙ্গের প্রাক্কালে দেহে আসিয়া প্রবেশ করে। আর যখনই সূক্ষ্মদেহ পুনরায় স্থূলদেহে প্রবেশ না করে তখনই দেহের মৃত্যু হইয়াছে বলা যায়।

এই সূক্ষ্মাংশ স্থূলাংশ অপেক্ষা ব্যাপক। স্থূলকে ব্যাপিয়া আত্মসাৎ করিয়া অবস্থান করে। যেমন সমষ্টিতে সেইরূপ ব্যষ্টিতেও এই কথা খাটে। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা জানেন যে, মানবদেহে সূক্ষ্মকোষগুলি একটীর মধ্যে অপরটী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—যেমন একটী পেঁয়াজের খোসার মধ্যে অপর একটী খোসা আছে,—যেমন রসগোল্লা, যখন রসে ভাসে তখন রস রসগোল্লার ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্র থাকে। সূক্ষ্মতম দেহকোষ (আনন্দময় কোষ) সূক্ষ্মতা হেতু সব কোষগুলির ভিতরেও আছে, আবার বাহিরেও আছে। বিজ্ঞানময় কোষ আনন্দময় কোষের মধ্যে থাকিয়া অন্য তিনটী কোষের ভিতর-বাহির ব্যাপিয়া আছে, এইরূপে অন্য গুলির পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধ।

জন্মান্তর গ্রহণ ও অব্যাহতির কারণ

মানুষের দেহান্তের পর স্থূলদেহ (অন্নময় কোষ) নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়া থাকে; ইহার অন্য চারিটি কোষ স্থূলদেহ হইতে বাহির হইয়া বায়ু অবলম্বনে আতিবাহিক দেহে ভাসিতে থাকে। পরে যখন কালের পরিপাক বশতঃ তাহার ঐ সূক্ষ্মদেহ মধ্যস্থ বহু জন্মজনিত সঞ্চিত কর্ম্মসমূহের মধ্যে কোনও কর্ম্মের বেগ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কোন প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগমুখীন হয় তখন তদনুযায়ী নূতন দেহ ধারণ করে। মহামায়া সেই দেহে প্রাণকে অগ্র করিয়া প্রবেশ করিয়া চিদাভাসরূপে অবস্থান করেন। এইরূপে একই জীব পুনঃপুনঃ ভোগ দেহ গ্রহণ করে ও সেই দেহে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য বহন করে।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্, কর্ম্মক্ষয়ে জন্মনাশঃ প্রাণিনাং নাত্রসংশয়ঃ।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণই দুঃখ। এই দুঃখের নাশ হয় কর্ম্মক্ষয়ে ও অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশে।

এতদ্ধি জন্মসাফল্যং যদজ্ঞানস্ত নাশনম্
পুরুষার্থসমাপ্তিশ্চ জীবন্মুক্তদশাপি চ।
অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যৈব তু পটীয়সী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্নরঃ। —দেবী ভাগবত।

মানব জন্ম সফল হয় যদি অজ্ঞান নাশ হয়। ইহা তাহার পরমপুরুষার্থ। তাহার জন্মমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ। অজ্ঞান নাশে সাহায্য করে বিদ্যা। তাই সর্ব্বপ্রযত্নে বিদ্যা আশ্রয়ে জ্ঞান অবলম্বন শ্রেয়ঃ। আত্মা হইতে জ্ঞান উদ্ভূত, ইহা মনের ধর্ম্ম। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলে বিষয়বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। ঐ বুদ্ধি আবার সংস্কারবিমুক্ত হইয়া মনোমধ্যে বিরাজিত হইলে যোগসমাধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এইরূপে উদ্ভূত জ্ঞানই সূক্ষ্ম জ্ঞেয়বস্তু প্রত্যক্ষ করে। তাই মন যেমন একদিকে জীবকে বিষয়জালে জড়িত করে, অপরদিকে সেই জাল হইতে মুক্তও করে। বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই কারণ মন।

মনস্তু সুখদুঃখানাং মহতাং কারণং দ্বিজ!
জাতে তু নির্ম্মলে যস্মিন্ সর্ব্বং ভবতি নির্ম্মলম্।

জীবের আত্যন্তিক দুঃখের কারণ মন। মন নির্ম্মল হইলে সব দুঃখ নিবৃত্তি হেতু নির্ম্মল হয়। তাই মনোনাশ কর্ত্তব্য। মনকে অনিত্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া নিত্যবস্তুতত্ত্বে সমাহিত করিবার নানা উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ বলেন, যাগযজ্ঞে মন দাও, কেহ বলেন জ্ঞানমার্গে, কেহ ধ্যানযোগে, কেহ বা ভক্তিপথে ও জপে চিত্ত স্থির কর। তন্ত্রের নির্দ্দেশ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিমিশ্র মন্ত্রসাধন পথ। যোগশাস্ত্রেও চতুর্ব্বিধ যোগের মধ্যে মন্ত্রযোগের উল্লেখ আছে। ক্ষ্যাপাবাবা শিমূলতলায় সাধনায় এই মন্ত্র জপের উল্লেখ করিয়াছেন। জপযোগের বৈশিষ্ট্য কি ও কিভাবে এই সাধনার সার্থকতা লাভ হয়?

সাধন পথে মনের বৈশিষ্ট্য

'মন্ত্রজপান্মনোলয়ো' ইতি মন্ত্রযোগঃ।

ওঁ কারাদি মন্ত্র বা ওকারান্ত বীজ মন্ত্র বা নাম জপ করিতে করিতে যে মন লয় হয় তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে।

মন্ত্রযোগ

মন্ত্র কি? মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

মনন হইতে ত্রাণ করে বলিয়াই উহাকে মন্ত্র বলা যায়। মনন অর্থে চিন্তা, চিন্তা মনেরই ধর্ম। মনোলয়ে চিন্তারাশির নাশ হইলে নিশ্চিন্ততা যোগ লাভ হয়। আবার প্রাণই মনের ত্রাণকর্তা। কেননা প্রাণ স্পন্দনই মন। প্রাণস্পন্দন রহিত হইতে হইলেই মনের ত্রাণ হয় অর্থাৎ মন সর্ব্ব বিষয় চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আত্মতত্ত্বে লীন হয়। যখন প্রাণবায়ু ঈড়া পিঙ্গলা ত্যাগ করিয়া সুষুম্না মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া সহস্রারস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয় তখন মনেরও লয় হয়। প্রাণ বায়ু ঈড়া ও পিঙ্গলায় থাকার দরুণ (নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে) চিত্ত রজঃ ও তমঃ অভিভূত হইয়া চঞ্চল হইয়া বিষয় ভোগে আকৃষ্ট হয়। উহা যখন গুরুকৃপায় সাধনবলে সুষুম্নায় প্রবাহিত হয় তখন সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায় আত্মতত্ত্বের প্রতি মনের একাগ্রতা ও সবিকল্প আনন্দলাভ হয়; পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে লয় হইলে মনের নিরুদ্ধতা বা নির্বিকল্পতা জন্মে। তাই ভৃগু ঋষি প্রাণকে মন্ত্র বলিয়াছেন। এই প্রাণ বায়ু প্রশ্বাসরূপে হংকারে নাসা দ্বার দিয়া দেহমধ্য হইতে বাহির হয় আর হংশক্তি নিশ্বাসরূপে স শিব স্বরূপ স-কারে দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। এই হংস মন্ত্র জীব অজ্ঞাতসারে অহোরাত্রে ২১৬০০ বার জপ করে। এই অজপা মন্ত্র জপ। এই হংস মন্ত্রের উৎপত্তি কোথা হইতে, অনুধাবন করিলে বুঝা যয় যে দেহস্থ মূলাধার পদ্মে যে কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন যিনি প্রাণ কেন্দ্রশক্তি—সকল নাড়ীর যেটি মিলন কেন্দ্র, সেইটি সকল জীবের প্রাণশক্তির স্থান। এখান হইতেই অক্ষর (অ হইতে ক্ষ-কার) বর্ণ সকলের উৎপত্তি, এই বর্ণময়ী মন্ত্রশক্তি সমূহের উদ্ভব স্থান। বাঙ্ময়ী সরস্বতী এই স্থানে বিরাজ করেন। ষড়চক্র বর্ণনাকালে এ বিষয় বিশদ ভাবে বলা হইবে।

মন্ত্র কি?

[মন্ত্র স্ত্রী, পুরুষ নপুংসকভেদে তিন প্রকার, যথা, হুঁ ফট্ অন্তে যে মন্ত্র তাহা পুরুষ—উহারই সংজ্ঞা মন্ত্র; স্বাহা অন্তে যে মন্ত্র তাহাকে বলে বিদ্যা আর নমঃ অন্তে যে মন্ত্র তাহা নপুংসক। বাকী সব মন্ত্রকে বলে মহাবিদ্যা বা মহামন্ত্র।]

মূলাধারে যে বিন্দুরূপিনী কুণ্ডলিনী শক্তি ইনি আত্মার আধারভূতা। জীবাত্মা এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সূক্ষ্ম বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর জন্মায়, এই কুণ্ডলিনী শক্তিরূপা সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি

হইতেই নাদের উৎপত্তি। আর মাতৃকাবর্ণ বর্ণমালাই রূপ দেয় ঐ শব্দ বা নাদকে। সকল মন্ত্র সামবেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, বিবিধভাষা সপ্তস্বরসমন্বিত গীতধ্বনি, এ সবই এই নাদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

শব্দের উৎপত্তি স্থান

এই শব্দ উৎপত্তির ক্রম আছে। আত্মার যেমন চারি অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, শব্দেরও তদ্রূপ চতুর্বিধ অবস্থা। এই ক্রমবিকাশের নাম—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মূলাধারে কুণ্ডলিনী (বিন্দুরূপিণী) পরা শক্তির নাম পরা যিনি শব্দের আদিভূতা, অনন্তা। নাদের এখানে তুরীয় অবস্থা। নাদ স্বাধিষ্ঠানে উঠিলে পশ্যন্তী অবস্থা। এই অঙ্কুর অবস্থায় যোগিগণ নাদের বিশ্ব অবস্থা দর্শন করেন তাই পশ্যন্তী অবস্থা—কারণ অবস্থা। হৃদয়ে উঠিলে নাদকে বলে মধ্যমা। আর কণ্ঠ হইতে স্পষ্ট শব্দরূপে বাহিরে আসিলে উহাকে বলে বৈখরী। হৃদয়ে বিনা আঘাতে ধ্বনি শুনা যায়, তাই উহা অনাহত ধ্বনি। যোগবিশারদগণই কেবল পরা ও পশ্যন্তী অবস্থায় নাদ শুনিতে পান। যোগপথে অগ্রসর ব্যক্তিরা মধ্যমা অবস্থায় অবস্থিত অনাহত ধ্বনি শুনিয়া আনন্দ পান। বৈখরী অবস্থায় স্পষ্ট উচ্চারিত শব্দ সর্ব্বসাধারণের গোচর হয়।

চতুর্বিধ শব্দ

এই কুণ্ডলিনী শক্তি সকল মন্ত্রের প্রাণ। তাই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন অর্থাৎ মন্ত্রচৈতন্য বা কুণ্ডলিনী জাগরণ। মানবমাত্রেরই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগে, গভীর শোকে ও দুঃখে, কঠিন দৈহিক আঘাতে, উৎকট প্রাণান্তকর ব্যাধির কষ্টে, আকস্মিক বিপদে, নিদারুণ উদ্বেগ, হতাশার প্রাবল্যে বা আনন্দের আতিশয্যে। কুণ্ডলিনী যখন নিদ্রিতা, এবং কুণ্ডলিনী না জাগায় যখন মন্ত্রচৈতন্য হয় নাই তখন মন্ত্রীর মন্ত্র, যন্ত্র ও অর্চ্চনাদি কিছুই সফল হয় না। শতপুরশ্চরণেও সিদ্ধিলাভ হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে ক্ষ্যাপাবাবা যে কয়জন সন্তানকে উদ্ধার করেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই আকর্ষণের পূর্ব্বে এইরূপ কোন না কোন উত্তেজনার কারণ দিয়াছিলেন।

মন্ত্রচৈতন্য বা কুণ্ডলিনী জাগরণ

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্র ন সিদ্ধতি॥

এই কারণে মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। মন্ত্র জাগরণের সার্থকতা। ঋষিরা চৈতন্যের উপাসক ছিলেন, জড়ের নহেন। জড়ের মধ্যে যে চিৎশক্তি বিরাজমানা তাঁহারই তাঁহারা উপাসনা করিতেন। তাই উপাসনায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান দেখা যায়। হঠযোগের প্রক্রিয়া মুদ্রা বা প্রাণায়াম সাধনে বা লয় বা রাজযোগ সাধনে কুণ্ডলিনী জাগেন। মন্ত্রজপেও ঐ সিদ্ধিলাভ হয়।

মন্ত্রার্থ বাচ্য ও বাচক শক্তি

মন্ত্রার্থ বলিতে বুঝায় মন্ত্র প্রতিপাদিত দেবতা। মন্ত্রের দুই শক্তি—একটি বাচ্য, অপরটি বাচক। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য যে দেবতা উনি বাচ্যশক্তি—নির্গুণ অধিগম্য। মন্ত্রময়ী দেবতা—বাচকশক্তি ইনি সগুণ, উপাস্য। মন্ত্র বাচ্যশক্তি বলে জীবিত; আর বাচক শক্তি বলে রক্ষিত হন। সগুণ উপাসক ক্রমে নির্গুণে লয় হন। দ্বৈত জগৎ অদ্বৈততত্ত্বে ডুবে। তাই গুরুদত্ত মন্ত্র জপ ও তৎ প্রতিপাদিত দেবতার চিন্তা দ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ ও পরে স্বীয় স্বীয় আত্মাতেই দেবতার দর্শন বা প্রকাশ হয়।

চতুর্বিধ যোগের মধ্যে মন্ত্রযোগকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় বলা হইয়াছে, জপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞানাম্ জপযজ্ঞোঽস্মি। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বলা হইয়াছে —তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। ইষ্টের মন্ত্র বা নাম জপ ও তাহার অর্থচিন্তা সাধনার মূল। কি ভাবে জপ করিতে হইবে, 'ওঁ'কার মন্ত্র ধরিয়া তাহার নির্দেশ মুণ্ডক্যোপনিষদে আছে। যথা—

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

মন্ত্র বা নাম, নামী অভেদ

অপ্রমত্তচিত্তে প্রণব (মন্ত্ররূপ) ধনুতে মনরূপ শরযোজনা করিয়া ব্রহ্মরূপ (মন্ত্রপ্রতিপাদিত ইষ্টরূপ) লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। শরের অগ্রভাগ যেমন লক্ষ্যবস্তুতে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হয়, সেইরূপ মন্ত্রজপ-পরায়ণ সাধকের মনও ব্রহ্মে (ইষ্টদেবতায়) প্রবেশ করিয়া লীন হইয়া যাইবে। মন্ত্র ও দেবতা অভেদ। নাম শব্দ বা বর্ণব্রহ্ম। কৈবল্যকল্যাণময়ী মহাবিদ্যাদেবী ঊনপঞ্চাশৎ বর্ণময়ী শব্দাত্মিকা। সৃষ্টিতত্ত্বে দেখান হইয়াছে যে শব্দ আকাশের গুণ। আকাশের উৎপত্তি প্রকৃতি বা ব্রহ্ম হইতে, তাই নাম ও নামী অভেদ। যেই নাম সেই কৃষ্ণ,

'নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি'। কলিতে 'নাম, দান ও সত্য'—ধর্ম্মের এই অঙ্গ। তন্ত্রে পশ্বাচারে পূজার শেষে ... ইষ্টে জপ সমর্পণের বিধি আছে। বীরাচারে পঞ্চ মকার সাধন পূজার মধ্যে মধ্যেও জপ আছে। দিব্যাচারে কেবল যোগযুক্ত জপ সাধনা। এই সাধনা ভাব-প্রধান—জ্ঞানমিশ্রা প্রেমভক্তির সাধনা।

তারাপীঠে মনোলয়

তারাপীঠ লয়ের স্থান। এখানে জপ সাধনায় মন লয় হয়। ইহার ইঙ্গিত ক্ষ্যাপাবাবা দিয়াছেন—একটী গাঁজার কলিকায় বশিষ্ঠাসনের বিরাট শিমুলগাছটি পুড়াইয়া দিয়া। বাসনা-কণ্টকিত সংসারই শিমুলবৃক্ষ। মনে এই সংসারের বীজ (পৃ. ১২৪)। তাই এই মনকে ছাই করিতে পারিলে, মনকে অমনীভূত করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হেতু ব্রহ্মদর্শন ঘটে। সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

বাসনায় দাও আগুন জেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটি।
কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই,
মনের ময়লা ফেল কাটি।
কালীদহের কূলে চল
সে জলে ধোপ ধর্ব্বে ভাল
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি।

সত্যই যত আপদ এই মনে। মনই বিষয়াসক্ত জীবের বন্ধনের কারণ, আবার বিষয় ত্যাগ হইলে মনই মোক্ষের কারণ। এই মন শান্ত নির্ম্মল হইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। তখনই আত্মবোধ উদিত হয়। মনের অহঙ্কার বশেই প্রাণী শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর মাকড়সার জালের মত নিজের কর্ম্ম-বিপাকজালে নিজে জড়ায়। এই অবস্থার অব্যাহতি হয় দেবীর (ইষ্টের) নাম স্মরণে।

সর্ব্বদোষনিরাসার্থং ধ্যায়েদ্দেবীপদাম্বুজম্।
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং শ্রীদেবীনামসংস্মৃতিঃ।

কালীই বল, কৃষ্ণই বল, দুর্গাই বল, শিব বা হরি যাহা বলিয়া ডাক না কেন, এক ঈশ্বরকেই ডাকা হয়। তাঁহার স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক

ভেদ নাই। তিনি বিশ্বতোমুখঃ। যে মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ডাক, সেই তিনি দেখা দেন। এক তিনি, পৃথক পৃথক ভাবনা দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে সাধকের হৃদয়ে বা সম্মুখে আবির্ভূত হন। ইষ্টের রূপভেদ উপাসকের প্রকৃতি ভেদে হয়। যাহার প্রকৃতিতে যে রূপ ভাল লাগে, যে লীলা ভাল লাগে, সে সেই দেবতার মন্ত্রের অধিকারী। মনে রাখা উচিত যে অনতিক্রমনীয় জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে সকলের দেবতা, গুরু ও মন্ত্রপ্রাপ্তি হয়। সাধনায় অগ্রসর হইলে আর তাহার ভেদজ্ঞান থাকে না।

নাম জপ বা নাম সাধনা

পুত্রপৌত্রাদি ভরণ ব্যাপারে, ধনধান্য ভোগ, ও যশঃলাভের জন্য আমরা যে চিন্তা নিয়োগ করি তাহার ক্ষণিকও কি ভগবৎ চরণারবিন্দে সমর্পণ করি? তাই বলি ত্রিতাপনাশিনী মায়ের নাম, রূপ গুণ ও লীলা—এইসব ভাবনায় নিজেকে ভুলিয়া যাও। নিজের ভিতর ডুবিয়া যাও। নাম করিতে করিতে দেহ ভুল হউক, জগৎ ভুল হউক, দেখিবে তোমার সেই তন্ময়তার মাঝে কখন নামী আসিয়া বসতি লইয়াছেন। তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার খণ্ডাইতে ইহা অপেক্ষা অমোঘ ঔষধ আর নাই। এই দুস্তর ভবসাগরে নামের ভেলায় চড়াইয়া দুর্ব্বল জীবকে শ্রীভগবান বা ইষ্টদেবতা হাতে ধরিয়া পার করিয়া দেন। আর জন্ম হয় না। ইহা মন্ত্রজপ বা নাম জপের মাহাত্ম্য।

বিবিধ প্রকার মন্ত্রজপ আছে। বাচিক, উপাংশু ও মানসিক ভেদে মন্ত্রজপ তিন প্রকার। যেমন—

ত্রিবিধ মন্ত্রজপ

১। সকলেই শুনিতে পায় এরূপভাবে উচ্চারিত জপ উচ্চ-বাচিক। তাড়াতাড়ি না করিয়া ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

২। যে জপে ওষ্ঠ স্পন্দন হয়, শব্দ শুনা যায় না, তাহা উপাংশু জপ।

৩। যে জপে শব্দ উচ্চারিত হয় না, কেবল মনে মনে জপ করা হয়, ও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ ও রহস্য চিন্তা—অর্থাৎ মনে মনে মন্ত্রের ধ্যান করিয়া যে জপ তাহা মানস জপ।

এই প্রকার জপও দ্বিবিধ। শোধিত রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, মহাশঙ্খ বা অন্য কোন মালায় বা করে সংখ্যা রাখিয়া জপ চলে। অঙ্গুলির এক একটি পর্ব্ব

(পাব) ধরিয়া জপ করিতে হয়। শক্তি মন্ত্রে অনামিকার মধ্য ও মূলপর্ব্বে, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূলপর্ব্ব, ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব এই স্পর্শ করিয়া জপ দশবার হইবে। এইরূপ দশ দফে করিলে ১০০ বার জপ হইবে, পরে আর আটবার জপ করিতে কেবল অনামিকার ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব দুইটি ছাড়িয়া জপ করিবে, তাহা হইলেই ১০৮ বার জপ হইবে।

আর একপ্রকার বিশেষ জপ আছে—মালায় বা করে মাতৃকাবর্ণে পুটিত করিয়া মন্ত্রজপ। ইহা বর্ণময়ী মালায় জপ।

দ্বিতীয় প্রথায় সুষুম্নার শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ। ইহার কোন সংখ্যা থাকে না। ধারণা ও ধ্যানসহ গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র এক করিয়া জপ। মন্ত্রার্থ অবগত না হইয়া নিয়মতান্ত্রিকভাবে, 'করতে হয় তাই করছি' ভাবে জপ নিষ্ফল।

মন্ত্র জপ

যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব
বীর্য্যবত্তরং ভবতি।—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

শ্রদ্ধার সহিত ইষ্ট চিন্তা ও মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিলে জপ সফল হয়। এইরূপ মন্ত্র জপের বিধি বিশদভাবে নিম্ন আলোচনা করা হইল—

বিধি অনুসারে জপ করিলে দেবতা প্রসন্ন হন। জপকালে ইষ্টদেবতা, গুরু ও ইষ্টমন্ত্র ঐক্য চিন্তা করিয়া জপ করিতে হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কথিত আছে—'মন্ত্রবর্ণ দেবতা স্বরূপ এবং দেবতা গুরু-রূপিণী'। যে ব্যক্তি গুরু, মন্ত্র, ও দেবতা 'এই তিনই এক', মনে চিন্তা করিয়া পূজার্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি উত্তম সিদ্ধিলাভ করে। সাধারণ মানুষ গুরুকে মনুষ্য মনে করে, মন্ত্রকে বর্ণ বা অক্ষর, ও প্রতিমাকে মৃণ্ময়মূর্ত্তি বিবেচনা করে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে গুরু, মন্ত্র ও দেবতাকে অভেদ মনে করা দুঃসাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে, জড় পঞ্চভৌতিক বিভিন্ন দেহবিশিষ্ট মনুষ্য গুরু নহেন। তাঁহাদের শরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য বা একমাত্র ব্রহ্মই গুরু। মন্ত্র দীক্ষাদাতা যিনি স্থূল নর শরীরে বর্ত্তমান, তিনি নিজ শিরঃপদ্মে সহস্রারে যাঁহাকে গুরু ধ্যান করেন, শিষ্যও তাঁহাকে সেই পরম ব্রহ্মকে গুরু বলিয়া জানিবেন। মন্ত্র বলিতেও বুঝিবেন মন্ত্রের দেবতা; এবং ইষ্ট বা দেবতা বলিতে মৃণ্ময়ী, শিলা বা প্রস্তর মূর্ত্তি নহেন। উপাসনা পদ্ধতিতে দেখান হইয়াছে

মন্ত্র জপের বিধি

সব পূজায় জীবন্যাসের পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূর্ত্তিতে চৈতন্যের অধিষ্ঠান হইলে সেই চিন্ময়ের পূজা করা হয়। তাই ভক্তিমান সাধক স্থূলভাগ ত্যাগ করিয়া উপাস্যের প্রকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্বাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইঁহাদের একত্ব চিন্তা করিয়া জপে মন দিবে (অষ্ট্য লহরী ১১, পৃ. ৩৫৩)। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই বিষয়টি আর একটু বোধগম্য করিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে—

"মস্তকে গুরুকে তেজোময় চিন্তা করিবে। হৃদকমলে দেবতাকেও তেজোময় ভাবিবে, আর রসনামূলে মূল মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যাকে ধ্যান করিবে। পরে গুরু, দেবতা ও মূলমন্ত্র—এই তিনজনের তেজের সহিত আত্মাকেও তেজোময় ও একীভূত হইয়াছেন—এই চিন্তা করিবে। পরে (যদি ক্রীং স্বাহা মূলমন্ত্র হয়) ওঁ ক্রীং স্বাহা এই মূলমন্ত্র সাতবার জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র মাতৃকাবর্ণে পুটিত করিয়া ১০৮ বার জপ করিবে। যথা অং ক্রীং স্বাহা অং, আং ক্রীং স্বাহা আং,.........শেষে লং ক্রীং স্বাহা লং বলিয়া শুধু ক্ষং বলিবে। এই অনুলোম ক্রম। পরে বিলোম ক্রমেও মন্ত্র জপ করিবে—যথা ক্ষং লং ক্রীং স্বাহা লং, হং ক্রীং স্বাহা হং,.........অং ক্রীং স্বাহা অং। অনন্তর মন্ত্রী হ্রীং বীজ মস্তকে দশবার, মুখে দশবার ওঁ বীজ, হৃদয়ে হ্রীং বীজ সাতবার জপ করিয়া মালাকে গ্রহণ করিয়া—

তন্ত্রে গুরু ইষ্ট মন্ত্র এক করিয়া জপ প্রণালী

মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনি।
চতুর্ব্বর্গস্তয়ি ন্যস্ত স্তস্মাৎ মে সিদ্ধিদা ভব॥

এই বলিয়া মালাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা এতে গন্ধে পুষ্পে মালায়ৈ বৌষট বলিয়া পূজা করিবে ও হ্রীং মালে মালে মহামালে ইত্যাদি পাঠ করিবে। পরে ঐ মালায় ১০৮ বা ১০০৮ জপ করিবে। অতঃপর যথাশক্তি সংখ্যা না রাখিয়াও ঐক্যভাবনায় নিজেকেও তেজোময় ভাবনা করিয়া তন্ময় হইয়া জপসহ ধ্যান করিবে। পরে ধ্যানান্তে—

গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।

এই মন্ত্রে দেবীর বাম হস্তের উদ্দেশ্যে জল দিবে, ইহা জপ সমর্পণ। পরে স্তবকবচ পাঠ, আত্মসমর্পণ, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। এই জপের ফলে

যে জ্যোতিঃদর্শন ইহাকে বৃহন্নীলতন্ত্রের অষ্টম পটলে বলা হইয়াছে, "এই তেজ মৃত্যুঞ্জয় শিব। অপর প্রকৃতির পরিচয়ে বলা হইয়াছে ইনি হৃদপদ্মে প্রদীপ-কলিকাকার তেজস্বরূপা এবং কার্য্যকারণ বর্জ্জিত অন্তরাত্মা এই তেজ মধ্যে অবস্থিত যেমন পদ্মমধ্যে ভ্রমর ও ভ্রমরী পরস্পর নিগূঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া থাকে। "বসিষ্টদেব পরমাত্মাকে দেখিয়াছিলেন হৃদয় মধ্যে বিধূমপাবকের ন্যায়, রশ্মিযুক্ত দিবাকরের ন্যায়, বৈদ্যুতিক অগ্নির ন্যায়।"—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব। ঘেরণ্ড সংহিতায় সূক্ষ্মধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ আছে—

নিরালম্ব পদে শূন্যে য তেজ উপজয়তে।
তদ্‌গর্ভমভ্যাসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্॥

নিরালম্ব শূন্য স্থানে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে (ইহাকে হৃদয়স্থান বলে) যে তেজ বা জ্যোতিঃদর্শন হয় সেই জ্যোতিঃ গর্ভে অর্থাৎ অন্তঃকরণে (আজ্ঞা-চক্রের ঊর্দ্ধস্থানে) ধরিয়া রাখিতে অভ্যাস করিবে। এইরূপে ঐ স্থানকে তেজোময় ভাবিতে ভাবিতে ধ্যান ও জপ অভ্যাস করিবে। এইরূপ ধ্যান জপ জপসিদ্ধির উপায়। কেবল সংখ্যা রাখিয়া মালাজপ অবিদ্যানাশের কারণ নহে। প্রগাঢ় ভক্তি, ভাব ও তন্ময়তা স্ফুরণ না হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়া ঊর্দ্ধগতা না হইলে জপাৎ সিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে পরম জ্ঞানী ভীষ্মদেব বলিয়াছেন—"জাপকেরা যোগীদিগের তুল্য ফলই লাভ করেন। কেবল যোগীদিগের যোগের সময় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, আর জাপকদিগের ব্রহ্মে লীন হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বেই ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য হইয়া থাকে।" ক্ষ্যাপাবাবার উক্তি জপাৎসিদ্ধির্জপাৎসিদ্ধির্জপাৎসিদ্ধির্নসংশয়ঃ যে কত গূঢ় অর্থযুক্ত এখন তাহা বুঝা গেল।

জপসাধনার ফল

তাই বলি সাধক যদি শিমূলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনের সন্ধান না-ও পাও, হতাশ হইবেন না। এই বসিষ্ঠপীঠে তারামার কৃপায় অকস্মাৎ মন্ত্রচৈতন্য ও সিদ্ধিলাভ হয়। হঠযোগের কঠোর নিয়ম পালন না করিলেও সিদ্ধপীঠের মাহাত্ম্য ও সিদ্ধ মন্ত্রের গুণে সাধক আপ্তকাম হইতে পারেন। সাধক, শ্রীবামের শরণ লন, তিনি এই পীঠের ভৈরব। মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জপে বসুন। অমৃত উঠিবে "মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"। জয় বাম, জয় তারা।

সমগ্রান তারাপীঠে জপ সাধনা মাহাত্ম্য

৩। যোগসাধনা

যোগবিশারদগণ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ যোগকে বলিয়াছেন 'চতুষ্পথ' অর্থাৎ চারি প্রকার,—যথা মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ও লয়যোগ। পূর্ব্ব পর্য্যায়ে মন্ত্রযোগের আলোচনা করা হইয়াছে। যদিও যোগপদ্ধতিকে এই প্রকারে চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে এই চারিটি ক্রমান্বয়ে এক যোগেরই অন্তর্ভূমিকা মাত্র। এই চারিযোগেই আবার সিদ্ধযোগ আছে বা সিদ্ধযোগে এই চারি যোগই আছে। হঠযোগ ও রাজযোগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, আবার সবগুলির পরিণতি লয়ে. তাই লয়যোগেরও বিশেষত্ব আছে।

যোগ কি? পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" মানুষের চিত্তের বৃত্তিগুলির নিরোধই যোগ (পৃ: ৩৬৯)। আবার "ঐক্যং জীবাত্মনো রাহুর্যোগম্" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকেও যোগ বলা হইয়াছে। শান্ত সমাহিত চিত্তে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সম্পাদনই যোগের চরম উদ্দেশ্য।

বিবেক ও বৈরাগ্য সহকৃত পুনঃপুনঃ অভ্যাস যোগে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ঐ মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই মহাজনগণের উপদেশ। সবগুলির সাধনা একসঙ্গে প্রয়োজন নাই, অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশ অনুসারে কয়েকটি প্রণালী অবলম্বন করিবার অভ্যাস করিলেও কার্য্যসিদ্ধ হইবে। তবে এ কথা বলিয়া রাখি সৌভাগ্যক্রমে সিদ্ধমন্ত্র লাভ হইলে সৎগুরুর কৃপায় হঠযোগের কঠোর-পদ্ধতিগুলির প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। এই মন্ত্রযোগে আপনাআপনি কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। আসন মুদ্রা প্রাণায়ামাদি স্বাভাবিকভাবে হইতে থাকে। ঐরূপে যে যোগসিদ্ধি তাহাকে কৃপাসিদ্ধি বলে। যম নিয়ম আসন মুদ্রা প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা যে সিদ্ধি তাহাকে সাধন সিদ্ধি বলে, আর—জন্মান্তরীণ উর্জ্জিতা ভক্তি দ্বারা বা স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ বা দেবতা দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত হইলে যে সিদ্ধি তাহাকে অকস্মাৎ বা দৈব সিদ্ধি বলে। তারাপীঠে শেষোক্ত দুই প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়।

প্রথমে হঠযোগ—

'হ' অর্থে সূর্য্য, 'ঠ' অর্থে চন্দ্র। নাড়ীর মধ্যে পিঙ্গলা সূর্যানাড়ী আর ঈড়া চন্দ্র নাড়ী। ঈড়া ও পিঙ্গলায় মানবের শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া পৃথক পৃথক ভাবে অনবরত চলিয়াছে। প্রাণবায়ু প্রবাহ দুইটির মিলন হঠযোগ। কেহ কেহ মুখ ও নাসিকা পর্যন্ত গতিরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণবায়ুকে সূর্য্য আর নাভি হইতে পদতল পর্যন্ত গতিরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট অপান বায়ুকে চন্দ্র বলেন। প্রাণ ও অপানের সংযোগ সাধনও হঠযোগ।

হঠযোগ

আবার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে সুস্থ সবল ও সুদৃঢ় কর্ম্মঠ করিয়া তোলার যে যৌগিক প্রক্রিয়া তাহাও হঠযোগের অন্তর্ভুক্ত।

যোগবিদগ্রগণ্য গোরক্ষনাথের মতে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিনিচয় হঠযোগ।

পতঞ্জলি যম ও নিয়মকে ইহার মধ্যে ধরিয়াছেন। ফলে অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনও হঠযোগ সাধন। কতকগুলি মুদ্রাসাধনও হঠযোগের ক্রিয়া যেমন—মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ, উড্ডয়নবন্ধ, মহামুদ্রা, খেচরী, বিপরীত করণ বজ্রোলী ইত্যাদি। এই মুদ্রা সাধনে বায়ুরোধের ক্রিয়া আছে। অভিজ্ঞ গুরুর নিকট এইগুলি অভ্যাসে সমুচিত ফল পাওয়া যায়। অন্যথায় ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

হঠযোগের প্রথম সাধন—

যম সাধন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই কয়টি যম সাধন।

অহিংসা বলিতে বুঝায়—	বাক্য ও মনের দ্বারা কাহারও কোন ক্লেশ উৎপাদন না করা।
সত্য বলিতে বুঝায়—	সদা সত্য কথা কহা, প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, স্বার্থবশতঃ সত্য গোপন না করা, অসত্য ও অধর্ম্ম পক্ষ অবলম্বন না করা বা প্রশ্রয় না দেওয়া বা প্রতিরোধ করা। সত্যই ধর্ম্ম, তপস্যা, সিদ্ধি ও মুক্তি, মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও অভ্যাস করা।

অস্তেয় বলিতে বুঝায়— পরদ্রব্যে নিস্পৃহা। পরদ্রব্য অপহরণ না করা বা চিন্তা না করা।

ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বুঝায়— কায়মনবাক্যদ্বারা মৈথুন ত্যাগ। স্ত্রী বিষয়ক সংকল্প, স্মরণ, মনন, আলাপ, অশ্লীল বই পড়া বা চিত্র না দেখা। এগুলিও মৈথুনের প্রকারভেদ।

অপরিগ্রহ বলিতে বুঝায়- কোন অবস্থাতেই দান, উপহার বা উৎকোচ গ্রহণ না করা। অপরিগ্রহের দুইটী গুণ—একটী স্বাবলম্বন, অপরটী বৈরাগ্য। সাংসারিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলভিত্তি।

নিয়ম সাধন- প্রথম সাধন শৌচ, ইহা দুই প্রকার—আভ্যন্তর ও বাহ্য। জল মৃত্তিকাদি দ্বারা শৌচ বাহ্য। আর সচ্চিন্তা জনিত নির্ম্মলচিত্ত প্রসাদ আন্তর শৌচ। জীবের সুখে মৈত্রী, দুঃখে করুণা, পুণ্যে আনন্দ, পাপে উপেক্ষা চিত্তপ্রসাদের কারণ।

নিয়মের দ্বিতীয় সাধন সন্তোষ—যথালাভে তৃপ্তিই সন্তোষ।

" তৃতীয় সাধন তপঃ— উপবাসাদি দ্বারা দেহ সংযমই তপস্যা। গীতায় ত্রিবিধ তপস্যার কথা আছে।

শারীরিক তপস্যা—পূজ্যপূজা—গুরু, দেবতা ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা।

বাচিক তপস্যা—সত্য প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ—যাহাতে কাহারও উদ্বেগ না জন্মায়।

মানসিক তপস্যা—চিত্তপ্রসাদ, অ-ক্রূরতা, মনঃ সংযম, ভাব বা চিত্তশুদ্ধি ও অকপটতা।

নিয়মের চতুর্থ সাধন স্বাধ্যায়—বেদপাঠ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং মন্ত্রজপ। মন্ত্রজপ—দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বিশদ-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

" পঞ্চম সাধন —ঈশ্বর পূজন ও ঈশ্বর প্রণিধান।

ঈশ্বর প্রণিধান বলিতে বুঝায়—ভগবৎ স্মরণ, মননাদি ঈশ্বরোপাসনা অথবা ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ।

ঈশ্বর পূজন—ভক্তিপ্রসন্নচিত্তে শিব, বিষ্ণু বা ইষ্টদেবতার পূজাকে ঈশ্বর পূজন বলে। এই পূজা সাকার। অমূর্ত্ত ব্রহ্মের চিন্তায় মন স্থির হয় না। ক্ষ্যাপাবাবা বলিতেন—"অব্যক্ত ব্রহ্মে মন রেখে সাধনা বড় কঠিন। বাবা, তাই মা মা বলে বড় সুখ পাই।" তাই সাধকের হিতের জন্য নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পনা। অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিরো ন স্যাত্তো মূর্তিং বিচিন্তয়েৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণ।

ব্যাস সংহিতায় ব্যাসদেব নিজের দোষ পরিহারার্থ ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি ও তাঁহার পূজাস্তব ও তীর্থ যাত্রাদির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হে জগদীশ, তুমি রূপ বিবর্জ্জিত কিন্তু আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি। তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু ও বাক্যের অতীত, তথাপি আমি তোমার স্তবস্তুতি দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব নষ্ট করিয়াছি। প্রভো, আমার এই তিনটি দোষ ক্ষমা করুন।"

বাহ্য পূজা ও মানস-পূজা কেন করি

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (১৪।১২১) উপাসনার প্রকার ভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে—

উত্তমো ব্রহ্ম সম্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ
স্তুতির্জপোঽধমো ভাব বাহ্যপূজাধমাধমঃ।

ঈশ্বরভাব অর্থাৎ পরমব্রহ্মের সচ্চিদানন্দভাবে যে চিত্ত লয় তাহা উত্তম। ধ্যানভাব—ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তিতে যে চিত্ত ধ্যানাবস্থায় নিমগ্ন থাকে তাহা মধ্যম। সেই সাকার মূর্ত্তির স্তুতিমন্ত্রাদি জপ বা স্তব ও জপভাব অধম; আর পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা সগুণ মূর্ত্তির যে বাহ্যপূজা তাহা অধম অপেক্ষাও অধম।

এখানে, অবধূত লক্ষণে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার অর্থাৎ ঈশ্বরভাবের বৈশিষ্ট্যই দেখান হইয়াছে। বাহ্যপূজা অধম অপেক্ষা অধম বলিয়াই সাকার দেবদেবীর পূজা বা ঘটে, জলে, যন্ত্রে, পুষ্প বা লিঙ্গে দেবদেবীর আবাহন করিয়া অর্চনা যে বৃথা ইহা মনে করা উচিত নয়। কারণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (১৪।১২৩) পূজার ফল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে পূজায় সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা ছাড়া যোগ নাই, ইহা ছাড়া পূজাও নাই। এই বাহ্য পূজাই ব্রহ্মের সম্ভাব প্রাপ্ত হইবার প্রথম সোপান। একথা ভুলিলে চলিবে না যে জড় সৃষ্টির ক্রমবিকাশে ব্রহ্মা সৃজনোন্মুখী জ্ঞান শক্তি প্রভাবে প্রথমে জড়ীভূত হন বা জড়ই প্রথম জন্মে—পরে অন্ন, প্রাণ, মন ও পৃথিবী। (মনু সংহিতা ১।১।৮)। তাই মনের গোচর বস্তু লইয়া মনের অগোচর পদার্থে উঠিতে হইবে। স্থূল ও স্বল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট মানব প্রথমেই ব্রহ্মের সূক্ষ্মভাব ধরিতে পারিবে না ভাবিয়াই ভগবানের অবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সাকার মূর্ত্তি উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

ঐ সাকার মূর্ত্তির পঞ্চদেবতা ভেদে উপাসনা পাঁচভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তির পাঁচ ভাগে ভাগ করার কারণ আছে। পূর্ব্বে সৃষ্টিতত্ত্বে দেখান হইয়াছে যে এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চতত্ত্বে গঠিত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)। পঞ্চতত্ত্বের প্রথম মহাভূত আকাশ হইতে বিন্দু ও নাদ হইতে পরমব্রহ্ম শিবরূপ ধারণ করেন। বায়ু হইতে শক্তি (দেবীরূপ), তেজ হইতে সূর্য্য রূপ, জল হইতে নারায়ণ রূপ (আপো নারায়ণঃ প্রোক্তঃ), পৃথিবী হইতে গণেশ রূপ। মনুষ্যগণ এই গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া মূলদেবতার পূজা করে ও ফলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। অগস্ত্য সংহিতায় বিশেষ উল্লেখ আছে যে সর্ব্বভূতের হিতকারী সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা সকল

জীবের মঙ্গলের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। তন্ত্র তাই এই জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তন্ত্রের মতে ইহা মায়েরই প্রকট রূপ, মানুষের রুচি বৈচিত্র্য ও উপাসনায় নানা পথের নির্দেশ থাকায় শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। নদী যেমন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া অবশেষে মহাসমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যায়, মানবগণও তদ্রূপ বিভিন্ন পন্থার অনুসরণ করিয়া সেই একই গন্তব্যে পৌছায়—সচ্চিদানন্দময় পরমাত্ম সত্তায় লীন হয়।

বাহ্য পূজা পদ্ধতির বহুবিধ অনুষ্ঠান আছে ও তাহার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশও বিবিধ। যথা—অনুষ্ঠান ক্রমে পূজা পঞ্চ, দশ বা ষোড়শ উপচারে সম্পন্ন করিতে হয়। এখানে পূজক পূজাসনে বসিয়া জীবন্যাস, ভূতশুদ্ধি ও দেবতার মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে যোগময়ী মানস পূজা না করিলে পূজার কোন সার্থকতা নাই। উপাসক মানস পূজায় তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর সমগ্র সত্তায় ভক্তি নিষ্ঠার সহিত একান্ত মনে প্রাণে ইষ্ট চরণে সমাহিত হইবে (পৃ. ২৩৮-২৩৯)। তাই হিন্দুর পূজা জড়ের পূজা নয়। ইহা চিন্ময়ের সেবা (পৃ. ৩৫৫)। দেবতার বাহ্য পূজার পদ্ধতিগুলি যাহা নানা পুরাণ-সংহিতা ও তন্ত্রে দেখা যায়, তাহাদের উদ্দেশ্য একই। দিবসের সন্ধিক্ষণে যে সময় মন স্বভাবতঃ প্রসন্ন ও দেহ স্নিগ্ধ থাকে ও সুষুম্নায় শ্বাস বহে, সেই সময় এই পবিত্র কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে চিত্ত ধীরে ধীরে একাগ্র ও অন্তর্মুখীন হয়। ক্রমশঃ ঈশ্বরে আসক্তি বাড়ে ও বিষয় বাসনা শিথিল হয়, ফলে চিত্তশুদ্ধি জন্মায়। এই ভগবৎ জ্ঞানলাভের প্রথম উপায়—"প্রথমন্তু: মনঃ শোধ্যং কর্তব্যং গুণবর্জ্জিতম্।" দেহ, মন শুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তির অপগমে পূজক অন্তর্যজ্ঞের অধিকারী হয়। এইরূপ অধিকার লাভ করিয়া যাবৎ ঈশ্বরে সেব্য সেবক ভাবনা জন্মে, যাবৎ না পূজ্য ও পূজকের ঐক্য জ্ঞান হয়, তাবৎ বাহ্য পূজা করা উচিত। জ্ঞানলাভ হইলে দেবতামূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মানসপূজা, স্তবস্তুতি, ধ্যান ইত্যাদি করণীয়। এইরূপ অন্তর্যাগপরায়ণ উপাসক সিদ্ধির অধিকারী।

সাকার পূজা জড়ের পূজা নয়

বর্ত্তমানকালে দীক্ষিত ব্যক্তি পূজাপ্রণালী না জানিয়া ও পূজার

অনুষ্ঠানাদির দিকে মন না দিয়া ইষ্টলাভের সহজ ও সরলপ্রণালীর সন্ধান করেন। মঠাধীশ বা আশ্রমাধীশ শুধু নাম জপ দিয়াই খালাস হন। ফলে বহুকাল অভ্যাস করিলেও দীক্ষিতের মনে ইষ্টের প্রতি কোন অনুরাগ বা জপে কোন আগ্রহ আসে না। কারণ ইহা বোঝা উচিত যে রহস্য না জানিয়া কর্ম্ম করিলে কোন রস পাওয়া যায় না; সব শুষ্ক বোধ হয়। তাই মন্ত্র দীক্ষা সৎগুরুর নিকট গ্রহণ করা উচিত, যিনি রহস্যভেদ করিতে পারেন। ভবেদ্ বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রাদ্ বহির্গতা। তবেই উহা ফলবতী হয়। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আত্মজ্ঞান লাভ সহজসাধ্য নহে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। শাস্ত্রপাঠ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, সব চাই তবে ত আত্মার দর্শন। নিম্নাধিকারীর তাই গোড়ায় মূর্ত্তি লইয়া খেলা। সেবা ভাবে অর্চ্চনা, উচ্চাধিকারী যাঁহারা তাঁহাদেরও দেখি মূর্ত্তি লইয়া পাগল। প্রেম ভক্তিতে তাঁহারা নির্গুণকে সগুণে প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মহারা (জয়দেব, রামপ্রসাদ ইত্যাদি), তাঁহাদের পূজায় ব্যয় বাহুল্য নাই। প্রাণের দেবতা ভাবের ভিখারী, ভক্তির কাঙ্গাল, দ্রব্যের কাঙ্গাল নহেন। পত্র, পুষ্প, ফল, জল যথাসাধ্য আহরণ করিয়া ভগবানকে অর্পণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ভক্ত যাহা কিছু কর্ম্ম করেন সব ভগবানে অর্পণ করিবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে তাঁহার কর্ম্মবন্ধন হয় না। কারণ ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ। এই সব অনুষ্ঠান সযত্নে আচরণ করিতে করিতে পূজকের দেবতার প্রতি ভক্তিভাব জন্মে ও ভক্তির প্রাবল্য সে নিজের মধ্যে দেবভাব অনুভব করে। তাই এইরূপ ভাবের উদয় হয়—"দেবো ভূত্বা দেবীং যজেৎ।" পরে এই দ্বৈত ভাবও লোপ পায়, উপাস্য ও উপাসক ভেদ ঘুচিয়া যায়। তখন "তত্ত্বমসি, সোঽহং ভাব আসে। এই ঐক্যই কাম্য। ইহা পূজার চরম সার্থকতা। গীতা যেমন ভক্তিবাদে পূর্ণ, তন্ত্র সেইরূপ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিমিশ্র উপাসনার প্রবর্ত্তক। এ জগতে আব্রহ্মভুবনাদি সব লোকই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন। কেবল ঈশ্বর লাভ করিলেই আর কাহারও পুনর্জন্ম হয় না। মৃন্ময় বা পাষাণের মধ্যে যখন ভক্ত চিন্ময়ের চিন্তায় আত্মহারা হয় তখন জগতে নানাত্বের মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ংকে নিরীক্ষণ করে। জন্মমৃত্যুর হাত হইতে

গুরু ও দীক্ষিতের কর্ত্তব্য

সাকার উপাসনায় তন্ময় ভাব

অব্যাহতি পায়। এই ত বৈতরণী পার, সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া, পরপারে যাওয়া। যথে যেমন বামনদর্শন। না সোপুনরাবর্ত্ততে। এইরূপ অষ্টাঙ্গযোগ সাধনে ঈশ্বর পূজন সাধনের পরিণতি ঈশ্বর প্রণিধানে ও ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণে সাড়ম্বর বা নিরাড়ম্বর পূজা অনুষ্ঠানাদি যে নিরর্থক নয় তাহা সকলেই প্রণিধান করিবেন।

উপাসনার সার্থকতা

অতঃপর যোগের তৃতীয় সাধন আসন সম্বন্ধে আলোচনা।

আসন—সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ আসন বন্ধন। আসন স্থিরসুখম্ হওয়া চাই। তবেই যোগের কোন ব্যাঘাত হয় না।

যে ভাবে ও যাহাতে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে ও স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকা যায় তাহাকেই আসন বলে। জীবজগতে ৮৪ লক্ষ যোনির জন্য ৮৪ লক্ষ আসন আছে। তাহার মধ্যে আমরা যোগিজন প্রিয় চারিটি আসনের উল্লেখ করিলাম। আসন—চারিটি যথা, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, শবাসন। ইহাদের কোন একটি অবলম্বনেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

আসন পাতিবার নিয়ম—প্রথমে নীচে কুশাসন ও কম্বলাসন, তাহার উপর ব্যাঘ্র বা মৃগচর্ম্ম, তাহার উপর রেশম কাপড় পাতিয়া তাহার উপর যোগী নিজ শরীর স্থির ও আয়ত্ত্বাধীন রাখিয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া যোগাসন অভ্যাস করিবেন। এইরূপ করিলে দেহের উত্তাপ আর আসন ভেদ করিয়া মাটিতে লীন হইতে পারিবে না। প্রথমতঃ মন্ত্র দ্বারা আসন শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। পূজা পদ্ধতি নিম্নোক্তরূপ—

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা, দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা,
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং কুরুচাসনম্।

এই মন্ত্রে পৃথিবীকে আসন কল্পনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুকে পৃথিবীর ধারক বলা হইয়াছে। তাই সাধকের এই পবিত্র আসনই কাম্য। তবে মন্ত্র দ্বারা শোধন কেন? কারণ পৃথিবীর যে অঞ্চলে সাধক বাস করেন, সে অঞ্চলের যিনি রাজা

তাঁহার পাপ পৃথিবীর ঐ অংশে স্পর্শ করে। তাই বিষ্ণু নামে শুদ্ধি বিধান প্রয়োজন হয়।

সাধনার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন প্রয়োজন। নির্জ্জন বন, শ্মশান, উচ্চ পর্ব্বতশিখর, শূন্য কক্ষে বা গৃহে, শূন্য দেবালয়ে আসন পাতা প্রশস্ত। নিজের আসন ব্যতীত অন্যের আসনে বসিয়া যোগাভ্যাস নিষিদ্ধ। অন্যের আভ্যন্তরিক শক্তি আসন-যোগে যোগীর দেহে সংক্রমিত হইলে সাধকের শক্তিহানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সিদ্ধাসন—সাধক এক পাদমূল দ্বারা যোনিস্থান পীড়ন করিয়া অন্য পাদ-মূল মেঢ্রের উপর রাখিয়া সরল ভাবে উর্দ্ধনেত্রে ভ্রূমধ্যে নিরীক্ষণ করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসম্পন্ন ঋষিগণ মেরুশিখরের (অর্থাৎ মেরুদণ্ডের) উৎকর্ষ দর্শনে তাহার উপর উপবেশনপূর্ব্বক প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি ভাবে মেঢ্রের উপর বাম ও দক্ষিণ গোড়ালি রাখিবেন, কণ্ঠসন্ধির উপর চিবুক রাখিবেন, পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ বাঁকাইবেন, হাসি হাসি মুখে দন্তের উপর দন্তবিন্যাস না হয় এরূপ ভাবে দন্ত বিকাশ, নাভিদেশে বাম করের উপর (চিৎ করা) দক্ষিণ কর রাখিবেন। এইরূপে অঙ্গ সঙ্কোচ করিয়া আসনে বসিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন —হরিবংশ, ২০৬ অধ্যায়।

পদ্মাসন—দক্ষিণ উরুর উপর বাম পা, ও বাম উরুর উপর দক্ষিণ পা রাখিয়া, বাম হাত চিৎ করিয়া দক্ষিণ উরুতে দক্ষিণ হাত চিৎ করিয়া বাম উরুতে রাখিয়া নাসার অগ্রভাগে (নাকের ডগায়) দৃষ্টি রাখিবে। জিহ্বা দাঁতের গোড়ায় রাখিবে। চিবুক ও বুক সিধা রাখিবে। ধীরে ধীরে পূরক ও রেচক অভ্যাস করিবে।

আর এক প্রকার পদ্মাসন আছে। ইহাতে হাত দুটি পৃষ্ঠদেশ বেড়িয়া ঘুরাইয়া আনিয়া পায়ের বুড় আঙ্গুলটি ধরিবে। ইহাতে মেরুদণ্ড ঠিক স্থির থাকিবে।

স্বস্তিকাসন—জানু ও উরুর মাঝে দুই পায়ের তলা দুটি রাখিয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসিবে। এই আসন স্বাস্থ্যকর ও সুখকর।

শবাসন—চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া দুই হাত দুই পাশে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবে। এই আসন খুব আরামপ্রদ।

যোগের চতুর্থ সাধন প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম যোগীদের অধ্যাত্মসাধনের উৎকৃষ্ট উপায়। সব শাস্ত্রে ভাগবত, রামায়ণ, পুরাণ, সংহিতা, বেদান্ত, তন্ত্র, পতঞ্জলি ও সাংখ্য মীমাংসা যোগশাস্ত্র সর্ব্বত্র প্রাণায়ামের আদর। প্রাণায়াম হইতে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই। ইহাতে শরীর ও মনের মল বিধৌত ও জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

প্রণায়াম গুরুগম্য বিদ্যা

(১) প্রাণবায়ু পাঁচটি—প্রাণ—হৃদয়ে অবস্থান ; বহির্গমনশীল
অপান—গুহ্যদেশে " ; অধোগমনশীল
সমান—নাভিদেশে " ; উর্দ্ধগমনশীল
উদান—কণ্ঠে " ; ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করিয়া এক করে, সমীকরণশীল
ব্যান—সর্ব্বাগাত্রে " ; সর্ব্বশরীরে গমনশীল ভুক্ত রস সর্ব্বশরীরে চালনা করে।

(২) এই পাঁচ বায়ুর অন্তর্গত আর পাঁচটী উপবায়ু আছে। যথা
নাগ —ইহার কার্য্য উদ্গার তোলা।
কূর্ম্ম —উন্মীলন অর্থাৎ বিকাশ করা।
কৃকর —ক্ষুৎ অর্থাৎ হাঁচি।
দেবদত্ত—জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই তোলা।
ধনঞ্জয় —হিক্কা তোলা ; পোষণ করাও ইহার কার্য্য।

প্রাণের স্থান হৃদয়ের মধ্যে। প্রাণবায়ুর তিন বৃত্তি, আকর্ষণ স্তম্ভণ ও বিশ্লেষণ। এই কারণে পূরক, কুম্ভক ও রেচক প্রাণায়ামের তিনটী বৃত্তি বা অঙ্গ। প্রাণবায়ু দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া চলিতেছে। ইহাই জীবের প্রাণ প্রবাহ। প্রাণবায়ু ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে চলে, যৌগিক প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা রোধ করিলে ঐ বায়ু ঈড়া ও পিঙ্গলা ছাড়িয়া সুষুম্নায় চলিতে থাকে। সুষুম্নায় বায়ু চলিলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন ও প্রবুদ্ধা

হইয়াছেন জানা যায়। ইহা যোগের প্রথম সাধন। হৃদয়ে দেবতা চিন্তা করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ (এই পূরক) ও বাম হস্তে বীজমন্ত্র চার বার বা ১৬ বার জপ করিবে। আবার অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া শ্বাস রোধ (কুম্ভক) করিয়া ১৬ বা ৬৪ বার জপ করিবে। পরে ডান নাক ছাড়িয়া দিয়া তদ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে (ইহাই রেচক)। ইহা করিতে ৮ বা ৩২ বার মন্ত্র জপ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বারে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিবে ও ডান নাসা টিপিয়া বায়ু রোধ (কুম্ভক) করিবে ও ১৬ বা আবার অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান নাক টিপিয়া বায়ু রোধ (কুম্ভক) করিবে ও ১৬ বা ৬৪ বার জপ করিবে ও বাম নাক ছাড়িয়া দিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ৮ বা ১৬ বার জপ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বারে প্রথম বারের মতন করিবে। ইহা প্রাণায়ামের নিয়ম। বহুবিধ প্রাণায়াম আছে। এই বায়ু নিরোধ অভ্যাসে বায়ুর সমতা আসে ও চিত্ত স্থির হয়। প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া অনেকে মোটর গাড়ী টানিয়া রাখে, বুকে পাথর বসায় ও অন্যান্য অনেক অসাধ্য সাধন করে। এইরূপে প্রশ্বাস ক্রিয়াকে সংযমন করিয়া নাসাব অভ্যন্তরচারী করিতে পারিলে দেহী দীর্ঘজীবী হয়। শ্বাস প্রশ্বাসেই আয়ু ক্ষয় হয়। ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস লইলে এই ক্ষয় কম হয়। যে প্রাণী বহু কুম্ভক করে সে বহু বৎসর বাঁচে যেমন কচ্ছপ। অভিজ্ঞ গুরু ব্যতীত এই সাধনা অনুচিত। বহু ব্যাধি জন্মাইতে পারে।

যোগের পঞ্চম সাধন প্রত্যাহার—বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের বলপূর্বক ফিরাইয়া আনা প্রত্যাহার। প্রাণসহ ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া দেহের মধ্যে ১৮টী মর্ম্মস্থানে ধারণা করাকেও প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহার অভ্যাস করিলে যোগীর চিত্তবৃত্তি বাহ্য বিষয় ছাড়িয়া তন্দ্রাভিভূতের ন্যায় অবস্থান করে ও প্রাণ ও অপান অন্তর্ম্মুখী হইলে সম্মুখে এক শূন্যভাব প্রকাশ করে। এই অবকাশ সুষুম্নার স্বরূপ ইহাই মোক্ষের দ্বার।

ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনার অধিষ্ঠান ভূমি। স্থূল শরীর অপেক্ষা, ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। এইরূপে বুদ্ধ্যতীত আত্মাতে স্থিতি করিতে পারিলে পরম প্রত্যাহারসিদ্ধ হওয়া যায়।

বাসনা ত্যাগ আন্তর প্রত্যাহার। মানসিক পূজাদিকে মানস প্রত্যাহার বলে।

যোগের অবশিষ্ট অঙ্গ ধারণা ধ্যান সমাধি। যম নিয়মাদি সম্পন্ন যোগী যে ঈশ্বরে মন সম্পাদন করিয়া থাকেন তাহাকে ধারণা বলে। হৃদপদ্ম, ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে বা কোন দিব্যমূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করা ধারণা। (পৃ. ৩৬৮)

ধ্যান—যে বিষয়ে চিত্তকে ধারণা করা যায় সে বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারাবৎ চিত্তের একতান প্রবাহকে ধ্যান বলে।

সমাধি—ধ্যানের পরিপক্ব অবস্থা সমাধি। সমাধিঃ সংবিত্তাৎপত্তিঃ পর-জীবৈকতাং প্রতি। পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব বিষয়ক জ্ঞানের নামও সমাধি।

সমাধি দুই প্রকার—সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত ও নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত। সবিকল্প ও নির্বিকল্পও বলে। সবীজ সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান থাকে ও চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না। উহা দমিত হইয়া বীজরূপে লুকাইয়া থাকে মাত্র।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি একেবারে তিরোহিত হয়। সমুদায় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়, কেবল সংস্কার মাত্র থাকে। ইহাই নিরোধ সমাধি।

যোগের অন্তরঙ্গ সাধন ধ্যান, ধারণা সমাধি। অপরগুলি বহিরঙ্গ সাধন।

যোগের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন

যম ও নিয়ম চিত্তশুদ্ধির উপায় সর্ব্বপ্রকার সাধনার ভিত্তিস্বরূপ। আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, মনঃ সংযমের সহায়ক শারীরিক প্রক্রিয়া।

অতঃপর রাজযোগ—মহাত্মা দত্তাত্রেয় ঋষি এই যোগের প্রবর্ত্তক, শরীর ও মন বায়ু স্থির করা এই যোগের প্রধান সাধন।

(১) কুম্ভক দ্বারা প্রাণবায়ুকে চিত্তে নিরালম্ব করা এই যোগের অঙ্গ। উচ্চাঙ্গের অবধূত পদবীর সাধকই এই রাজ যোগের সহজাবস্থা পান। মনস্থির করিয়া প্রাণবায়ুকে সুষুম্না পথে অন্তঃ কুম্ভকদ্বারা প্রবাহিত করিয়া প্রাণকে ভ্রূর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে নিরালম্ব পুরীতে রুদ্ধ করিলে চিত্ত নিরালম্ব হয়। তখন বোধহয় 'আমি আদি, অন্তহীন আকাশের ন্যায় শূন্য। ইহাই

চিত্তাকাশ ; এই সময় মন হইতে বাহ্য চিন্তা একেবারেই দূর হয় ও খুব নেশাবোধ হয়। অর্দ্ধনিমীলিত অবস্থায় চক্ষু স্থির হয়, দৃষ্টি ভ্রূর মধ্যে থাকে। তখন প্রাণবায়ু নাসার অভ্যন্তরে বিচরণ করে। দীর্ঘকাল অভ্যাসে যোগী ইচ্ছারাহিত্য লাভ করেন ও পরে মুক্তি পান।

গীতায়—(১) এই যোগের কথায় উক্ত হইয়াছে যে মন হইতে বাহ্য বিষয় সকল দূর করিয়া, চক্ষুদ্বয়কে ভ্রূমধ্যে রাখিয়া প্রাণ ও আপন বায়ুকে নাসা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনকে সংযত করেন ; ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে একেবারে তিরোহিত করেন এমন মননশীল মোক্ষপরায়ণ সাধকই মুক্ত হন। রাজযোগের প্রকৃত মাহাত্ম্য—জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান, ব্রাহ্মীস্থিতি, সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি ও অষ্টসিদ্ধিলাভ।

(২) ঘেরণ্ড সংহিতায় রাজযোগের আর একটী বর্ণনা আছে। যথা—

লোকমধ্যে ভবেৎ কর্ত্তা, মনোমধ্যে হি নিষ্ক্রিয়ঃ ;
এষোঽপি রাজযোগীতি সুখেদুঃখে সমস্তথা।

যিনি অন্তরে নিরাসক্ত, বাহিরে কর্ম্মবীর, সুখেদুঃখে অবিচলিত সমজ্ঞান, অর্থাৎ সংসারে পদ্মপত্রে জলের ন্যায় বাস করেন, গীতোক্ত কর্ম্মযোগীবৎ, তিনি একজন রাজযোগী।

(৩) সহস্রার কমলে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের বহির্দেশে) যিনি মন রাখিয়া ধ্যানে লীন হন, তাঁহার হৃদয় হইতে জগৎ বিলুপ্ত হয়। তিনি কুল অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব জয় করেন। তাঁহার জন্মমৃত্যুরহিত হয়। এইরূপ যোগী অতঃপর মহৎ শূন্যের ধ্যান করিবেন। আদ্যন্ত মধ্য রহিত শূন্য ধ্যানে সঙ্গবিবর্জ্জিত যোগী পরমানন্দময় হন। কৈবল্যসিদ্ধি তাঁহার করতলগত। ইনি যথার্থ রাজযোগী ও পরমভক্ত।

লয়যোগ

ভগবান বেদব্যাস এই যোগের প্রথম সাধক। লয়যোগীরা শরীরস্থ নবচক্রে চিত্ত লয় করিয়া মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্যলাভ করেন।

লয়যোগের উদ্দেশ্য শক্তিদ্বয় পরিচালনপূর্ব্বক মধ্য শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রত্যেক মানবের দেহে তিন প্রকার শক্তি আছে। একটির নাম ঊর্দ্ধশক্তি, অপরটি অধঃশক্তি ও অন্যটি মধ্যশক্তি।

মূলাধার হইতে নাভিচক্র পর্যন্ত অধঃশক্তির স্থান। ইহা ইচ্ছাশক্তিরূপা ব্রাহ্মী শক্তি। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত মধ্যশক্তির স্থান। ইহা ক্রিয়াশক্তিরূপা বিষ্ণুশক্তি। কণ্ঠ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ঊর্দ্ধশক্তির স্থান। ইহা জ্ঞানশক্তিরূপা রুদ্রশক্তি (মূলাধারে আছে ব্রহ্মগ্রন্থি, মণিপুরে বিষ্ণুগ্রন্থি, কণ্ঠে রুদ্রগ্রন্থি)।

(১) ঊর্দ্ধশক্তি নিপাতনের দ্বারা অধঃশক্তির সংযোগে মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া সাত্ত্বিক প্রবাহ বা আনন্দের প্রাচুর্য্য উপভোগ হয়। এই প্রক্রিয়ায় আসন বা প্রাণায়ামের অপেক্ষা নাই। লয়যোগীর গ্রন্থিগুলি আপনা হইতেই ভেদ হইয়া যায়।

(২) "মনোলয়ে দ্বৈতনিবৃত্তিঃ" : অনাহতধ্বনিতে মন সমাধান চিত্ত লয়ের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যোনিমুদ্রা অবলম্বনে নাদানুসন্ধান মন লয়ের কারণ। এই নাদ দশবিধ। প্রথমে চিন্, দ্বিতীয়ে চিনচিন্, তৃতীয়ে ঘণ্টানাদ, চতুর্থে শঙ্খ, পঞ্চমে তন্ত্রীনাদ, ষষ্ঠে তালনাদ, সপ্তমে বেণু, অষ্টমে মৃদঙ্গ, নবমে ভেরী, দশমে মেঘনাদ।

এই অনাহত ধ্বনিতে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে মন ক্রমশঃ নিস্তরঙ্গ হয়, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় ব্যাপারে তিরোহিত হয় ও চিত্ত নির্বিকার হয়। তখন 'আমি তুমি' ভাব ঘুচিয়া গিয়া একাকার ভাবে চিত্ত ডুবিয়া যায়। এই দ্বৈতভাব লোপে অদ্বৈতভাবের স্ফুরণ।

(৩) শাম্ভবী মুদ্রাভ্যাসেও লয় অবস্থা আসে। তখন দৃষ্টিশক্তি স্বতঃই নাসার অগ্রভাগ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভ্রূমধ্যে স্থির হয়। প্রাণবায়ু রেচক পূরক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে আসিয়া বসিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনও সংকল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়া শূন্যভাবে অবস্থান করে। চক্ষুদুটিও শিবনেত্র হয়। এই প্রকার ভাবনায় বিদ্যুততেজসন্নিভ যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় তাহাতে পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। দেবদর্শন ঘটে, তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ হয়। শূন্যস্বরূপ পরমাত্মার অহর্নিশ ধ্যানে যোগীমন চিদাকাশে লীন হয়। তাঁহার খেচরত্ব সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি শিবস্বরূপ হন।

৪। ষটচক্রে ধ্যান

মানব দেহ মধ্যে ৭২০০, কেহ বলেন তিন লক্ষ পঞ্চাশটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে দশটি প্রধান। এই দশটির মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ, যথা—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মেরুদণ্ড মধ্যে সুষুম্না বিরাজিত। আর মূলাধার পদ্ম হইতে ঈড়া নাড়ী উঠিয়া মেরুর বাম পার্শ্ব দিয়া এক একটি পদ্মকে বেষ্টন করিয়া আজ্ঞাচক্রের উপর দিয়া বাম নাসামূল পর্য্যন্ত এবং পিঙ্গলা মেরুর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ঐরূপ আজ্ঞাচক্রের উপর দিয়া দক্ষিণ নাসামূল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুষুম্না গুহ্যদেশের কন্দস্থান হইতে শীর্ষ দেশ পর্য্যন্ত মেরুর মধ্য দিয়া অর্দ্ধস্ফুট ধুতুরা পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইয়া আছে। এই কন্দস্থানে জীব চৈতন্য কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। যে স্থান হইতে এই তিনটি নাড়ী পৃথকভাবে উঠিয়াছে তাহাকে যুক্তবেণী ও আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে যেখানে এই তিন নাড়ী মিলিয়াছে ঐ স্থানকে মুক্তবেণী বলে। ইহাই ত্রিবেণী সঙ্গম। এ স্থানে যোগীর যে সূক্ষ্মস্নান তাই সঙ্গম স্নান। বাহিরের ত্রিবেণী বা প্রয়াগ স্নান ইহারই প্রতীক মাত্র। যেমন ঐস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন ইত্যাদি এখানেও তাহাই। কারা ঈড়া নাড়ীকে যমুনা, পিঙ্গলাকে গঙ্গা আর সুষুম্নাকে সরস্বতী বলে। ঈড়াকে চন্দ্র, পিঙ্গলাকে সূর্য্য, এবং সুষুম্নাকে অগ্নিও বলে। ইহাদিগকে বরুণা, অসিও বলে; আর উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বারাণসী বলে। সুষুম্নাকে যোগপথ, রাজমার্গ, শাম্ভবী, শ্মশান, মেরু, পশ্চিম পথ ইত্যাদি বলে। এই সুষুম্নার মধ্যে বজ্রানাড়ী। (শিশ্নদেশ স্বাধিষ্ঠান) মেরুদেশ হইতে শির পর্য্যন্ত দীপাকারে জ্বলিতেছে। এই বজ্রানাড়ীর অভ্যন্তরে ঔর্ক্কা মাকড়সার জালের সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মা এক নাড়ী আছে—চিত্রিণী মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের কিছু ঊর্দ্ধের প্রণব পর্য্যন্ত অবস্থিত। এই চিত্রিণী নাড়ীতে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞা ও সহস্রার এই ষটচক্র সূত্রে গ্রথিত আছে। চিত্রিণীর ভিতরে আবার মূলাধারস্থ কন্দস্থানে যে মহাদেব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন তাঁহার মুখ বিবর হইতে বাহির হইয়া সহস্রদল পদ্মস্থ পরমশিব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ

দেহে যোগনাড়ী ও ষড়চক্র বর্ণনা

এক নাড়ী আছে—ইহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। এই নাড়ী পথেই সহস্রার হইতে অমৃতক্ষরণ হয়। ইনি তড়িৎজ্যোতির ন্যায় প্রকাশমানা, অতিসূক্ষ্মা, বিশুদ্ধ-জ্ঞানময়ী ও নিত্যানন্দময়ী।

যোগীরা এই স্থানের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া চক্রগুলির ধ্যানে মনঃ লয় করেন। লয় বলিতে "অপুনর্বাসনোত্থানাল্লয়ো বিষয় বিস্মৃতিঃ"। পুনর্ব্বার না উঠিতে পারে এইভাবে বাসনার নিবৃত্তি হইলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণ ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়। ইহাই লয়াবস্থা।

চক্রধ্যানে মন লয় হইলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়।

গুরুত্ববিধায় নিম্নে ষটচক্র বর্ণনায় সাধকের একটী গান ও একটী চিত্রে চক্রগুলির মানবদেহে মেরুমধ্যে সংস্থান দেখান হইল। পরে বিশেষ বিবরণও দেওয়া হইল। আশা করি এইভাবে এই সুকঠিন বিষয়টি সাধকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার মন বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী।
মূলে পৃথ্বী ব, স অন্তে চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে শিবে ঘিরে কুণ্ডলিনী।
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল অন্তে ষড়দলোপরিবাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু শিব ভৈরবী রাকিনী
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নিবীজ ধারিণী।
ড, ফ অন্তে দশ (দিগ) দলে শিব ভৈরবী লাকিনী।
অনাহতে ষড়কোণে দ্বিষড়দলবাসিনী
ক, ঠ অন্তে বায়ুবীজ শিবভৈরবী কাকিনী।
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শদলবাসিনী।
গজোপরি বিষ্ণু আসন শিবশঙ্করী শাকিনী।
ভ্রূ মধ্যে দ্বিদলে মন শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্রবীজে সুধাক্ষরে হ, ক্ষ বর্ণে হাকিনী।

মূলাধার চক্র—গুহ্য ও মেঢের অন্তরালে যোনিমণ্ডল—ইহাই কন্দ স্থান, ইহা পশ্চিমাভিমুখী। তাহারই মূলদেশে কুণ্ডলিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা, সুষুম্নাকে সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করিয়া নাড়ী সমূহে বেষ্টিতা হইয়া স্বীয় পুচ্ছদেশে সুষুম্নার মুখে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে নিবেশ করিয়া সুষুম্নার বিবরে অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডলিনীশক্তি নাগরূপে নিদ্রিতা আছেন। অপর একটি মুখ খোলা আছে, সেইটি দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বহে। এই মুখে তিনি সদা জাগ্রত; তাই জীবের বাহ্যজ্ঞান আছে ও বিভেদবোধ আছে। অন্তর্মুখবন্ধ থাকায় আত্মজ্ঞানের অভাবে একত্ববোধ নাই। ইনি বাগ্‌দেবী স্বরূপিনী; কাঞ্চনবৎ প্রভাবশালিনী; সত্ত্বরজতম গুণপ্রসবিনী বিষ্ণুশক্তি।

স্বর্ণবর্ণ চতুর্দ্দল পদ্ম ব স শ ষ এই মাতৃকাবর্ণ বিরাজিত। এই যোনিমণ্ডলে কামকলারূপ রক্তবর্ণ ত্রিকোণ মণ্ডল ও তন্মধ্যে রক্তবর্ণ কামবীজ ক্লীং ও কন্দর্প নামক রক্তবর্ণ স্থিরতর বায়ুর বসতি। এই বীজকে ধৌত সোণার ন্যায় বর্ণরূপে ধ্যান করিতে হয়। তাহার মধ্যে ঠিক ব্রহ্মনাড়ীর মুখে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ অধোমুখে আছেন। ইনি রক্তবর্ণ কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়। এই কুলকুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে চিৎশক্তি অবস্থিতা, তাই ইনি সকলেরই ইষ্টদেবী স্বরূপিনী। এবং মূলাধার চক্র মানবদেহের আধার স্বরূপ। সাধন ভজনের মূল এইখানে। তাই ইহাকে মূলাধার কহে। ইহার ধ্যানে গদ্য পদ্য বাক্যসিদ্ধি ও আরোগ্য ও দার্ঢ্য সিদ্ধি লাভ হয়। অশ্রুতপূর্ব্ব শাস্ত্র সরহস্য-জ্ঞাত হন, ত্রিকালজ্ঞ ও সর্ব্বকারণাভিজ্ঞ হন ও মনোজয় বিন্দুধারণশক্তি ও বায়ুধারণ ক্ষমতা জন্মে। ইহলোক ও পরলোক উভয়ে সিদ্ধি লাভ হয়। এইস্থানেই ব্রহ্মগ্রন্থি। সাধক এই গ্রন্থিভেদ করেন। এখানে ক্ষিতিতত্ত্ব, পৃথ্বীবীজ—লং আছে। এই তত্ত্ব খুলিলে নানাপ্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। দেবতা ব্রহ্মা, শক্তি ডাকিনী।

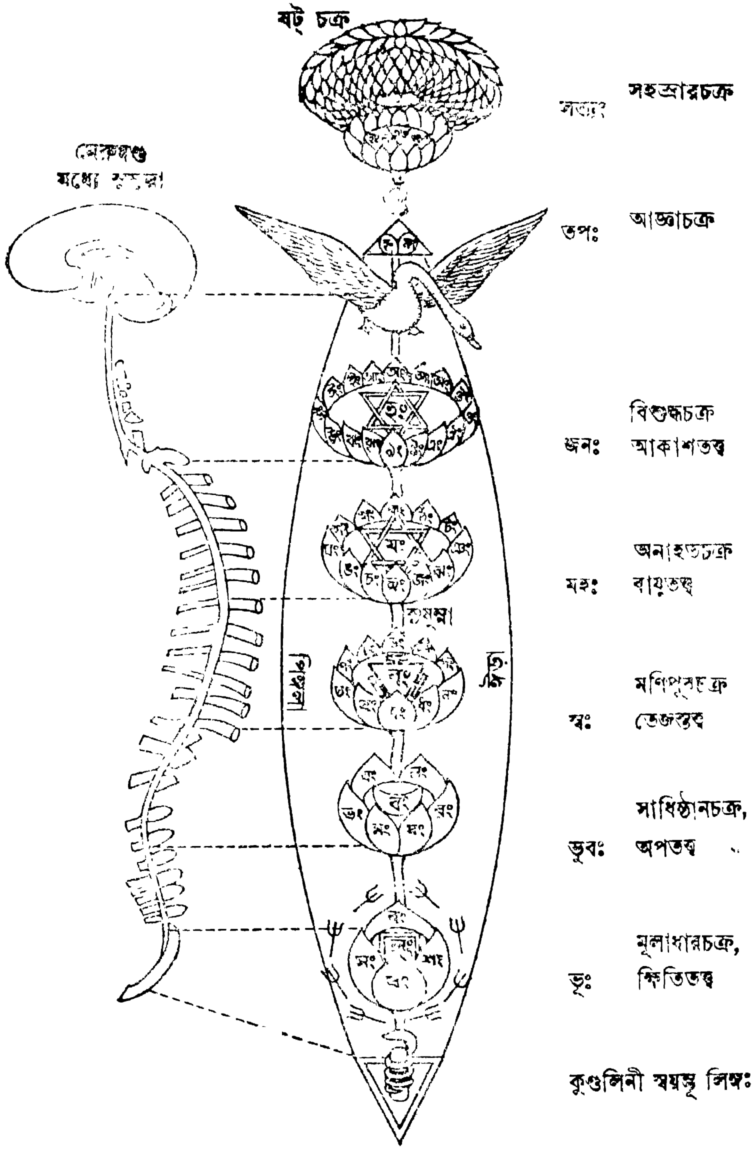
২। স্বাধিষ্ঠান—পদ্ম—লিঙ্গমূলে যে দ্বিতীয় পদ্ম তাহাই স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। সুপ্রদীপ্ত ছয়টি দল বিশিষ্ট রক্তবর্ণ পদ্ম। ব, ভ, ম, য, র, ল, এই মাতৃকা বর্ণ। কর্ণিকা মধ্যে শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার বরুণ মণ্ডল ও বরুণ বীজ বং। রক্তপাণ্ডুর বাণলিঙ্গ। চতুর্ভুজ বিষ্ণু ক্রোড়ে

চতুর্ভুজা গৌরবর্ণ রাকিনী শক্তি। এই পদ্মধ্যানে অনিমাদি সিদ্ধিলাভ হয়। মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। এখানে অপতত্ত্ব।

মণিপুর চক্র—নাভিদেশে নবীন মেঘের বর্ণ দশদল পদ্ম। দশদলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প ফ মাতৃকা বর্ণ আছে। কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল ও রক্তবর্ণ রং বহ্নিবীজ। চারিহাত রক্তবর্ণ অগ্নিদেব মেষে আরূঢ়। তাহার ক্রোড়ে সিন্দুরবর্ণ রুদ্র—ব্যাঘ্রচর্ম্মে আসীন—দুই হস্তে বর ও অভয়, ত্রিনয়ন. পদ্মধ্যানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ক্রোড়ে পীতবসনা, চতুর্ভুজা সিন্দুরবর্ণা লাকিনী শক্তি। ধ্যানে আরোগ্য, ঐশ্বর্য্যলাভ ইত্যাদি ক্ষমতা লাভ হয়। এখানে তেজঃ তত্ত্ব।

অনাহত চক্র হৃদয়ে। কাঞ্চনবর্ণা দ্বাদশদল পদ্ম। দলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, এই দ্বাদশ মাতৃকা বর্ণ আছে। বাণ ও পিনাকী লিঙ্গ, কাকিনী শক্তি। এই পদ্ম মধ্যে ধুম্রবর্ণ বায়ুতত্ত্ব ও বায়ুবীজ যং। বায়ু দেবতা কৃষ্ণসারে আসীন, চতুর্ভুজ। পদ্মের অধিপতি ঈশান বা ঈশ্বর—শুভ্রবর্ণ, দুই হাত। ক্রোড়ে কাকিনী শক্তি পীতবর্ণা, সালঙ্কারা, ত্রিনেত্রা, কঙ্কালমালা ধারিণী, চারি হাতে পাশ, কপাল বর ও অভয়। ঐ বাণ লিঙ্গের মস্তকে তেজোময় মণি অতিসূক্ষ্ম। তাহার মধ্যে নিবাত দীপ শিখাকার শ্বেতবর্ণ হংস বীজ প্রতিপাদ্য তেজবিশেষ আছে। এই জীবের জীবাত্মা, এই অনাহত পদ্মে জীব সর্ব্বদা হংস মন্ত্র জপ করেন। শব্দব্রহ্মরূপ 'ওঁকার' অনাহত ধ্বনি এইখানে শোনা যায়। পদ্ম ধ্যানে সৃষ্টি স্থিতি সংহার শক্তি বাক্‌পতিত্ব পরকায় প্রবেশ শক্তি ইত্যাদি লাভ হয়।

বিশুদ্ধ চক্র—কণ্ঠে ষোড়শ দল পদ্ম ধুম্রবর্ণ। ষোড়শ স্বরবর্ণ ষোড়শ দলে আছে শোন ফুলের বর্ণ বিশিষ্ট। পদ্ম মধ্যে আকাশতত্ত্ব, বৃত্তাকার আকাশ মণ্ডল আছে। কর্ণিকা মধ্যে স্ফটিকের ন্যায় বর্ণের হং বীজ ও তৎ প্রতিপাদ্য আকাশ দেবতা শ্বেতহস্তীতে বসিয়া আছেন, চারি হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বর অভয়। তাঁহার ক্রোড়ে পদ্মের অধিপতি সদাশিব, সদাশিবের দশহাত, পাঁচমুখ



চিত্রে মেরুদণ্ডের মধ্যে ষটচক্র দেখান হইল।

প্রতিমুখে ত্রিনেত্র—ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানে, তাঁহার কোলে অর্দ্ধাঙ্গিনী শাকিনী শক্তি চতুর্ভুজা পীতবসনা, রক্তবর্ণা—এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি।

বিশুদ্ধাখ্য—পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল বিদ্যমান আছে। শাকিনীশক্তি সর্ব্বদা চন্দ্রমণ্ডল বিগলিত সুধাপানে পুলকিত। এই স্থানে মনস্থির হইলে সাধকের মন আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ হয়। এই জন্য ইহাকে বিশুদ্ধপদ্ম বলে। পদ্মধ্যানে জরামৃত্যু পাশ বিরহিত হয়। এই স্থান জনলোক, জালন্ধর পীঠ।

ললনাচক্র—তালুমূলে রক্তবর্ণ দ্বাদশ দল বিশিষ্ট (কেহ বলেন ৬৪ দল) পদ্মে অমৃতস্থলী আছে। এই চক্রধ্যানে উন্মাদ, জ্বর ও পিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

আজ্ঞাচক্র বা মানসচক্র—ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থানে আজ্ঞাচক্র ও দ্বিদল পদ্ম অবস্থিত। এখানে মনঃস্থির হইলে আজ্ঞা বা দৈববাণী লাভ হয়, তাই ইহাকে আজ্ঞাচক্র বলে। এখানে শ্বেতবর্ণ দ্বিদলে হং ক্ষং বর্ণ আছে। দুই দলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক দুই বৃত্তি পদ্মের কর্ণিকামধ্যে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল যোনিরূপিণী ত্রিকোণের তিন কোণে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণ, ও এই তিন গুণ আশ্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আছেন। ত্রিকোণের মধ্যে শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজ ঠং আছে। অধিপতি দেবতা জ্ঞানদাতা শিব। ইনি শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ও ত্রিনেত্র। তাঁহার ক্রোড়ে বিদ্যামুদ্রা পাশ ও ডমরু ধারিণী চতুর্ভুজা হাকিনী শক্তি আছেন। আজ্ঞাচক্রের ধ্যানে যোগের চরম ফল নির্ব্বাণ মুক্তি।

আজ্ঞাচক্রের উপর ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থানকে ত্রিকুঠী বা ত্রিবেণী সঙ্গম বলে। এই ত্রিবেণীর উর্দ্ধে সুষুম্নামুখের নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল আছে। তাহার উপর তেজঃপুঞ্জ একটি বিন্দু, তাহার উপরিভাগে দণ্ডাকার নাদ (শিবলিঙ্গ) ইহার উপর ত্রিকোণমণ্ডল শ্বেতবর্ণ, তন্মধ্যে শক্তিরূপা শিবাকারা হকারার্দ্ধ আছে। এই স্থানে বায়ুর ক্রিয়া শেষ। ইহার অপর

মন বা জ্ঞান বা গুরুচক্র

নাম জ্ঞানচক্র। ওখানে জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাত্মা আছেন। পরমাত্মা ইহার অধিষ্ঠাতা, ইচ্ছা তাঁহার শক্তি। প্রদীপ শিখারূপিণী অন্তঃজ্যোতিঃ সুপীত সোণার বেণুর ন্যায় আছে। এই যে জ্যোতিঃদর্শন ইহা সাধকের আত্মপ্রতিবিম্ব। এই পদ্মের ছয়টি দল: শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্বপ্ন—এই ছয়টি বৃত্তি। দলগুলি সাদা, লাল, হলদে ইত্যাদি বর্ণের। মন এই ছয়টী দলের যখন যে দলে ঘোরে তখন স্বত্ব বা রজঃ বা তমঃ ভাবের উদয় হয়।

ব্রহ্মরন্ধ্রে অষ্টদল বা শতদল গুরুচক্র শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকায় ত্রিকোণমণ্ডল হ, ল, ক্ষ এই তিন বর্ণ। ইহার তিনদিকে সমুদায় মাতৃকাবর্ণ আছে। এই মণ্ডলই যোনিপীঠ বা শক্তিপীঠ। এই শক্তিমণ্ডলমধ্যে তেজোময়, কামকলা বিরাজমানা॥ বীজ ঐং তাহার পার্শ্বে গুরুদেব, হংস পাদপীঠে গুরু-পাদুকা, হংসের দুই পক্ষ আগম-নিগম; চরণ দুটি শিব-শক্তিময়। চঞ্চুপুট প্রণব, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলারূপ। গুরুদেব শ্বেতবর্ণ কোটিসূর্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জ; দুই হাতে বরাভয়। শ্বেতমালা, শ্বেতগন্ধ, শ্বেত-বস্ত্র, হাস্যবদন, করুণদৃষ্টি। তাঁহার বামক্রোড়ে রক্তবসনা, সর্ব্বালঙ্কারা, অরুণ রক্তবর্ণা গুরুপত্নী। তাঁহার বামকরে পদ্ম, দক্ষিণকরে শ্রীগুরু-কলেবর বেষ্টন করিয়া আছেন। এই গুরু অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ইনি সকলের গুরু। এই গুরুপদ্ম ধ্যানে সর্ব্বসিদ্ধি ও দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

সহস্রার—এই গুরুচক্রের উর্দ্ধে নিরালম্বপুরী বা শূন্যস্থান। এখানেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ হয়। ইহার পরেই সহস্রার পদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর মহাশূন্যে শ্বেতবর্ণ সহস্রদল পদ্ম বিরাজিত চারিদিকে পঞ্চাশদল উপর্য্যুপরি ২০টি স্তবকে সজ্জিত। প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশদলে ৫০টি মাতৃকাবর্ণ। কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণ-চন্দ্রমণ্ডল বা শক্তিমণ্ডল। তিন কোণে হ, ল, ক্ষ, বর্ণ আছে ও তিন দিকে সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। এই শক্তিমণ্ডলমধ্যে তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডল। তাহার উপর মধ্যাহ্নকালীন কোটি সূর্য্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জ আর একটী বিন্দু—তাহা বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ শ্বেতবর্ণ। এই বিন্দুই পরমশিব নামে

জগৎ উৎপত্তি নাশ করেন—ইনি পরমেশ্বর, ইনিই অজ্ঞান তিমির নাশকারী পরমাত্মা। ইহাকেই সাধনবলে প্রত্যক্ষ করাকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলে। অ হইতে বিসর্গান্ত ষোড়শ বর্ণযুক্ত ব্রহ্মরেখা প্রজাপতি, ককারাদি তকারান্ত ষোড়শবর্ণযুক্ত পরাৎপর বিষ্ণুরেখা, থকারাদি সকারান্ত ষোড়শযুক্ত শিবরেখা সত্ত, রজ, তমযুক্ত রেখাত্রয় বিন্দুত্রয় হইতে উদ্ভূতা হইয়া যোনি আকারে ভূষিতা। এই বিন্দুত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাত্মক পরমতত্ত্ব, ত্রিকোণ বিন্দুতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। উক্ত ত্রিকোণের মধ্যে মহাশূন্য অবকাশ গুণাতীতা পরমাপ্রকৃতি। আপন আপন সম্প্রদায়ের গুণাতীত জগদ্গুরু এই পরাপ্রকৃতির অধীশ্বর হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন।

পরমশিব ঐ বিন্দু সতত গলিত সুধাস্বরূপ। ইহারই মধ্যে সমস্ত সুধার আধার গোমূত্রবর্ণা অমা নামক কলা আছে। ইনিই আনন্দ ভৈরবী। ইহার মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার নির্ব্বাণ কামকলা আছেন। এই নির্ব্বাণ কাম-কলাই সকলের ইষ্টদেবতা, তাহার মধ্যেই পরম নির্ব্বাণশক্তি আছেন। তাহার পর নিরাকার মহাশূন্য। এই মহাশূন্য নির্ব্বাণতত্ত্বে দিবারাত্র নাই; তম ও প্রকাশভাব নাই; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বি পঞ্চতত্ত্ব নাই। সুতরাং তত্ত্বসমূহ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের ও বুদ্ধিরও অগোচরের প্রাধানিক ব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ বর্ত্তমান আছেন। নির্ব্বাণ শক্তির অধীশ্বর এই পরমপুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই—ইনিই চরম সীমা ও পরমগতি। ইহাতে জ্ঞান হইলে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ও অমৃতস্বরূপত্ব নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। শৈবগণ এই নির্ব্বাণপদকে শিবপদ, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীহরির পরমপদ, ভগবতীর শ্রীচরণসেবী সুরসিক শাক্তগণ দেবীর পদ, সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতি-পুরুষ স্থান বলেন। এই স্থানে উপলব্ধি হলে যোগীর পরিচ্ছিন্ন দেহভ্রান্তি দূর হইয়া বিশ্বসংসারই নিজ দেহরূপ মনে করেন ও আত্মানন্দ ও অমৃতের যুগপৎ অভেদ জ্ঞানের পূর্ণতায় পূর্ণানন্দময় হয়েন।

অতঃপর যোগের অবস্থাভেদে যে ৭টী স্তর আছে সেগুলির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।

হঠযোগের মধ্যে যে যোগের সপ্তভূমিকা অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা

হইয়াছে সেই সাধনার স্তর আছে। অন্নপূর্ণোপনিষৎ ও অক্ষ্যুপনিষদে তাহার নিখুঁত বর্ণনা আছে। নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যোগাভ্যাস কালে যোগীর আধ্যাত্মশাস্ত্রালোচনা ও সাধু সঙ্গ দ্বারা, চিত্তশুদ্ধি হইলে প্রথমতঃ সন্তোষরূপ আমোদে প্রথম ভূমিকা উদিত হয়। ইহা ভূমি হইতে মাত্র উত্থিত হইয়াছে। ইহা অমৃতের ক্ষুদ্র অঙ্কুরতুল্য। এই অবস্থায় অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও সন্ন্যাসযুক্ত হয়। মোক্ষ বিষয়ে ইচ্ছা আসে। এই অবস্থা হইতেই পুষ্পফল ইত্যাদিরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিকা উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মবিষয়ক বিচার, ব্রহ্মই সত্য, অন্য প্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া অসত্য ইত্যাদি বিচার দ্বিতীয় ভূমিকা। তৃতীয় ভূমিকায় সর্ব্বপ্রকার সংকল্পের সম্বন্ধ ত্যাগ, শমদমাদি অভ্যাসসহ আত্মভাবনা ফুটে ও অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। ফলে চতুর্থ ভূমিকায় (বিলাপিনী ভূমিকায়) যোগী আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করিলে দ্বৈতাবস্থার উপশম ও অদ্বৈতাবস্থায় স্থিরতা প্রাপ্ত হন ও লোকসমূহকে স্বপ্নবৎ দেখেন। চিত্ত ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ডের ন্যায় বিলয় প্রাপ্ত হয়।

যোগসাধনের সপ্তভূমিকা

প্রথম তিন ভূমিকা জাগ্রৎ অবস্থা। চতুর্থকে স্বপ্ন বলে।

পরে পঞ্চম ভূমিকায় যোগী কেবল ব্রহ্ম স্বস্বরূপেই অবশিষ্ট থাকেন। এখন চিত্তের বিলয় বশতঃ জগদ্রূপ বিকল্পের উদয় হয় না, দ্বৈতবিজ্ঞান বিগলিত হইয়া কেবল অদ্বৈতরূপেই ও অন্তঃপ্রবোধরূপ সুখে অবস্থান করেন। এই পঞ্চমী ভূমিকায় অর্দ্ধসুপ্ত ও অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকেন, তাই ইহাকে সুষুপ্ত অবস্থা বলে। তিনি মিথ্যা জ্ঞান জন্য সংস্কার বশতঃ শয়নাশনাদি বাহ্যপরায়ণ হইয়া ও অন্তর্ম্মুখীন ব্রহ্মাকার বৃত্তিদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্মরূপে আনন্দঘনাকার সংবিধানরূপ পঞ্চম ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া যেন বাহ্যবৃত্তিতে পরিশ্রান্ত হইয়াই সর্ব্বদা নিদ্রালুর ন্যায় পরিদৃষ্ট থাকেন। বাসনা শূন্য হইয়া এই অবস্থার অভ্যাস করিলে ক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত অসংবেদন নামা ষষ্ঠ ভূমিকাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অবস্থা তুর্য্য নামেও কথিত হয়। এই অবস্থায় আত্মস্বরূপের বোধ হয় না বলিয়া যোগী অসৎরূপে অবস্থান করেন না; লৌকিক অর্থক্রিয়ার অভাব বশতঃ সৎরূপও নয়, অহংকারের বাধাবশতঃ অহংরূপ শূন্য ও মিথ্যাসংস্কারবশতঃ "আমি" এরূপ ব্যবহার থাকায় অনহঙ্কার ও নহে; তবে অন্তঃকরণ বৃত্তির অভাব বশতঃ অদ্বৈতে

আত্মনির্ভরশীল হইয়া অবস্থিত, তখন হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ পায়, সকল সংশয়ের বিনাশ ঘটে। অতএব বৃত্তিহীন হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের অপরিসমাপ্তিহেতু দেহ পতন না হইয়া বাহ্যক্রিয়া বিশিষ্ট বলিয়া অনির্ব্বাণরূপ হইলেও বাহ্য বিষয়ে শ্রদ্ধা ও বৃত্তির অভাববশতঃ নির্ব্বাণ স্বরূপে অবস্থিতি হয়। যেমন চিত্রিত প্রদীপ সর্ব্বদা একরূপে স্থির ভাবে অবস্থান করে—এই ষষ্ঠ ভূমিকা প্রাপ্ত যোগীর অবস্থা। পরে সপ্তম ভূমিকা তুর্যাতীতপদ রূপ অবস্থা। শমতা, স্বচ্ছরূপতা, সৌম্যাকরতা পরমনির্ব্বাণরূপ বিদেহ কৈবল্যাবস্থাস্বরূপা, বাক্য ও মনের অগোচর অবস্থা পরব্রহ্মস্বরূপতাহেতু পূর্ণানন্দময় মুক্তাবস্থা।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

গান

(শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত)

(১)

একদিন এসেছিলে তুমি এ শ্মশানে দ্বারকাতীরে
গৃহবাস তুচ্ছ করি মাতৃআজ্ঞা ধরি শিরে ।১
মেটেনি তব পিয়াসা সংকীর্ত্তন ও গোচারণে
শালগ্রাম নিমজ্জনে আর পূজাধ্যান আনমনে ।২
ব্রজবাসী কৈলাসপতি দেখে তব শুদ্ধমতি
বেধ দীক্ষা দিল মন্ত্র-তন্ত্র-সারাৎসার ।৩
তারাপ্রেমে হ'য়ে আকুল ছুটে এলে "শিমুলমূল"
অনায়াসে "সিদ্ধাসনে" করলে অধিকার ।৪
সে দিন সে বর্ষাদিনে কে ছিল হে তবপাশে ?
এ ভীষণ মহাশ্মশানে বিভীষিকা অট্টহাসে ?৫
কৌলাচার্য্য কৈলাসপতি সহসা ভৈরবী সনে
নিমেষে লুকাল শূন্যে অনন্ত মহাপ্রয়াণে ।৬
উলঙ্গ ভৈরব বেশে ধূলি উড়ে রুক্ষকেশে
শৃগাল কুকুর তব নিত্য সহচর ।৭
বাতাতপে নাহি ক্লেশ অন্নচিন্তা নাহি লেশ
চিন্তামাত্র তারামার চরণ দুস্তর ।৮
কিবা তব জপতপ কিবা পূজাবিধি
কে জানে গোপন কথা ওহে জ্ঞাননিধি ।৯
তারাপীঠ গুপ্তপীঠ এই সবে জানে
বামাচারে সিদ্ধক্ষেত্র বসিষ্ঠ আসনে ।১০
তোমার ভৈরবী কই ? কে করে সন্ধান
"তারা মা" কি ভৈরবী হ'য়ে "তোষয়ে সন্তান" ?১১
এ বড় বিচিত্র লীলা কলিযুগে দেখাইলা
প্রেমভক্তি পরকাশে জগৎ মাতান ।১২

কভু দেখি নিরজনে বনফুল হাতে
দর বিগলিত ধার প্রেমাশ্রু অনিবার
বক্ষে বহিছে পাথার "জয় তারা" স্বরে ।১৩
(কভু) ধূলি ধূসরিত অঙ্গে দুই সারমেয় সঙ্গে
ভ্রমিছ শ্মশানে দেখি নিঃসঙ্গ শঙ্করে ।১৪
সে নাদের মোহন ছন্দে প্রাণ নাচে প্রেমানন্দে
ঘুচে ভ্রমদ্বন্দ্বাদ্বন্দ্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার ।১৫
এ তারাপুর শ্মশানে আসি দেখেছিল জগদ্বাসী
ভক্ত আর ভক্তাধীনা তারা সারাৎসার ।১৬
উঠিতে বসিতে তারা খেতে শুতে তারা তারা
তারা বিনা এ ব্রহ্মাণ্ডে নাহি কিছু আর ।১৭
তারা ভিন্ন নাহি আশ তারাময় চিদাকাশ
ঘটে পটে একতারা বাজে অনিবার ।১৮
কভু বা আসনে বসি 'তারা' সনে হাসিখুসি
কভু অভিমান স্বরে দাও গালাগালি ।১৯
কভু কত অনুযোগ কভু বা মিনতি
কি তব বিচিত্র লীলা নৃকপালমালি ?২০

(২)

বল্‌রে তারাপুরবাসী কোথা শ্রীবামে দেখে আসি,
আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীবামে কোথা রেখেছিস লুকায়ে ।
বলেদে বলেদে ওরে কোথা গেলে পাব তারে
এ তাপিত প্রাণ শীতল হবে তাঁর দেখা পেয়ে ।
ওরে তারাপুর মহাশ্মশান, হেথা বাজে নাকি তাঁর বিষাণ ?
আর ওঠে নাকি নাদসিদ্ধের জয়তারার ভীমভৈরব তান ।
যে নাদ শুনে মা ছুটে যেত বিহ্বল হয়ে তার পাছু নিয়ে
সে গোপনস্বরে বাহির করে মনমাতান প্রাণ কাঁদান
তারা বলে দেরে শুনায়ে ।

বলরে ওরে দ্বারকানদী, তুমি খ্যাপার খেলার সাথী
তব অঙ্গে তারা প্রেমের তপ্ত অশ্রু খ্যাপা দেছে মিশায়ে।
খ্যাপা অদর্শনে হায়, বুঝি তুমি শীর্ণকায়
তাই বুঝি কুলুনাদ গেছে ফুরায়ে।
এ নহে অলীক কথা বুঝিছিরে তব ব্যথা
বর্ষারম্ভে আকুলিত তরঙ্গ উচ্ছ্বায়ে।
ওরে তারাপুর তরুলতা আমার শ্রীরামে রেখেছিস কোথা
তোরা তাঁর প্রেমের গানে কুসুমিতা আজও বনছায়ে।
বলরে বল অলি কুল তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল।
অনুরণে গুণগুণে, যাই শুধায়ে।
বলরে ওরে বনপাখী কুঞ্জে কুঞ্জে থাকি থাকি
সুখে যাস কি সুরধারা তারা নাম গেয়ে?
যে গান শুনে শ্রবণে মুগ্ধ জীব পায় চেতনে
কালুভুলু সারমেয় ডাকে উভরায়ে?
ধন্য তারাপুর বাসী ধন্য মহাশ্মশান
ধন্য দ্বারকা নদী ধন্য তরুলতা বিতান
ধন্য পাখী অলিকুল ধন্য সারমেয় কালুভুল
ধন্য হইল কলি জীবকুল রাম সঙ্গ পেয়ে।
কে বুঝিবে মম দশা কহিতে নাহিক ভাষা
রাম অদর্শনে বুঝি জীবন বা যায়ে।
ওরে ঐ ধূলিকণা বুঝি রাম-পদ রেণুকণা
দাও মোরে মাখাইয়া আর সহন না যায়ে।
শীতল জানিয়া ও পদ সেবিব জুড়াইব সব জ্বালায়ে।

(৩)

নাইবা চিনিল কে নাইবা বুঝিল

পাগলা চ্যাবা কত নাম অনাদরে দিল।

তাতে তোমার কি এল গেল প্রভু হে।

তারা নামামৃত পান করি তারা দিশি দিশি হেরি

পূর্ণস্নান অহর্নিশ করিলে অভ্যাস হে।

তুমি তারাময় হ'লে তারা তোমাময়।

সাকার নির্ব্বাণ পেল নিরাকার হ'ল সাকার।

এ অপূর্ব্ব মিলন হ'ল তোমা দোঁহাকার।

কেই বা বুঝিবে কেই বা জানিবে তুমি না বুঝালে হে।

(৪)

আমি অতি মূঢ়মতি বুঝিব কেমনে দাওহে দেখায়ে বুঝায়ে।

তব অপরূপ লীলা দাওহে জানায়ে

একদিন ধরা দিয়েছিলে প্রভু জননীর তব শ্রাদ্ধদিনে

যেদিন উঠেছিল মেঘ ঘনঘটা হয়ে

হাহাকার রবে কেঁপেছিল সবে

পণ্ড হল বা সব আয়োজন বিঘ্ন হ'ল ভোজনে।

সেদিন নীরবে দণ্ডহাতে দেখাইলে তব ভৈরব রূপ।

উড়ে গেল মেঘ থেমে গেল ঝড়

দূরে বরিষণ হল কড়মড়।

হেথা ব্রাহ্মণ ভোজন হল সমাপন গভীর আনন্দেতে।

ধন্য ধন্য উঠিল রে রব সিদ্ধ হয়েছে বামা।

করতলগতা হয়েছে রে তার "তারা" মনোরমা।

এ নহে পাগল চ্যাবা, এযে ভৈরব প্রেমময়

ওরে ফুটেছে কুসুম এযে অন্তর মধুময়।

শ্মশানে বসিল আনন্দের মেলা দিকে দিকে ঘোষে বামের জয়।

কত রাজা মহারাজা আতুর ফকির
তৃষিত তাপিত প্রেমাতুর কত ভরিয়া লইল ডালা
তব চরণ পরশে ধন্য হইল জুড়াল কতই জ্বালা।
কত অজানারে জানাইলে তুমি কত অভাগারে দিলে ঠাঁই।
এ অধমের তরে তব চরণ প্রান্তে আর কিগো ঠাঁই নাই।
দেহি পদবল্লভমুদারম্

জয় রাম।

শ্রীশ্রীমহাত্মা বামাক্ষ্যাপাবাবার নিত্যপূজা

ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি মন্দিরে বেদীর সম্মুখে ও আশ্রম মন্দিরে বাবার মর্ম্মর মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতি ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ প্রাতঃকৃত্য, স্নান, কাছা দিয়া বস্ত্র ও উত্তরীয় করণ, তিলক, ত্রিপুণ্ড্র ধারণ, শিখা বন্ধন করিয়া নিত্য বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবে।

(১) আসনে বসিয়া আচমন করিয়া গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিবে।

(২) প্রথমে মন্ত্র বলিবে—পুষ্পপাত্রে চন্দনাদি স্পর্শ করিয়া ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

পরে ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ

ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ

ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ

" ওঁ ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালেভ্যো নমঃ

" ওঁ ঐং শ্রীগুরুবে নমঃ

" ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

" ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ

পরে উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে বাবার দিকে বা বেদীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বলিবে—

(৩) ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যভ্যন্তর শুচিঃ
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।

(৪) পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে, যথা—

নিজের সামনে একটু বাঁদিক ঘেঁষিয়া একটি ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুষ্কোণ আঁকিয়া তাহার উপর গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবে মন্ত্র যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

'ফট্' মন্ত্রে কোশা ধুইয়া ঐ মণ্ডপের উপর বসাইবে।

'নমঃ' এই বলিয়া কোশা জলপূর্ণ করিবে, কোশার মুখ গন্ধপুষ্প বিল্বপত্র, দূর্ব্বা আতপ চাল দিয়া অর্ঘ্য দিবে।

(৫) পরে জলশুদ্ধি করিবে—কোশার জলে অঙ্কুশ মুদ্রা দেখাইয়া মন্ত্র—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি

নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

এই বলিয়া মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা দেখাইবে। 'ওঁ' মন্ত্র আট বার জলের উপর জপ করিবে। পরে ঐ জল নিজ মস্তকে তিনবার ছিটাইবে। ওঁ ফট্ মন্ত্রে পূজা দ্রব্যে ছিটাইবে।

(৬) দ্বারদেবতা পূজা—মন্ত্র—ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।

নৈঋতকোণে সচন্দন ফুল ছুঁড়িয়া বলিবে—

ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ,

ওঁ এতে গন্ধে পুষ্পে বাস্তু পুরুষায় নমঃ

(৭) পরে বিঘ্ন উৎসারণ—বৃদ্ধ অঙ্গুলী তর্জনীর অগ্রভাগে যোগ করিয়া, নারাচ মুদ্রায় আতপ চাল ধরিয়া তাহাতে 'ফট্' মন্ত্র সাতবার পাড়বে ও চাল নিজের চারিদিকে ছড়াইতে ছড়াইতে বলিবে—

ওঁ সর্ব্ববিঘ্নান্ উৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা।

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ

যে ভূতাঃ বিঘ্নকর্ত্তারঃ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।

(৮) পরে ভূতাপসরণ—ভূমিতে ডান হাতের মুষ্টি নিঃসৃত জল ছিটাইয়া বলিবে—

ওঁ পবিত্রে বজ্র ভূমে হুং হুং ফট্ স্বাহা

ওঁ ঐং বলিয়া চারিদিকে কটাক্ষে চাহিয়া দিব্য বিঘ্ন দূর করিবে 'অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া অন্তরীক্ষ বিঘ্ন দূর করিবে। বাঁ পায়ের গোড়ালি ভূমিতে তিনবার আঘাতে ভৌম বিঘ্ন দূর করিবে।

(৯) পরে আসনশুদ্ধি—আসনের নীচে একটি ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুষ্কোণ আঁকিবে। সচন্দন পুষ্প দিয়া এই মণ্ডলের পূজা করিবে। মন্ত্র—

ওঁ হ্রীং এতে গন্ধে পুষ্পে আধার শক্তয়ে নমঃ;

ওঁ হ্রীং মণি ধার বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা।

এই পূজার পর সুখাসনে বসিয়া জোড় হাতে আসন ছুঁইয়া বলিবে—

ওঁ পৃথ্বীত্বয়া ধৃতা লোকা, দেবিত্ব, বিষ্ণুণাধৃতা।

ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্

(১০) পরে আসনের উপর আবার ত্রিকোণ আঁকিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া বলিবে—

ওঁ হ্রীং এতে গন্ধে পুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।

(১১) পরে করজোড়ে বামকর্ণের ঊর্দ্ধে স্পর্শ করিয়া বলিবে—

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ.

ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ

ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ।

(১২) পরে জোড় হাত ডান কানের উপর রাখিয়া বলিবে—

ওঁ গণেশায় নমঃ।

কপাল স্পর্শ করিয়া বলিবে ও প্রণাম করিবে—

ওঁ ঐং শ্রীগুরুবে বাম দেবায় নমঃ।

ঊর্দ্ধে জোড় হাতে বলিবে—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ

অধঃ দেশে হাত জোড় করিয়া বলিবে—

ওঁ অনন্তায় নমঃ

ভূমি স্পর্শ করিয়া বলিবে—

ওঁ পবিত্র ব্রহ্মভূমে হূং ফট্ স্বাহা

(১৩) কায়শোধন—বিন্দু পরিমাণ জলপান করিয়া বলিবে—

ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট্ স্বাহা।

আত্মরক্ষা—হৃদয় স্পর্শ করিয়া বলিবে—

রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা

(১৪) বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন—মণি ধরি বজ্রিনি—

রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা

উত্তরীয়ে গ্রন্থিস্তাদন—ওঁ আং হূং ফট্ স্বাহা

(১৫) পরে পুষ্প শুদ্ধি—পুষ্পে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া বলিবে—

ওঁ শতাভিষেক শতাভিষেক হূং ফট্ স্বাহা

পরে পুষ্পে দেবতার অধিষ্ঠান ভাবিয়া বলিবে—

ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়
ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে
পুষ্প চয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।

(১৬) দিক বন্ধন—ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জ্জনী সিদ্ধ করিয়া তদ্বারা বাম করতলে 'ফট্' বলিয়া তিনবার আঘাত করিবে। তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গলি দ্বারা ফট্ বলিয়া পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ ক্রমে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ও অধঃ ও উর্দ্ধ দিকে তুড়ি দিয়া দিগ্‌বন্ধন করিবে।

(১৭) পরে প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি—সমর্থ হইলে।
প্রাণায়াম—ওঁ ঐং মন্ত্রে ৪ ১৬।৮ ক্রমে প্রাণায়াম করিবে।

(১৮) ভূতশুদ্ধি—হৃদয়ে শ্রীগুরু বামদেবকে চিন্তা করিয়া রং মন্ত্রে নিজের চারিদিকে বহ্নি প্রাকার চিন্তা করিবে ও কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার হইতে উঠাইয়া সুষুম্নাপথে সহস্রারে বসাইবে ও মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ মূল শৃঙ্গাটাচ্ছির সুষুম্নাপথেন জীবশিবং
পরমপদে যোজয়ামি স্বাহা।
ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোধয় স্বাহা।
ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা।
ওঁ পরম শিবপদ সুষুম্নাপথেন মূল শৃঙ্গাটমুল্লসোল্লাস
জ্বল জ্বল প্রোজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল সোহং হংসঃ স্বাহা।

(১৯) জীবন্যাস বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিজ হৃদয়ে লেলিহান মুদ্রায় হাত দিয়া ভাবিবে 'তুমি ও বামদেব' এক হইয়া গিয়াছ এইরূপে দেবভাব লইয়া পূজায় ব্রতী হইবে নিম্ন প্রকারে।

(২০) পরে ঋষ্যাদিন্যাস—
মস্তকে হাত দিয়া বলিবে—শিরসি বামদেবায় নমঃ
মুখে " " " —মুখে পুংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ
হৃদয়ে " " " —হৃদি সদাশিব দেবতায়ৈ নমঃ

(২১) পরে করন্যাস— অঙ্গন্যাস—

করন্যাস	অঙ্গন্যাস
হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ	হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ
হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা	হ্রীং শিরসি স্বাহা
হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্	হ্রূং শিখায়ৈ বষট্

হৈং অনামিকাভ্যাং হুং — হৈং কবচায় হুং
হৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ — হৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্
হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ — হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্

(২২) এইরূপ ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। কূর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান যথা-

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে বামদেবং পরমং গুরুং।
মুক্তাম্বরং স্থূলতনুং সর্ব্বসিদ্ধিময়ং প্রভুম।
ব্যাঘ্রকৃত্তি সুখাসীনং ব্রহ্মসূত্রাক্ষ শোভিতম্
ত্রিশূল লেলিহামুদ্রাং দণ্ডকঞ্চ মনোহরাং
ভবপাশ ভীতিহরং শান্তং শিবং সুন্দরং
ভক্তাভীষ্ট সুখদং আশুতোষং শরণাম্।

(২৩) এইরূপ ধ্যানের পর মানস পূজা—পুষ্পটি মস্তকে দিয়া মনে মনে বাবাকে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে।

মনে মনে বলিবে—ইদং তে আসনং সুস্বাগতং দেব,

এষঃ তে গন্ধঃ
এষঃ তে অর্ঘ্যঃ
এষঃ তে দীপ
এষঃ তে ধূপ
এতৎ তে পুষ্পং
এতৎ তে নৈবেদ্যং

দশ বার জপ করিবে— ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ।

(২৪) পরে মাথার পুষ্প নামাইয়া বাবার চরণে রাখিয়া বামদেবের পূজা করিবে। তিনবার স্নানীয় জল দিবে—

ইদম্ স্নানীয়ং — ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ
ওঁ এতৎ পাদ্যং — ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ
ইদমর্ঘ্যং — ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ
এষঃ গন্ধঃ — ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ
এতৎ সচন্দন পুষ্পং — ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ
এষঃ ধূপঃ — ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ
এষঃ দীপঃ — ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ

ইদং সফল বা সমষ্টি সোপকরণ নৈবেদ্যং

ওঁ ঐং সশক্তিক শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ

ইদং পানীয়ং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ

জলগণ্ডূষ দেখাইবে— ওঁ অমৃতাপি ধানমাসি স্বাহা।

ইদং আচমনীয়ং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ

ওঁ ঐং এতে গন্ধে পুষ্পে শ্রীগুরু বামদেব ষড়ঙ্গ দেবতাভ্যো নমঃ

ওঁ ঐং এতে গন্ধে পুষ্পে শ্রীগুরু বামদেব আবরণ দেবতাভ্যো নমঃ।

(২৫) প্রণাম—ওঁ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ।

(২৬) জপ মন্ত্র – ওঁ ঐং শ্রীগুরবে বামদেবায় নমঃ (১০৮ বার)

জপ সমর্পণ—ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং

জলগণ্ডূষ দান করিবে ডান হাতের উদ্দেশ্যে—
সিদ্ধি র্ভবতি মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরঃ।

(২৭) করজোড়ে প্রার্থনা—ওঁ ঐং শ্রীগুরো বামদেব ক্ষমস্ব।

(২৮) বিসর্জন মুদ্রা দেখাইবে।

(২৯) প্রণাম করিয়া উঠিবে।

সংক্ষেপে নিত্য পূজা— অপিচ্ছিলাতন্ত্রে প্রথমে আচমন, সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, ঋষ্যাদিন্যাস, করশোধন, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, তালত্রয়দান, দিগবন্ধন, প্রাণায়াম, পরে ধ্যান, মানস পূজা ও বাহ্য পূজা, পঞ্চ বা দশোপচারে। উপচার অভাবে গন্ধপুষ্পে বা শুধু পুষ্পে বা পত্রে বা তণ্ডুলে জলে মানস পূজা সারিবে। পূজা লঙ্ঘন দিবে না।

১, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৬, ২০, ২১, ২২ হইতে ২৯ প্রকরণগুলি অবশ্য করণীয়।

নৈবেদ্য নিবেদন নিয়ম--

দেবতার ডান দিকে বা সামনে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া পুষ্প দ্বারা পূজা—
—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ ও ঐ মণ্ডলে আধারে নৈবেদ্য আনিয়া বসাইবে ও বিল্বপত্র বা একটি পুষ্প উহার উপর দিবে।

ফট্ মন্ত্রে উহাতে সামান্যার্ঘ্য জল ছিটাইবে।

হুং মন্ত্রে উহাতে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইবে।

যং মন্ত্রে উহাতে চক্রমুদ্রা দেখাইবে—(দোষ শোষণ হইবে)

রং মন্ত্রে দহন

বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ—(ইহা অমৃতে পরিণত হইল ভাবিবে)

মৎস্য মুদ্রা দেখাইয়া নৈবেদ্য আচ্ছাদন করিবে।

পরে নৈবেদ্যর উপর ৮ বার 'ওঁ ঐং শ্রী গুরবে রামদেবায় নমঃ' মন্ত্র জপ করিবে।

পরে বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ বা অনামিকা দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া বলিবে—

ওঁ এতস্মৈ নৈবেদ্যায় নমঃ, ওঁ ঐং ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যং, সশক্তিক শ্রীগুরুবে রামদেবায় নিবেদয়ামি।

ও ডান হাতের অনামিকা—অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অর্ঘ্যজল নৈবেদ্যে ছিটাইবে, পরে ডান হাতে অর্ঘ্যজল গণ্ডূষ লইয়া বলিবে—

ওঁ ঐং সশক্তিক শ্রীগুরু রামদেব এতৎ জলং অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।

ও একটু জল পানীয় জলের গেলাসে দিবে।

পরে বাঁ হাত গ্রাসের ন্যায় চিৎ ভাবে রাখিয়া গ্রাস মুদ্রা দেখাইবে ও ডান হাতে প্রাণাদি পঞ্চ মুদ্রা দেখাইবে ও বলিবে—

ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা

ওঁ ব্যানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা,

ওঁ সমানায় স্বাহা,

ক্ষণকাল চিন্তা করিবে রামদেব নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন।

পরে দশ বার মূল মন্ত্র ওঁ ঐং শ্রীগুরবে রামদেবায় নমঃ, জপ করিবে।

ডান হাতে অর্ঘ্য জলগণ্ডূষ লইয়া বলিবে—

ওঁ ঐং সশক্তিক শ্রীগুরো রামদেব এতৎ জলং অমৃতাপি ধানমসি স্বাহা

অন্নভোগ দিবার নিয়ম ও এইরূপ—

কেবল ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যৎ ওঁ ঐং ইদং সংঘৃত সোপকরণ— অন্নং সশক্তিক শ্রীগুরবে রামদেবায় নিবেদয়ামি—বলিবে।

পরে প্রার্থনা—নৈবেদ্যং বা আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং স্বাদুভক্ষ্যসমন্বিতং
সোপহারং ফলং দেব যুবাণ পরমেশ্বর।

প্রণাম করিবে—ওঁ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ।

শীতল ও এইরূপে নিবেদন করিবে।

আরতি—পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ, জল, বস্ত্র, গন্ধপুষ্প, মাল্য ও চামর দিয়া করিবে। আসন হইতে বাম পা ঈষৎ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরতি করিবে। বাম হাতে ঘণ্টা বাজাইতে থাকিবে ও সঙ্গে সঙ্গে আরতিও করিতে থাকিবে। প্রথমে কোশার বাঁ দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া উহার পূজা গন্ধপুষ্পে—ওঁ আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ। এই মণ্ডলের উপর দীপাধার রাখিবে ও সামান্যার্ঘ্য জলে উহার পূজা করিবে—

এতস্মৈ দীপমালায়ৈ নমঃ,

ওঁ ঐং শ্রীগুরবে রামদেবায় নমঃ।

এই শেষোক্ত মন্ত্রটি মনে মনে জপ করিতে করিতে বাবার চরণ হইতে আরম্ভ করিবে— পদের নিকট ৪ বার

নাভির নিকট ২ বার

মুখের নিকট ৩ বার

সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার

প্রত্যেকটি দ্রব্য এইরূপ ঘুরাইবে। মোট ১৬ বার ঘুরাইলে আরতি হয়।

ও সব শেষে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবে।

নিত্য ইষ্ট পূজা

স্নানান্তে বা মানস স্নান করিয়া হাত পা ধুইয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে পূজায় বসিবার কালে প্রথম শুদ্ধ স্থানে শুদ্ধ আসনে বসিয়া ক্ষণকাল মনোমধ্যে নিজ ইষ্টদেবীর প্রশান্ত মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া মন স্থির করিয়া দিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা করিবে। পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে—

(ক) তান্ত্রিক আচমন—

গায়ত্রী পড়িয়া শিখাস্থান স্পর্শ করিবে। বাম হাতে কুশীতে জল লইয়া তাহা হইতে এক এক বার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল ডান হাতে ঢালিয়া নীচের লেখা তিন মন্ত্রের এক এক মন্ত্রে এক এক বার নিঃশব্দে জল পান করিবে।

ওঁ হ্রীং আত্ম তত্ত্বায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বিদ্যা তত্ত্বায় নমঃ

ওঁ হ্রীং শিব তত্ত্বায় নমঃ। [দ্বিজ নমঃ স্থানে স্বাহা বলিবে]

পরে হাত ধুইবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে ওষ্ঠ, অধর, দুই নাক, দুই কান, নাভি হৃদয় মস্তক ও বাহু দুটি স্পর্শ করিবে। আবার হাত ধুইবে। পরে—

(খ) আসন শুদ্ধি—

আসনের নীচে জল দ্বারা অধোমুখ একটি ত্রিকোণ আঁকিয়া হাতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া—

হ্রীং এতৎ জলম্ আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ

এই মন্ত্রে আসনে জল ছটা দিবে। দুই হাতে আসন ধরিয়া মন্ত্র বলিবে।—

অস্য আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোবেশনে বিনিয়োগঃ। পরে করযোড়ে বলিবে—

নমঃ পৃথ্বি ত্বয়া লোকা দেবিত্বং
বিষ্ণুনা ধৃতা, ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং
পবিত্রং কুরুচাসনম্।

(গ) পরে—গুরু আদি নমস্কার—

করযোড়ে ভক্তির সহিত বামকানের উর্দ্ধে

মন্ত্রদাতা	মন্ত্রটি
ঐং গুরুভ্যো নমঃ	ঐং পরম গুরুভ্যো নমঃ শিব

মন্ত্রের দেবতা

ঐং পরাপর গুরুভ্যো: নম: ঐং পরমেষ্টি গুরুভ্যো: নম:

(ঐং পরাৎপর গুরুভ্যো নম: বৈষ্ণবগণের অতিরিক্ত)

ডান কানের উর্দ্ধে—গাং গণেশায় নম:

মধ্যে—ক্রীং শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়ৈ নম:

(ঘ) জলশুদ্ধি—

অঙ্কুশ মুদ্রায়—গঙ্গে চ ইত্যাদি

হূং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন ও মূলমন্ত্র ১০ বার জপ।

অভিষেচন—

কোশার জল ডান হাতের তত্ত্ব মুদ্রার দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগ্য ভুমিতে ৩ বার ছিটা, পরে ৭ বার ঐরূপ জল মস্তকে ৭ বার অভিষিঞ্চন। ভূমি ও তুমি পবিত্র হইলে চিন্তা করিবে।

(ঙ) প্রাণায়াম—

করন্যাস ও অঙ্গন্যাস—

(চ) অঘমর্ষণ—

বাম হাতে জল লইয়া ডান হাতে আচ্ছাদন হং যং বং লং রং তিনবার পাঠ, অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া বিন্দু বিন্দু জল তত্ত্ব মুদ্রায় ৭ বার মূলমন্ত্রে ছিটাইয়া দিবে —"সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি" হইল এই চিন্তা।

তৎপরে বাম হাতের অবশিষ্ট জল ডান হাতে লইয়া ডান নাকের নিকট ধরিয়া উহাকে তেজোময় চিন্তা করিবে ও ডান নাক বন্ধ করিয়া বং মন্ত্রে বাম নাকে নিঃশ্বাস টানিয়া দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেহের সমস্ত পাপ ধোত করিয়া, বাম নাক বন্ধ করিয়া ডান নাকে বায়ু ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিবে পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ জল বাহির হইল সেই জল সম্মুখে বজ্রশিলা আছে মনে করিয়া ফট্ মন্ত্রে সেই শিলার উপর ছুঁড়িয়া দিবে। এইভাবে দেহের পাপ পুরুষ বিনষ্ট হইল ও তুমি নিষ্পাপ হইলে।

ইহার পর হাত ধুইয়া পুনরায় আচমন করিবে।

তারপর এক এক গণ্ডুষ জল দিবে এই ভাবে।

(ছ) তর্পণ—

দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ ঋষীস্তর্পয়ামি নমঃ

পিতৃস্তর্পয়ামি নমঃ মনুষ্যাস্তর্পয়ামি নমঃ

ঐং গুরুং তর্পয়ামি নমঃ ঐং পরম গুরুং তর্পয়ামি নমঃ

ঐং পরাপর গুরুং তর্পয়ামি নমঃ ঐং পরমেষ্টি গুরুং তর্পয়ামি নমঃ

বৈষ্ণবপক্ষে ঐং পরাৎপর গুরুং তর্পয়ামি নমঃ

বিশেষ অতিরিক্ত বৈষ্ণবদের প্রত্যেক মন্ত্রে তিনবার তর্পণ যথা—

ওঁ নারদং তর্পয়ামি ওঁগর্ব্বতং তর্পয়ামি

ওঁ বিষ্ণুং তর্পয়ামি ওঁ নিশধং তর্পয়ামি

ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি ওঁ দারুকং তর্পয়ামি

ওঁ বিশ্বকসেনং তর্পয়ামি ওঁ শৈনেয়ং তর্পয়ামি

ওঁ গুরুং তর্পয়ামি।

ইষ্ট তর্পণ—

ক্রীং সপরিবারাং দক্ষিণ কালিকাং তর্পয়ামি নমঃ (স্বাহা)।

(জ) সূর্য্যার্ঘ্য—

রক্তচন্দন দুর্ব্বাদি সহযোগে অথবা শুধু জল দিয়া দ্বিজতি পক্ষে

ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য বা হ্রীং হংসঃ

ইদমর্ঘ্যং শ্রী সূর্য্যায় স্বাহা

অপরে হ্রীং এষোহর্ঘ্য শ্রী সূর্য্যায় নমঃ

কালীতারাদি—(দ্বিজতি পক্ষে)

হ্রীং হংসঃ মাউণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় ইদমর্ঘং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা

অপরে—

হ্রীং মাউণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায়

এষোহর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ

(ঝ) ইষ্ট অর্ঘ্য—ইষ্টকে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে চিন্তা করিয়া অর্ঘ দিবে—

কৃষ্ণ গায়ত্রী—ওঁ (নমঃ) সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থায় ইদমর্ঘ্যং (এষোহর্ঘ্যঃ)

শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা (নমঃ)

দুর্গা গায়ত্রী ... . শ্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ

কালীতারা ইষ্ট গায়ত্রী ওঁ (নমঃ) উদ্যদাদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্তিন্যৈ
নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং (এষোঽর্ঘ্যঃ)
শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ। একজটায়ৈ। শ্রীত্রিপুরাসুন্দর্যৈ দেবতায়ৈ
(নমঃ) স্বাহা।

পরে গায়ত্রী, ধ্যান, জপ

(এ) জপ সমাপন প্রণাম, স্তব, কবচ পাঠ ইত্যাদি।

১। বীজ মন্ত্র—ক্রীং

২। এই মন্ত্রের গায়ত্রী—

কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ

৩। এই মন্ত্রের দেবীর ধ্যান—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল কর্ত্তৃকাকরাং।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।

৪। (ক) ঋষ্যাদিন্যাস—(করযোড়ে)

অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিঃ উষ্ণিক্‌ছন্দঃ
শ্রীদক্ষিণাকালী দেবতা, হ্রীং বীজং হূং শক্তিঃ,
ক্রীং কীলকং পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

(খ) ন্যাস করিবে—(পুষ্প বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা)

মাথায় ঠেকাইয়া বলিবে—ভৈরব ঋষয়ে নমঃ
মুখে " " —উষ্ণিক্ ছন্দসে নমঃ
হৃদয়ে " " —দক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ
মূলাধারে " " —হ্রীং বীজায় নমঃ
দুই পায়ে (পাদয়ো) —হূং শক্তয়ে নমঃ
সর্ব্বাঙ্গে করতল দ্বারা —ক্রীং কীলকায় নমঃ

করন্যাস—

ক্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ
ক্রীং অর্জ্জুনীভ্যাং নমঃ
ক্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্
ক্রৈং অনামিকার্ভ্যাং হূং
ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট
ক্রঃ করতল পৃষ্টাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্

৬। অঙ্গন্যাস—

ক্রীং হৃদয়ায় নমঃ
ক্রীং শিংবসে নমঃ
ক্রুং শিখায়ৈ বষট্
ক্রৈং কবচায় হূং
ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্
ক্রঃ করতল পৃষ্টাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্

পরে পূজা, ইষ্ট মন্ত্র জপ, জপ সমর্পণ ও প্রণাম।

৫৪

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২৬	১৪	অপসপিণ্ড	অপসর্পন্তু
”	১৫	শিবাজ্জয়া	শিবাজ্ঞয়া
”	২৮	দেবিত্ব	দেবিত্বং
৫২৭	১৭	ব্রহ্মভূমে	বজ্রভূমে
”	২৪	গ্রন্থিস্তাদন	গ্রন্থিবন্ধন
৫২৯	১০	মুখদং	সুখদং
”	১৬	দীপ	দীপঃ
”	১৭	ধুপ	ধূপঃ
”	২৪	ওঁ এতৎ	এতৎ
৫৩০	১	সমষ্টি	সমিষ্টি
”	৪	ধানমাসি	ধানমসি
৫৩৩	১৯	আসনোবেশনে	আসনোপবেশনে
”	২৭	নমঃ শিব	নমঃ
৫৩৫	১	ঋষীস্তর্পয়ামি	ঋষীংস্তর্পয়ামি
”	২	মনুষ্যাস্তর্পয়ামি	মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি
”	২০	দ্বিজতি	দ্বিজাতি
”	২১	মাউণ্ড	মার্ত্তণ্ড
,,	২৪	মাউণ্ড	মার্ত্তণ্ড
৫৩৬	৪	শ্রীত্রিপুরাসুদর্ষে	শ্রীত্রিপুরাসুন্দর্য্যৈ
৫৩৭	২	ক্রীং ক্রীং	ক্রাং ক্রাং